বাংলা কাব্যে শিব

গুরুদাস ভট্টাচার্য

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭
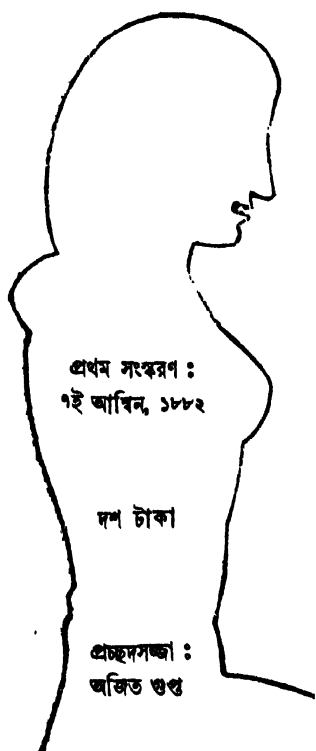
প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন, ১৮৮২

দশ টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীহরলাল বর্দ্ধন, বর্দ্ধন প্রেস,
৮।৪এ, কালীঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

৺ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত স্মরণে

রচনাকাল : ডিসেম্বর, ১৯৫১—মে, ১৯৫৬

॥ প্রাক্-কথা ॥

ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে যে কয়েকজন সর্বজনপ্রিয় দেবতা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হয়ে আসছেন, শিব তাঁদের অন্যতম। হাজার হাজার বছর ধরে তাঁর চারপাশে নানা কাহিনী ও সাধনা, ভক্তি ও বিস্ময় গড়ে উঠেছে। সাধক ও সন্ধানীর কাছে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন নানা রূপে ও রসে। দেবাদিদেব শিবের এই বিরাট ও ব্যাপক বিবর্তন-ইতিহাসের পর্যালোচনা দেশী-বিদেশী বহু মনীষী বিভিন্ন সময়ে করেছেন। এই আলোচনার অনেকগুলি মূলত ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক; শিব এখানে প্রসঙ্গত উল্লিখিত ও স্বল্প-আলোচিত। কয়েকজনের শিব-সম্পর্কীয় গবেষণা অবশ্য ধারাবাহিক সুবিহিত ও সুসমঞ্জস। এঁদের সকলের আলোচনাই কঠোর পরিশ্রম ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফল।

তথাপি শিব সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেছি দুটি কারণে।

পূর্বসূরিগণ যে-শিবের পর্যালোচনা করেছেন, তিনি মুখ্যত উত্তরভারতের অভিজাত সমাজ ও মানসের রুদ্রশিব—ঋগ্বেদ থেকে পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্য অবধি তাঁর সীমা। কিন্তু এই সীমার বাইরেও শিব ছিলেন এবং কালপ্রবাহে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। তার মধ্যে দক্ষিণ ও পূর্বভারতে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে, তাঁর যে ক্রম-বিবর্তন হয়েছিল, তার ব্যাপক অনুসন্ধান আজ পর্যন্ত হয়নি। আবার দক্ষিণদেশীয় শিব সম্পর্কে যতটা আলোচনা হয়েছে, বাঙলাদেশের শিব সম্পর্কে ততটাও হয়নি। আমাদের মুখ্য আলোচ্য—'বাংলা কাব্যে শিব' এবং প্রাসঙ্গিকভাবে বাঙলার লোকায়ত সমাজে তাঁর রূপ ও রূপান্তরের যথাসম্ভব ইতিহাস পর্যবেক্ষণ। ইতঃপূর্বে শিবের যে আলোচনা হয়েছে, তা মূলত গ্রন্থ-নির্ভর—অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র ও ধ্রুপদী সাহিত্যে শিবের যে রূপ ও কথা চিত্রিত হয়েছে, তার অনুসন্ধান। কিন্তু শিবের উদ্‌ভব শাস্ত্রে ও সাহিত্যে নয়, তারও অনেক আগে, জনসমাজের কর্ম ও কল্পনায়। তাঁর ইতিহাসের উৎস-সন্ধানে এবং ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণে শাস্ত্র-সাহিত্যের বিশ্লেষণের পাশেপাশে সমাজ-দর্শনেরও প্রয়োজন আছে। পূর্বগামী কিছু আলোচনায় এই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। আমাদের মতে, শিবের উদ্ভব ও বিকাশের মূল সমাজজীবনের অনেকগুলি কার্য-কারণের মধ্যে নিহিত এবং জনগণের মধ্যে বহমান লোকায়ত সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে সেইসব কার্য-কারণের সূত্রগুলির সন্ধান-লাভ সম্ভব। বস্তুজাগতিক জীবনসংগ্রামের আদিম ও রুক্ষ ভিত্তির ওপর দেবতার প্রথম প্রতিষ্ঠা, পরবর্তীকালের উন্নততর সমাজ ও মনন তাঁকে একদিকে ধর্মশাস্ত্রবৃত অন্যদিকে কাব্যরূপায়িত করেছে—আমাদের পর্যালোচনা এই দৃষ্টিকোণ থেকে। অতএব বাংলা কাব্যে বিধৃত শিবের রূপসী চিত্রের অনুসন্ধানে আমরা মুখ্যত

বাঙলার লোকসংস্কৃতির দ্বারস্থ হয়েছি। দেশজ ধর্মশাস্ত্রে অঙ্কিত শিবরূপের স্বতন্ত্র পর্যালোচনা করিনি, তবে প্রয়োজনস্থলে উল্লেখ করেছি।

বাঙালীর মানসে ও মননে শিবের যে রূপ ও রূপান্তর, তার উৎস-বিন্দু এবং ক্রমবিকশিত রেখাগুলির অনুসন্ধানই আমাদের মুখ্য কর্তব্য। সমগ্র ভারতবর্ষে শিব-রূপের যে অভিনব প্রকাশ-ইতিহাস, তা (সমাজতাত্ত্বিক মানদণ্ডে তার বিচার-বিশ্লেষণ অবশ্যকর্তব্য হলেও আপাততঃ) আমাদের আলোচনার পরিধির বহির্ভূত। কিন্তু ভারতশিবের উৎস-সন্ধান ও ইতিহাস-বিশ্লেষণ ব্যতীত বাঙলাদেশের শিবের পরিচয় অসম্পূর্ণ। তাই প্রথমে প্রাক্-বঙ্গীয় শিবের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আমাদের এঁকে নিতে হয়েছে। একই কারণে, দাক্ষিণাত্যের শিবের স্বতন্ত্র পর্যালোচনা না করে সমান্তরাল দৃষ্টান্তগুলি প্রয়োজনস্থলে উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে।

বাংলা কাব্যে ও সমাজে লোকায়ত শিবের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে আরও দুটি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে।

লোকায়ত সংস্কার ও সংস্কৃতি শিবের রূপ-চরিত্রের ভিত্তি গঠনে ও বিকাশে যেভাবে প্রভূত সহায়তা করেছে, একইভাবে অন্যান্য দেব-দেবীর গঠন-ইতিহাসের ক্ষেত্রেও লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির এই দানকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। এবং শিবের রূপান্তর ও বিকাশ একটি দেবতার ইতিহাসমাত্র নয়। তার পশ্চাতে বহুসমাজের বহুমানুষের বহুমানসের কর্ম ও ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। দেবতার বিবর্তন সেই সামাজিক কর্ম ও তন্নিষ্ঠ মনোভাবেরই বিবর্তন। তাই 'বাংলা কাব্যে শিব'—একটি দেবতার পর্যালোচনা দৈবকথা মাত্র নয়, বাঙালীর জীবন ও মানসের সমাজ ও সংস্কৃতির (একটি বিশেষ দিকের) ইতিহাস-দর্শন এবং ইতিহাস-চিত্রও।

অধ্যাপক টয়েনবী বলেছেন: In any age of any society the study of history, like other social activities, is governed by the dominant tendencies of the time and the place (A Study of History, vol. I)। ইতিহাস স্থানকালবিধৃত। সেই ইতিহাস গড়ে তোলে যে মানুষ, সেই মানুষও স্থানকালবিধৃত। সে যেমন স্বয়ম্ভূ নয়, তেমনি তার কর্মচিন্তাও স্বয়ংক্রিয় নয়। তার জীবন ও মানসের পশ্চাতে বাহিরজগৎ ও মনোজগতের অনেক বোঝাপড়া নিহিত থাকে। এই পথেই তার সংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তর। বাহির ও অন্তরের এই বোঝাপড়ার কথা উল্লেখ করে নৃতত্ত্ববিদ্ ম্যালিনওস্কী বলেছেন: no art or craft, however primitive, could have been invented or maintained, no organised form of hunting fishing tilling or search for food could be carried out without the careful observation of natural process and a firm belief in its regularity, without the power of reason (Magic, Science and Religion)। আদিম মানুষ পৃথিবী ও প্রকৃতির নিয়মকে বোঝবার

চেষ্টা করেছে এবং সেই লব্ধ জ্ঞানকে আশ্রয় করে খাদ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছে। জ্ঞানকে তারা (অজ্ঞাতে) প্রয়োগ করেছে বৈজ্ঞানিক রীতিতে; কিন্তু উন্নত বুদ্ধি ও বিজ্ঞানদৃষ্টির অভাবে তারা এগুলির ওপর বিশ্বাস ও কল্পনার আরোপ এবং জাদু-বিদ্যার প্রয়োগ করেছে। এই জাদুবিদ্যা তথা 'কৃত্যের' আধারে জন্ম নিয়েছে নাচ-গান-শিল্প-সাহিত্য। আদিম সংস্কৃতি 'কৃত্যিক', তার আবর্তন-বিবর্তন সবই প্রয়োজনের জগৎকে ঘিরে। যে-মন নিয়ে তখনকার মানুষ হাতিয়ারের মুঠি ধরেছে, মাটিতে পা ফেলেছে, সেই মন নিয়েই তারা প্রকৃতি-প্রমথের আধাভৌতিক পূজা করেছে, অপরিজ্ঞাত বিজ্ঞান-বিদ্যার অনুশীলন করেছে, রচনা করেছে শিল্পের বিবিধ আল্পনা। তাদের এই কর্মতৎপরতা, জাদু, কল্পবৃত্তি, বিজ্ঞানবুদ্ধি, অন্ধ বিশ্বাস এবং শিল্পচেতনা একই ভিত্তি থেকে জাত হয়েছে, একত্রে থেকেছে এবং একই সঙ্গে একই বাস্তব প্রয়োজনে প্রযুক্ত হয়েছে। সে বাস্তব প্রয়োজন—বেঁচে থাকার দুরন্ত তাগিদ। কালপ্রবাহে পৃথিবীর বয়স বেড়েছে, সমাজ ও মনের নানা রূপান্তর ও অগ্রগতি ঘটেছে; যারা একদিন এক-আধারে ছিল, তারা ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে; একই উৎসে যাদের জন্ম, স্ব-স্ব পথে তাদের বিবর্তন হয়েছে, পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে, বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতি জটিলতর হয়ে উঠেছে।

জীবন ও মানসের এই বিচিত্র ক্রম-স্থিতি লক্ষ্য করে ঐতিহাসিক বলেছেন: মানবসংস্কৃতি is a picture of astonishing creation, of form rising out of chaos, of one road after another being opened from the animal to the sage (The Story of Civilization: Our Oriental Heritage—Will Durant)। সেই কোন্ অজানা আদিম উৎসে সংস্কৃতির প্রথম আবির্ভাব; তারপর কাল ও কলার সিঁড়ি পেরিয়ে পেরিয়ে, ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর ঘট ভরে ভরে সে এগিয়ে এসেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, পৌঁছেছে সাম্প্রতিকের মোহনায়। দেবতত্ত্বের ইতিহাস এই দ্বন্দ্বজটিল সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। তারও জন্ম প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগসন্ধিক্ষণে: তারপর কাল-কলা-কলাবিদের নিরন্তর সহযোগে তার অনিবার অগ্রস্থিতি ও ক্রমরূপান্তর, তার আবর্তন ও বিবর্তন, বৈচিত্র্য ও জটিলতা।

'দি এভল্যুসন অফ্ ফিজিক্স্' গ্রন্থের ভূমিকায় আইনস্টাইন ও এনফিল্ড্ বলেছেন: Our intention was to sketch in broad outline the attempt of the human mind to find a connection between the world of ideas and the world of phenomena. We have tried to show the active forces which compel science to invent ideas corresponding to the reality of our world। বাস্তব ও মনোজগতের এই সম্বন্ধের আবিষ্কার এবং তথ্যনির্ভর যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণই সংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত ইতিবৃত্ত। বিভিন্নের-বিচিত্রের সমবায়ে যে জীবন ও মানস গড়ে ওঠে, সমাজ-বিজ্ঞানের সর্বঙ্কর দৃষ্টি-আলোকে ধরা পড়ে তাদের রহস্য ও রীতি, ক্রিয়া ও

প্রতিক্রিয়া, স্বরূপ ও রূপান্তর। বাহির ও অন্তরের যোগে যে মানুষ সমগ্র, তাকে নানাদিক থেকে সমগ্রভাবে জানাই সত্য করে জানা—এই নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে সামনে রেখে শৈব সংস্কৃতির পর্যালোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনায় এই সমাজবিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচেতনা এবং প্রয়োগকলার আভাস পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য: সাহিত্য-গ্রন্থের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'সাহিত্যসৃষ্টি' এবং সমাজ-গ্রন্থের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রভৃতি। কবি এখানে শিল্পসৃষ্টিকে দেখেছেন বস্তুদৃষ্টি নিয়ে, সাহিত্যের ফুলকে খুঁজেছেন 'ইতিহাস-বনস্পতির' শাখা-প্রশাখায়, জেনেছেন—'বৃত্তিগত ভেদে চিত্তগত ভেদ' এবং 'সংঘাত মাধ্যমে সভ্যতার যৌগিক বিকাশ' ঘটে। রামসীতা-কাহিনী কেমন করে 'কৃষিকথা' থেকে 'গৃহকথায়' উপনীত হয়েছে, তার পর্যালোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন: 'ইহা নিঃসন্দেহ যে এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে'। এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করেছেন: 'কিন্নরজাতিসেবিত হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া কোন শুভ্রকায় রজতগিরিনিভ প্রবল জাতি এই দেবতাকে বহন করিয়া আনিয়াছে? অথবা ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা অথবা ক্রমে উভয় দেবতায় মিশ্রিত হইয়া ও আর্য উপাসকগণ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় আর্য দেবতত্ত্বের ইতিহাসে আলোচ্য। সে ইতিহাস এখনো লিখিত হয় নাই।'

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত এই সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা ও পর্যবেক্ষণরীতি আমাদের গবেষণার সূত্ররেখা। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীর আহৃত তথ্যগুলি আমাদের চলন-পথের ও সিদ্ধান্তে উপনীতির পাথেয়। কোন বিশিষ্ট 'স্কুল' অথবা পূর্বনিহিত কোন তত্ত্বের মানদণ্ডে তথ্যের বিচার নয়, তথ্য থেকে সত্যে উপনীতির প্রয়াসই এই পর্যালোচনার মৌল ধর্ম। শিব সম্পর্কে সংগৃহীত যাবতীয় তথ্যের 'সাধারণীকরণ' করে যে 'সামান্য-ধর্মগুলি' লক্ষ্যগোচর হয়েছে, সেগুলিকেই শিব-সংস্কৃতির উপাদান এবং সত্য রূপ বলে গ্রহণ করেছি। সেই রূপ এবং সেই উপাদান-গুলিই বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বছরের শৈব ইতিহাসের আলোচনায় পূর্বগামী সূরিদের মূল্যবান গবেষণা থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। মতানৈক্যের স্থলে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি। আলোচনার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে মুদ্রিত গ্রন্থ ও অমুদ্রিত পুঁথি থেকে। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের শৈব কথা-গান-অনুষ্ঠান ও তীর্থের অনেকগুলি বিবরণ ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ যোগা-যোগের মাধ্যমে আহৃত হয়েছে।

প্রবন্ধটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনার পর বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় পরীক্ষকদের অনুমতি নিয়ে সেগুলি থেকে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও উদ্ধৃতি মুদ্রিত গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে এবং গ্রন্থগুলি তারকাচিহ্নিত

করা হয়েছে। পরিশিষ্টে পাদটীকা, গ্রন্থপঞ্জী ও শব্দ-সূচী সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সঙ্গে তরুণ কবিতায় বিধৃত শিবরূপের ছবিগুলিও সংযোজিত করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অধিকাংশ রচনা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকায় সমস্ত ছবিগুলি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি। ভবিষ্যতে এই কর্তব্য সম্পাদনের আশা রইল।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে গবেষণাকালে বহু শুভানুধ্যায়ীর স্নেহ ও প্রীতি লাভ করেছি। বস্তুনির্বাচন এবং বিষয়ে প্রবৃত্তিদান করেন শ্রদ্ধেয় আচার্য পরলোকগত ডক্টর সুধীর কুমার দাশগুপ্ত। তাঁর আগ্রহ ও আশীর্বাদ আমার এই গবেষণাকার্যের প্রেরণাস্বরূপ। গ্রন্থটি তাঁর স্মরণে নিবেদন করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের সস্নেহ ধৈর্য, আন্তরিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় উপদেশ আমার মানসিক অগ্রস্থতিতে যে প্রেরণা দান করেছে, তা আমার জীবনে পরম সম্পদ। অন্যতম পরীক্ষকদ্বয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন এবং ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে নিবন্ধটি পরীক্ষা করেছেন, সে-কথা কখনও ভুলব না। গ্রন্থমুদ্রণের পূর্বে প্রবন্ধটি পাঠ করে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী আমার প্রতি অহৈতুকী স্নেহ বর্ষণ করেছেন। বিশ্বভারতী পুঁথিবিভাগ এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ দান করে অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল প্রীতিপূর্ণ উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথিকে সহজপ্রাপ্য করে দিয়েছেন জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বহরমপুর গার্লস কলেজ এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ। আই. এ. পি. প্রাঃ লিঃ-এর অন্যতম কর্ণধার শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ. আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে গ্রন্থটি প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন ; তাঁর সহৃদয়তা, সহযোগিতা ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি। শ্রীপুষ্পেন দাশগুপ্ত এম. এ, শ্রীহিরণ্ময় চৌধুরী এম. এ., বি., টি., বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী এবং প্রকাশনা ও মুদ্রণ কর্মীদের সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থরচনাকালে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয়া ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী উষা ভট্টাচার্য এবং ভারতীয় জাদুঘর-প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী কিউরেটর মনিরা খাতুন এম. এ.।

যাঁদের গ্রন্থ থেকে তথ্য ও আলোচনা সংগ্রহ করেছি, যাঁরা আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন ও উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, আমার দেশের সাধারণ মানুষ : পল্লী-অঞ্চলে তথ্য আহরণকালে যাঁদের কাছে পেয়েছি সরল ও সহৃদয় ব্যবহার, যাঁরা একদিন মন মিলিয়েছেন আমার মনে—তাঁরা সকলেই রইলেন আমার সানন্দ স্মরণিকায়, আমার বাদলদিনে আর বাদলগানে॥

রবীন্দ্র-শতাব্দ। কলকাতা॥ গুরুদাস ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

শিবরূপ

আধুনিক যুগ

সংকেত

A. S. B	Asiatic Society of Bengal.
C. H. I.	Cultural Heritage of India.
E. B S. P.	Early Bengali Saiva Poetry.
Ency. Brit.	Encyclopoedia Britanicca.
E. R. E.	Encyclopoedia of Religion and Ethics.
I. V. C.	Indus Valley Civilisation.
J. A. S. B.	Journal of the Asiatic Society of Bengal.
M. J. D. & I. V. C.	Mohen-jo-Daro and Indus Valley Civilisation.
O. R. C.	Obscure Religious Cults.
Pr. Fl. N. I.	Popular Religion and Folklore of North India.
R. Fl. N. I.	Religion and Folklore of North India.
V. G. S. I.	The Village gods of South India.
অ:	অধ্যায়।
আ. বা. প.	আনন্দবাজার পত্রিকা।
ক. বি.	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢা. বি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্র.	প্রকাশক।
ব. ভা. সা.	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।
ব. সা. প.	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
বা. দে. ই.	বাঙলা দেশের ইতিহাস।
বা. প্রা. পু. বি.	বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।
বা. ম. ই.	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।
বা. সা ই.	বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস।
স.	সম্পাদক।
সং.	সংস্করণ।
সা. প. গ্র.	সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী।
সা. প. প.	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

ভূমিকা

সংস্কৃতির ধারা

সংস্কৃতি বলতে সাধারণত কল্পনাভাবনাজাত সৃজনীশিল্পকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সমগ্র জীবনই সংস্কৃতির অন্তর্গত। সংস্কৃতির এই সামগ্রিক রূপটি উপনিষদের 'পঞ্চকোষতত্ত্বে' বিধৃত হয়েছে। এক সর্বাতিশায়ী জীবন-দর্শনের আলোকে ঋষি উপলব্ধি করেছিলেন: ব্রহ্ম অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময় এই পাঁচটি কোষে সমভাবে বিদ্যমান। ব্রহ্ম স্থানে যদি জীবন ধরি, তবে সংস্কৃতিকে সত্য ও সমগ্রভাবে উপলব্ধি করতে পারব। পঞ্চকোষ ও তার নানা বৈচিত্র্য-ঐক্য নিয়ে মানুষ, মানুষের জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি। এদের জানতে হলে অন্নময় থেকে আনন্দময় অবধি মানুষের জীবন ও মননের যে বিচিত্র গতি-প্রকৃতি, তাকে জানতে হবে। এই জানা, এই দর্শনই সমাজবিজ্ঞানসম্মত। তাই সংস্কৃতির বিচারণায় সমাজতত্ত্ব একমাত্র মানদণ্ড।

মার্কস বলেছিলেন: Man adopts as an all-sided being in an all-sided manner। অর্থাৎ বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ কর্ম ভাবনা জীবন মনন সমস্ত মিলিয়ে মানুষ সম্পূর্ণ। তার এই বহুমুখীনতা মূলত পরিবেশ-নির্ভর। সামাজিক আর্থিক রাষ্ট্রনৈতিক বস্তুভূমিকে ভিত্তি করে মানুষের মন সক্রিয় ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে, হৃদয়-সহায়ে গড়ে ওঠে মানস-সংস্কৃতির রূপময় প্রাসাদ। ক্রিস্টোফার কডওএল বলেছেন: Economic production, in its primary form of metabolism, necessarily appears before love, for it is the essence of life[১]। আদিম সংস্কৃতির বিশ্লেষণে ফ্রেজার দেখেছিলেন: To live and to cause to live, to eat food and to beget children, these are the primary wants of man in the past[২]। পঞ্চকোষতত্ত্বের প্রথম তত্ত্ব তাই অন্ন এবং ব্রহ্মই অন্ন <ঋক্ ১০. ৭১. ৯>। বেঁচে থাকার এই আদিম ও প্রাথমিক প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে ক্রমে ক্রমে রূপলাভ করেছে অপ্রয়োজনের জগৎ, তারপর সে স্বকীয় পথে বিকশিত-বিবর্তিত হয়েছে। স্রষ্টার ভাবনা-বাসনা একদিকে পরিবেশের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়: The ideas and views put forward in his works no longer depend on his will, but are...determined by the objective conditions and the inter-relation of classes[৩]; অন্যদিকে, শিল্পের প্রয়োগরীতি ও শিল্পিমনের অবদানও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে স্রষ্টাকে

সুগঠিত ও নিয়মিত করে। বাস্তব জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি শিল্পিমানসে বাসনালোকের সৃষ্টি করে, শিল্পী প্রকাশ করেন ভাবকে রূপে-রসে। আবার এই শিল্প রূপ গ্রহণান্তে কর্মকে গতি দেয়, মনকে প্রেরণা দেয়, বিবর্তনকে সহায়তা দান করে। বস্তুভূমি ও রূপলোক এইভাবে পরস্পরের সহায়ে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। এক পরম মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে এই কর্ষণ-কলার কাব্যরূপ :

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙ্গলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে—
মনের অন্ন ফলে। <স্ফুলিঙ্গ>

এক কোটিতে অন্ন, অপর কোটিতে আনন্দ, মধ্যে প্রাণ-মন-প্রজ্ঞার ধারাবাহিক আলোকসম্পাত।

ধর্ম এই মাঠের ও মনের ফসলের একটি গুচ্ছ। যখন বলা হয়, Religion, in the concrete, is a mode of behaviour, a system of intellectual beliefs, and a system of feelings held by and current among human beings who form a society[৪], তখন ধর্মের প্রাথমিক গঠনে সমাজ-বন্ধনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ধর্মের সঙ্গে বস্তুজীবনের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, পরিবেশবিরহী ধর্মের কোন প্রতিষ্ঠা নেই। বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে কৃত্য ধর্ম ও তজ্জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রাথমিক ও মানসী পরিকল্পনা, সংগীত নৃত্য শিল্পাদির রচনা—(সচেতনভাবে) জীবনকে সুন্দর ও (অবচেতনে) মননকে তৃপ্ত করতে। আদিম যুগে (নব্য প্রস্তর) মানুষ ছিল সমাজ-অনুগত, সংগীত নৃত্য ধর্মও ছিল সমাজগত ও পরস্পরসংশ্লিষ্ট[৫]। আদিম মানুষ সমবেতভাবে কাজ করত, নাচগান করত; কৃত্য-ঘনিষ্ঠ কাব্য ও নৃত্যগীতাদি ছিল জীবনসংগ্রামের অবশ্য-প্রয়োজনীয় হাতিয়ার: Poetry combined with dance, ritual and music becomes the great switch-board of the instructive energy of the tribe, directing it into trains of collective emotions whose immediate causes are not in the visual field and which are not automatically decided by instincts[৬]। এর দ্বারা প্রয়োজনের দাবিই যে শুধু তৃপ্ত হত তা নয়, মানবমনের প্রকাশবেদনাও শমিত হত। এইসব কৃত্য-শিল্প একদিকে যেমন বস্তুজাগতিক প্রয়োজনসিদ্ধির সহায়ক জাদুবিদ্যা ছিল: the adaptation of man's emotions to the necessity of social co-operation[৭], অন্যদিকে তেমনি মনোজাগতিক ভাবস্ফূর্তির সহায়কারী সৃজন-শিল্পও ছিল: Ritual, then, does imitate, but for an emotional,

not an altogether practical end[৮]। এই আবেগ ব্যষ্টিগত নয়, সমষ্টিগত, জাগতিক দাবির উদ্বৃত্ত মানসিক ফসল নয়, প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভূত অপ্রয়োজনের আনন্দ। তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকত ভয়, বিস্ময়—প্রকৃতি পরিবেশ জন্ম মৃত্যু যৌনতা সামাজিকতা আত্ম ও আত্মা সম্পর্কে। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দেখা দিতে থাকে: 'নানা ব্যবহারিক কারণে আমাদের সামাজিক জীবনে যে জিনিসটি একটি বহুমূল্য লাভ করে তাহা আস্তে আস্তে একটি ধর্মমূল্য অর্জন করিয়া বসে। দেখা যায়, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজচিত্তের কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন, তাহারই ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মবস্তুতে বা ধর্মানুষ্ঠানে রূপান্তর'[৯]। আদিম সমাজে উৎসব অনুষ্ঠান দেবতা নৃত্য গীতি কাহিনী কাব্য একই কৃত্যের আধারে মিলেমিশে ছিল; সমাজের ক্রম-রূপান্তরে জাদুবিদ্যা যেমন ধর্মে ও বিজ্ঞানে উপনীত, তেমনি নাচগানকথা ইত্যাদি বস্তুভূমি থেকে সরে সরে গিয়ে বিশুদ্ধ শিল্পরূপ নিতে থাকে, পরস্পর-বিশ্লিষ্ট হয়ে বিকশিত-বিবর্তিত হতে থাকে নিজ নিজ কক্ষপথে, একদা 'সমাজের আবশ্যকের অনুরোধে যাহা প্রচলিত হয়, ক্রমে তাহার সহিত ভাবের সৌন্দর্য জড়িত হইয়া পড়ে'[১০]। তখন স্বকীয় স্বতন্ত্র পথে রূপ ও রূপান্তর লাভ করে তত্ত্ব দর্শন কথা কাব্য নৃত্য গীত শিল্প সাধন কৃত্য ধর্ম দেবতা। সংস্কৃতি হয় দ্বিধাবিভক্ত, কালপ্রবাহে বহুধাবিভক্ত—যেমন একটি সমাজ ভেঙে পরিণত হয় বিভিন্ন শ্রেণীতে-সম্প্রদায়ে।

স্থানকালপাত্রের পার্থক্যে নামে ও রূপে সাধ্য ও সাধনে বিভিন্ন গোষ্ঠী ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়, স্বাতন্ত্র্য জাগে আবেশে ও প্রকাশে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ভাষা চিন্তা আচার ও জীবনধারা যেমন স্বতন্ত্র, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যেও তেমনি স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান থাকে। জৈব প্রয়োজনের তরঙ্গদোলায় দুটি বিভিন্ন সমাজের সংস্কৃতি প্রতিবেশী হলে সংঘাত ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক জীবনধারা ও মননের বিনিময় হতে থাকে :When a country is successfully invaded by a new religion, the old gods are not immediately dismissed from being. Their existence is still recognised by the new religion but their position is altered. For those of them who are rooted too deeply in the affection of the people to be dethroned entirely, some position in the new religion is found by accommodation[১১]। বস্তুজাগতিক ক্ষেত্রে যেভাবে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় ঘটে থাকে, ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্রনাথ 'যাত্রী'তে এই ভাবটিকে ব্যক্ত করেছেন: 'সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ। প্রজা বেড়ে যায়, তখন খাদ্য নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন নব নব ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রসারিত করতে হয়। চিত্তের প্রসার বেড়ে যায়, তখন যারা সঙ্কীর্ণ প্রথাকে আঁকড়ে থাকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে যারা সত্যকে প্রশস্ত ও

গভীরভাবে গ্রহণ করতে চায় ’ এবং ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা’য়: ‘এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে এইরূপ সংঘাতেই মানুষ রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।’

ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী নিগ্রোবটু আজ নিঃশেষিতপ্রায়। কিন্তু তাদের বৃক্ষপূজা, মৃতাত্মার ধারণা ইত্যাদি আজও আমাদের সংস্কৃতিতে বহমান। আদি অস্ট্রেলীয়দের জীব ও প্রাণিপূজা লিঙ্গ-উপাসনা ব্রহ্মাণ্ড-ধারণা পশুদেবতা ও গ্রামকেন্দ্রিক উৎসব, দ্রবিড়ভাষাভাষীদের মন্দির লৌকিক দেবতা আগমযোগ কলাবিদ্যা ও নাগর সংস্কৃতি, মঙ্গোলীয়দের আত্মবলিদান মাতৃকাপূজারীতি যে বিচিত্র ধর্মাচরণকে ফুটিয়ে তুলল, নর্ডিক আর্যরা তার ওপর জ্বালল দর্শনতত্ত্বের আলোকদীপ[১২]। আর্য ও অনার্য মনন-মানসের এই সংগম-সমুদ্রে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যমুখী অবগাহন[১৩]।

আর্য ভিন্ন অপর নৃগোষ্ঠীর জীবনযাপনপদ্ধতি ছিল বিভিন্ন। কেউ সামুদ্রিক, কেউবা সমতলবাসী, কেউ আরণ্যক বনচর, কেউবা অরণ্যপ্রান্তিক পার্বত্য। স্ব-স্ব পরিবেশে বিভিন্ন দল বন্য দৈত্যদানার কল্পনা, বৃক্ষের উপাসনা বা পর্বতবাসী প্রমথের ভাবনা করত। শিকারী শিকার ও যুদ্ধের উৎসবাভিনয়, কৃষক কর্ষণের, সমুদ্রতীরবাসী সূর্যের আবাহন করত। ‘রক্ত’ ‘লিঙ্গ’ ও ‘মৃত্যু’ তাদের সর্বাধিক বিস্মিত করত। তাই পূজামাত্রেই ছিল এ-তিনের সমাহার, মূর্তিকল্পনা ছিল বীভৎস, প্রতীকধারণা অপরিহার্য।

এই প্রতীক ছিল ত্রি-স্তরের। বস্তুকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করে বস্তুপূজা; বস্তু ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে প্রাণশক্তিসম্পন্ন ভৌতিক শক্তির কল্পনা করে প্রাণিপূজা; নিজেদের এক বিশেষ জীবের বংশজাত কল্পনা করে জীবপূজা। নিষিদ্ধ ছিল এইসব জীবের যথেচ্ছ হত্যা। বিশেষ উৎসবমাধ্যমে বলিদানে আহার ও উক্ত জীবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ব্যবস্থা ছিল[১৪]। এই জীবপূজা থেকে গোত্রধারণা সঞ্জাত হয়[১৫], এবং এ থেকেই পশুদেবের বিবর্তিত আবির্ভাব: Totemism as a religion tends to pass into the worship first of animal gods and next of anthropomorphic gods with animal attributes[১৬]।

মাতৃতান্ত্রিক অস্ট্রিক ও দ্রবিড়-ভাষীদের প্রধান জীবনোপায় ছিল কৃষিকার্য। প্রান্তরকে শস্যশ্যামল করার, অজন্মা ও মড়করোধের জন্যে তারা নানাবিধ জাদুবিদ্যাশ্রিত কৃষি-উৎসবের প্রযোজনা করত: Those who lived on an agricultural basis developed a belief in gods and demons of fertility, or in magic rites designed to secure rich harvests and to deter evil spirits[১৭]। ঋতুর পালাবদলে খাদ্যশস্যের আসাযাওয়াকে

কেন্দ্র করে বিবিধ নৃত্য গীত অনুষ্ঠান উৎসবের সূচনা হত এবং these periodic festivals are the stuff of which those faded unaccomplished actions and desires, which we call gods, are made [১৮]।

আদিম মানুষ শস্যে প্রাণের কল্পনা করেছিল এবং তার জন্ম মৃত্যু ও পুনঃফলনের প্রাকৃতিক ব্যাপারকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিল। শস্যের এই জীবনপালাকে সে প্রাণেরই এক লীলা বলে বিশ্বাস করেছিল, শস্য ও শিশুর মধ্যে কোন পার্থক্য সেদিন তার চোখে পড়ে নি। দুয়ের অভেদ-ধারণায় শিশুশস্যের মাতারূপে গ্রহণ করেছিল পৃথিবীকে, কারণ তাঁরই মধ্যে থেকে শস্যের আবির্ভাব। ঘরে সন্তানের জন্ম মাতৃগর্ভে, বৃদ্ধি মায়ের কোলে মাতৃস্নেহে; মাঠে শস্যের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, বৃদ্ধি তাঁর কোলে তাঁর স্নেহে। পৃথিবী হলেন শস্যের মাতা, অতএব শস্যজীবী মানুষেরও অন্নদাত্রী মাতা (এবং যজ্ঞের উদ্গাত্রী ও ধর্মোপদেশকর্ত্রী —ঋগ্বেদ)।

কৃষকের তখনকার সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, মা সমাজ-সংসারের কর্ত্রীকারক। ফলে, আদিম মানবের ধারণায়, বিশ্বজগতের কর্তৃত্বভার এক বিশ্বমাতার হাতে। পৃথিবী অন্নদা, তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, সর্বলোকের আশ্রয়, জীবপালিকা ও শস্যদায়িনী। তাই কৃষকের কাছে পৃথিবী আদিমাতা [১৯]। বসুমাতার পূজা, বসুধারা ব্রত, যার ফল: 'অষ্টপুতে ঝাঁপুই খেলবে। পৃথিবী জলে হাসবে', তাঁর সন্তোষে বৃদ্ধি পাবে শস্য ও শিশু, ভরে উঠবে মাঠ ও ঘর, উদর ও হৃদয়। এইজন্যে শস্যদেবতারা মূলত নারী, গ্রামস্থ মারীদেবতারা প্রায়শ স্ত্রীলিঙ্গ।

সবার ওপর, কৃষি নারীর আবিষ্কার; অন্নপূর্ণাদের হাতে অন্নের পূর্ণতা: When the women plant maize, the stalk produces two or three ears. Why? because women know how to produce children. They only know how to plant corns to ensure its germinating [২০]।

নারী জনয়িত্রী, নারী অন্নপূর্ণা—পৃথিবীও। কালক্রমে কৃষিকার্যপদ্ধতি উন্নততর হল, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল; পুরুষ নারীর হাত থেকে কৃষির ভার তুলে নিল, সৃষ্টিব্যাপারে দুজনের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব স্বীকৃতি পেল। পৃথিবীর স্বামী হয়ে এলেন আকাশদেবতা বা সূর্য। যুগ্ম দেবদেবীর ধারণার ভিত্তি রচিত হল।

ভারতে আগমনের মুহূর্তে (আঃ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ) আর্যরা ছিল যাযাবর শিকারী পশুপালক। জীবিকা ও জীবননির্বাহের জন্যে তাদের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জলবায়ুর ওপর নির্ভর করতে হত। আকাশ জল মেঘ বাতাস চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি ছিল উপাস্য, প্রধান বাহন অশ্ব, প্রধান উপকরণ অগ্নি; যজ্ঞে এদের প্রাধান্য। বন্যপশু ও চারণভূমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং শত্রুদলের সঙ্গে নিয়ত সংঘর্ষে ব্যাপৃত থাকতে হত বলে আর্য সমাজের কাঠামো ছিল পিতৃতান্ত্রিক, দেবমণ্ডলীতে পুরুষের প্রাধান্য। আর্যজাতির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমবায়ে ও একাধিক দলপতির

প্রতিভাসে আর্য দেবতারা সংখ্যায় বহু। ক্রমে বিভিন্নের সমন্বয়ে একজাতি ও একনায়কের ধারণার আবির্ভাবের সঙ্গে একদেবতাবাদের ভাবনা রূপায়িত হয়ে উঠতে থাকে।

ভারতে স্থায়িভাবে বসবাসের ফলে আর্যরা ধীরে ধীরে যাযাবরী জীবন ত্যাগ করে কৃষিকার্য আশ্রয় করল। ব্রহ্ম হলেন অন্নময়, ক্ষেত্রপতি মধুময়, পৃথিবী অন্নপূর্ণা ও মধুমতী। ক্রমে পুরুষ-প্রধান দৈবচক্রে অনিবার্যভাবে দেবীদের আগমন সূচিত হল। উচ্চতর জীবনযাপনপ্রণালী ও মানের জন্যে আর্যসমাজে এল অবসরের অবকাশ। বিলাসব্যসনের পাশাপাশি কাব্যিক চেতনা ও দার্শনিক চিন্তা ছিল তাদের নিত্য-সহচর। পরিপার্শ্ব থেকে তারা যাকিছু গ্রহণ করেছে, গ্রীক মানসের মত এক সুবিহিত তত্ত্ব ও সৌন্দর্যের আবেশময় আলোকে সেগুলিকে দীপ্ত ও প্রমূর্ত করে তুলেছে।

ভারতের সংস্কৃতি এই আর্য-অনার্য ভাবনার সমীকরণে গঠিত[২১]। ক্রমে ঐশলামিক জীবনধারা ও ধ্যানধারণার আলোছায়াখেলা তাতে নতুন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে[২২], খ্রীস্টীয় আদর্শ এর অন্তর্ভূত হয়েছে। ভারতবাসীর জীবনবাদ তাদের অন্তরঙ্গ ও মরমী করে তুলেছে। বিসদৃশকে সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ করে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য এনে বিচিত্র ভাবনা বাসনার সম্মিলিত ঐকতানে ভারত-সংস্কৃতি ময়ূরকণ্ঠী রূপ ধারণ করেছে: Hinduism is not a particular system of thought, but a commonwealth of systems; not a particular faith, but a fellowship of faiths[২৩]। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে'[২৪]।

সংস্কৃতি চির-প্রগত। সমন্বয়ের কোন এক বিন্দুতে উপনীত হয়ে তার পরিব্রাজনা সমাপ্তি লাভ করে না, আন্তর ও বাহির দ্বন্দ্বের আবর্তনে সে ক্রমপ্রসারী। আর্য ও অনার্য (এবং পরে ঐশলামিক) সাধনার সংশ্লেষে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতি একটি সমন্বিত রূপ পেল বটে, কিন্তু মূলধারাগুলির স্বাতন্ত্র্য তাতে বিলুপ্ত হল না। এইদিক থেকে অন্যান্য দেশের মত এখানেও সংস্কৃতির দুটি রূপ পাশাপাশি দেখা দিল— অভিজাত ও লোকায়ত। লোকসংস্কৃতির প্রবাহ থেকে উপাদান আহরণ করে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' উচ্চবিত্ত সংস্কৃতি তথা (শাস্ত্রীয়) ধর্ম সাহিত্য শিল্পের সমারোহ। প্রাথমিক পর্যায়ে এই দুটি প্রবাহের মধ্যে গঙ্গাযমুনার নৈকট্য থাকে; কিন্তু ক্রমেই ব্যবধানের বালুচর দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে। তখন একের পূজা, অপরের হোম; একের প্রলয়ংকর প্রমথ, অপরের শংকর দেবতা; একের উপাসনার লক্ষ্য পরতোষণ, অপরের সাধনার লক্ষ্য আত্মতুষ্টি; একের কাম্য সুখী জীবন, অপরের সুন্দর মন; একের ভূতশান্তি, অপরের আত্মার আরাম।

বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে উভয় কোটির বিরহসমুদ্রে জাগে মিলনের দ্বীপাবলী।

কোন এক শুভ মুহূর্তে ছুটি ধারা নিকটতর হয়, নতুন করে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের টানা-প'ড়েন চলতে থাকে, নবীনতর রূপবদল হয় যমজ সংস্কৃতির; আবার বিচ্ছেদ হয়, আবার সংযোগ। এমনিভাবে পথিক-সংস্কৃতি বারে বারে অপ্রয়োজনীয় বস্তুভার ত্যাগ করে অন্তরের ঐশ্বর্য সঞ্চয় করতে থাকে, মাঝে মধ্যে শীর্ণকায় ও জীর্ণকায় হলেও গতিহীন হয় না। তাই সংস্কৃতি-সন্ধানীর চোখে: Hinduism is an eclectic and ever-expansive socio-religious system[২৫]। ভারত-ইতিহাসের এই আন্তর স্বরূপ উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন।...ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।...ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে'[২৬]।

ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি এবং বিবর্তনের সামগ্রিক ইতিহাস কেবলমাত্র বেদ বেদান্ত উপনিষদ পুরাণে নিহিত নয়। এর বাইরে যে বিপুল লোকসংস্কৃতি জীবন-ঘনিষ্ঠ স্বতন্ত্র চেতনায় নিয়ত বহমান, তার কথাও মনে রাখতে হবে। অভিজাত মননশীলতা এই লোকায়ত সংস্কৃতি-প্রবাহের যাকিছু গ্রহণ করেছে, তাকে স্ব-ভাবে রূপান্তরিত শৃঙ্খলিত ও শাস্ত্রনিবদ্ধ করেছে, আবার লোকায়ত ধ্যান-ধারণার প্রবাহকেও প্রভাবিত করেছে। এইসব মিলিয়েই ভারতবর্ষের সত্য ও সমগ্র ইতিহাস। সুতরাং লোকসমাজবাহিত লোকসংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতীত ভারতসংস্কৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাসপাঠ ও পরিচিতিলাভ সম্ভবপর নয়[২৭]। এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙলাদেশ সম্পর্কেও তা সমভাবে সত্য।

[হ্যাভেল বলেছিলেন: The root of Indian religion is to be found in the daily life of the people, rather than in dogmas or religious feasts and ceremonies[২৮]। কিন্তু হ্যাভেলের এই জনগণ মুখ্যত আর্য। অনার্য স্পর্শ থেকে ভারতীয় সভ্যতাকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে গিয়ে তিনি সত্যের সান্নিধ্যে এসেও তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারেন নি। সেই আন্তর সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন রবীন্দ্রনাথ; এবং অবনীন্দ্রনাথও—'বাংলার ব্রতে'।]

বস্তু ও কল্পনা সীমা ও অসীম এক ও বহুর সম্মিলনে গঠিত এই বিরাট ও বিচিত্র প্রেক্ষাপটে আমরা অনুধ্যান করব শিবের: 'যিনি দেবতাদিগের মধ্যে মহাদেব, যিনি রুদ্র অথচ শিব, যিনি গৃহী অথচ সন্ন্যাসী, যিনি ত্রিলোকপতি অথচ ত্যাগী দরিদ্র, সেই মহেশ্বর দেবতা বহুকালের বহুদেশের বহু সমাজস্তরের দেবকল্পনার সমষ্টি'[২৯]।

তন্মহেশায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ॥[৩০]

ভারতশিব

ক। রুদ্র-শিব

ঋগ্বেদে 'রুদ্র' ও 'শিব' শব্দ দুটি বিভিন্ন দেবতার উগ্রত্ব ও শান্তরূপের বিশেষণ-রূপে কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই সময়ে শিব নামে কোন বিশিষ্ট আর্য দেবতা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি। কিন্তু রুদ্র ঋগ্বেদীয় দেবতামণ্ডলীর অন্যতমরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই রুদ্রই সর্বজনপরিচিত শিবদেবতার আদি শাস্ত্রীয় রূপ।

রুদ্র উগ্রদেবতা। 'শিব' শব্দ তাঁর গুণরূপে একবার প্রযুক্ত হয়েছে <১০. ৯২. ৯>। বিশেষণটি রুদ্রের সন্তুষ্টি বিধায়ক। কিন্তু ইতিহাসের কালচক্রে বিচিত্রজটিল পথ-পরিক্রমার মাধ্যমে বিশেষণ একদিন বিশেষ্য হয়ে উঠল। রুদ্র হলেন রুদ্রশিব, তারপর শুধুই শিব—রুদ্র যাঁর অন্যতম বিশেষণ।

ঋগ্বৈদিক রুদ্রের বিশিষ্ট স্বকীয়তা থাকলেও সমকালীন প্রধান দেবতাদের তিনি সমকক্ষ ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে আগামী কালের শিব যে দেবাদিদেব বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, তার বীজ ঋগ্বেদেই উপ্ত হয়েছিল। শিব-চরিত্রের বহু গুণ ও শৈব কাহিনীর অনেক মূল রূপক অলংকার অথবা বিশিষ্ট বিশেষণরূপে বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রুদ্রের রূপগুণকে প্রসারিত করে আগামী দিনের শাস্ত্রে ও কাব্যে শিবের চারিদিকে নানা সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য কথা কাহিনী শক্তি ক্রিয়ার জাল বুনে উঠেছে।

শিব-স্বরূপের যে দুটি বিশিষ্ট লক্ষণ—রুদ্রত্ব ও শিবত্ব, বেদের রুদ্রে সেই বৈপরীত্যের সমাবেশ ঐতিহাসিকরা লক্ষ্য করেছেন। তিনি ছিলেন Rudra (the fierce) as well as Siva (the beneficent)[১]। একদিকে ক্রোধ ধ্বংস মহামারী আসুরিকতা ভীষণতা, অন্যদিকে প্রসন্নতা সৃষ্টি আরোগ্য দেবত্ব সুন্দরতা। বভ্রুবর্ণী ও উগ্রভৈরব, জটিল ও হিরণ্যকেশী, শক্রঘ্ন ও বীরেশ্বর, লম্বোদর ও সোদর, বৃষভ ও রথী, ব্রাত্য ও স্বয়ম্ভূ, প্রলয়ংকর ও কল্যাণসুন্দর—সদসতের বৈপরীত্যের সমাবেশে রুদ্রশিব বহুরূপান্বিত।

মিশর বাবিলন নিনেভ গ্রীস রোমের আদিম স্বর্গলোকে বিভিন্ন রৌদ্র দেবতা বিরাজমান ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের এই জাতীয় দেবতার অনুলেশ নিয়ে ইশলামের আল্লাহ্ একাধারে ভীতি ও প্রীতির দেবতা। ইশলামী সাধনায় দুটি মিলনমুখী বিপরীতভাব : Fear of God and love of God[২]। ভারততীর্থযাত্রী আর্যদেরও সঙ্গী ছিলেন এই রৌদ্র দেবতা। অন্যদিকে প্রাগার্য ভারতের উপাস্য প্রমথবৃন্দও

ছিলেন সমধিক উগ্র। পঞ্চনদের তীরে উভয়ের প্রথম দর্শন ও প্রাথমিক মিশ্রণ, পরে অধিকতর সংশ্লেষ। তার ক্রমবিকশিত ফল রুদ্রশিব : যিনি আর্য দেবমণ্ডলীর অন্তর্গত হয়েও বাহিরস্থিত, দেবাদিদেব হয়েও যজ্ঞভাগবঞ্চিত, যিনি

যজ্ঞানামপি যো যজ্ঞঃ শিবানামপি যঃ শিবঃ।
রুদ্রাণামপি যো রুদ্রঃ············॥ ২৮ (শিবসহস্রনামস্তোত্র)

যিনি বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিচিত্র ধারণার ছায়াপাতে, বহু দেবতার নির্জন জনতায় 'একো রুদ্রঃ' রূপে সমন্বিত, সেই রুদ্রশিবের উৎসমূল আর্য ও আর্যেতর জীবন ও মননের সমাজব্যবস্থা ও ধর্মসাধনার মধ্যে নিহিত। তাঁর সামগ্রিক পরিচিতি লাভ করতে হলে এই দুটি জাতির সার্বিক সংস্কৃতির মধ্যেই করতে হবে।

১। আর্য রুদ্র

ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের দেবতা রুদ্র। তিনটি স্বতন্ত্র সূক্তে তাঁর ভীষণ সুন্দর রূপ বর্ণিত। অন্য সূক্তেও তিনি সবিশেষ উল্লিখিত। রুদ্র সুওষ্ঠ সুনাসিক সুবাহু দৃঢ়াঙ্গ তাম্রবর্ণী স্বর্যজটাকলাপ স্বর্যলোহিতাভ কিরীটী হিরণ্য রথস্থ ত্রৈমাতুর ত্রিনেত্র—হিমালয়োত্তর মুজবান পর্বতে আবাসিক দেবতা। তিনি শিব <১০.৯২.৯> ধন্বন্তরি <২.৩৩.৪,১২> বৈদ্যনাথ <১.৪৩.৪।১.১১৪.১,৫> কোপনসংহারক জ্ঞানী দাতা মহান <১.৪৩.১> জগৎপিতা অক্ষর <৬.৪৯.১০> সর্বজ্ঞ <৭.৪৬.২> স্বয়ম্ভু <৭.৪৬.১> মৃত্যুমঙ্গল <১.১১৪.৯> সুখদ <২.৩৩.৬> ধানুকী <২.৩৩.১০।১০.১২৫.৬> পশুপ <১.১১৪.১>।

রুদ্রের ক্রোধশান্তির জন্যে প্রার্থনা নিবেদিত হয় : তিনি যেন আত্মীয় গুরুজন মানব শিশু গবাদিকে হনন না করেন <১.১১৪.৭,৮।৬.২৮.৭।২.৩৩.১>, শরণার্থীকে যেন ত্রাণ করেন <৫.৫১.১৩>, অনুগতজনকে আশীর্বাদ করেন <১.১১৪.১,২। ২.৩৩.৬>, তাঁর আশিসবর্ষণে ও সুচিকিৎসায় অনুগামিগণ আশা পোষণ করেন শত শীত অতিক্রমণের <২.৩৩.২>, রোগাদি দূরীকরণের <৭.৪৬.২>, গ্রামকে সুস্থ ও নিরাময় রাখার <১.১১৪.১>।

পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থে রুদ্রের নাম ও রূপের বিস্তার ঘটেছে। যজুর্বেদে তিনি 'শংকর' নামে উল্লিখিত এবং (অগ্নির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে) 'ত্র্যম্বক' উপাধি প্রাপ্ত। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতায় তিনি 'দিক্‌পাল' 'শম্ভু' 'শংকর'। অথর্ববেদের রুদ্র মহাদেব ও ঈশান <১৫.১,৪.৫> এবং নীলশিখণ্ডিন্ <২.২৭.৬। ৬.১৩.১।১১.২.৭>। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে রুদ্র অভেদ হয়েছেন সোমের সঙ্গে <তৈত্তিরীয় ২.২.১০> ও অগ্নির সঙ্গে <কৌষীতকি ৩.৬>এবং জাত হয়েছেন অগ্নি-বায়ু-চন্দ্রমস্ থেকে <ঐ ৬.১>। কৌষীতকি ও শতপথ ব্রাহ্মণে তিনি 'মহাদেব' (মহান দেবঃ)—সর্বচারী এবং সর্বপ্রাণীর দেবতা।

বৈদিক রুদ্র রৌদ্র দেবতা। আদিতে সব দেবতাই উগ্র রৌদ্ররসান্বিত : ক্রমে

তাঁরা শান্ত হয়ে ওঠেন। মধ্য প্রাচ্যে এই জাতীয় উগ্র রুদ্র দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রেস্টেড-উদ্ধৃত পিরামিড-কথায়:

When the Lord is enraged, the heavens tremble before Him,
When Adad is enraged, the earth quakes before Him.
Great mountains are cast down before Him.
At His anger, at His wrath,
At His roar, at His thunder,
The Gods in heaven retire into heavens,
The Gods of earth recede into the earth.

কিংবা ঈশতার-স্তোত্রে:

At the mention of Thy name, heavens and earth quake.
The Gods tremble.

—ইত্যাদি শ্লোক রুদ্র-চরিত্র ও রুদ্র-স্তবকে স্মরণে আনে।

এই রুদ্র দেবতার মৌল পরিকল্পনা আর্যদের নিজস্ব। ভারতে প্রবাসী আর্য ও নিবাসী অনার্যে যতই সংঘাত বাধুক না কেন, সম্পূর্ণ আর্যেতর একটি দেবতাকে স্বীয় দেবগোষ্ঠীতে স্থান দিতে বাধ্য হবার মত অবস্থা আর্য সমাজে ও মানসে তখনও অনাগত। আর্যদের সঙ্গে ভারতে আগত জনৈক শক্তিশালী উগ্র দেবতাই ঋগ্বেদের রুদ্র। স্থানীয় অনার্য প্রমথের সঙ্গে তাঁর বিস্ময়কর সাদৃশ্য ছিল এবং প্রাথমিক সংমিশ্রণও সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চরিত্রের মূল ভিত্তিস্থাপনায় আর্যজাতিকে অপর কারও দ্বারস্থ হতে হয় নি।

আর্যরুদ্রের গঠনভঙ্গিমায় বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল।

অ। প্রাচীন দেবতাদের অনেকে বীরপূজার আশ্রয়ে গড়ে ওঠা। আর্য ভাবনায় শক্তিমান নেতার দেবত্বে উপনীতি যে দুর্লভ নয়, ভারতের ইতিহাসে তার পরিচিতি আজও মেলে। তাই অনেকে মনে করেন, বেদের রুদ্র এমনই কোন জনপ্রিয় বীরনেতা। কিন্তু এই বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক মূল নেই। এ সম্পর্কে ইলিঅটের যুক্তি হল, শিবের নররূপ ধারণের কোন ইঙ্গিত আমাদের (প্রাচীন) শাস্ত্রে বা সাহিত্যে পাওয়া যায় না[৩]। যুক্তিটি মাননীয়। রুদ্র বীরনেতা নন; অবশ্য তাঁর অনুধ্যান ও অলংকরণের পশ্চাতে বীরপূজার ছায়া সতত সঞ্চরমাণ। রুদ্রের কাছে সাধক যেভাবে আপনার ভীতিবোধিত ও আত্মসমর্পিত হৃদয় নিয়ে বার বার উপনীত হয়েছেন, তা সেকালীন গোষ্ঠীপতির কাছে অনুচরদের নির্ব্যূঢ় আত্মনিবেদন ও সভয় প্রার্থনার বাস্তব রূপকে আশ্রয় করে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

আ। বৈদিক যজ্ঞে আকাশচারী নক্ষত্ররাজির গতিবিধি লক্ষ্য করার প্রয়োজন হত। তাই থেকে অনেকে মনে করেন, সেসময়ের আর্য দেবতারাও ছিলেন নক্ষত্রের রূপক। অধ্যাপক হুইটনী—যিনি বিশ্বাস করতেন, There is the

whole story illustrated in the sky[৪]—Avenger <Sirius> নক্ষত্রকে রুদ্র বলে নির্দেশিত করলেন। লোকমান্য তিলকও লিখলেন, Rudra is the presiding deity of Andra[৫]। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে <৩.৩৩> রুদ্র ও 'সিরীয়ুস' বা 'মৃগব্যাধ' অভিন্ন দেবতা বর্ণিত হয়েছেন; সঙ্গে তাঁর ধনু, মাথার ওপর ছায়াপথিক আকাশগঙ্গা। তাই তিনি হলেন কিরাত, যজ্ঞধ্বংসী, উগ্র ও শ্মশানী[৬]। এই মতের অনুসরণে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীকে পিনাকপাণি রুদ্ররূপে চিহ্নিত করেছেন[৭]। লোকমান্য তিলক আরও বললেন: বিষ্ণু ও রুদ্র may be taken as the types or the embodiments of mild and terrible aspects of nature of the vernal and the autumnal equinox[৮]।

যাযাবর ও কৃষি উভয় বৃত্তিতেই নক্ষত্রবিদ্যা অপরিহার্য অঙ্গ। মিশরে লুব্ধকের নির্দিষ্ট সময়ান্তে আবির্ভাব-তিরোধানকে আশ্রয় করে নীলনদের বন্যা ও কৃষির সময় নির্ধারিত হত। মধ্যপ্রাচ্যের 'ফার্টাইল ক্রিসেণ্ট' অঞ্চল থেকে কৃষিকার্য, নীলনদ উপত্যকা অথবা বাবিলন থেকে কৃষি ও ক্ষেত্রসিঞ্চনপদ্ধতির সঙ্গে নক্ষত্রপাঠ ও বর্ষগণনা মেসোপতেমিয়া পার হয়ে সিন্ধু উপত্যকা এবং পরে চীন আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরে বিস্তৃত হয়[৯]। কৃষিতান্ত্রিক পরিবেশে আকাশী নক্ষত্রের গতাগতির হিসেবে কৃষি সম্পাদিত হয় এবং ধর্মকর্মও নির্বাহিত হয়। আর্যরা এই জ্যোতিষ-গাণিতিক রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তার ফলে নক্ষত্রবৃন্দ দেবতা বা ঋষিরূপে কল্পিত হয়েছে। অতএব 'কালপুরুষের' রুদ্রত্বলাভ অত্যন্ত স্বাভাবিক; প্রতিবেশী অন্যান্য নক্ষত্রের সহায়ে ও সমবায়ে কল্পিত রূপ গুণ ক্রিয়ার আরোপও অসংগত নয়। কিন্তু একমাত্র এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই রুদ্রের যাবতীয় রূপগুণ কথাকাহিনী অন্যনিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠেছে, এ ধারণা সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের দিক থেকে অসম্পূর্ণ বিচারণা। এর ফলে মানুষের সামাজিক পরিবেশকে এবং তা থেকে উদ্ভূত জীবন ও মননশিল্পকে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানানো হয়।

ই। অনেকে বৈদিক দেবতাদের একমেব সূর্যের বিভিন্ন রূপ মনে করেন[১০]। ম্যাক্সমূলরের মতে, (রুদ্রের অপর নাম) 'ভব' ও গ্রীক সূর্যদেব Phoebus অভিন্ন। রুদ্র শুধু দিনমণি 'মিত্র' নন, নিশাপতি 'বরুণ'ও (আকাশ)[১১]। উদয়ভানু ব্রহ্মা, অস্তরবি বিষ্ণু ও মধ্যাহ্নগগনের খরদীপ্ত সূর্য রুদ্র। সূর্যকিরণের অপর নাম তাই 'রৌদ্র'। যাযাবর ও পশুপালক আর্যরা স্বভাবতই সূর্যের উপাসক ছিল; তাঁর জ্যোতির্ময়ী কৃপার ওপর ব্রজভূমির উন্নতি নির্ভর করত। তাই সূর্য অন্যান্য দেবতার সঙ্গে রুদ্রকেও স্পর্শ করেছিলেন[১২]। আবার অগ্নির সঙ্গে উভয়ের যোগ এবং উগ্রতা-গুণ সূর্য ও রুদ্রকে ক্রমে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে: 'যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ'[১৩], 'সকলই সূর্যরূপী

মহাদেবের স্বরূপ' ১৪। কিন্তু রুদ্র ও সূর্য অভিন্ন নন, হয়েও যান নি। রৌদ্ররস আজও নবরসের অন্যতম্—সৌর সংস্পর্শে নয়, রুদ্রত্বের সংশ্লেষে। উভয়ের পারস্পরিক যোগ সত্বেও রুদ্র সূর্য নন।

ঈ। রুদ্র অগ্নি নন কিন্তু (আগ্নেয়) বিদ্যুৎ-গর্ভ। বিদ্যুৎ ও অগ্নির সাদৃশ্যে মিশ্রণজনিত অভেদ দেখা দিয়েছে রুদ্র ও অগ্নির মধ্যে। ঋগ্বেদে রুদ্র অগ্নিরূপে বর্ণিত হয়েছেন <১.২৭.১০। ২.১.৬>; দুজনেই সর্বসংহারক <৬.২৮.৭। ১০.১২৫.৬। অথর্ব ৪.৩০.৫>; সায়ণের ভাষ্যে, 'রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে'; যাস্ক বলেছেন, 'অগ্নিরপি রুদ্র ইতি উচ্যতে তস্যৈবং ভবতি'। অগ্নিও রুদ্ররূপে আহুত হয়েছেন। ফলে রুদ্র অগ্নিকে গ্রাস করলেন। তিনি হলেন 'ত্র্যম্বক' (তিন পিতার জন্যে অগ্নিকে ত্র্যম্বক বলা হত), অগ্নির জটিল শিখাধূম শোভিত হল রুদ্রজটারূপে, অগ্নির কৃষ্ণ-নীল কান্তি নিয়ে রুদ্র হলেন 'নীলগ্রীব', অগ্নির নাম ও শক্তি (সপ্তশিখা) রুদ্র লাভ করলেন, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উপাসিত হলেন অগ্নিরূপে।

উ। বৈদিক আর্যরা স্বাভাবিক কারণেই ছিলেন প্রকৃতিনির্ভর ও প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতির পটে গড়ে উঠত দেবতার রূপমূর্তির কল্পনা ও ধ্যান। রুদ্রের দেহে ও মনে যে বিচিত্র রূপারোপ, প্রকৃতির তূলিচালনা তার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। একদিকে রজতগিরিনিভ শুভ্রদেহ হিমালয়ের মহিমা ও ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দিয়েছেন রজতগিরিসদৃশ রুদ্র—স্থাণু জটিল নীলকণ্ঠ ও কৈলাসী; অন্যদিকে কালো মেঘের গায়ে লেগে থাকা রক্তবিদ্যুতের স্ফুরণ ও দ্যুতি নিয়ে রুদ্র হলেন নীল-লোহিত—বিরাট ও সর্বধাতৃ। কিন্তু ইনি মেঘবাহন ইন্দ্রও নন। রুদ্রকে যদি প্রকৃতির কোন বিশেষ রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত দেখা যায়, তা হল বিদ্যুৎগর্ভ বাত্যাঝঞ্ঝা। ঋগ্বেদে তিনি বজ্রী <২.৩৩.৩।৭.৪৬.৩> ও বায়ুর অধিপতি <১.৬৪.২।৫.৫২.১৬।৬.৬৬.৩।৭.৫৬.১।৮.২০.১৭,১৮>, an already-existing Aryan storm-god [১৫]।

রুদ্রের এই বজ্রবৈদ্যুতিক ঝঞ্ঝাবাত্যার স্বরূপ ঋগ্বেদের বিভিন্ন বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিক দীপ্তি-বর্ষণ-গর্জন, বভ্রু-শ্বেত-লোহিত বর্ণের সমাহার, অগ্নিময় ধনুক, মেঘসদৃশ কপর্দ, 'দিবো বরাহ' উপাধি এবং বর্ষণের সঙ্গে নবজীবন ও নিরাময়ত্ব দানের ক্ষমতা ইত্যাদি রূপারোপ [১৬] বিশ্লেষণ করলে রুদ্রকে আকাশচারী বজ্রবিদ্যুৎগর্ভ ঝঞ্ঝাবাত্যা ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতীক বলে ভাবা যায় না। এই কারণেই তাঁকে অথর্ববেদে 'নীলশিখণ্ডিন্' এবং যজুর্বেদে 'নীলগ্রীব' বলা হয়েছে, এবং অগ্নির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সহজে সম্পাদিত হয়েছে।

'রুদ্র' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে 'নিরুক্ত'-কার যাস্কের অভিমত: 'রুদ্' ধাতুর উত্তর 'ণিচ্' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন 'রুদ্র' [১৭], এবং "রুদ্রো রৌতীতি সতঃ। রোরূয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তের্বা। 'যদরুদৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্'—ইতি কাঠকম্" [১৮]। পুরাণে পাই এর কথারূপ: কল্পারম্ভে ব্রহ্মার ললাট থেকে জাত হয়েই যিনি রোদন করতে

থাকেন তিনিই রুদ্র। এখানে 'রোদন' শব্দটি 'ক্রন্দন' অর্থে ব্যবহৃত; কিন্তু ঋগ্বেদে শব্দটির অর্থ 'গর্জন'। আকাশমার্গে বাত্যাঝঞ্ঝার বিক্ষুব্ধ ও সশব্দ প্রবহমানতাই এই রোদন বা গর্জন। সুতরাং রুদ্র গর্জনকারী ঝড়বাতাসের দৈবরূপ। বাত্যারূপী মরুদ্‌গণ রুদ্রপুত্র ও রুদ্র <১.৩৯.১-৯>, 'রুদ্রীয়াঃ···রুদ্রাসঃ', 'সিংহ ইব নানদতি', মেঘজ্বালক বিদ্যুৎপ্রকাশক গর্জন ও বর্ষণকারী <১.৩৯.৪।৫.৬০.২।১০. ৭৮.২,৩>, বিঘ্নস্রষ্টা <অথর্ব ৮.৬>। এঁদেরই নেতা ও পিতা রুদ্র—'আ তে পিতর্‌ মরুতান্‌' <ঋক্‌ ২.৩৩.১>।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মরুৎ থেকে রুদ্র-কল্পনা, এবং বাবিলনের বাত্যা-দেবতা 'মেরোডাক' বা 'মার্ডীক' থেকে 'মরুৎ' নামের বিবর্তন হয়েছে [১৯]। কিন্তু শুধু এই দেবতাই নন, মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেবতাই ছিলেন ঝঞ্ঝাবাত্যার প্রতিরূপ। মিশরের 'শূ' ও 'আতোন', আসিরিয়ার 'এনলিল' ও 'অসুর' (মরুৎরাও অসুর নামে বর্ণিত—তৈত্তি ২.৪.১.১> প্রভৃতি ছিলেন এই জাতীয় রুদ্র দেবতা। কারও সঙ্গী দৈত্যদানা, কারও প্রতীক বৃষ, কারও বা স্ত্রী সিংহমস্তকা [২০]। তাই একথাই বলা সংগত যে আর্যরা মূল জন্মভূমি থেকে এই রুদ্রদেবতার পরিকল্পনাটি সঙ্গে করে নিয়ে আসে এবং ভারতের আকাশে বাত্যাবিদ্যুৎবজ্রপাতের ভয়ংকরত্ব ও বেগবত্তার মধ্যে তারা স্থাপনা করে রুদ্রের, who went about howling with the stormy winds [২১]। তাই তিনি উগ্র সঞ্চরণশীল ও সাংগীতিক। মেঘের সঙ্গী ঝড় চিরচঞ্চল—তাই রুদ্র হলেন যাযাবর ব্রাত্য সর্বত্রচারী, সর্বদাই তিনি 'রৌতীতি নানদতি' নটরাজ।

উ। আদি প্রমথগণ আগামী কালের বহু দেবতার পূর্বপুরুষ। প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ দেবতা বাস্তবঘনিষ্ঠ, রৌদ্র ও ভীতি উৎপাদক [২২]; কালক্রমে তাঁরা সমাজ ও মানসের পরিবেশ-প্রভাবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতার স্পর্শে শিবত্ব লাভ করতে থাকেন। বাহির-ভারতের রুদ্র দেবতাদের মত আর্য রুদ্রও উগ্রতা পরিহার করে ক্রমে শান্তরূপ ধারণ করতে লাগলেন। রুদ্রব্রহ্মের প্রচারিকা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে the terrible and the destructive god হলেন a benignant god এবং যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের সময়ে তিনি attained to the whole majesty of the Godhead [২৩]।

বিভিন্ন গোষ্ঠী যখন একত্রিত হয়ে একটি বৃহত্তর সমাজের পত্তন করে, তখন নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে এবং একের বা মুষ্টিমেয়ের জয়সূচক পরিণতি দেখা দেয়। বিভিন্ন দেবতাও নিকটবর্তী হলে এইভাবে একের রূপগুণ অপরে সংক্রামিত হয় এবং বহুকে অবনত করে একজন বা কয়েকজন দেবদেবী প্রাধান্য লাভ করেন। এইরকম মিশ্রণের মধ্য দিয়ে রুদ্র নিজ শক্তিবলে অন্যতম প্রধান দেবতা হয়ে উঠেছেন। তখন (কৈবল্য উপনিষদে) উমাপতি শিব ব্রহ্ম—'স ব্রহ্ম স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমস্বরাট্‌। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ' ॥৮। অথর্ববেদে—

'সোঽর্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ <১৩.৪.৪>। অথর্বশির উপনিষদে রুদ্রই ইন্দ্র বরুণ যম ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মৃত্যু।

অপরদিকে, অন্যান্য দেবতার সমান্তরাল প্রাধান্যলাভে রুদ্র তাঁদের কাছে নির্জিতও হয়েছেন। ভাগবতে ও মনুসংহিতায় ব্রহ্মা এবং রামায়ণে বিষ্ণু ও রাম হলেন রুদ্রেশ্বর। আদিকাণ্ডের <৬৬ অঃ> হরধনুভঙ্গ ব্যাপারটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মহাভারতে <শান্তিপর্ব> নারায়ণ-কৃষ্ণ রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; রুদ্র এখানে শান্ততর। কিন্তু তাঁর প্রসন্নদক্ষিণ রূপের পাশে রৌদ্রত্বের বিদ্যুৎঝলক বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। মহাভারতে তাঁর কাহিনী ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় এবং পুরাণেও শিবের মধ্যে রুদ্রের স্ফুলিঙ্গ স্বত জ্বলে উঠেছে—শান্তরসের সরোবরে রৌদ্ররসের দীপ্তি। অন্য দেবতার নৃত্যপর মূর্তি যেখানে নটমাত্র, তিনি সেখানে নটরাজ। শান্তম্ শিবম্-এর মধ্যে অকস্মাৎ আদি রুদ্রকে আমরা ফিরে পাই বিশ্ববিধ্বংসী ভৈরবরূপে প্রলয়কালীন কোন এক গোধূলির আলোকে। তখন কবি ভাবে, 'উনমত দেবতা সো হৈ' ; দার্শনিক উপলব্ধি করে, the impersonification of the dissolving and disintegrating powers and process of nature [২৪] ; আর মানুষ ভীত হয়ে বলে, 'মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ' ; প্রার্থনা করে, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'। .....'হে ভৈরব! শক্তি দাও ভক্তপানে চাহ। সর্বখর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ॥'

২। অনার্য শিব

ঋগ্বেদে রুদ্রের সদ্যকথিত গুণগুলির পাশে আরও কয়েকটি বিচিত্র বিশেষণের সমাবেশ ঘটেছে। তিনি মনুষ্যগবাদির সংহারক <৪.৩.৬> ব্যাধিসংক্রামক <১.১১৪.৭,৮> অসুর <২.১.৬।৫.৪২.১১> নন্দী <২.৩৩.৭,৮> প্রলয়ী <২.৩৩.১১> দুর্গম <৭.৪৬.১> ঈশান <২.৩৩.৯> বৃষভ <২.৩৩.৪,৬-৮> কপর্দী <১.১১৪.৫> বীরশাস্তা <১.১১৪.১,২> ও বনস্পতি <১.১৪৩.৬। ২.৩৩.৭>।

যজুর্বেদে রুদ্রের ভীষণ ও বিধ্বংসী শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কথা বলা হয়েছে, মানুষ ও পশুর সংরক্ষণের জন্যে তাঁর কাছে কাতর আবেদন জানানো হয়েছে<তৈত্তি সং ১.১.১।১.২.৪।১.৮.৬। বাজ সং ১০.২০।৩৯.৯>। তিনি ব্রাতপতি গণপতি ক্ষেত্রপতি বনস্পতি মৃগায়ু শ্বনি নিষাদ এবং কৃত্তিবাস (কৃত্তিম্ বসানঃ)। 'ত্র্যম্বকহোম' প্রসঙ্গে তাঁর মূজবৎ পর্বতে স্থিতির ও মূষিক বাহনের উল্লেখ করা হয়েছে <তৈত্তি সং ১.৮.৬।বাজ সং ৩.৫৭,৬৩>। রুদ্রকে 'শিব' নামে এখানে আহ্বান করা হয়েছে—এই প্রথমবার। অথর্ববেদে রুদ্রের ভয়ংকর রূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি ভূতপতি পশুপতি যাতুধানী উগ্র সহস্রচক্ষু ঈশান ও সদাশিব, পঞ্চপশু আকাশ নক্ষত্র পৃথিবী ইত্যাদি তাঁর অধীন। সন্তানবৃদ্ধির কামনায় যজমান তাঁর কাছে মনুষ্যসহ 'পঞ্চপ্রাণী' বলি দেয়। অথর্ববেদের রুদ্র 'ভব' ও 'শর্ব' রূপে <৬.৪>

দ্বিপদী ও চতুষ্পদীদের শাস্তা, এবং 'ব্রাত্য' <১৫.৫.১.৭>। গৃহ্যসূত্রে রুদ্রের এই ভীষণ রূপ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তাঁর নতুন তিনটি নাম 'হর-মৃঢ়-ভীম' <আশ্বলায়ন>। পারস্কর ও হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে পথিক কর্তৃক পথে রুদ্রপূজার এবং 'শূলগব' প্রভৃতি বিভিন্ন জটিল রুদ্রযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে।

এইভাবে রুদ্রশিবের রূপে এমন কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়ার সমাবেশ হয়েছে, যেগুলির মূল সর্বতোভাবে বৈদিক আর্য ভাবনা ও সাধনার মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ তাঁর শান্ত রূপের পাশে এই অশান্ত রূপ-কল্পনা ঋগ্বেদেই বিদ্যমান (অবশ্য আর্য অনার্য সকল দেবতা-প্রমথের মধ্যেই এই দ্বৈধ রূপ লক্ষিত হয়); এবং এই দ্বিতীয় রূপটি বিস্তৃত হতে হতে এক সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই নামাবলীর কতকগুলি নতুন দেওয়া, কতকগুলি অন্যান্য দেবতার সংশ্লেষে পাওয়া। উল্লিখিত রুদ্র-অনুষ্ঠানগুলি যজমানের কল্পিত কৃত্য নয়, লোকসমাজে প্রচলিত ব্রত-কৃত্য ইত্যাদির শাস্ত্রীয় যজ্ঞরূপ। গৃহ্যসূত্রে যেমন রুদ্রশিবের ক্রূর রূপের চরম পরিণতি দেখা দিয়েছে, তেমনি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে শোধন-মাধ্যমে তাঁর আর্যীকরণের চেষ্টা হয়েছে। এমনিভাবে শান্ত ও অশান্ত দ্বিবিধ রূপের সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস হতে থাকে। উপনিষদের যুগে তাঁর উগ্রত্ব শান্ত ভাবের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে থাকে; ক্রমে ক্রমে রুদ্র নামে রূপে গুণে ক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়ে যান শান্তম্ 'শিব'-এ।

রুদ্র দেবতার এই যে ধীরে ধীরে শিব দেবতায় উপনীতি, উগ্রত্ব ক্রূরত্ব থেকে শান্তরূপে উপসংহৃতি, তার পটভূমিকায় সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এক বিরাট বিবর্তন-ইতিহাস বিদ্যমান। সেই অপরূপ ইতিহাসের সন্ধানে আমাদের যেতে হয় আর্য এলাকার বাইরে আর্যেতর জীবনের ও মননের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে।

রুদ্রশিবের রূপগুণের আলোচনায় শ্রীনীলকণ্ঠন শাস্ত্রী অনার্য ধর্মায়ণের প্রলেপ লক্ষ্য করেছেন[২৫]। ক্রুকের ধারণা, বহু লৌকিক ভাবনার সংমিশ্রণে রুদ্র-শিবের রূপলাভ সম্ভব হয়েছে[২৬]। অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য শৈব ধর্মকে প্রাগার্য জনগণের ধর্ম থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন[২৭]। ডঃ কুমারস্বামীর বিশ্বাস, নটরাজের তাণ্ডবনৃত্য প্রাগার্য প্রমথর নৃত্য থেকে অনুকৃত[২৮]। অধ্যাপক হুইটনী বলেন: Siva may be a local form of Rudra, arisen under the influence of peculiar climatic relations in the districts from which he made his way into Hindostan proper[২৯]।

'একব্রাত্য' শিব ব্রাতপতি ও গৃহপতি। ঋগ্বেদে 'ব্রাত' শব্দ পাওয়া যায় দল বা ঝাঁক অর্থে <১.১৬৩.৮।৩.২৬.২।৯.১৪.২>। এই ব্রাতরা আর্য ঋষিগোষ্ঠীর বহির্ভূত যাযাবর মানুষের দল। বৈদিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে হাজার হাজার ব্রাত্যকে একত্রে শুদ্ধ করে নেওয়া হত 'ব্রাত্যস্তোম'-এর মাধ্যমে <তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, লাট্টায়ণ ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র দ্রঃ>; প্রধান যজমানকে বলা হত 'গৃহপতি'। শুদ্ধি-অন্তে তারা গ্রামে এসে বাস করত, কিন্তু পূর্বজীবনের কোনকিছুই সঙ্গে

করে আনতে পারত না। শিব এই ব্রাত্যদের সঙ্গে যুক্ত, লোকালয়ের বাইরে তাঁর পূজা।

প্রমথ শিব যেমন যাযাবর ব্রাহ্মণ ও ব্রাত্যদের দেবতা, তেমনি চোর ডাকাত অন্ত্যজদের অধিপতি। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও বাজসনেয়ী সংহিতা, শতপথ ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বহুবার এর উল্লেখ আছে। নির্ঘণ্টুতে তিনি 'তস্করাণাং পতিঃ'। হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে পথিক কর্তৃক রুদ্রপূজার উল্লেখ এবং পারস্কর গৃহ্যসূত্রে তাঁর পূজার বিধান দেওয়া আছে। তিথিতত্ত্বে তিনি 'নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্বদস্যুভিঃ'। এই তস্কর-অন্ত্যজরা ম্লেচ্ছ তথা অনার্য। গৃহ্যসূত্রে রুদ্রপূজা পথ নদী পর্বত অরণ্য চৌরঙ্গী শ্মশান ও গোশালায় কৃত্য বলে বিহিত হয়েছে [৩০]। এই বাহিরমুখী পূজা-রীতির জন্যে রুদ্রের রুদ্রত্ব দায়ী নয়; অনুষ্ঠানগুলি আর্যেতর এবং অনেক ক্ষেত্রে আর্যদের অনার্যস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষার মনোভাব থেকে জাত বলে লোকালয়ের বাইরে পূজাস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

বহির্ভারতীয় সমজাতীয় রুদ্র দেবতাদের অনেকেই ছিলেন পথিক ও ব্রাত্যদের দেবতা। গ্রীক দেবতা 'হারমিসের' পূজাবিধি ছিল গৃহ্যসূত্রের রুদ্রের মত; উপাসনা হত পথের ওপর, মূর্তি স্থাপিত হত দ্বারদেশে ও চৌরঙ্গীতে [৩১]। এটি আর্যেতর পূজাপদ্ধতি। গ্রীয়ারসন-কথিত 'বিহারী পীর', হোআইটহেড-বর্ণিত দক্ষিণী 'মহেশ্বর অম্ম' প্রভৃতি দেবতা, আমাদের বাঙলা দেশের বিদায়লাভী 'অলক্ষ্মী' এবং সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা সংখ্যাহীন ঘোড়সওয়ার ও বৃক্ষকোটর-পর্বতগুহা-নদীতীর-আশ্রয়ী প্রমথবৃন্দের লৌকিক উপাসনা এখনও এই পূজারীতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

রুদ্রের নিজ শরীরেই আছে তার স্বাক্ষর: 'তাঁহার বাহ্যরূপ বিচার করিলে অনার্যভাবেরই পরিচয় হয়। শিব উলঙ্গ বা তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, কণ্ঠে সর্পমালা, বৃষভ তাঁহার বাহন, পর্বতে তাঁহার বাস, ভূতপ্রেত লইয়া শ্মশানে তিনি বিচরণ করেন এবং চিতাভস্ম গায়ে মাখিয়া বিষ সিদ্ধি বা ধুস্তুর সেবন করিয়া থাকেন।...সংখ্যাতীত অনার্য নরনারীর নিত্য-পূজিত এই শ্মশানচারী উন্মত্ত দেবতা' [৩২]। ঋগ্বেদের রুদ্রে এই অনার্যত্ব প্রকট না হলেও অন্তর্ভূত এবং কালক্রমে বিস্তৃততর। 'আর্য রুদ্রের' যখন ব্রহ্মত্ব ঘটে, তখন 'অনার্য শিবের' উপাসনা হয় পূজামণ্ডপ থেকে বহু দূরে। তাই (রুদ্র-) শিবের অমরাবতীতে কোনদিনই স্থান হয় নি, অনার্য সমাজ থেকে আগত কোন প্রমথেরই না। বিষ্ণুর বাস যখন বৈকুণ্ঠে, তখন কৃষ্ণের স্থান বৃন্দাবনে-কুরুক্ষেত্রে-দ্বারকায়। তাই যজ্ঞে (রুদ্র-) শিবের অনধিকার [৩৩], তিনি স্বতন্ত্র [৩৪]। আর যখন তিনি ব্রাহ্মণগ্রন্থে স্বীকৃতি পেলেন, তখনও there was hostility between the old-fashioned Brahmanas and the worshippers of Rama, Krishna and Siva [৩৫]। শিব তখন নবীন ও প্রগতিশীল ধর্ম-অনুগামীদের অন্যতম নেতা।

আর্য রুদ্রে অনার্য শিবের মিশ্রণ হয়েছে। এই অনার্য কারা এবং তাদের উপাস্য শিবের রূপ ও ক্রিয়া কি ছিল?

অ। বেদে রুদ্রের অনুধ্যানে যে 'শিব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার সাধারণ অর্থ—শান্তরূপ। এর গঠনভঙ্গিতে, 'শী'+বন্ প্রত্যয়েন সাধু ৩৬। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমতে <৬ষ্ঠ অঃ>, 'শি' অর্থে পাপনাশক, 'ব' অর্থে মুক্তিদায়ক। সাধারণভাবে, 'শী' অর্থে শয়ন করা, 'ব' অধিকরণে জল, মঙ্গল, সুখ, রমণীয়তা ইত্যাদির দ্যোতক ৩৭। কিন্তু এ সবই পরবর্তী কালের আরোপিত দার্শনিক ব্যাখ্যা। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে, 'শিব' শব্দটি দ্রবিড়ী ৩৮। তামিল 'শিবন্' শব্দের অর্থ লাল, আর 'শেম্বু' বা 'চেম্পু' <তামা> থেকে 'শম্ভু' শব্দটি গঠিত। অন্যদিকে ঋগ্বেদে 'শিব' জাতির উল্লেখও স্মরণীয় <৭.১৮.৭>। দ্রবিড়ভাষীদের জনপ্রিয়তম রক্তদেবতা 'শিব-শম্ভু' বৈদিক বাত্যাদেব 'রুদ্রের' সঙ্গে মিলিত হয়ে হলেন নীললোহিত <ঋক্ ১০.১৩৬.৭>। দুজনের মিলন একই বিন্দুতে—দুজনেই উগ্রভৈরব, ভয়ানকসুন্দর।

স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি পড়ে সিন্ধুতীরে একদাজাগ্রত মহেঞ্জোদড়ো ও সিন্ধু-সভ্যতার দিকে। এখানে প্রকাশিত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কেউ কেউ বৈদিক-অবৈদিক সমন্বয় ৩৯, আবার কেউ তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসের তীর থেকে আগত ৪০ বলে মনে করেন। স্যর অরেলস্টাইন পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এই সভ্যতার যোগাযোগ ও সাদৃশ্যের প্রমাণ পেয়েছেন। অনেকের মত, দ্রবিড়ভাষীদের একটি বিশেষ শাখার দান সিন্ধুসভ্যতা ৪১। এখানে পাওয়া বহু-আলোচিত যোগিমূর্তিটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। একটি চতুষ্কোণ বেদীতে যোগাসনে মূর্তিটি উপবিষ্ট—ত্র্যম্বক জটাধারী উলঙ্গ উধর্বমেঢ্র ; একটি হস্ত জানুতে, কটিতে কোমরবন্ধনী, হস্তে-বক্ষে আবরণী, মস্তকে যুগ্ম শৃঙ্গ ; আসনের নীচে হরিণ, চারিদিকে হস্তী গণ্ডার মহিষ ও ব্যাঘ্র ৪২।

নীলকণ্ঠন শাস্ত্রী একে যোগিমূর্তি বলে মেনে নিতে রাজী নন। তিনি একে আর্যপূর্ব দৈবশক্তির প্রতিমূর্তি ও পরিণতি বলে মনে করেন ৪৩। কিন্তু এটি যে যোগিমূর্তি এবং শিবেরই আদিরূপ, মার্শালের এই অভিমত বহুসমর্থনপুষ্ট ৪৪। বৃষকে তাঁর বাহন হিসেবে এখানে দেখানো হয় নি বটে, কিন্তু উর্বরতাবৃদ্ধির প্রতীক লিঙ্গ-উপাসনার সঙ্গে সংযোগের প্রমাণ তাঁর উধর্বমেঢ্রার মধ্যে বর্তমান ৪৫। এটি তাঁর পশুপতি মূর্তি ; তিনি এখানে মহাযোগী, মৃগাসন, ত্রিমুখ ; উল্লম্ফনরত ব্যাঘ্র যুদ্ধ বা ধ্বংসের প্রতীক। শিবের 'দক্ষিণামূর্তি'তে মৃগাসনের উল্লেখ মেলে এবং গোপীনাথ রাওয়ের মতে ইনি 'চতুর্মুখ মহেশ'। ফাদার হেরাসের অনুমান, এই উগ্র দেবতাকে সাত বা তার অধিক নরবলি দেওয়া হত ৪৬। মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধের রুদ্রের কাছে নরবলি দানের সঙ্কল্পের কথা সর্বজনবিদিত। এ ছাড়াও যোগিশিবের আরো দুটি খোদিত চিত্র এখানে পাওয়া গেছে। যোগসাধনা আর্যেতর সাধনজাত। অতএব অনুমিত হয়, আলোচ্য অঞ্চলের অধিবাসীরা জনৈক উগ্র প্রমথেশের উপাসনা যোগমাধ্যমে করত ও প্রয়োজনবোধে তাঁর কাছে নর

বা পশু বলি দিত। লিঙ্গপূজার সঙ্গেও এঁর যোগ ছিল। ফলত, সিন্ধুতীরের এই মহাযোগী যে প্রাগার্য কোন গোষ্ঠীর উপাস্য দেবতার পরিণত শিল্পরূপ, এ সম্পর্কে সংশয় না থাকারই কথা। প্রোটো-অস্ট্রেলএড, ভূমধ্যসাগরীয়, অ্যাল্‌পিনএড, মঙ্গোলএড প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর মিশ্রণজাত হলেও সিন্ধুসভ্যতা মূলত দ্রবিড়ী। অতএব এই দেবতা দ্রাবিড়ভাষি পূজিত এবং রুদ্রশিবের ভিত্তিরচয়িতা।

আ। কিন্তু দ্রবিড় সভ্যতা কেবলমাত্র পঞ্চনদের তীরেই আবদ্ধ ছিল না, ভারতের নানাস্থানে তারা ছড়িয়ে ছিল। তাছাড়া ছিল অনার্য জাতির অন্যান্য শাখাও। আলোচনার কেন্দ্রকে সিন্ধুনদের বিন্দু থেকে সরিয়ে সারা ভারতের পরিধি-পরিক্রমায় নিয়ে গেলে আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। রুদ্রজ 'মরুদ্‌গণ' এ বিষয়ে অন্যতম সহায়ক। ঋগ্বেদে এদের বলা হয়েছে গণ ভূত রাক্ষস পিশাচ অসুর বহুরূপী ভৌতিক দেহধারী ও অপাচ্য মাংসাহারী। এরাই মহাভারতে<সৌপ্তিকপর্বে> নরপশু এবং পুরাণে ভূতপ্রেতদৈত্যদানা নামে-রূপে বিবর্তিত। গ্রীসের প্রাক্‌-হেলেনীয় দেবতাবৃন্দ, রোমক দৈত্যদানা ও পরবর্তী কালের পাশ্চাত্ত্য যুদ্ধদেবতা 'বাইথিনীয়া' 'আরেশ' প্রভৃতির মত মরুৎরাও দস্যু তস্কর ব্যাধ মৎস্যজীবীদের পূজ্য [৪৭], 'শূদ্রাণাম্‌ গণনায়কঃ'। ইন্দ্রশত্রু, দক্ষযজ্ঞে রুদ্রসঙ্গী, বীরভদ্র-অনুগামী, দেবপিতৃ-মানববিরোধী মরুদ্‌গণ 'দাস-দস্যু-অরাতি'গণের মতই অনার্য জাতির দ্যোতক: দেবতাদের সঙ্গে তাদের নিয়ত দ্বন্দ্বকে আর্য-অনার্য সংঘাতের কল্পনামণ্ডিত শিল্পরূপ বলা যেতে পারে [৪৮]। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতায় গণপতি রুদ্রগণকে সূত্রধার কামার কুমোর ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলা হয়েছে [৪৯]। এরা নিষাদ বা আদি-অস্ট্রেলীয়। মরুদ্‌গণ এদের উপাসিত প্রমথবৃন্দ, এবং উপাসকদের রূপকও। রুদ্রের সঙ্গে মরুৎদের আত্মীয়তা রুদ্রের আদি-অস্ট্রেলীয় ঘনিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে।

ই। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতায় শিবের অপর নাম গিরিশ গিরিত্র গিরিচর; মূষিক তাঁর বাহন। তিনি পর্বতের ন্যায় উন্নত ও শুভ্রোজ্জ্বল রজতগিরি-সন্নিভ। ভগিনী নিবেদিতার মতে, হিমালয়ের উপমা নিয়ে শিবের এই মহান রূপটি পরিকল্পিত [৫০]। ডঃ ভাণ্ডারকর বলেন, এই পর্বত হল মেঘ, যেখান থেকে তিনি বজ্র নিক্ষেপ করেন। তাই তিনি 'গিরৌ শেতে' [৫১]। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ধারণা, শ্বেত পর্বতের ওপর কৃষ্ণ মেঘের আভাসে শিব নীলকণ্ঠ [৫২]। পর্বতের সঙ্গে রুদ্রের যোগ আদ্যন্ত: মুজবৎ পর্বতে তিনি বাস করেন, তাঁর স্ত্রী পার্বতী, শ্বশুর পর্বতাধিপ, পার্বতীয়া গঙ্গার ধারক তিনি।

ইউরোপের দৈত্যদানারা পর্বতগুহাবাসী। অতএব ক্রুকের অভিমত, হিমালয়ের ভৌগোলিক প্রাধান্য এবং এখানে মুনিঋষিদের আবাসস্থান, তাই রুদ্র ও গিরি অভিন্ন [৫৩]। যে সময়ে রুদ্র মূজবান পর্বতবাসিরূপে বর্ণিত, তখন হিমালয়ে মুনি-ঋষিদের পঞ্চাশোর্ধ্ব জীবনের ভগ্নাংশও অতিবাহিত হত না। বরং, বিদেশী প্রমথের মত এই রুদ্রকেও পার্বত্য দেবতা বলে গ্রহণ করা সংগততর; অর্থাৎ হিমালয়ে বসবাসকারী

(রজতগিরিনিভ) পার্বত্যজাতির উপাসিত জনৈক প্রমথ আর্যরুদ্রের সঙ্গে মিলিত হন। লিঙ্গ-উপাসনার সঙ্গে এঁরও যোগ ছিল। আজও হিমালয়ের উপলবন্ধুর বুকের ওপর অমরনাথ-পশুপতিনাথ-বদ্রিনাথ-মহাকাল প্রভৃতি অসংখ্য শিব ও প্রতীক সেই সুপ্রাচীন পার্বত্য উপাসনার স্মৃতি বহন করে চলেছে। ওপার্ট একে তুরাণীয় পূজারীতি বলে মনে করেন [৫৪]। হিমালয়ের নির্জন অধিত্যকায় অর্জুন যে পশুপতির সাক্ষাৎ লাভ করেন, তিনি ছিলেন কিরাতবেশী। অথর্ববেদে রুদ্র কিরাতরূপী এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে <১৬.৯.১২>মৃগয়াধিপ। পার্বত্য কিরাতরা ছিল এই 'Lord of the mountains and master of the ghosts' স্থপতি কৃত্তিবাসের ভক্তিনম্র পূজারী। এরা মঙ্গোলগোষ্ঠীভুক্ত। অবশ্য পর্বতপূজা কেবলমাত্র উত্তরদেশীয় বৈশিষ্ট্য ছিল না, দক্ষিণ ও মধ্য ভারতেও পর্বতদেবতা ছিলেন ভিন্ন নামে কিন্তু প্রায়-অভিন্ন রূপে [৫৫]।

ঈ। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত দ্রবিড়ভাষী ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত আদি-অস্ট্রেলীয় (পূর্বমতে এরাও ভূমধ্যসাগরাগত)। একদল নিয়ে এল গ্রামকেন্দ্রিক শস্য উৎসব, অন্যদল যুগনদ্ধ দেবদেবী। ভারতে এই দুটি গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটে এবং আর্য আগমনের আগেই বিস্তৃতিলাভ করে। সিন্ধুনদের তীরেও এরা পরস্পর মিলিত হয়েছিল [৫৬]। প্রাগার্য এই সংস্কৃতির ধর্ম মণ্ডলীতে দেখা যেত, প্রধান প্রধান গ্রামদেবী ও শস্যদেবীর সঙ্গে এক একজন নিত্যসঙ্গী প্রমথ। সেকালের এইরকম একজন শক্তিশালী দেবতার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ওপার্ট [৫৭]। এঁর নাম Aiyanār (শাস্তা), ভূতেশ ভূতনাথ ভূতরাজ। দাক্ষিণাত্যে ইনি 'আয়ার'-রূপে পূজা পেতেন। শব্দটির মূল Aya, Ayya, Aiya থেকে, অর্থ—প্রভু, পিতা। তাই অনেক সময়ে এঁকে 'পরমপিতা' বলে মনে করা হত। ইনি শিকারী বিভূতিকায় হস্তী বা ঘোটকারোহী শক্রঘ্ন বরদ পুত্রদ জলদ ক্ষেত্রপাল অরণ্যরক্ষক বীরভদ্র ভৈরব; সঙ্গী একটি সারমেয়। এই Ayyappar সমজাতীয় প্রমথ ভারতের অনার্য জাতির মধ্যে নানা নামে ও রূপে ছড়িয়ে ছিলেন He is, as lord of the ghosts, revered by the Non-Aryan aborigines under one designation or another all over the country [৫৮]। আজও দক্ষিণ ভারতে এঁর চড়ক-উৎসব হয়।

বৈদিক রুদ্রের অনার্য উৎসমূল ভারতের বুকে ছড়িয়ে থাকা এই ভূতপতি শাস্তা ভৈরব প্রমথদের মধ্যে নিহিত। বিভিন্ন অঞ্চলে এঁদের বিভিন্ন প্রকাশ হলেও গুণ-ক্রিয়া প্রায় একরূপ ছিল। এবং রুদ্রশিবের চরিত্রের সঙ্গে সেগুলির সাদৃশ্য ও অভিন্নতা প্রশ্নাতীত। স্বাভাবিকভাবেই এঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসীম এবং আর্যরা যতই দ্বন্দ্বমাধ্যমে অনার্যদের নিকটতর হয়েছে, ততই 'অযজ্ঞ'-জাতীয় প্রমথের ছায়াপাত রুদ্রচরিত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উ। এইভাবে আর্য রুদ্রের রূপে ও গুণে আর্যেতর ভূতনাথ, রক্তদেবতা,

লোহিতদেব, পর্বতেশ্বর, অরণ্যাধিপতি, পশুপ, ব্রাত্য ও শিল্পীদের উপাস্যদেব, মহাযোগী, বলিকামী প্রমথবৃন্দের দেহ-মনের প্রভাব তিল তিল করে সঞ্চিত হয়েছে। কালক্রমে ঐতিহাসিক কারণে আর্যরুদ্রে অনার্য-শিবের তথা আর্যেতর প্রমথদের প্রাধান্য বিস্তৃততর হতে হতে একদা তাঁকে লোকায়ত করে তুলেছে। তখন অথর্ব-বেদে যজ্ঞধূমাঙ্কিত বেদীর পাশে জাদুবিদ্যার আসর পাততে হয়েছে। অনার্য শিবকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার প্রাথমিক প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন তাঁর অনার্যত্বকে শুদ্ধি-মাধ্যমে আর্যায়িত করে নেওয়া হল, ঠিক যেভাবে ব্রাত্যদের 'শুদ্ধ' করে নেওয়া হত যজ্ঞমাধ্যমে। এই পথেই বহু আর্যেতর উপাদান অনুপ্রবিষ্ট হল আর্য সংস্কৃতিতে—শিব হলেন 'মহানুভব দেবপ্রিয় দেবাধিদেব'। অনার্য প্রমথগণ স্বীকৃতি পেলেন, ব্রাহ্মণগ্রন্থে পেলেন প্রতিষ্ঠা, প্রাধান্য পেলেন 'শিব শম্ভু'। শর্ব সর্ব ভব উগ্র ঘোর এঁরা হলেন ভূতনাথ, দ্বিপদী ও চতুষ্পদীদের অধীশ্বর, পঞ্চপশুর অধিপ, বিষঘ্ন, ব্রাত্যরক্ষক, গ্রামপ্রহরী, দিক্‌পাল ও রৌদ্র। চলার পথে এলেন 'একাদশ রুদ্র', কালপ্রবাহে যুক্ত হলেন রুদ্র-শিবের সঙ্গে। তখন রুদ্র-শিবের যে রৌদ্ররসায়িত অভিব্যক্তি, তার ক্রোধশান্তির জন্যে রচিত হল শুক্লযজুর 'রুদ্রাধ্যায়ের' সশ্রদ্ধ প্রার্থনামন্ত্র।

কিন্তু দেবতার পথ-পরিক্রমা শেষ হল না। পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনার্য প্রমথদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে লাগল আর্য দেবসভায়। ক্রিয়াসাদৃশ্যে অনেকে মিলিত হলেন রুদ্রশিবের সঙ্গে। আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূঃর আগে প্রচলন হল শিবপূজার, আঃ ১৫০ খ্রীঃ পূঃর আগে গঠিত হল শিবমূর্তি [৫৯], খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকে সাহিত্যে উল্লিখিত হতে থাকলেন শিব দেবতা।

আর্য রুদ্র ও অনার্য শিব—উভয়ের মিলন ঘটল রজত-লোহিত বৈপরীত্যের সমাবেশে। আর্যেতর প্রভাবে উগ্র রুদ্র হয়ে উঠলেন উগ্রতর রুদ্রশিব—ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং, সহজ সরল রুদ্র-উপাসনা পরিণত হল জটিল দুর্বোধ্য রুদ্রপূজায়। কালের আঘাতে, পরিপার্শ্বের প্রয়োজনে, (বুদ্ধ-প্রভাবে) এবং আর্য ও অনার্য মানসজাত শান্তরসের অবগাহনে রুদ্রশিব রুদ্রত্বত্যাগে শান্ত হয়ে উঠলেন। তিনি হলেন 'শিব'—তিনি আর অশান্ত 'রুদ্র' বা রক্তপিয়াসী 'প্রমথ-শিব' নন, শান্ত দান্ত শমতার প্রতিমূর্তি কল্যাণসুন্দর দেবতা। শিবসাধনার প্রসারিত ক্ষেত্রে তিনটি ধারা পাশাপাশি বহমান হল—ভূতশক্তি-আশ্রিত রুদ্রপূজা, উপনিষদ ও দর্শন-আশ্রয়ী শৈবধর্ম, এবং উভয়কোটির মিশ্র সংস্কৃতিসমন্বিত লৌকিক শিবপূজা। এই প্রবাহত্রয় মিলিত হয়ে যে মহাসমুদ্রে উপনীত হল, সে অনন্ত সায়রে শয়ন করে আছেন অপরূপ সমন্বিত 'পুরাণশিব'। পুরাণরচনার কালে, সার্বিক সমন্বয়ের যুগে শিব হলেন 'ত্রিদেবের' অন্যতম এবং তাঁর বিবর্তন-গতিপথে একটা মস্ত বড় পূর্ণচ্ছেদ পড়ল সাময়িকভাবে।

কিন্তু এই পরিণতি খুব সহজে হয় নি। বহুবার দক্ষযজ্ঞ নাশ করে তবেই

শিবকে যজ্ঞভাগের অধিকার লাভ করতে হয়েছিল ৬০। ঋগ্বেদোত্তর রুদ্রশিবের জীবনী এক নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সে চলার পথে পথে দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের সংখ্যাহীন ঘূর্ণাবর্ত, নব নব স্পর্শলাভ, নবীনতর রূপসাগরে অবগাহন। সেই ধারাস্নানে শিব হয়ে উঠেছেন বহুবিচিত্রের বর্ণালিসম্পাতে হিমালয়ের মত বিরাট ও সুন্দর, ভীতি-উৎপাদক ও প্রীতি-উদ্‌বোধক, মহিমান্বিত ও মনোবাসিত, কাছের ও দূরের।

অপরদিকে (আর্য সংস্পর্শ সত্ত্বেও) অনার্য ভাবপ্রবাহও স্ব-ছন্দে বহমান রইল। পুরাণ তার অনেক-কিছু গ্রহণ করল, অনেকখানি স্পর্শ করল, কিন্তু সমস্ত গ্রাস করতে পারল না। সেখানে শিবের আদিম অনার্যত্ব অব্যাহত রইল, বিবর্তিত হতে থাকল স্ব-ভাবে স্ব-পথে শান্তোগ্র রূপে-রসে।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক আবর্তে দোলায়িত রুদ্রশিব প্রাচীনের নিয়ন্তা ও নবীনের নেতা, বার্দ্ধক্যের প্রতিমূর্তি ও যৌবনের প্রতিমা, গোষ্ঠীর অধিপতি ও গণধর্মের অধীশ্বর— ব্রাত্য পথচারী উদাসীন অশাস্ত্রীয় অনিয়ম।

খ। শিব-শিবানী

ভারতীয় শাস্ত্রে ও সাহিত্যে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশকথা একাধিকবার পাওয়া যায়। মহাভারতে ও পুরাণে কাহিনীটি পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। এই পৌনঃপুনিকতা যে নিতান্তই অসাবধানতাবশত অথবা নিছক অনুকরণজনিত, তা মনে হয় না।

বৈদিক দেবমণ্ডলীতে রুদ্রের প্রাথমিক অবস্থান সহস্থিতির মাধ্যমে। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যতই তিনি অনার্য প্রমথদের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হতে লাগলেন, ততই আর্য দেবতাদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। বার বার তাঁকে যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হয়, বার বার তিনি যজ্ঞনাশান্তে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। কালক্রমে তাঁর শক্তি ও অধিকার প্রশ্নাতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আবার পুরাণে যখন সেই একই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তখন মনে প্রশ্ন জাগে।

আদিতে রুদ্রশিব যজ্ঞনাশে একাকী ব্রতী হয়েছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে গৌরীরোষ থেকে জাতা ভদ্রকালী বীরভদ্রসহ যজ্ঞস্থলে গমন করেন। গৌরী এখানে পার্বতী শৈলরাজদুহিতা, দাক্ষায়ণী নন, দেহত্যাগও করেন নি। কিন্তু পুরাণে তিনি দক্ষসুতা সতী, পতিনিন্দাশ্রবণে দেহত্যাগব্রতা ; এবং শিব যজ্ঞ ধ্বংস করেন সতীকে হারিয়ে বিক্ষুব্ধ চিত্তে। সুতরাং দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারে দুটি সমান্তরাল কাহিনী দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে রুদ্র-শিব একাকী যজ্ঞনাশ করেন স্বীয় যজ্ঞভাগ লাভ

করার জন্যে (পরবর্তী কালে এই কার্যটি শিব-শিবানী একত্রে সম্পন্ন করেন)। দ্বিতীয় আখ্যানে, সতীর আত্মবিসর্জনে শিবের প্রলয়ংকর বিক্ষোভ ও সেই কারণে যজ্ঞধ্বংস। হয়তো প্রথম কাহিনীরই এটি বিবর্তিত রূপ। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। গৌরী প্রথমে ছিলেন পার্বতী অর্থাৎ আর্য দেবমণ্ডলীর বাইরে; দ্বিতীয়ে তিনি হলেন দক্ষকন্যা অর্থাৎ আর্যদৈবচক্রের অন্তর্ভুক্তা, তৃতীয়ে (মৃত্যুর পর) পুনরায় হিমালয়কন্যা। এইভাবে আর্য-বহির্ভূতা দেবীকে আর্য স্পর্শ ও স্বীকৃতি দান করে তারপর স্বর্গীয় পরিধির বাহির-দুয়ারে রাখা হল, যেমন রুদ্রশিব যজ্ঞভাগ পেয়েও অমরাবতীর স্থায়ী নাগরিক হতে পারেন নি।

একই কাহিনীর এই বিচিত্র গতিভঙ্গির উৎস সন্ধান করতে গেলে দেখা যায়, সংমিশ্রণের প্রথম পর্যায়ে আর্য মানস অনার্য প্রমথদের তাদের শক্তিময়ী সঙ্গিনীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল; ঋগ্বেদের রুদ্রের সঙ্গে একা শিবকে যুক্ত করে অন্যান্য দেবতাদের মতই দান করেছিল একক জীবনের নির্জন পরিবেশ। 'আর্য রুদ্রের' পক্ষে এ অবস্থা হয়তো সহনীয়, কিন্তু 'অনার্য শিবের' পক্ষে তা ছিল না। আর্যদের পক্ষেও আর্যেতর দেবীকে বেশিদিন দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হল না। তাই দেবী এলেন প্রথমে শৈলরাজতনয়ারূপে, তারপর দক্ষের আত্মজা হয়ে। দক্ষের স্বর্গীয় যজ্ঞে আত্মহতা সতীদেহ কাঁধে নিয়ে রুদ্রশিব বিশ্ব পরিভ্রমণে রত হলেন, সারা দেশে ছড়িয়ে দিলেন তাঁকে খণ্ড খণ্ড করে (অর্থাৎ ভারতের বুকে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন শক্তিদেবী স্বীকৃতি পেলেন এই রূপক কাহিনীর মাধ্যমে), পূর্ব বিরহের প্রতিশোধ নিলেন বেদনামথিত মিলনের মধ্যে দিয়ে, নিত্যসঙ্গিনীকে ফিরে পেলেন চিরকালের সহধর্মিণীরূপে। প্রতিটি শক্তিমন্দিরে শিবের উপস্থিতি ও সাহচর্য অবশ্য-স্বীকৃতি পেল, আর্য আত্মিক সাধনা অনার্য প্রাণশক্তির কাছে হল পরাজিত, একক রুদ্রের স্থান অধিকার করলেন শিব-শিবানী।

কিন্তু এ হল সমগ্র ইতিহাসের সারাংশ। এই বিবর্তন দু'একদিনের নয়, দু'-একজনেরও নয়। এর পেছনে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের বিরাট আকাশ, যার পটভূমিকায় আর্য ও অনার্যের বস্তুজাগতিক সংঘর্ষ ও মনোজাগতিক সংঘাতের বিচিত্র লীলা, যার মর্মোদ্ধার আমাদের শিব-শিবানী তত্ত্বে পৌঁছে দিতে পারে।

১। আর্যা রুদ্রাণী।

প্রাক্-ঋগ্বেদীয় যুগে আর্যরা ছিল অশ্বারোহী যাযাবর, সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। ঋগ্বেদের যুগেও এই ধারা ও ধরণ অব্যাহত ছিল। নারী একদিকে ছিল সহধর্মিণী, অন্যদিকে স্বাধীনতা সত্ত্বেও পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দাম্পত্য সম্বন্ধকে যেমন পবিত্র আদর্শ মনে করা হত, তেমনি পাশাখেলায় স্ত্রীকে পণ রাখা হত, তার মনকে অনিয়ন্ত্রিত, প্রেমকে অস্থির ও হৃদয়কে হায়নার মত বলে বর্ণনা করা হত [১]। সমাজ-ব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিক রূপায়ণ ও সেইপথে পূর্ণতর বিবর্তনের ফলে সমাজকর্মে

নারীদের প্রাধান্য ক্রমে কমে আসতে থাকে। দু'একজন মুদ্‌গলানীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও নারী ছিল মূলত দুহিতা মাত্র ২। এই পরুষ সমাজে লালিত আর্যদের কল্পনাদৃষ্টিতে (দেবীর অস্তিত্ব সত্ত্বেও) পুরুষ-দেবতার একমেব প্রাধান্য। তাই ঋগ্বেদের রুদ্র অদ্বিতীয় ('রোদসী' রুদ্রাণী নন)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 'একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায়' <৩.২> শ্লোকটি রুদ্রের একত্ব ও একাকিত্ব দ্বিবিধ রূপেরই ভাষ্য।

কিন্তু আর্য দেবমণ্ডলীর এই চিরকুমারসভা চিরস্থায়ী হল না, কালক্রমে স্বীকার করে নিতে হল তাঁদের দ্বিতীয়াকে। বলতে হল: 'স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। সহৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্॥'

যাযাবর আর্যরা স্থাবর হয়ে কৃষিকার্যে ও পশুপালনে মনোনিবেশ করে <ঋগ্বেদ ৪.৫৭; অনেকে 'আর্য' অর্থে কৃষক মনে করেন>। ফলে মাটির পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা তাদের সংস্কৃতি-ভাবনায় পবিত্রতার ভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়। পৃথিবী-বন্দনা বিধৃত হয় সূক্তে, সেইসঙ্গে কৃষি-স্তবও। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ঋক্: 'ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোন…লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক…পর্জন্য মধুময় জল দ্বারা সিক্ত করুন পৃথিবীকে' <৪.৫৭. ৩,৪,৮। ৬.৭০. ২,৫>। পৃথ্বীমাতার প্রতি সশ্রদ্ধ হৃদয় নারীর প্রতিও শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠে, তাঁদের সম্পর্কে অনাদরের পাশে পাশে সমাদরের শ্লোক প্রকাশিত হতে থাকে < ৪.৩২.১৬। ৫.৩.২। ৮.৩১.৫>। বাক্-সূক্তের মাধ্যমে তার শৈল্পিক অভিব্যক্তি: 'অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মাদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ।' উষাস্তুতিতে স্ফূর্ত হয় ভোরবেলাকার সহজ লাবণ্য <১.১২৩>: 'কালো আঁধার ভেদ করে পুরাতনী ও নিত্যনবীনা উষা জাগলেন সকলের আগে…বিচিত্রগামিনী ও রোগনাশিনী উষা ..তিনি মহতী ও যুবতী, আনন্দদায়িনী ও সুখদায়িনী…প্রণয়ী সূর্য তাঁর অনুগমন করেন…তিনি অনবদ্যা।…উচ্চারিত হোক সত্যবাক্য, উন্মীলিত হোক প্রজ্ঞা, প্রজ্বলিত হোক প্রদীপ্ত অগ্নি।…দেবি! কন্যার মত বিকশিত শরীরে তুমি দীপ্ত সূর্যের কাছে গমন কর, যুবতীর মত সহাস্যে তাঁর সম্মুখে অনাবৃত কর তোমার বক্ষোদেশ…বিদূরিত কর অন্ধকার।'

ধীরে ধীরে আর্য দৈব স্বর্গে দেবীদের ক্রমিক আবির্ভাব ও প্রাধান্য সূচিত হতে থাকে; উত্তরকালে আর্য দেবগণ একে একে সস্ত্রীক হয়ে ওঠেন। আর্যদের সেই সময়কার এই নতুন মনোভাবটি বেদেই প্রকাশিত হয়েছে। 'পৃথিবীসূক্তে' যেমন পৃথ্বীদেবীর বন্দনা করা হয়েছে, তেমনি 'দেবীসূক্তে' ভূলোকদ্যুলোকের পরপারে বর্তমানা আদি শক্তির স্তুতি রচিত হয়েছে ৩। অনেক ক্ষেত্রে দেবদেবীদের পিতা-মাতারূপে 'দ্যাবা-পৃথিবী' একত্রে বন্দিত হয়েছেন <১.৮৯.৪। ১.১৫৯.১,২। ১.১৮৫. ২-১১। ৬.৭০.৬>:

ভূরিঃ দ্বে অচরন্তী চরন্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতুং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥

এঁরা বিশ্বপিতা 'প্রজাপতি' ও বিশ্বমাতা 'অদিতি'-রূপেও স্তুত হয়েছেন <১.৮৯.১০ । ১০.১২১. ৮-১০> । গ্রীক রোমক কেল্টীয় টিউটন শ্লাভ কল্পনাজগতের মত এঁরা প্রকৃতির পটে রূপায়িত দেবদেবী। অন্যত্র <১০.১২৯.৫> এঁরা 'ইচ্ছা' ও 'প্রকৃতি'-রূপে কল্পিত হয়েছেন। আবার, এঁদের কাছে অন্নদানের প্রার্থনাও করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে <৪.২৭> আকাশ ও পৃথিবীর দ্বৈতলীলা বর্ণিত হয়েছে: দুজনের নিত্য মিলনের মধ্যে একদা দেখা দিল বিরহের অপার বৈতরণী, ব্যাহত হল সৃষ্টিকার্য, দেবতাদের সহায়তায় পুনরায় মিলন এবং সেই উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান। পৃথিবী-মাতার বিস্তৃত বন্দনা রচিত হল অথর্ববেদে <১২.১-৬৩> ; উদ্‌গীত হল: ''যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ' <১২.১.৮> ; প্রার্থনা হল: 'স নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ' <১২.১.১০> ; ঘোষণা করা হল: 'মাতা ভূমিং পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ' <১২.১.১২.> ।

শিব-শিবানীর মিলন ও ক্রমবিকাশের ভিত্তিগঠনে এই 'দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী'র দানকে অস্বীকার করা চলে না। অবশ্য আর্য দেবমণ্ডলীতে এঁদের নির্ব্যূঢ় প্রাধান্য তখন ছিল না এবং আর্য মানসেও আকাশপিতা ও পৃথ্বীমাতা সমগ্র জগৎ ও জীবনের রূপ ও রহস্যের আদি তত্ত্ব বলে প্রতিভাত হন নি (বরং উভয়ের মানবীকরণ হয়েছিল)। তবু বলা চলে, ঋগ্বেদে এরূপ যুগ্ম দেবতা তথা পিতা-মাতার ধারণা প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল[৪] বলেই পরবর্তী কালে তা শিব-শিবানীর (এবং অন্যান্য যুগ্মদেবতার,) মাধ্যমে সমগ্র স্বর্গরাজ্য ও দর্শনজগৎকে গ্রাস করতে পেরেছিল। আরও লক্ষণীয়, ঋগ্বৈদিক এই দ্যৌস্‌পিতা-পৃথ্বীর মধ্যে বিশ্বপিতৃত্ব ও বিশ্বমাতৃত্ব, পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্ব, দৈব বিরহমিলনকথা সংকেতে বিদ্যমান ছিল ; এবং এইগুলি শিব-শিবানীর মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিকাশমান হল।

আর্য দৈবচক্রে শক্তিদেবতার প্রথম আবির্ভাব যজুর্বেদোক্ত 'ত্র্যম্বকহোম'-এ <তৈত্তি সং ১. ৮. ৬> । তিনি এখানে রুদ্রভগিনী 'অম্বিকা', আর রুদ্র হলেন 'কৃত্তিবাস'—মূষিকবাহন মূজবৎ পর্বতবাসী। মনে হয়, এই অম্বিকা ও তাঁর সহচর প্রমথ হিমালয়বাসী কোন জাতির উপাস্য দেবতা ; রুদ্রের সঙ্গে এঁদের যোগ হয়। কেন উপনিষদে 'উমা-হৈমবতী' নামে এক দেবীর আবির্ভাব হয় দেবতাদের ব্রহ্মজ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে <৩.১২>। ভাষ্যকার এঁকে বলেছেন 'ব্রহ্মবিদ্যা'[৫]। ডঃ ভাণ্ডারকর কেনোপনিষদের ব্রহ্মকে রুদ্রশিব এবং উমাকে তাঁর শক্তি বলে মনে করেন[৬]। এই অভিমত অবশ্য সর্বজনীন নয়। 'হৈমবতী'র অর্থ সোনারবরণী ; পরে শব্দটি হিমবতের কন্যা অর্থে প্রযুক্ত হতে থাকল। রুদ্রশিব গিরিশ, উমা হৈমবতী: অতএব অমরাবতী থেকে বহুদূরে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে দুজনের মধ্যে যে একটি পূর্বনিহিত যোগ বিদ্যমান ছিল, এ অনুমান বোধহয় অসংগত নয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শিব আহূত হয়েছেন পরব্রহ্মরূপে। এই গ্রন্থে সাংখ্য দর্শনের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে; পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের 'মায়ী' পুরুষ-শিব, 'মায়া' প্রকৃতি-শিবানী। শৈবদর্শন শ্বেতাশ্বতরের দর্শনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

শ্রৌতসূত্রে ভবানী শর্বাণী ঈশানী রুদ্রাণী প্রভৃতি দেবী রুদ্রের সহচরীরূপে উল্লিখিত হয়েছেন। পারস্কর ও হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে 'ভবস্য দেবস্য পত্ন্যায়ৈ স্বাহা'। গৃহ্যসূত্রে 'দুর্গা' নাম প্রথমবার উল্লিখিত হয়; এঁকে বলা হয়েছে মহাকালী মহাযোগিনী মহাপৃথ্বী। এঁরা সকলেই রুদ্রপত্নীরূপে পরিগণিত হন এবং একই দেবীর বিভিন্ন রূপ বলে পরিচিত হন। মহাভারতে (ভীষ্মপর্ব) তিনি পার্বতী স্কন্দমাতা কাত্যায়নী। অতঃপর অন্যান্য অনেক দেবী শিবের সঙ্গে একে একে যুক্ত হতে থাকেন—পার্বতী কালী করালী চণ্ডী শাকম্ভরী ভ্রামরী চামুণ্ডা বিন্ধ্যাচলবাসিনী ইত্যাদি।

শিবানীর এই সকল নাম ও রূপ আর্যসমাজের নয়। 'আর্যসমাজের মূলে পিতৃশাসনতন্ত্র, অনার্যসমাজের মূলে মাতৃশাসনতন্ত্র। এইজন্য বেদে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য নাই। আর্যসমাজে অনার্য প্রভাবের সঙ্গে এই স্ত্রীদেবতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। তাহা লইয়াও যে সমাজে বিস্তর বিরোধ ঘটিয়াছে প্রাকৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও এক দিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্যমূর্তি অন্যদিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্য-মূর্তি ৭।' আর্যেতর দেবী আর্য মননে সুশোভিতা হয়ে উঠতে লাগলেন, বিভিন্ন জন ও জনপদ থেকে আহৃত বিভিন্ন দেবী শিবানীর সঙ্গে একীভূতা হয়ে গেলেন; তাঁদের নামগুলি হল দেবীর বিশেষণ-মালা। করালী-কালিকার অনার্যমূর্তি স্বীয় রীতিতে অব্যাহতভাবে পূজিত হয়ে চলল আর্যেতর সমাজে। আর্য প্রজ্ঞার সহায়ে শিবানী হলেন ব্রহ্মবিদ্যা, তন্ত্রের ত্রিপুরভৈরবী, পুরাণে ত্রিদেবতার অন্যতমা। শিব-শিবানী একত্রে এক বিশিষ্ট রূপ তত্ত্ব কল্পনা আদর্শ রূপে স্থায়ী হলেন ভারত-হৃদয়ে। আর সেই স্থায়ী ভাব গান হয়ে উঠল ধ্রুপদী কবিকণ্ঠে।

২। অনার্যা শিবানী।

শক্তিবাদের উৎসরূপে 'বাক্‌সূক্ত' <ঋক্ ১০.১২৫> এবং 'দেবীসূক্ত'<অথর্ব ৬.৩৮>উল্লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু শিবের অন্যতম উৎসমূল যেমন বৈদিক রুদ্র, শিবানীর গঠনভিত্তিতে তেমনি কোন আর্য দেবীর অবদান আছে, একথা স্বীকার করা যায় না। দ্যাবা-পৃথিবীর প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। শক্তিসাধনা ও শাক্ত দর্শনের স্বতন্ত্র স্বকীয় বিকাশ থেকে বোঝা যায়, অনার্য মণ্ডলীতে মাতৃকা-দেবতার উপাসনা প্রধানতম ছিল। পৃথ্বীদেবীরূপে এবং পর্বতে অরণ্যে কৃষিপ্রান্তরে আরও নানা দেবীরূপে এঁরা পূজিতা হতেন। অম্বিকা হৈমবতী ভবানী শর্বাণী বিন্ধ্যবাসিনী শাকম্ভরী দুর্গা প্রভৃতি দেবী অনার্যপূজিতা মাতৃকা। 'মধুকৈটভবধে মহাশক্তি

বরাননে' এইসব দেবী আর্যেতর গোষ্ঠীর সর্বজনপূজিতা 'মা'র বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন বিচিত্র রূপের নামমালা [৮], যিনি 'শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা' (হরিবংশ)। অনার্যা প্রমথিনীরাই আর্যস্বর্গে শক্তিদেবীরূপে প্রবেশ এবং আর্যেতর প্রভাবে শক্তিসঞ্চয় করতে থাকেন। আর্য মননশীলতা তাঁদের শিবের সঙ্গে যুক্ত করে শিব-শক্তি তত্ত্ব রূপায়িত করে তুলল [৯]। শক্তি হলেন শিবের 'সমবায়িনী শক্তি', আর শিব 'প্রসরচ্ছক্তি-কল্লোলজগল্লহরিকেলয়ে' (স্বচ্ছন্দতন্ত্র)।

পুরাণে, শিবানীর এই অনার্য-সম্বন্ধের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। মৎস্য ও ব্রহ্ম-পুরাণের হিমালয়কন্যা 'অপর্ণা' ও 'একপর্ণা' অনার্যাদেবী 'পর্ণশবরীর' সংশোধিত রূপ। দেবীপুরাণে বর্ণিত <৩১ অঃ> দেবীর রথযাত্রা, মণ্ডপে সাময়িক উপাসনা ও পূজান্তে গ্রামোপান্তে বিসর্জন আর্যেতর সাধনরীতির চিত্র। কয়েকটি পুরাণে বলা হয়েছে, শিবানী আদিতে ছিলেন কৃষ্ণা (কালী), তপস্যান্তে হলেন কাঞ্চনবর্ণা গৌরী [১০]; তাঁর কৃষ্ণাকোষ চিহ্নিত হল সিংহবাহনা 'কাত্যায়নী' তথা 'কৌষিকী' নামে। স্পষ্টতই অনার্যা দেবীর আর্যীভবনের ইতিহাস এখানে রূপক আকারে ফুটে উঠেছে। ভয়ংকরী কালী কোষত্যাগে হলেন 'রাজরাজেশ্বরী গৌরী'; আর তাঁর পূর্বেকার রূপটি 'কাত্যায়নী' 'কালী' ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়ে রইল।

লিঙ্গ <১০৬ অঃ> এবং আরও কয়েকটি পুরাণে পার্বতী থেকে কালীর জন্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মৎস্যপুরাণে, রাত্রিদেবী মেনকার গর্ভে গিয়ে দেবীকে কৃষ্ণবর্ণা করে দেন। এখানে আর্যীকরণের চেষ্টার থেকেও বড়ো হয়ে উঠেছে অনার্যা দেবীকে মূলত আর্যা বলে প্রমাণিত করার প্রয়াস। আসলে, দুটি কাহিনীর উদ্দেশ্য এক, ইতিহাসও এক। রুদ্র-শিবের পরিকল্পনায় যেমন অনার্য প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল, রুদ্রাণী-শিবানীর ক্ষেত্রেও তেমনি আর্যেতর প্রভাব ক্রিয়া করেছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য, শিবানীর জীবনী নয়, শিব-শিবানীর দ্বৈত রূপের উৎসসন্ধান। প্রাগার্য ভারতসংস্কৃতি যে সেই উৎসের অন্যতম আধার, দেবীর অনার্যত্বের উল্লেখ তারই ইঙ্গিতবহ।

অ। প্রথমেই আমাদের আসতে হয় আর্যপূর্ব সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের কাছে। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার লিঙ্গ, যোনিপ্রতীক, মাতৃকামূর্তি ও পৃথ্বীদেবীর খোদিত মূর্ত নিতান্ত অল্প পাওয়া যায় নি [১১]। সসন্তান মাতা, গর্ভবতী নারীমূর্তি ও আর একটি সীল—যাকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণে বলা যেতে পারে 'আত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ' শাকম্ভরী। এগুলি উর্বরতাসাধিকা [১২]। এই জাতীয় দেবী মিশরে ব্যাবিলনে এবং আদিমদের মধ্যে বিদ্যমানা ছিলেন। অবশ্য এই মূর্তির সবগুলিই যে মাতৃকা এবং উপাস্যা দেবী, এমন কথা বলা চলে না; শক্তিপূজাও যে এখানে বহুল প্রচলিত ধর্ম ছিল, এমন প্রমাণও মেলে না [১৩]। সিন্ধুতীরের লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট বিজয়ী আর্যরা তখনই গ্রহণ করে নি। এখানকার মহাযোগী ও মাতৃকা শিব-শিবানীর রূপগঠনে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন পরবর্তী কালের

কুশান মুদ্রায় অঙ্কিত শিবের সহচরীকে সিন্ধু উপত্যকার জনৈকা দেবী বলে মনে করা হয়[১৪]।

সৈন্ধব শক্তিপূজাকে স্বীকৃতি দিয়ে মার্শাল অভিমত দিলেন, এই উপাসনা প্রাচীনতর মাতৃকাসাধনা থেকে জাত এবং শৈব সাধনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল[১৫]। আধুনিক ঐতিহাসিকও বলেন, Siva was one of the principal deities of the people along with the Mother Goddess[১৬]। আগম স্মৃতিসারে যে 'শূদ্রাণাম্ গ্রামদেবতাঃ'র কথা বলা হয়েছে, তাঁরাই ভারতের জাতীয় দেবী; এঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এক একজন নিত্যসঙ্গী প্রমথ। এঁরা দুজনে পৃথ্বীমাতা ও জগৎপিতার প্রতীক: Mother earth and the great Father, as represented by the gramadevata and Aiyanar, are the central figures of the Gauda-Dravidian Pantheon[১৭]।

বাহির-ভারতে এই যুগল দেবতা বিভিন্ন নামে ও রূপে লীলারত ছিলেন। রোম ফিনীসিয়া মিশর বাবিলন আসিরিয়া আরব ইরাণে এঁরা একদা ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। বাইবেলে, আদম স্ত্রীর নামকরণ করেন 'ঈভ'; কারণ 'she was the mother of all living' <Gen. 3. 20>। ঈজীয় উপদ্বীপ ও সাগরের উপকূল বরাবর গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের 'মা' এবং তাঁর নিত্যসহচর—'সিবিলি' ও 'এথিস', 'হেপিৎ' ও 'থেসুপ' প্রভৃতি নামান্তরিত হয়ে ভারতে আগমন করেন। দ্রবিড়রা এই 'মা', 'অম্মা' (উমা)র উপাসনা করত 'অয্য্'-জাতীয় প্রমথের সঙ্গে একত্রে এবং এঁরাই—the Great Asiatic Mother Goddess and Father God, the former having as her symbol or vehicle the lion, the latter the bull, form undoubtedly one of the bases on which the Siva-Umā cult of the Hindu India grew up[১৮]।

আজও ভারতের পথেপ্রান্তরে সসঙ্গিনী ভূতেশ্বর ভৈরবের স্মরণিকা বর্তমান। তামিলনাদের 'মাদুরাই বীরণ', তেলেগুর 'পটুরাজু', বাঙ্গালোরের 'মুনেশ্বর'[১৯], উত্তর ভারতের 'গোরবাবা গোরেশ্বর ভীমসেন', গোন্দদের 'ভীব্‌সান,' বদ্রিনাথের 'ঘণ্টাকর্ণ,' কেদারনাথের 'ভৈরব', তুঙ্গনাথের 'কালভৈরো'[২০], বাঙলার 'দক্ষিণরায়' 'পঞ্চানন্দ' ইত্যাদি সংখ্যাহীন দেবতা আদিম প্রমথদের বিবর্তিত রূপ। এঁদের কারও বাহন ঘোড়া, কারও প্রতীক পাথর 'শূলম্' বা বংশদণ্ড, কারও হাতে 'লাট' বা গদা। এঁদের অনেকে আজ নিঃসঙ্গ, অনেককে সহজে পরিচিত বলে মনে হয় না, কিন্তু অধিকাংশ প্রমথ কোন না কোন গ্রামদেবীর সঙ্গী বা স্বামী, প্রায় সকলেই রুদ্র-শিবের সঙ্গে যুক্ত; মিশ্রণ সর্বত্র সমান নাও হতে পারে।

এই আর্যেতর যুগল দেবদেবী (তথা শৈব পিতামাতার ধারণা) ভারতীয় ধর্মভাবনায় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং অনুকূল পরিবেশে স্বাভিক বিবর্তনের মাধ্যমে যে ভেদরহিত যুগনদ্ধ দেবতায় পরিণত হয়, তাঁরাই শিব-শিবানী।

আ। কিন্তু শুধু এই ইতিহাসটুকুই নয়, শিব-শিবানীর উৎসসন্ধানে আমাদের আরও পেছনে সরে যেতে হয়।

বাইবেলে বলা হয়েছে : The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living thing। এবং : The rib which Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man <Gen. ii 7,22>। মাটি থেকে নর এবং নর-দেহ থেকে নারীর জন্মসম্ভাবনার এই বিশ্বাসটি আদিম। অস্ট্রেলিয়া মেলানেশিয়া টোগোল্যাণ্ড মেক্সিকো তাহিতি নেদারল্যাণ্ড নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে এই ধ্যানধারণার অল্পবিস্তর পার্থক্যসহ পরিচিতি মেলে ২১। ভারতে ওরাওঁ সাঁওতাল কুর্মী খাসী ইত্যাদি উপজাতির মধ্যে এবং আমাদের কতকগুলি গাজন-গীতিতে এই ধরণের মৃত্তিকাবিলাস আজও দেখা যায়।

আদি নরনারীর এই বিচিত্র জন্মকথা দেবদেবীকেও আশ্রয় করে। আত্মবিভক্তির মাধ্যমে ব্রহ্ম নিজদেহ থেকে সৃষ্টি করেন স্বীয় শক্তিকে; শিবানী হলেন শিবাংশ-সম্ভূতা; মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে <২.১০> তিনি শিবের বদনজাতা; লিঙ্গপুরাণে <১০৬ অঃ> পার্বতী শিবদেহে প্রবেশ করেন এবং কালীরূপে পুনর্জাতা হন; মেয়েদের ব্রতসাধনায় মাটির হরগৌরী মূর্তি গঠন করে পূজার যে রীতি আছে, তাও আদিম বিশ্বাসের ধারাবাহী। এর কথারূপ প্রকাশ পেয়েছে পুরাণের শিবানী ও অর্ধনারীশ্বর জন্মকাহিনীর মধ্যে। কিন্তু শিব-শিবানীর উদ্ভবের মূল শুধু এখানে নয়, জীবনের আরও গভীরে, আর্যেতর কৃষিভিত্তিক সমাজে ও তার ওপর গড়ে-ওঠা বিশিষ্ট মানসগঠনের গ্রাম্য পরিবেশে। সেখানেই তাঁদের প্রথম পরিচয়, শেষ পরিচয়ও।

ই। বাইবেলে ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করে বললেন : Be fruitful and multiply <Gen. i 22; ii 8, 21-25>। কৃষকের দৃষ্টিতে কর্ষণ ও প্রজনন অভিন্ন ব্যাপার। এবং যেহেতু দুয়ে মিলে প্রজনন, সেইজন্য তাদের স্ত্রী-দেবতাগণ সর্বদা জনৈক পুরুষসঙ্গী সহ বিরাজমানা। অগ্রসৃত কৃষিতন্ত্রে যুগল দেবতা উপাস্য : পিতৃদেবতা (আকাশ বা) সূর্য, মাতৃদেবতা পৃথিবী (অথবা নদী কি তদ্‌গোত্রীয়া শস্যদেবী)। ওপর থেকে সূর্য করেন ধারাবর্ষণ, দেন তাপ; পৃথিবী হয় পরিতৃপ্তা ও পরিপূর্ণা; কোলে আসে নবজাত শিশু কচিধান। এই মূল ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে দেবতার দ্বিবাচনিক রূপ, কর্ষণ ও প্রজনন-ঘনিষ্ঠতা এবং আনুষঙ্গিক কথা তত্ত্ব ও লীলাবিলাস।

সৃষ্টিতত্ত্বের এই আদিম ধারণাটি ব্রেস্টেড-উদ্ধৃত বাবিলনের Table of Creation-এ রূপায়িত হয়েছে :

When on high, heaven was not named,
Below, dry land was not named,
Apsu, their first begetter,
Mummo, Tiamat, the mother of all of them,
Their waters combined together.

পার্বত্য বাত্যাদেবতা এনলীল ছিলেন একক; সুমেরীয়রা যখন কৃষিকার্যকে জীবিকারূপে গ্রহণ করল, তিনি পেলেন একটি স্ত্রী—নিনলীল তার নাম। কৃষি সমাজের পরিবেশে সেমিটিক দেবতা নিনিভ বিবাহ করলেন গুলাকে ২২। শুধু বিবাহ-বার্তা নয়, নামেও এই ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'ভগবান' ও 'ভগবতী'র 'ভগ' শব্দটির অর্থ জননাঙ্গ ও ঐশ্বর্য দুইই—অর্থাৎ প্রজনন ও শস্যসম্পদের দেবতাই 'ভগবান-ভগবতী'।

[নানা কার্যকারণে মানুষ এর বিপরীত ভাবনাও করেছে। কৃষিকালে কৃত্য যৌনসংযম ক্রমে যৌন-বিরোধিতার প্রবণতায় পারিণত হয়। তখন প্রজনন তথা সৃষ্টিরহস্যকে অস্বীকৃতি জানিয়ে ব্রহ্মকে 'স্বয়ম্ভূ' বলে স্তব করা হয়। বাইবেলের ঈশ্বরও স্বয়ম্ভূ; এবং আল্লাহ সম্পর্কে কোরাণের ধ্যানমন্ত্র: He begetteth not neither is begotten]

কৃষকের ধারণায়, দেবতা কৃষির সহায়ক, শিক্ষক ও প্রথম কৃষাণ এবং দেবী তাঁর সহায়িকা।

মিশরের দেবী ঈসিস স্বামী অসিরিসকে যব-গমের বীজ দেন; তাই থেকে মানুষ শেখে কৃষিকর্ম। তামুজ-ঈশতারের জীবনীতেও অভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায়। দায়োনিসস ও আফ্রোদিতে এই ধরণের কৃষি-দম্পতি ২৩। আদমের জীবনে প্রথম বিস্ময় ঈভের জন্ম, দ্বিতীয় বিস্ময় কৃষিকার্য। এই ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনি আর্যদের কণ্ঠে, যেখানে পৃথিবীর মিলনকামনা জাগ্রত হয় এবং দ্যৌস্‌পিতার রেতঃ বা সূর্যের বর্ষণমাধ্যমে তিনি হন গর্ভবতী; আবির্ভাব হয় নবজাত শস্যের ২৪। মধ্যপ্রাচ্যের 'ফার্টাইল ক্রিসেণ্ট' অঞ্চলের কৃষির সঙ্গে দ্রবিড়ভাষীরা এই বিশ্বাস ও দেবতার যুগ্মরূপ নিয়ে আসে ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে; কালক্রমে তারই অন্যতম প্রধান পরিণত রূপ—শিব-শিবানী।

রুদ্রশিব কৃষিদেবতা। শস্যসংস্কৃতির অধীশ্বররূপে তিনি personifies the reproductive power of nature ২৫। বৈদিক রুদ্রের বর্ষণক্ষমতা, চন্দ্রসান্নিধ্য, বিষ (=জল) পান, ক্ষেত্রপতি বনস্পতি পুত্রপতি পশুপতি উপাধি, বৃষ মূষিকাদি বাহন ইত্যাদির উল্লেখ ও আলোচনা যথাস্থানে করেছি। এসবই উর্বরতাসাধনশক্তির পরিচায়ক। আর্য রুদ্র উর্বরতাসহায়ক, আর্যেতর শিব উর্বরতাসাধক, ফলে উভয়ের নিবিড় একাত্মতা। এবং রুদ্রচরিত্রে শৈব গুণগুলি ক্রমে ক্রমে আরোপিত হয়ে রুদ্র-শিবকে মূলত উর্বরতাবৃদ্ধির ও প্রজননের দেবতা করে তুলেছে।

শিবানীর শস্যঘনিষ্ঠতার অন্যতম পরিচয় সিন্ধু উপত্যকার উর্বরতাসাধিকা মাতৃকামূর্তির মধ্যে বিদ্যমান। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর 'শাকম্ভরী, ভ্রামরী' ইত্যাদি বিশেষণ কৃষির ইঙ্গিতবহ। তন্ত্রের দেবীর আদিম রূপ কৃষিসংশ্লিষ্ট; মণ্ডল চক্র লতাপাতায় তার শিল্পরূপ। দুর্গাপূজা মূলত কৃষি-উৎসব। এই পূজা বিহিত বর্ষণের পরে শস্যপ্রাপ্তির প্রাক্‌কালে। তাঁর পার্শ্ববর্তিনী 'নবপত্রিকা' সঞ্চারিতপ্রাণ শস্য এবং দুর্গার প্রাথমিক রূপ: 'কদলী দাড়িমী ধান্যঃ হরিদ্রা মানকং কচুঃ। বিল্বাশোক-জয়ন্ত্যশ্চ ইত্যেতে নবপত্রিকাঃ।' নবপত্রিকার গঙ্গায় স্নানবিধি কৃষকের শস্যব্রতকে স্মরণে আনে। কৃষকের এই শস্যদেবীকে পাই মধ্যপ্রাচ্যে গ্রীসে রোমে বিভিন্ন নামে ও রূপে। ইনিই ইরাণের মিত্রা, আরবের অল্‌লাৎ অল্ উজ্জা, মনাহ্[২৬], মেক্সিকোর সেন্‌টিওট্‌ল্[২৭]। ঈসিস-ঈশতার-ঈশানী তিনজনেই কৃষিদেবী, যুদ্ধের দেবী এবং জায়া ও জননী।

উর্বরতার দেবতারূপে শিব ও সূর্য অভিন্ন। পটুয়াসংগীতে শিব বলেন: 'সূর্যপুরে থাকি আমি আমার ইন্দ্রপুরে ঘর'। নিত্যপূজায় শিব আরাধনার আগে সূর্যার্ঘ্যদানের বিধি আছে। শিব চন্দ্রশেখর সোমনাথ; এবং চন্দ্র হলেন a source of moisture and fertility ও ঔষধাধিপতি[২৮]। শিবের জটায় গঙ্গার স্থিতি-কল্পনা তাঁর উর্বরতা-সাধনক্ষমতার ইঙ্গিত বহন করে। বৃক্ষপূজা অনেক ক্ষেত্রে লিঙ্গপূজায় রূপান্তরিত হয়েছে[২৯]। এইদিক থেকেও শিব দায়োনিসসের মত উর্বরতার দেবতা[৩০]। সিন্ধুসভ্যতায় শস্যসংস্কৃতির যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তার মধ্যে শিবের তিনটি মূর্তি উল্লেখ্য: একটির মাথায় লতাপাতার মুকুট, দ্বিতীয়টি পত্রসজ্জিতদেহ ধানুকী, তৃতীয়টি যুগ্মবৃক্ষের মধ্যবর্তী ত্রিশূলমস্তক[৩১]। এই আর্যেতর কৃষিদেবতা ঋগ্বেদে 'অন্নময় রুদ্র' <১.৪৩.১> নামে উল্লিখিত[৩২], শুক্লযজুতে <১৬.৬২> 'যে অন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্'-রূপে আভাসিত, নির্ঘণ্টুতে <৩.১৬> তিনি কৃষি (ও অক্ষের) দেবতা। সনৎকুমার-সংহিতায় চৈত্র-বৈশাখে উপবাসক্লিষ্ট শিবপূজাকে ধনধান্যলাভের কারণ বলা হয়েছে। এই শিব কৃষিজীবী জনগণের, তাঁকে কৃষিতে উদ্বুদ্ধ করেন যিনি তিনিই শিবানী অন্নপূর্ণা।

উপনিষদের 'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নম্ অভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ তস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্, ব্রহ্মণঃ রূপমন্নং চ জায়তে॥' কিংবা 'অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ শুক্রো বৈ তন্নেতঃ তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে' ইত্যাদি শ্লোকে আর্য ঋষি যে 'অন্নং ব্রহ্মেতি' ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন, ব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রশিব তারও স্পর্শলাভ করেছিলেন। কিন্তু পুরাণে শিবের কৃষিঘনিষ্ঠতার স্বল্প উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কৃষিদেবতা শিব আর্য মানসকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেন নি। অন্নময় রুদ্রশিব তথা কৃষিদেব-শিবকে পাই আরও প্রসারিত ও প্রসাধিতরূপে লোকায়ত কাব্যে ও সংগীতে।

ই। কৃষিদেবতা প্রজননদেব বলে এঁরা কল্যাণকারী, পুত্রদ এবং যৌনপূজার

সঙ্গে যুক্ত। যখন বলা হয়, the discovery of the biological fact of human paternity created the new gods Siva and Vishnu (ই, এ, পেইন-উদ্ধৃত স্লেটারের উক্তি) তখন আমরা এই তথ্যকে সমর্থন জানিয়ে বলি, শুধু পিতৃত্ব নয়, মাতৃত্বের জ্ঞান থেকে সমভাবে মাতৃদেবতার কল্পনা হয়েছিল সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা হওয়ার অনেক আগে। মধ্যপ্রাচ্যের নানা উপকথার দেবীই আদিমাতা, দেব এলেন পরে। আদিকালের একক স্বয়ম্ভবের ধারণা বিবর্তিত হল সৃষ্টিকার্যে যুগ্ম শক্তির দ্বৈত প্রযোজনার ধারণায়। তখন মানুষ সব কিছুকে এক বিশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টি নিয়ে দেখত। প্রজনন ব্যাপার তাদের কাছে জৈব যৌনায়ন মাত্র ছিল না, জীবনসংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার ছিল। কর্ষণ ও প্রজনন ছিল একই সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বিবিধ প্রকাশ; উভয়ের শ্রীবৃদ্ধিকামনায় অভিন্ন দেবতা কৃত্য কথা ও মন্ত্রের পরিকল্পনা, একের জন্যে অপরের অনুশীলন। সন্তানকামিনী নারীর বিভিন্ন মেয়েলী ব্রতে (প্রধানত যুগ্ম) শস্য ফল ও পিটুলি পুতুলের ব্যবহার এ যেমন একদিকে, তেমনি অন্যদিকে কৃষিকালে (মাঠে বা ঘরে) অবশ্যকরণীয় যৌনসংগমের সংযমিত বিধি এই আদিম অখণ্ড ভাবনার পরিচায়ক। দুইই ছিল ফসল—একটি মাঠে পৃথিবীর গর্ভে, অন্যটি ঘরে মানবীর গর্ভে। তাই শস্যদেবী দুর্গাপূজার সময়ে যৌনাচারের নির্দেশ, আর ঋতুমতী পৃথিবীর 'অম্বুবাচী'তে যৌনমিলনের নিষেধ বিহিত হয়েছে।

শস্য উৎসবে, শস্যসংশ্লিষ্ট ব্রতে, শস্য-শিশু-পশু বৃদ্ধির কামনায় লিঙ্গপূজা ও যৌন উপাসনার ধারা ও কৃত্য বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে বিচিত্র রূপে ও রীতিতে দেখা দিয়েছিল। গ্রীসের ব্যাক্কাস দেবের উৎসব, রোমের স্যাটারন্যালিয়া, ফ্রান্সের ফেত্ দ্য ফৌ, ইংলণ্ডের মে-ডে, ইউরোপের মার্ ষ্ গ্রজ, কার্নিভ্যাল ইত্যাদি উল্লেখ্য। দায়োনিসস অসিরিস প্রভৃতি দেবতার প্রতীক ছিল লিঙ্গ; দেবস্থানে এই প্রতীকের পূজা হত [৩৩]। দাক্ষিণাত্যের আয়ানার ছিলেন পুত্রদাতা। সিন্ধু সভ্যতার ঊর্ধ্বমেঢ্র যোগী ও লিঙ্গ প্রজননশক্তি-পূজার সাক্ষ্য। আর্য রুদ্র পশুপতিরূপে প্রজননদেবতা ছিলেন। তাঁর পুত্রদানক্ষমতার রূপ ও রূপক মূলত আর্যেতর সংস্পর্শে প্রাধান্য লাভ করেছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার <২.২.১০> 'সোমারৌদ্র' চরুতে তাঁর এই প্রজনন-দেবত্বকে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। অন্যদিকে যোনিকেও সৃষ্টির প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যোগিনীতন্ত্রে সৃষ্টির পূর্বে 'যোনিধ্যান'-এর কথা বলা হয়েছে; তন্ত্রের মণ্ডল ও চক্রে আঁকা হয়েছে তার রেখচিত্র।

কালক্রমে প্রজননক্রিয়া বস্তুজাগতিক প্রয়োজন ও তজ্জাত কৃত্য থেকে পরিণত হয় ধর্মজাগতিক আয়োজন ও বিধিবিধানে। উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতিতে সমাজে ঐশ্বর্য ও অবকাশ সৃষ্টি হওয়াতে একদল লোক দৈনন্দিন কর্মের দায় থেকে মুক্তি পেল, কাজের লোকদেরও কিছু অবসর মিলল। বাস্তব পরিবেশের বদল হল, কিন্তু ঐতিহ্যের আবেশ রইল মনে। ফলে, যে ভাবনা ও অনুষ্ঠান পরিচালিত হত বাঁচবার জৈবিক

তাগিদে, তা এখন সঞ্চালিত হতে থাকল অধ্যাত্ম সাধনার সিদ্ধিতে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১.৪; ৩.৭; ৬.৪, ছান্দোগ্যের ২.১.৩, শুক্লযজুর ২২.২২ ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে এই বিবর্তনের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'বামদেব্য' উপাসনা ও তৎসংশ্লিষ্ট পরদার-মিথুনের নিয়ম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন মন্দিরগাত্রে সংগমরত যৌনচিত্র এর শিল্পরূপ; এর ব্যবহারিক সাধনরূপ তন্ত্রে চক্রপূজা, মৈথুন <কুলার্ণব ৮.৭৩>, দেবীর শিবসহ বিচিত্র রতিক্রীড়া <কালীতন্ত্র ১.৩>, শিব-চতুর্দশীতে নৃত্যগীতমিথুনের নির্দেশ <নীলমত পুরাণ ৫৫৯> ইত্যাদি আচার-অভিচারে। আর একটু অগ্রসর হয়ে এই চক্রপূজা লতাসাধনা উপনীত হয়েছে মিথুনীকামে। জাদুবিদ্যাশ্রিত জীবনসংগ্রামী প্রয়োজনের কৃত্যের বিবর্তিত পরিণাম প্রয়োজনাতীত আনন্দে: আদিম শস্যভাবনা থেকে আদিরসাত্মক কামনায়, কর্মবোধ থেকে ধর্মবোধ, সেখান থেকে কামবোধে; নরনারীর মিলন তখন আর ফসল ফলানোর জাদুবিদ্যা নয়, ভাগবত সাযুজ্যের অন্যতম রূপক বা সোপান কিংবা ভাবগত রসোল্লাসের উপায়-উপাদান।

আর্যরা 'অন্নময় রুদ্র'কে আগে গ্রহণ করে পরে ত্যাগ করেছিল, 'লিঙ্গশরীর শিব'কে আগে ত্যাগ করে পরে গ্রহণ করেছিল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তখন বললেন: 'যো যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি একো'; শুক্লযজুতে রুদ্রোপাসনা সুরু হল: 'প্রজননায়···সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্যায়।'' মহাভারতে লিঙ্গপ্রতীক শিবের মাহাত্ম্য সর্বাংশে স্বীকৃত হল। তিনি হলেন পুত্রদ, পৃশ্নি-সহযোগে মরুৎদের জন্মদান করেন[৩৪]; পুরাণে তিনি শিশুরূপে পার্বতীর স্বয়ম্বরসভায় তাঁর স্তন্যপান করেন[৩৫]। পুত্রার্থে শিবপূজা ও 'হত্যা-দেওয়া' বাঙলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আজও বহুল অনুসৃত প্রথা। চৌরঙ্গীর দেবতা শিব; তাই চৌরঙ্গীতে স্নান বন্ধ্যাত্ব-মোচনের সহায়ক। শিবলিঙ্গে জলদান এবং কুমারীব্রতে লিঙ্গপূজার প্রাধান্য শিবের প্রজননক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কৃষি-প্রজনন দেবতার আরও কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ বর্তমান থাকে, যার সাহায্যে তাঁদের বহুদেবতার ভীড় থেকে চিহ্নিত ও স্বতন্ত্র করা যায়।

উ। প্রজনন তথা সৃষ্টির জন্যে চাই মিলন, আর মিলনের জন্যে চাই বিবাহ। আদিম মানব শস্যে-শস্যে বিবাহ দিত একজনকে বর অন্যজনকে বধূ কল্পনা ক'রে। তারপর শস্য হল দেবতা। তখন এইসব শস্যঘনিষ্ঠ দেবদেবীর মধ্যে বিবাহ হল অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান, কৃষি-উৎসবে দৈব বিবাহের অভিনয় (দেবদেবীর মধ্যে এবং নরনারীর মাধ্যমে) প্রধান আঙ্গিক, যৌন সংগমন অন্যতম অঙ্গ। যৌনায়ন এখানে জাদুবিদ্যা, জীবনসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য কৃত্য ৩৬; মূল উদ্দেশ্য—সুফলন ও শস্যবৃদ্ধির কামনা। যৌনবিলাসের স্পর্শ যদি এসে থাকে তো সে অনেক পরে এবং নাগর সংস্কৃতির দৌলতে। আজও আমাদের চারপাশের নিস্তরঙ্গ কৃষিজীবনে এই বিচিত্র মননধারা ও কৃত্যরীতি অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে বর্তমান।

কৃষক কল্পনা করে : সূর্য ওপর থেকে নেমে আসেন রথে বা নৌকায় চেপে, কখনও একাকী, কখনও সঙ্গীদের নিয়ে, সবস্ত্রা সালংকারা পৃথিবীকে গ্রহণ করতে ; বিবাহ ; মিলন ; নবজাতকের সৃষ্টি সম্ভাবিত হয় বৈধী পথে। অনুগামী কৃষকরা ফলে ফুলে ধানে ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে উৎসবকে উজ্জ্বল করে তোলে। অন্যদিকে, বিয়ের অভিনয় হয় : গ্রামের বা মণ্ডলীর প্রধান ও প্রধানা সূর্য ও পৃথিবীর ভূমিকায় অবতরণ করেন ; ওদিকে মাঠে বীজ ছড়াবার আগে নগ্ন নৃত্যগীত ও নরনারীর যৌনসংগমের (অভিনয়) দ্বারা মিলনাত্মিক ফলশ্রুতিকে ত্বরান্বিত করার বাসনা প্রকাশ ও ইচ্ছাপূরণের প্রয়াস করা হয়। দেবদেবীর প্রতীক নরনারীর মিলনে জন্ম নেবে শস্য, জন্ম নেবে শিশু। গ্রীসে দায়োনিসস এবং জীউস-হেরার বিয়ে হত। ব্যাকাস ও মিনার্ভা বিবাহান্তে অভিনয় দর্শন করতেন। ভারত মহাসাগরের দ্বীপাবলীতে 'উপুলেরো' ও উপুমেসা'র (সূর্য ও পৃথ্বী) বিয়ে জাতীয় উৎসব। ইউরোপের 'মে-ডে' ও পশ্চিম আফ্রিকার 'পুতুলের বিয়ে' এই জাতীয় কৃষি উৎসব [৩৭]। বাল্ বা এনলীল দেবতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ইনি ছিলেন সূর্যদেবতা লিঙ্গপ্রতীক উর্বরতাসহায়ক গ্রামদেবতা এবং not only was each Baal given a consort in the form of an Ishtar or Astate, the goddess of human fertility, but also sexual rites became a part of Baal worship [৩৮]।

দক্ষিণ ভারতের 'বিসলমরীঅম্ম'-গোত্রীয়া দেবী, সালেমের 'সর্বরায়ণ' ও 'কাবেরী', ছোটনাগপুরের 'মুচুকরাণী', খোন্দদের 'বেলাপেন্নু' ও 'তেরীপেন্নু' প্রভৃতি দেবদেবী এই সূর্য-পৃথিবীর স্থানীয় সংস্করণ, এবং বিবাহ এঁদের ললাট-লিখন—কারও প্রতি বছরে, কারও নির্দিষ্ট সময়ান্তে, কারও বা সাময়িকভাবে [৩৯]। বাঙলার গাজন-গম্ভীরা এবং দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে প্রচলিত সমজাতীয় অনুষ্ঠান মূলত কৃষি উৎসব। ধর্ম ও আদ্যার (বা সজাতীয় অন্য দেবদেবীর) বিবাহ এবং তার মাধ্যমে কৃষির শ্রীবৃদ্ধিকামনা এই জাদুবিদ্যালালিত কৃত্যের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

শস্যপূজা ও শিবপূজা যেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তেমনি কৃষি উৎসবে শিববিবাহ প্রধানতম অঙ্গ। অনেক জায়গায় মাটির মূর্তি তৈরী করে শিব-শিবানীর মিলন সংঘটিত হয়। বিজাপুরে সংগমেশ্বর শিব বিবাহার্থে রথে যাত্রা করেন। হিমালয় অঞ্চলে 'হরেলা উৎসব' একটি বিবাহ অনুষ্ঠান। উদয়পুরের শিব-গৌরীর বিয়েতে দেবীর গায়ের রঙ পাকা গমের। অনেক অঞ্চলে কুঞ্জে দুজনের ঝুলনযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়—তার মধ্যে কাঙড়ার 'বলী কা মেলা' উল্লেখযোগ্য। বাঙলাদেশের গাজন-গম্ভীরায় যেখানে শৈব প্রভাব, সেখানে শিব-শিবানীর বিবাহ কেন্দ্রবস্তু, অন্যান্য আয়োজন ও নৃত্যগীতাদি তার বহুবিচিত্র পরিধি। দেশ-প্রচলিত শিব-শিবানীর এই বিবাহ উৎসব ক্রমে পুরাণে কথারূপ ও কাব্যে রসরূপ লাভ করেছে ; আর্যেতর কৃষিপ্রজননসংশ্লিষ্ট অভিন্ন ধারণা থেকে কৃষিকে বাদ দিয়ে আর্য মনন

কেবলমাত্র প্রজননকেই গ্রহণ করেছে। তার ফলে, পুরাণের নানা যৌনজনন কথা, 'কুমারসম্ভবম্'-এর অপূর্ব প্রেম ও সৌন্দর্যের ছবি। বিবাহ-কথার বস্তুজাগতিক এবং জীবননীতিক ভিত্তি ও কৃত্যকে অতিক্রম করে ওপর থেকে আরোপিত হয়েছে আধ্যাত্মিকতা ও মননশীলতা, ফুটে উঠেছে শিবশক্তি তত্ত্ব, শৈবশাক্ত ধর্ম, শিব-শিবানী প্রেমগাথা। শিব ও শিবানীর বিবাহ ব্যাপার তখন আর মাঠের ফসলের শ্রীবৃদ্ধিকামনায় জাদুবিদ্যা ও কৃত্যকলা নয়, মনের ফসলের সমৃদ্ধিবাসনায় প্রজ্ঞাবিদ্যা ও শিল্পকলা।

শুধু আর্যেতর মাতৃকা-পিতৃদেব নন, আর্য দ্যুস্পিতা-পৃথ্বীরও উৎসমূল এই-জাতীয় প্রাচীনতর আদিম ও বস্তুনিষ্ঠ কৃত্য ও কল্পনা। বৈদিক যজ্ঞ মন্ত্র দেবতা দৈব মিলন-বিরহ-মাতৃত্ব সমবেত অনুষ্ঠান ঋক্‌সমূহের উদ্‌গীতি ইত্যাদির মধ্যে তার পরিচয় বিদ্যমান। বস্তুত যুগল দেব-দেবীর রূপকল্পনার সূত্রপাত আদিম কৃত্যে ও কবিত্বে; বিশ্ববিধান ও প্রকৃতির প্রসাধন তার পট ও ভূমিকা:

বসন্তশেষে খরগ্রীষ্মে মিলনান্তিক বিচ্ছেদে আগ্নেয় তপস্যায় শুষ্ক ও শুদ্ধ হয়ে ওঠে পৃথিবী; বর্ষায় প্রিয়-মিলনে যে পূর্ণতা ও আনন্দ, ফলভারানত শরতে-হেমন্তে তার প্রকাশ; আসে প্রখর শীত, শুরু হয় পত্রঝরা, পৃথিবী তখন অপর্ণা অপূর্ণা; বসন্তে মিলনের আবেশে পরিপূর্ণা পৃথিবী পর্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা। বিশ্বপালার এই লীলায়িত সৌন্দর্যরূপের যেন সংহতি হয়েছে বারোমাসের তিন 'পৌর্ণমাসী' অনুষ্ঠানে। বাসন্তী পূর্ণিমায় দোল: পৃথিবীর সে তখন নহেলী যৌবন, বয়ঃসন্ধির কাল, দেহমনের অস্ফুট জাগরণ; পূর্বরাগের রাঙা আবীরে রক্তিম অশোকে-পলাশে অলংকৃত দেহ ও আলোকিত হৃদয়ের আরক্তিম প্রকাশ। বর্ষা-পূর্ণিমায় ঝুলন: প্রথমযৌবনা পৃথিবী এখন পূর্ণ যৌবনবতী, অম্বুবাচী-উত্তর ব্যাকুল মিলনকামনা; সবুজ অনুরাগের আন্দোলনে নাবুঝ হৃদয়ের দুরন্ত উল্লাস; শ্যামল দোলনায় বধূকে পাঠানো হয় অভিসারে সুদূর আকাশকুঞ্জে, ওপর থেকে নেমে আসে বঁধুর বাসনা, ধারাপ্রপাতে; সম্ভাবিত মিলন সম্ভোগমুখর হয়ে ওঠে রভস-আলসে। হৈমন্তী পূর্ণিমায় রাস: মিলনান্তিক আনন্দে পরিতৃপ্তা ও পরিপূর্ণা, সফল সংগমে শস্য-শ্যামলা সোনার পৃথিবী। বসন্তে পৃথিবী কুমারী, বর্ষায় জায়া, হেমন্তে জননী: সফলতা ও ফলপ্রাপ্তির বাহুল্যে সানন্দ মানবহৃদয়, আর সেই নন্দিত যৌবনজীবনের ছন্দিত প্রকাশ—সমবেত নৃত্যগীতকথাশিল্প-অভিনয় অথচ অভিনয় নয়।

উ। কৃষিদেবতার আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—নির্দিষ্ট সময়ান্তর মৃত্যু ও পুনর্জন্ম। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই কল্পনা ও কৃত্যকে ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতিজাত বলে মনে করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সামান্য রূপান্তরে এর স্থানিক রূপ ফুটে উঠেছে।

মধ্যগ্রীষ্মে গ্রীসে 'আদোনিস' ও পরে 'এথিস' দেবতার মৃত্যু কল্পিত হত এবং নাগরিকবৃন্দ আর্ত বিলাপ করতে করতে তাঁর মৃতদেহ (বৃক্ষ বা অন্য কোন

প্রতীকসহ) শোভাযাত্রা সহকারে বহন করে নিয়ে যেত। শস্যদেবতা দায়োনিসসের দ্বিজত্বের উদ্দেশ্যে সংগীতের মাধ্যমে আনন্দ জানান হত। মিশরের ঈসিস-অসিরিস এবং বাবিলনের তামুজ-ঈশতারের সর্বপরিচিত কাহিনী এই গ্রীষ্মকালীন উৎসবের ছবি। ইউরোপের 'মে-ডে' উৎসব এর আরেকটি রূপ। কোথাও মূল গাছটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে শুদ্ধিমাধ্যমে বারে বারে নতুন করে নেওয়া হত, কোথাও সেটি কলাবধূ-সদৃশ নিত্যনবীনা। এইজাতীয় উৎসবে দেবতার সঙ্গে মানুষও একদা মৃত্যু ও জন্মের ব্যাপারটিকে অভিনয়মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলত—এখনও 'মে-রাণী'র মধ্যে তার স্মৃতি বহমান [৪০]। ইসলামী সংস্কারগত 'মহররম' বছরের প্রথম মাস—'শোকের মাস' এবং 'শান্তির মাস'। প্রাক্-ইসলামিক পর্বে জরথ্রীয় ইরানীরা এই বাৎসরিক মৃত্যুতিথিটি পালন করত [৪১]। উভয় ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক চরিত্র এর আলম্বন বিভাব হলেও এটিও যে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কর্ষিত অনুষ্ঠান, তার সাক্ষ্য মেলে 'তাজিয়া'র মধ্যে। একে 'আবেগনাট্য', কারবালার সমাধির প্রতিরূপ এবং সেইসঙ্গে আদোনিস-তামুজ-সংস্কৃতির পরিণতি বলে স্বীকার করা হয়েছে [৪২]।

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সি. জি. ইয়ুং মনে করেন, 'all these sea-going gods are sun-symbols' এবং এই কাহিনী সৌর উপকথা (Sun-myth)। তাঁর মতে, এই মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কল্পনা 'মাতৃগমনেচ্ছা'র অবদমিত বাসনার উদ্বর্তিত শিল্পরূপ ; আদিম মানবের শিশু হয়ে থাকবার বাসনা রূপান্তরিত হয়ে দ্যুস্-পৃথ্বী, মাতা-পিতার কাল্পনিকতায় রত হয়। এই 'মাতৃমুখী বাসনাই' সৌর সাধনার মূল ভিত্তি বলে তিনি মনে করেন। সূর্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় রাত্রির, সমুদ্রের বা মৃত্যুর পথে—মাতৃগর্ভের অভিমুখে ; পরদিন তার নবজন্ম মাতৃ-উদরে নবজাতকরূপে। এই ধারণার প্রতিচ্ছায়ায় সঞ্জাত মানবচিত্তের বাসনা : to attain rebirth through the return to the mother's womb, that is to say, to become as immortal as the sun [৪৩]।

ইয়ুং-এর সূক্ষ্ম আলোচনা বিস্ময়কর। কিন্তু কালের ব্যবধান তিনি স্বীকার করেন নি। যে তত্ত্ব আধুনিক মানসের বিচারক, তার সাহায্যে তিনি আদিম মানবের যৌনবোধ ও দেহবাদকে পরিমাপের চেষ্টা করেছেন, যা মোটেই নিরাপদ নয়। ফলে, তাঁর ক্রান্তদর্শী পর্যালোচনা হয়েছে একদেশদর্শী। কারণ তখনকার মানুষের কাছে যৌনক্রিয়া ছিল সৃষ্টিক্রিয়া ও জীবনসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মাত্র, যৌনায়ন নয়, কর্মায়ণ, কামায়ন নয়। অপিচ it is absurd to see a phallic symbol in every long-shaped object, or an emblem of motherhood in every semi-globular hut [৪৪]।

মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ভাবনার উদ্ভব ও বিকাশ কৃষিসংস্কৃতির পরিবেশে [৪৫]।

আদিম কৃষকের দৃষ্টিতে শস্য ছিল প্রাণযুক্ত। সে দেখত, শস্য কেটে নিয়ে আসার পর নির্দিষ্ট সময়ান্তে (ফেলে-আসা পড়ে-থাকা বীজ বা মূল থেকে) কর্তিত

রিক্ত মাঠ আবার ভরে উঠেছে কচিধানে শিশুগাছে। মৃত্যুর মধ্যে সে দেখল পুনর্জন্মের আবর্তিত ধারা এবং জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনে এই প্রবাহকে অব্যাহত রাখতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গে তখনকার মানুষের আর একটি বিশ্বাস উল্লেখ্য—ইষ্ট বস্তুর সঙ্গে কল্পনা ও জাদুবিদ্যার সহায়ে অভেদ আত্মীয়তা স্থাপন করে তাকে জয় করার বাসনা ও প্রয়াস। শিকারে যাওয়ার আগে নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ নিজে সাজত ইষ্ট পশু, তার সঙ্গে কাল্পনিক একাত্মতার মাধ্যমে তাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করত; শস্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম অভেদ স্থাপন করে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে করায়ত্ত করার স্বপ্ন দেখত। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের ভাবনার সঙ্গে এই অভেদ ধারণা যুক্ত হয়ে সূচিত হল একটি বিশিষ্ট কৃত্যের। মরণের মাঝে উজ্জীবিত প্রাণের ধারা-বিবর্তনকে অব্যাহত ও স্থায়ী করে রাখার জন্যে তারা কিছু বীজধান রেখে আসতে লাগল মাঠে, কিছু নিজেরা আহার করত নতুন ফল-ফসলের এতটুকু বাদ না দিয়ে—শস্যের প্রাণকে নিজেদের মধ্যে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত করার বাসনায় <নবান্ন গোটাষষ্ঠী ইত্যাদি কৃষিব্রত দ্রষ্টব্য>। যখন শস্যের প্রতীক হল পশু কিংবা মানুষ (গোষ্ঠীপতি, পুরোহিত কিংবা রাজা), জটিল হয়ে উঠল জাদুবিদ্যাশ্রিত কৃত্য। তখন নির্দিষ্ট সময়শেষে ঐ প্রতীককেও হত্যা করা হত মাঠে বা স্তূপীকৃত ফসলের বেদীতে। প্রতীকের তখন ভরা যৌবন, কারণ মাঠের শস্য যখন কাটা হয় সেও তখন তার সোনালী যৌবন—শক্তিমত্তার পূর্ণাবস্থা। তার দেহের সদ্যঃছিন্ন রক্তাক্ত চামড়া পরত পুরোহিত, নবজীবনের প্রতীক রক্ত ছিটানো হত মাঠে ঘরে মাথায় <'শান্তিজল' !>, মাংস খণ্ড খণ্ড করে কেটে ছড়িয়ে দেওয়া হত বীজকণার মত, পুঁতে ফেলা হত অস্ত্রতন্ত্র, খেতে দেওয়া হত সকলকে ও পরবর্তী নির্দিষ্ট প্রতীককে। সেই মাংসের মধ্যে যে প্রাণশক্তি তা শস্যের—তার প্রসাদগ্রহণে মাটি হত সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারিণী, মানুষের বাড়ত সৃজনশক্তি, শস্যপ্রাণের অব্যাহত ধারা বেঁচে থাকত নবতর প্রতীকের মধ্যে। এমনিভাবে চলত মৃত্যুর কোলে অমরতার সাধনা: একটি প্রতীকের মরণ-মাধ্যমে শস্যের মৃত্যুদ্যোতনা ও সকলের বিলাপ, পরবর্তী জীবিত প্রতীকের মধ্যে তার নবজন্ম ও সকলের আনন্দ। গড়ে উঠল মৃত্যু ও পুনর্জন্মের লোকায়ত বিশ্বাস কৃত্য উপকথা গীতিনাট্য।

শস্য যখন দেবতার রূপ নিল, তখন এই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান তাকেও আশ্রয় করল। দেবতার বিবাহের সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ও পুনর্জন্ম কল্পিত হল। তাঁকে হত্যা করে অথবা তাঁর মৃত্যু কল্পনা করে তাঁর দেহেরও সৎকার হত ঐভাবে—সেই উপলক্ষে যৌন সংযম, শোকপ্রকাশ ও শবযাত্রা; তারপর তিনি আবার বেঁচে উঠতেন নবদেহে—তখন যৌনসংগম আনন্দোৎসব ও শোভাযাত্রা। এইভাবে চলত জন্ম-মৃত্যুর অবিরাম পালা দেহ থেকে দেহে, প্রাণ থেকে প্রাণে, প্রতীক থেকে প্রতীকে—যৌবন যার বাহন।

পৃথিবীর বুকে শস্য-শিশু-শাবকের জন্মমৃত্যু লক্ষ্য করে আদিম মানুষ তাকেই

একমাত্র আদি বলে মনে করত। কালক্রমে উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নে সূর্যের সরে যাওয়া এবং সরে আসার সঙ্গে শস্যের ফলন-অফলনের যোগ লক্ষ্যগোচর হল, ঘরেও পিতার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা এল ; পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হলেন সূর্য। আরোপিত হল পিতৃত্ব-মাতৃত্ব, দুই দেবতার মিলন-বিরহ, মিলিত হল কৃষিসংস্কৃতি ও সৌর উপকথা। তখন আদিম মানব মৃত্যু ও পুনর্জন্মকে দেখল ফসলের আসাযাওয়ায়, দিনরাত্রির আবর্তনে, ঋতুর পালাবদলে, শীতগ্রীষ্মের বর্ষাবসন্তের বাসাবদলে, প্রাণের লয় ও নতুন প্রাণের উদয়ের মধ্যে—মৃত্যু-অমরতার ছেদহীন ছন্দোবন্ধে।

ঋগ্বেদের ঋষি কল্পনা করতেন, মৃতদেহ আকাশে-পৃথিবীতে-উদ্ভিদে মিশে যায় <১০.১৬>। পিরামিডে পাওয়া একটি প্রার্থনা তুলনীয়: Thou art the Father and Mother of mankind, they live on Thy breath, they subsist on the flesh of Thy body এবং I am Osiris, I live as grain, I grow as grain, I am barley[৪৬]। আজও পূজাকালে গৃহাগত আরাধ্য দেবতা গ্রহণ করেন যজমানের গোত্র-প্রবরাদি, অর্থাৎ তার সগোত্র আত্মীয় হন। ইষ্ট ও ভক্তে স্থাপিত হয় সাযুজ্য (যার চূড়ান্ত পর্যায় অদ্বৈতপন্থীর ইষ্টসহ অভেদের সাধনা)। নবান্ন গোটাষষ্ঠী-জাতীয় কৃষিব্রত, বলিপ্রদত্ত পশুরুধিরের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, 'মহাপ্রসাদ' গ্রহণ ইত্যাদি কৃত্য ও সংস্কারের মধ্যে শস্যপ্রাণের সঙ্গে মানুষের একাত্মতার ও মৃত্যু-পুনর্জন্মের সেই সুপ্রাচীন ভাবনা ও রীতির বীজীভূত প্রভাব আজও বিদ্যমান। এমন কি স্বজনমৃত্যুজনিত আমাদের 'অশৌচ-বিধি'র মধ্যেও এই আদিম সংস্কৃতির ছায়া আছে, যেখানে 'নিয়মপালন' করতে হয় ব্রহ্মচর্য হবিষ্যগ্রহণ ও যৌন বিরতির মাধ্যমে এবং 'নিয়মভঙ্গ' করতে হয় পরিশুদ্ধি, আমিষভোজন ও যৌন সংগমের মধ্যে দিয়ে।

পিরামিড-লেখের উদ্ধৃতিটির শেষভাগ মৃত আত্মার আত্মঘোষণা। দেবতা শস্যের অধিকর্তা, কর্ষণ-প্রজননের অধীশ্বর, মৃত্যুর অধিপ, অমরতার অধিদেবতা, শস্যের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চক্রনেমিতে আবর্তিত শস্যদেব—তাই তিনি মরণ ও পুনরুজ্জীবনের অধীন, মৃত্যু ও অমরতার অধিরাজ, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের ঈশ্বর, (জন্মে তথা) সগুণে সাকার, (মৃত্যুতে তথা) নির্গুণে নিরাকার।

শস্যদেবতার এই শস্যসংশ্লেষের স্বাক্ষর তাঁর নামেরূপেগুণেক্রিয়ায় উপাসনায় উৎসবে মন্ত্রেকৃত্যে কোন-না-কোনভাবে বিদ্যমান থেকে যায়। যেমন দুর্গার আদি-রূপ কলাবৌ—নবপত্রিকার সমাহার, তাঁর আধুনিক রূপপ্রতিমা মহিষাসুরমর্দিনী—রাজরাজেশ্বরী সমারোহ। বসন্তের দেবী শুভ্রা: পৃথিবীর তখন সানন্দ দিন, জাগরণ ও সৃষ্টির সূচনা ; শীতের দেবী শ্যামা: পৃথিবীর তখন রিক্ত রাত্রি, মৃত্যু ও অফলনের কাল ; শরতের দেবী সুবর্ণা: পৃথিবীর তখন পরিপূর্ণতা, পাকা ধানের সোনাফসলের কাঁচাহলুদ বর্ণবিলাস।

ফিলীতে অসিরিসের দেহে উদগত শস্যশাখাকে ফ্রেজার মনে করেন, 'an omen

or rather as the cause of the growth of the crops'। এ সম্পর্কে জেন হ্যারিসনও অনেক তথ্য-আমাদের গোচরীভূত করেছেন [৪৭]। অসিরিসের দেহ নির্মিত হত বার্লি ও শস্য দিয়ে, তাতে নীলনদের জল ঢালা হত, কবর দেওয়া হত শস্যপ্রান্তরে; প্রারম্ভে শস্যবপন ও হলচালনার অভিনয়ানুষ্ঠান, অন্তে ক্ষেত্রকর্ষণের গীত, সেইসঙ্গে অসিরিসের জন্ম-মৃত্যুর নাট্যরূপ। দেন্দেরার খোদাই চিত্রে অসিরিস প্রথমে শায়িত, ক্রমে উত্থিত, শেষে দণ্ডায়মান; পশ্চাতে পৃথ্বীদেবী ঈসিস। এগুলি নিঃসন্দেহে কৃষির সাময়িকতা ও শস্যের মৃত্যু-জন্মকথা। ইয়ুং নিজেই একথা স্বীকার করেছেন: The mystic dies, figuratively, like the seed-corn, grows again and comes to the corn-harvest [৪৮]।

পৃথিবীর বুকে সুফলন সংবৎসরস্থায়ী নয়, সঞ্চারী ভাবের মত সাময়িক। অফলন বা আকালের কাল দেবতার মৃত্যু: তখন ব্রহ্মচর্য বিলাপ শোক বেদনামথিত অনুষ্ঠান; পুনরায় নতুন বছরে নতুন ফলন, তখন দেবতার পুনর্জন্ম বা পুত্ররূপে নবজন্ম: আর তাকে ঘিরে উৎসব মিলনবাসর নতুন সম্ভাবনার সানন্দ বাসনা, ছবিগানকথাকৃত্য। এর নাম 'কৃষি উৎসব', এরই মণ্ডপতলে জাত হয়েছে কাব্য-শিল্প-ধর্মের জন্মবীজ। দেশ ও পাত্রভেদে তার রূপ বিশিষ্ট, আর কালভেদে তার চারিদিকে কথা ও রসের অলংকরণ ও কারুকার্য, তত্ত্ব ও দর্শনের আভরণ ও চারুশিল্প। তখন সে আর মাটির সম্পত্তি নয়, মনের সম্পদ, বস্তুচেতনা নয়, অধ্যাত্মচেতনা; তখন এই অগ্রসৃত মানস ও চেতনার স্পর্শে পরিকল্পিত হয় ঈশ্বর ও শক্তির সহযোগে বিশ্বসৃষ্টির অলৌকিক তত্ত্বভাবনা।

শিব-শিবানী এই আর্যেতর কৃষিসংস্কৃতির উপাস্য দেবদেবী—মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কল্পিত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লালিত, শেষে সমন্বয়ে উপসংহৃত। তাই দ্বিজত্বলাভ শিবের জীবনীর অন্যতম অঙ্গ: He personifies the power of birth and death, of change, decay and rebirth [৪৯]।

শিবরূপের (অন্যতম) প্রধান উৎস কৃষিদেবত্ব বলে তিনিও মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অধীন; তাই তিনি স্রষ্টা হয়েও প্রলয়ী, মৃত্যু ও অমরতার দেবতা। তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয়' বিশেষণ এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত মৃত আত্মার অধীশ্বরত্বের সঙ্গে অথর্ববেদে একটি কুকুর-সাথীর উল্লেখ করা হয়েছে। কুকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যমের ও শ্মশানী চণ্ডালের। শিব এখানে যম ও শ্মশান তথা মৃত্যুর অধিপ। যজুর্বেদে তাঁর কাছে মৃত্যুর মাধ্যমে অমরত্বের প্রার্থনা করা হয়েছে; মহাভারতে তাঁর কপালভূষিত কাপালিক রূপ মৃত্যুর উপম; বায়ুপুরাণে তাঁকে 'কপালী' ও 'ভস্মনাথ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে <১১২.৫৩>, তিনি মৃত্যুরূপে বন্দিত, তিনি কাল বিকৃত বীভৎস ভীষণ দুঃসহ দুর্বারণ ঘোর <২৪.১২৮। ৫৫.৫১-৫৫>। তাই তাঁর বাস শ্মশানে, সঙ্গী ভূতপ্রেত, দেহে বিভূতি, মন্দিরশিখরে স্তূপের শিল্পকলা। গাজনে নরমুণ্ডনৃত্য শ্মশাননৃত্য মড়ানাচ কালিকাপাতার নাচ আদিম মৃত্যুধারণার ধারাবাহী এবং মৃত্যুদেবতা শিবের

সঙ্গে গাজনের যোগ গভীর। গৃহ্যসূত্রকথিত 'শূলগব' যজ্ঞের কৃত্যে আগুন জ্বেলে বেদীর ওপর দূর্বা বিছিয়ে ষণ্ড বলি দেওয়া হত; বধ্য পশুর রক্ত আটটা ছোট পাত্রে ভরে আটদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হত বা মাটিতে পোঁতা হত; সঙ্গে সঙ্গে শতরুদ্রীয়ের এক-একটি অনুবাকের আবৃত্তি উদ্‌গীত হত। তারপর পশুটির বক্ষোদেশ উন্মুক্ত করে তার হৃদয় নিবেদন করা হত রুদ্রের কাছে। একদিকে যখন একটি ষণ্ড বলিপ্রদত্ত, অন্যদিকে আর একটি কিশোর ষণ্ডকে ছেড়ে দেওয়া হত—এই পশুটি পরবর্তী বৎসরের নির্বাচিত প্রতীক ও পরবর্তী যজ্ঞের নির্দিষ্ট বলি।

সমগ্র যজ্ঞটি আদিম কৃষি-কৃত্য, শস্য ও গবাদি সম্পদবৃদ্ধির কামনায় বিহিত। একটি শস্যপ্রতীকের হত্যা ও তার রক্তমাংসের অর্ঘ্যদান এবং নতুনতর প্রতীকের নির্বাচন-নির্দেশ এখানে স্পষ্টত বর্তমান। একটি ষণ্ডের বলি এবং অপর ষণ্ডের প্রতীকীকরণের মধ্যে কৃষক-কল্পিত মৃত্যু ও পুনর্জন্মের ভাবনা ও কৃত্য দ্যোতিত হয়ে উঠেছে। এই আদিম কৃত্যকেই যজ্ঞ নাম দিয়ে সূত্রগ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে আমরা মৃত্যু ও পুনর্জন্মের বিশ্বাসের সঙ্গে রুদ্রের যোগাযোগের সাক্ষ্য সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্টভাবে পাই। বৃষটি তাঁর প্রতীক, শূলগব রুদ্রযজ্ঞ।

শিবলিঙ্গ পূজাবিধিতেও কৃষিদেবতার এই জন্মমৃত্যুর ইতিহাস নিহিত আছে। আদিম মানুষ দেবতার সাময়িক প্রতিমা গঠন করত ও পূজান্তে বিসর্জন দিত। পুরাণে এই রীতি গৃহীত হয়েছে। শিবলিঙ্গ একদিকে যেমন নিত্য, অন্যদিকে তেমনি ব্রতিনী প্রত্যহ নতুন মাটিতে তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা করে; পুরাতনটি পরিত্যক্ত বা বিসর্জিত হয়; হৃদয় বলে, 'প্রভাতে শিবপূজার বেলায় তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।'

অসিরিসের মৃতদেহ বহুদিন সমুদ্রে ছিল এবং পুনর্জন্মের সময় তিনি শিশ্ন-বিরহী হন। রুদ্র বা নীললোহিত সৃজনে অক্ষম হয়ে ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রে গিয়ে বহুদিন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সময়ান্তে শক্তিমান হয়ে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি নিজ লিঙ্গ ছিন্ন করেন। অসিরিস ও শিবের দেহচ্যুত লিঙ্গ পূজিত হতে থাকে। এ দুটি কাহিনীর মধ্যে শত ব্যবধান সত্ত্বেও মূলগত ঐক্যের ভাবটি সহজেই চোখে পড়ে। হয় এদের মূল ছিল অভিন্ন অথবা দুটি উপকথাই পৃথকভাবে গড়ে উঠেছে। কৃষিতন্ত্রের অভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন স্থানে সমজাতীয় কথা ও দেবতার রূপলাভ অভাবনীয় নয়।

শিবের শবরূপের বিবিধ ব্যাখ্যা আমাদের শাস্ত্রে ও সাধনায় দেওয়া হয়েছে। তাঁর যোগিরূপের মধ্যে কামক্রিয়া-বিরতির তত্ত্ব বর্তমান। আদিম কৃষক চাষের সময়ে যৌনাচার করত; এই কৃত্যমূলক যৌনক্রিয়া তন্ত্রে শক্তিসাধনা ও বৈষ্ণব ধর্মে লীলারূপে পর্যবসিত হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে যৌনাচার থেকে বিরতও হত তখনকার কৃষক; এই যৌনতানিরোধ চিত্তবৃত্তি-নিরুদ্ধ যোগাভ্যাসে পর্যবসিত হয়েছে—যোগী ও শব-শিব তার আভাস-প্রকাশ। অন্যদিকে, একে সৌর দেবতার সাময়িক মৃত্যুর

তোতনা বলেও মনে করা যেতে পারে। শবরূপী শিব সৃজন-অক্ষম; তখন পৃথিবীর কোলে থাকে না নবজাত শস্য, অন্ধকার নিশীথিনীর করাল ছায়া সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কিন্তু মৃত্যুই জীবনায়নের শেষ কথা নয়। শবসাধনার মাধ্যমে সাধক নিজের প্রাণকে শিবে সঞ্চারিত করে জীবের শিবত্বলাভে তাঁর পুনর্জন্মকে সম্ভাবিত করে তোলেন—তখন সহস্রারে শিব-শিবানীর অদ্বয় মিলন ও পরা সংবিতের জাগরণ, তখনই ফলেফুলে শস্যশ্যামলা হয় ধরণী। কৃষকের জাদুবিদ্যা ও সাধকের হঠযোগ মূলত অভিন্ন: একটির লক্ষ্য বাস্তব ও সমষ্টিগত, অপরটির লক্ষ্য মানসিক ও ব্যষ্টিগত, একটি আদিম সমাজের জৈব প্রয়োজনে কল্পনাধৃত, অপরটি মধ্যযুগীয় সমাজের দৈব আয়োজনে ধর্মবিধৃত, প্রথমটি জীবনসংগ্রামনির্ভর কৃত্য, দ্বিতীয়টি সেই কৃত্যের ওপর আরোপিত তত্ত্বরূপ ও সাধনাচার। শিবের বুকে শ্যামা, শবের বুকে জীবন, মৃত্যুর কোলে অমরতা।

সতীহারা শিবের যোগিরূপ পুরাণে, কালিদাসের কাব্যে ও বাংলা সাহিত্যে বহুল বর্ণিত। দৈব কার্যকলাপ ত্যাগ করে এই যে জ্ঞানের গভীরতায় নির্ব্যূঢ় অবগাহন, সামুদ্রিক তপস্যার মত, এও তো মৃত্যু। যোগসাধনা অন্ধকারের সাধনা, সমুদ্রযাত্রা মরণবরণ। তাঁর তপস্যায় আত্মসমর্পিতা উমা স্বামী-সন্ধানব্রতিনী ঈসিস ও ঈশতার-উপমা, অর্থাৎ পৃথিবী, যিনি তপস্যায় ফিরিয়ে আনেন দেবতাকে। বিচ্ছেদ-অন্তে পার্বতীকে নতুন রূপে নতুন করে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে গৃহী শিবের যে আনন্দিত বাসর রচনা, তা-ই তাঁর পুনর্জন্ম। তখনই বরযাত্রা বিবাহ ভিক্ষাত্যাগে কৃষি-ব্রত গ্রহণ।

শস্য যখন মাটির বুক থেকে নিরুদ্দেশ, পৃথিবী তখন তাঁর সন্ধানে বিশ্বপথিক দুর্গমের পথে দুঃসাধ্যের প্রান্তে; মাটির তলার নিতল অন্ধকারে তার সাক্ষাৎলাভ; উভয়ের প্রত্যাবর্তন ও মিলন। পুনর্জাত শস্যের লীলা শিশুর মত, কালো মাটির গায়ে সোনার আলো হয়ে। তাই চিরযুবক শিব যোগী চিরকিশোর কৃষ্ণ প্রবাসী হন, তাই উমার তপস্যা ও রাধার অভিসার, বিরহশেষে পুনর্মিলন ও ভাবসম্মিলন।

তাই শুধু দেব নয়, দেবীর মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কথাও এই লোকায়ত বিশ্বাস থেকে গড়ে উঠেছে। এবং কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-পরিবেশে সেই ভাবনাই উচিততর ও প্রথমতর। গ্রীসের সর্বজনবিদিত উপকথায় প্লুটো প্রসারপিনোকে হরণ করে নিয়ে গেলে পৃথিবীদেবী সিরীস মৃতপ্রায়া হয়ে পড়েন; দেবতাদের সহায়তায় শেষপর্যন্ত স্থির হয়, প্রসারপিনো ছমাস মর্ত্যে ছমাস পাতালে থাকবেন। অনেক জায়গায়, এর স্মরণে পাঁচ বছর অন্তর উৎসব হত। সামোস-এর কথায়, জীউস হেরাকে হরণ করে নিয়ে যান—তখনই তাঁর মৃত্যু, পৃথিবী ফলহীনা; এক বছর পরে স্নানান্তে তিনি পুনরায় কুমারী হতেন; তখন আবার ফলন, সানন্দ কৃত্যনৃত্য কথা উৎসব, মিলনবিবাহহরণের বিরহমিলনগীতি। ডিমিটারকন্যা পারসিফনি প্রতি বছর এইভাবে নির্বাসন থেকে ফিরে আসতেন, পৃথিবী ভরে উঠত ফলেফুলে। দায়োনিসসপত্নী পৃথ্বীমাতা-সিমিলোকে জাগাবার জন্যে বসন্তগীত গাওয়া হত, তখন পৃথিবী পর্ণাপ্ত পুষ্পস্তবকনম্রা শস্যভারনতা ফলবতী।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দেবী পৃথিবী বা শস্য, অতএব শস্যের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অধীন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সেই স্থান গ্রহণ করেন পুরুষদেবতা। তাই প্লুটো-প্রসারপিনো উপ কথার প্রতিধ্বনি যখন তামুজ-ঈশতারে, তখন প্রসারপিনোর স্থান লাভ করেন তামুজ; জীউস-হেরার কাহিনীর প্রতিবেদন ঈসিস-অসিরিসের কথায় অনুকৃত। পার্থক্য এই, অপহৃত হন অসিরিস, আইসিস নয়, এবং তৃতীয় এক শত্রুর দ্বারা। মেয়েলী কথায় পৃথিবী মাতা, শস্য কন্যা, তার মৃত্যু হয় অথবা অপহারক হয় কন্যার স্বামী বা প্রণয়ী; পুরুষালী কথায় পৃথিবী স্ত্রী, সূর্য বা শস্য স্বামী, তার মৃত্যু হয় অথবা অপহারক হয় শত্রুস্থানীয়। আদিতে এই উপলক্ষে যে নৃত্যগীত, তা ছিল নারীর অধিকারে, পরে পুরুষ সেই স্থান অধিকার করে; তখন কাহিনী চরিত্রও নব রূপান্তর লাভ করতে থাকে।

পৃথিবী মাতা, শস্য কন্যা। মাঠে যখন শস্যের অভাব বা কৃষির আকাল, শস্য-দেবীর তখন তিরোভাব কল্পিত হয়েছে; মায়ের ক্রন্দন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রিক্ততায় ও নিঃস্বতায়। কন্যার মৃত্যু হয়, অথবা আকাশ কি পাতাল কিংবা সূর্য (কারণ শস্যের উদ্‌গম আকাশ থেকে বর্ষণে, সূর্যের আলোয়, মাটির তলা থেকে) তাকে হরণ করে নিয়ে যায়। তখন পৃথিবী বন্ধ্যা, প্রকৃতির সৃষ্টিক্ষমতা বিলুপ্ত- অতএব মানুষেরও। মাটির কোলে শস্য নেই, মায়ের কোলে শিশু নেই, পশুর কোলে শাবক নেই। কৃষক তখন মা পৃথিবীকে পাঠায় মেয়ের সন্ধানে (কারণ একমাত্র তিনিই জানেন মাটির আঁধারনীচে পাতালের ঠিকানা, যেখানে শস্য নিরুদ্দিষ্টা), মায়ের বিলাপ শস্যজীবী মানুষেরই বিলাপ। শেষে নির্দিষ্ট সময়ান্তে কন্যা ফিরে আসে অনেক চোখের জলের পথ বেয়ে, কিংবা নতুন করে জন্ম নেয় নতুন দেহে, পুরাতনী অথচ নিত্যনবীনা ধরিত্রীমাতার গর্ভে। তখন আবার আনন্দ শক্তি যৌবন মিলন প্রাণময়তা ও পরিপূর্ণতা; ফসল হয় মাঠে ঘরে বনে, ভরে ওঠে রিক্ত ডালি। ক্রমে মূল কথার অনেক রূপান্তর হয়েছে কিন্তু এই মৌল ভাবনার ভাবান্তর ঘটেনি। তাই যখন After the lady Ishtar had gone down
into the land of no return,

তখন The bull did not mount the cow, the ass
approached not the she-ass,
To the maid in the street no man drew near,
The man slept in his apartment,
The maid slept by herself.

ফিরে এলেন ঈশতার, ফিরে এল জীবন যৌবন ধন প্রাণ। ফলন-অফলনের আবর্তিত ধারার পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে মৃত্যু-পুনর্জন্মের ধারণা, রূপ নিয়েছে পৃথিবী ও শস্য-দেবতা সম্পর্কে নানা উপকথা কৃষিকৃত্য মেয়েলীব্রত বিরহগাথা ও মিলনগীতি। আগামীকালের কবিকল্পনা ও মানস-অনুভূতি সেগুলিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত

করেছে, রূপান্তরিত ও রূপায়িত করেছে সাহিত্য ও শিল্পের সুষম আধারে; অনেকক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ-চরিত্র পরস্পর স্থান বদল করেছে।

ঈশতার স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন পাতাল থেকে নিজের চেষ্টায় ও দেবরাজের সহায়তায়. ঈসিস একাকিনী উদ্ধার করেছিলেন স্বামীকে, প্রসারপিনোকে ফিরিয়ে আনেন তাঁর মা। আবার চলে যেতে হয়, অথবা মৃত্যু হয়, পুনরায় পুনরাগমন। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে চলে যাওয়া আর আসা, আসা আর যাওয়া, আগমনী ও বিজয়া, নিত্যমিলন ও নিত্যবিরহ, মরণ-বাঁচনের নিত্য ও সনাতনী লীলা। ক্রম-বিবর্তনে এই কৃষিগীতি উপনীত হয় কাব্যগীতিতে, মাঠের কথা থেকে ঘরের কথায়; লীলা তখন শস্যকে কেন্দ্র করে নয়, দেবতাকে মানুষকে ঘিরে, হৃদয়বিনিময়ের ময়ূরকণ্ঠী রাসরূপে।

রাম-সীতা কৃষি-রূপক-দেবতা। রামচন্দ্র নবদূর্বাদলশ্যাম, সীতা কৃষিব্রত <কর্ষকাণাং চ সীতেতি—হরিবংশ>। ঋগ্বেদে <৪.৫৭.৭> বলা হয়েছে, 'ইন্দ্র সীতাকে (লাঙ্গলচিহ্নিত ভূমিরেখাকে) গ্রহণ করুন।' গৃহ্যসূত্রে ধান-গমের মাঠে কৃষিদেবী সীতাকে অর্ঘ্যদান ও সেইসঙ্গে বর্ষণ-অধিপ ইন্দ্রকে পূজা করার কথা আছে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রের একটি মন্ত্রে <২.১৭.৯> সীতাকে 'ইন্দ্র-স্ত্রী' বলা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে গান গাইত নারীরা। সীতা এখানে ইন্দ্রাণী বলে অনেকে রাম-রাবণের যুদ্ধকে ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধের পরবর্তী রূপান্তর বলে মনে করেন[৫০]। রামচন্দ্রের অনুচর হনুমান পবননন্দন কৃষির অনুকূল মৌসুমী বায়ুর প্রতীক; রামানুজ লক্ষ্মণ শিবাত্মজা লক্ষ্মীর মত 'শ্রী'-র সঙ্গে যুক্ত; রাবণ শব্দের অর্থ গর্জন (অর্থাৎ টাইফনের মত ঝড়ের দৈত্য); কুশ ও লবণ দ্বারা নির্মার্জনের ব্যাপারটি কবিকল্পনামাত্র নয়। রামায়ণ কৃষিকথা। তাই সীতাকে হরণ করেন রাবণ, 'দশেরায়' রাবণের মূর্তি পোড়ানো হয়, (যেমন দোলের আগের দিন হয় 'চাঁচর'); সীতার উদ্ধার তথা পুনর্জন্মের স্মরণে হয় 'বিজয়া উৎসব', অবশেষে তিনি পাতালপ্রবেশ করেন। অদ্ভুত রামায়ণে আছে, 'ভূমিপুত্রী' সীতা 'মুণ্ডমালাবিভূষণা মহেশ্বরী'রূপে রাবণকে নিহত করে রামচন্দ্রকে জয়ী করেছিলেন। কাহিনীটি অদ্ভুত মনে হলেও আকাশকল্পনা মাত্র নয়—মাতৃতান্ত্রিক কৃষিসমাজের আদিম শস্যভাবনার বিবাহ মৃত্যু পুনর্জন্মের রূপককথা—ঈসিস-ঈশতারের মত স্বামীকে ফিরিয়ে আনলেন সীতা। পরবর্তীকালে সীতার উদ্ধারকার্যে ব্রতী ও সফল হলেন রামচন্দ্র। কর্ষণকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন পৃথিবীর কোলে অফলনকে জয় করে, অপহারক পরাজিত হল, সহায় হল পবননন্দন লক্ষ্মণ প্রভৃতি; সন্তান হল কুশ-লব, যেমন সূর্য-পৃথ্বীর পুত্র রাওল বা লাউল।…কালক্রমে সমাজের রূপান্তরে ক্ষেত্রদেবতা হলেন ক্ষাত্রদেবতা, কৃষিকথা রামায়ণ বিবর্তিত হল জাতীয় গাথায়, বীরযুগের মহাকাব্যে, তা থেকে গৃহধর্মের আদর্শে, শেষে অবতারত্ব ও ভক্তিসিঞ্চিত আধ্যাত্মিকতায়[৫১]।

শস্য ও পৃথিবী দেবীর এই জন্ম-মৃত্যুকথা শিবানীর জীবনীতেও রূপান্তরিত

আকারে বিদ্যমান। তাঁর 'দশমহাবিদ্যা'র রূপক-রূপে এই ভাবনার আদিরূপ নিহিত আছে। দক্ষযজ্ঞ কাহিনীতে, পতির অপমান সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করলেন, তাঁর মৃত্যু হল। সতীদেহ কাঁধে নিয়ে শিব বেরুলেন বিশ্বভ্রমণে ; বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সতীদেহ বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হল উনপঞ্চাশ খণ্ডে ; হাহাকার উঠল পৃথিবী জুড়ে ; তারপর দৈববাণী হল দেবীর হিমালয়ঘরে নবজন্মের কথা ঘোষণা করে ; শমিত হল বিলাপ, আনন্দিত হল হৃদয় উমার জন্মসম্ভাবনায়। বিরোধী ঋতুর আবির্ভাবে পৃথিবীর বুকের ওপর থেকে শস্য অদৃশ্য হয়ে যায়, লুকিয়ে পড়ে মাটির কোলে, ছড়িয়ে থাকে হাজার কণা হয়ে ; আবার অনুকূল ঋতুর আগমনী-সূচনায় কৃষক সংখ্যাহীন বীজ ছড়িয়ে দেয় মাঠের ওপর, তার থেকে জাত হয় নতুন শস্যকণা —ওই বছরের পুরাতন বীজ থেকে এবছরের নতুন দেহ। শস্যের ফলন-অফলনের এই ধারা এবং এসম্পর্কে আদিম ধারণা শস্যদেব বা শস্যদেবীর দেহকে খণ্ডছিন্ন করেছে। এই বিক্ষিপ্ত বীজকণাই অসিরিস ও সতীর দেহের ভগ্নাংশ, প্রতীক-পশু বা দেবতার খণ্ডিত মাংস। শস্যরূপে বীজগুলি ঘনসম্বদ্ধ হয় ; তখন অসিরিসের দেহও জোড়া লাগে, নবজাত হয় শিশু-শস্য হোরাস ; আর, সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন হিমালয়গৃহে উমারূপে ; তখন তাঁর পুনর্জন্ম, শিবের সঙ্গে বিবাহ ও কার্ত্তিকের জন্ম—নবজাত শস্যের প্রতীক নবজাত মানবক তথা দেবতা। সেই নবজন্মকথার পরিণত কাব্যরূপ 'কুমারসম্ভবম্'।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সতী-উমার উপকথাটি গ্রীক ও মিশরীয় কথা-কাহিনীর সাদৃশ্যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে গঠিত। সতীর মৃত্যু হেরা প্রসারপিনো পারসিফনি ঈশতার প্রভৃতি দেবীর নির্বাসন হরণ বা মৃত্যুরই প্রতিরূপ ; অসিরিসের দেহ বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছিল অর্ণবপোতে, সতীদেহ করেছিল শিবস্কন্ধে ; অসিরিসের মত সতীদেহও খণ্ড-বিভক্ত হয়। পুনরাগতা বা পুনর্জাতা দেবী, বিশেষত হেরার মত, সতী কুমারী-কন্যারূপে পুনরায় আবির্ভূতা হলেন। কার্ত্তিক টাইফন-বিজয়ী হোরাসের দেশজ প্রতিমূর্তি ; পার্থক্য এই যে, দক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন স্বয়ং শিব ও পরে তজ্জাত বীরভদ্র ; কার্ত্তিকের প্রথম দেবসৈনাপত্য দৈত্য-বিরোধিতায়। অবশ্য সে দৈত্যও টাইফনের মত সকল দেবের অনধিগম্য।

মধ্যপ্রাচ্যের কৃষিপ্রথার সঙ্গে কৃষিকথার ভারতে আগমন অসম্ভব নয়। তথাপি শিব-উমার সদ্য: আলোচিত কাহিনীটি বিদেশাগত, এ সিদ্ধান্তের পক্ষে এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট প্রমাণাভাব। অন্যদিকে সমজাতীয় কৃষি-পরিবেশে সদৃশ উপকথার উৎপত্তি অসম্ভব নয়, যদিও স্থানকালপাত্রের পার্থক্যে সেগুলির রূপ-কথা স্বাভাবিকভাবেই বিসদৃশ। মূল যেখানেই থাকুক, ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ পরিমণ্ডল তাকে স্বকীয় করে নিয়েছে, ভারতের বিশিষ্ট দার্শনিকতা তাকে নিজস্ব একটি স্ব-তন্ত্র রূপ দান করেছে, আরও নতুন কাহিনী ও ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। পরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রমথিনীবৃন্দ যখন আর্য স্বীকৃতিমাধ্যমে শিব-ঘরণী হলেন,

তখন তাঁদের কৌম 'থান'গুলি 'পীঠ'রূপে চিহ্নিত হল এবং সতীদেহ-বিভক্তির কাহিনীর সঙ্গে এই পীঠ-স্থাপনার আখ্যান যুক্ত করা হল। আদিম শস্যভাবনার উপকথা পর্যবসিত হল মধ্যযুগের ধর্মসমন্বয়ের রূপকথায়।

খ। এইভাবে আর্য-আর্যেতর সাধনা, শিবপূজা ও শক্তিপূজা, গ্রাম্য ও নাগর সংস্কৃতি প্রকৃতি-উপাসনা ও কৃষিসাধনা মিলেমিশে শিবকে একবচন ও দ্বিবচনে নব নব রূপ দান করেছে। অজ্ঞতাহেতু আদিকালে লিঙ্গ-যোনি অবিনাভাবে যুক্ত ছিল না। কালক্রমে গোপালন ও সমাজপালনের মাধ্যমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গচ্ছেদ কাহিনীকে সরিয়ে দিয়ে লিঙ্গযোনি একত্র সন্নিবদ্ধ হল; পিতামাতা-দেবদেবী-তত্ত্ব এবং সেই সঙ্গে বিবাহ ও যৌনমিলনমূলক কথা ও উৎসব প্রাধান্য পেল; সূর্য-পৃথ্বীর সংগমলীলার পটভূমিকায় শিব-শিবানী দেখা দিলেন নতুন রূপে। শিব ও শিবপ্রিয়া—দীপ ও আলোক, সূর্য ও কিরণ, শক্তিমান ও শক্তি। উভয়ের দ্বৈতরূপ হল তত্ত্ব, ধর্মসাধনার অন্তর্নিহিত মৌল দর্শন। তখন

ন শিবঃ শক্তিরহিতো ন শক্তির্ব্যতিরেকিণী। <শিবদৃষ্টি ৩.২>

এবং যথালোকেন দীপস্য কিরণৈর্ভাস্করস্য চ।

জ্ঞায়তে দিগ্বিভাগাদি তদ্বচ্ছক্ত্যা শিবঃ প্রিয়ে॥ <বিজ্ঞানভৈরব ২১>

মহাভারতে গৌরীপট্টসহ লিঙ্গের মাহাত্ম্যবিবৃতি এবং হস্তীগুম্ফায় হরগৌরীর বিবাহমূর্তি ও অর্ধনারীশ্বর প্রতিমাস্থাপনে কৃষি-প্রজনন ধারণার পথ-পরিক্রমার বৃহত্তর পর্যায়টিতে একটি পূর্ণযতি পড়ল। যতিপতন জাগিয়ে দিল ছন্দকে ছবিকে; কাব্য এগিয়ে এল হাতে নিয়ে তূলি পাত্রে নিয়ে রঙ। তার নিজস্ব আধারে ছবি হল গান, অপূর্বসুন্দর প্রণয়গীতি। দেবদম্পতি উঠে এলেন কর্ষণের ক্ষেত্র থেকে শিল্পের বৃত্তে, হলেন নায়ক-নায়িকা।

গ। শৈব পরিবার

সংস্কৃত ব্যাকরণে শব্দরূপ ত্রিধা: একবচন-দ্বিবচন-বহুবচন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে রুদ্রশিবের ইতিহাসও ত্রৈত: ঋগ্বেদে তিনি একক, উপনিষদে শিবানীসহ দ্বৈত এবং পুরাণে পুত্রকন্যাপরিবৃত বহুবচনান্বিত—'য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্' <শ্বেত ৪.১>।

ধর্ম-সংস্কৃতির অগ্রগতির পথে আর্য অনার্য ভাবনা বারবার নিকটবর্তী হয়েছে এবং সংঘাতের মাধ্যমে পারস্পরিক ভাবের বিনিময় ঘটেছে। আর্যেতর প্রমথ ও প্রমথিনীবৃন্দ একে-একে আর্য দেবমণ্ডলীতে স্থান পেয়েছেন। শিবকে কেন্দ্র করে ও বিভিন্ন সম্বন্ধসূত্রে এঁদের অনেকেই আর্য স্বর্গে প্রবেশলাভ করেছেন—শুধু কেন্দ্রীয়

নয়, আঞ্চলিক ধর্মসমন্বয়ের ক্ষেত্রেও। শিব-শিবানীর মানবিক রূপ ও বৃত্তি (যা আদিম ধারণায় অন্তর্নিহিত ছিল) এর পশ্চাতে অনেকখানি কাজ করেছে। দ্বৈত দাম্পত্য জীবনে পুত্রকন্যাদের আবির্ভাব পার্থিব সংসারে আকাঙ্ক্ষিত ও স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বিবাহের অনেকদিন পরে গৌরী যখন বলেন, 'তখন ছিলে দুই প্রাণি অখন পাঁচ সাত'—তখন শিব রীতিমত গার্হস্থ্য আশ্রমিক, তাঁর চারপাশে আরও অনেকে। এইসব নবীনতর দেবদেবীর সঙ্গে যোগে রুদ্রশিব হলেন তরুণী শিবানীর বৃদ্ধ পতি, কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতীর উপহাস্য পিতৃদেব।

শিব-পরিবারের সদস্য ও সদস্যাবৃন্দের অন্যনিরপেক্ষ জীবন-ইতিহাস আমাদের আলোচ্য সীমার বাইরের বিষয়। শিবের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধবন্ধনের সূত্রগুলিমাত্র আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন শিবকে উপলব্ধি করার জন্যে।

১। **গণেশ** ॥ ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলে 'গণেশ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু ইনি বৈদিক বা আর্য দেবতা নন। পথ ও পথিকদের দেবতা গণেশ দক্ষিণী অনার্য প্রমথ [১]। এঁর রূপ গুণ [২] এবং পূজারীতি রুদ্র-উপাসনার আদিম প্রথার সদৃশ। আর্য আশ্রয়ে শিব ও গণেশে যোগসূত্র স্থাপিত হল [৩]। আদি অস্ট্রেলীয়দের টোটেম পূজা থেকে গণেশ-উপম পশু-দেবতাদের জন্ম। তিনি বিঘ্নরাজ, উগ্র প্রমথ এবং গণসমাজের উপাস্য। কৃষিভিত্তিক শস্যসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা লক্ষণীয় [৪]; শিবপুরাণে <উত্তর ১৯শ অঃ> হরিদ্রাপুতুল থেকে গণেশ জাত; শিব অজ্ঞাতে তাঁর মুণ্ড ছেদ করেন, পরে নবজীবন দান করেন। গণেশের গজমুণ্ড ঐরাবত থেকে প্রাপ্ত; বৃষ্টিসম্ভব মেঘকে তখন ঐরাবত বলে মনে করা হত। গণেশের জন্ম ও জন্মান্তরের এই কাহিনীর মধ্যে তাঁর পশু ও শস্য-ঘনিষ্ঠতার সাক্ষ্য বিদ্যমান। মহাদেবও গণেশ, গণপতিরূপে উল্লিখিত হয়েছেন <মহাভারত বন ৩৯.৭৯। দ্রোণ ২০১.৪৮। সৌপ্তিক ৭.৮। শান্তি ২৮৪.৭৬>। একদা মূষিক ছিল রুদ্রের অন্যতম বাহন। মূষিক কৃষিসংশ্লিষ্ট। বরাহপুরাণমতে, গণেশ ইঁদুরটি পান পৃথিবীর কাছ থেকে; এবং তাঁর হাতে অঙ্কুশ মুষল পরশুর সঙ্গে লাঙ্গলও দেওয়া হয়েছে। ফলে, শিবের সঙ্গে তাঁর মিলন অবিলম্বে হয়। ঋগ্বেদে মরুদদের অপর নাম 'গণ'; রুদ্র ছিলেন 'গণপতি-বিনায়ক'। গণেশেরও অপর নাম বিনায়ক, তিনি গণ থেকে গণপতিত্বে উন্নীত হন; তখন তিনি সিদ্ধিদাতা শান্ত দেবতা। কোন কোন পুরাণে বলা হয়েছে, তাঁর জন্ম মহাদেবের আস্য থেকে, কোথাও গৌরীর দেহমল থেকে, কোথাও-বা পার্বতীর খেলার পুতুল হয়ে। বিষ্ণু ও বৃহস্পতির সঙ্গেও তাঁর যোগ বিদ্যমান [৫], কিন্তু শুধু রুদ্রশিবই তাঁর ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়। দুজনের প্রকৃতি অভিন্ন, চরিত্র অপৃথক—অবহেলায় ঘোর উগ্র, আবাহনে প্রসন্নদক্ষিণ; দুজনেই নৃত্যবিদ, গজরূপী, অনার্য প্রমথ—শিব প্রমথেশ, গণেশ উপপ্রমথ; শিব গণেশরূপে পুনরাবির্ভূত [৬]—মৃত দেবতা মাতা বা স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন পুত্ররূপে, মৃত শস্য পৃথিবীর কোলে নবীন শস্যকণার জন্মের মত।

২। **কার্ত্তিক**॥ যৌবন ও শক্তির অধিদেবতা দক্ষিণী প্রমথ 'মুরুকন' কাত্তিক-রূপে আর্যায়িত হয়েছেন [৭]। ইনি প্রথমে গণপতি, পরে হন দেবসেনাপতি। কার্ত্তিক সর্পভীত বনচরদের দেবতা, ময়ূর তার সাক্ষ্য, আরণ্যক পুলিন্দ-শবরদের যুদ্ধদেবতা, তাই তিনি ধানুকী। টোটেম পূজার সঙ্গে ময়ূরের যোগ বর্তমান। 'কুমার' কার্ত্তিকেয় কৃষিদেবতা, তাই পুত্রদ; সৌর দেবতাদের মত, শিব ও গণেশের ন্যায় তাঁরও জন্মমুহূর্ত বিচিত্র ও রহস্যভরা। আর্য দেবচক্রে প্রথমে ইনি অগ্নির পুত্র বলে চিহ্নিত হন <বুদ্ধচরিতে 'অগ্নিসূনুঃ'>। বৈদিক অগ্নি রুদ্রে লীন হতে থাকলে ইনি রুদ্রপুত্ররূপে পরিচিত হন। সাংখ্যায়ন <৬.১.৯.> ও শতপথ <১.৭.৩.৮> ব্রাহ্মণে রুদ্র অগ্নি ও কার্ত্তিকের পিতা (অগ্নিরও এক নাম ছিল 'কুমার')। রামায়ণে কার্ত্তিক অগ্নি-গঙ্গার পুত্র, মহাভারতে শিব-গঙ্গার। পুরাণে শেষের পরিচয়টি স্থায়িত্ব লাভ করে [৮]। কার্কিত্তকে লালন করেন কৃত্তিকা নক্ষত্র, অদূরে আকাশ-গঙ্গা; তাই কার্তিক হলেন গঙ্গার পুত্র। কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলী কালপুরুষের সন্নিকটে; শিব এই কালপুরুষ; ফলে, শিব-কার্ত্তিকে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল, গাঙ্গেয় হলেন গঙ্গাধর-শিবের আত্মজ। শিব ও কার্ত্তিক উভয়েই ছিলেন 'গুহ', রুদ্র ও স্কন্দ দুজনেই একদা অগ্নি ছিলেন, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে স্কন্দ ও শিব অভিন্ন। রুদ্রের আবাস হিমবৎ পর্বতে কার্ত্তিকের জন্ম, রুদ্রের শক্তি ও মহিমা কার্ত্তিকে স্বল্প হস্তান্তরিত। কার্ত্তিকও তস্করপতি, নবজাতককে তিনি হরণ করেন [৯]; আবার তিনি পুত্রদ ও কামদেবতা, মদন-মহোৎসবের অধিপতি। ত্রিপুরদহনে রুদ্র দেবসেনাপতি, তারকনিধনে কার্ত্তিক দেবসেনাপতি। পতঞ্জলি যে 'শিব-স্কন্দ' মূর্তির কথা বলেছেন, তাঁরা এক দেবতা নন। তবে এইসব সাযুজ্যের কথা মনে রাখলে, শস্যসংস্কৃতির দৈবমণ্ডলে পুত্ররূপে পিতার পুনর্জন্ম গ্রহণের কল্পনা কার্ত্তিকের মধ্যেও লক্ষিত হয়—অসিরিস যেমন হোরাস, রুদ্র যেমন গণেশ, তেমনি রুদ্র কার্ত্তিক। পার্বতী একরূপে কালী, অন্যরূপে দুর্গা; পার্বতীনাথের দ্বৈতরূপ—রুদ্র ও শিব; গণপতিরও দুই রূপ—গণেশ ও কার্ত্তিক। তাই কার্ত্তিক শিবের পুত্র ও গণেশ ভ্রাতা।

৩। **লক্ষ্মী**॥ আর্য-অনার্য ভাবনার ত্রিবেণীসংগমে পরিশুদ্ধা নারায়ণী-লক্ষ্মী শ্রী হ্রী ও পুষ্টির অধীশ্বরী। পুরাণে তিনি 'শ্রীর্ধৃতা হরিণীরূপম্ অরণ্যে সংচচার হ।' লক্ষ্মী পেচকবাহনা, মত্তহস্তী ও বৃষভে তাঁর বাস, তিনি বলিকামিনী [১০]। পশু-পূজার দৈবরূপ লক্ষ্মীর সঙ্গে যুক্ত, তেমনি কৃষিভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি—তিনি ধান্যদেবী, নারিকেল ও চিঁড়া তাঁর অর্ঘ্য। 'গজলক্ষ্মী'র মধ্যে এই দুটি ধারারই মিশ্রণ দেখা যায়। যজ্ঞ মেঘ ও পদ্মবন তাঁর আবাসস্থল এবং তাঁর 'কমলেকামিনী' মূর্তিতে দুটি গজের জলবর্ষণ সুবর্ষণ ও সুফলনের ইঙ্গিতবহ। কোজাগরী ও অন্যান্য সাময়িক লক্ষ্মীপূজা, ঘট ও ধান এবং (দায়োনিসসের মত) মৃৎপাত্রে তাঁর পূজা আর্যেতর কৃষিসংস্কৃতির দ্যোতক। দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালী ও লক্ষ্মী দুজনেরই একই রাত্রে পূজা বিহিত এই কারণেই। নারায়ণ উপনিষদে পৃথিবী শ্রীদেবীরূপে

বর্ণিত ; আবার উমাও পৃথিবী। পুরাণে, লক্ষ্মী পার্বতীর অংশজাতা ও যোগমায়া। মহাভারতে লক্ষ্মী গো-স্বরূপা, মহাদেব বৃষধ্বজরূপে গো-কুলের সঙ্গে ক্রীড়ারত [১১]। অতএব শিব ও লক্ষ্মী উভয়ের মধ্যে একদা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু ভগবতী যখন গো-রূপা হলেন তখন লক্ষ্মীর স্থান হল অন্যত্র—যেমন, লক্ষ্মীপূজায় 'অলক্ষ্মী-বিদায়'-এর মাধ্যমে গৃহচ্যুত করা হয় আর্যেতর শস্যদেবীটিকে অথবা মৃতা শস্যদেবীকে। আগে শ্রীপঞ্চমীর দিন লক্ষ্মীপূজা হত, এখনও 'লক্ষ্মীব্রত' হয় ; ঐদিন স্কন্দ ও ষষ্ঠীর এবং লক্ষ্মীরও বিবাহ, রতি ও কামের পূজা ; পরদিন 'ষষ্ঠী'। অর্থাৎ এই দুদিন 'হলপর্ব' ও 'কামপর্ব'। এগুলির সঙ্গে লক্ষ্মীর যোগাযোগ তাঁর কৃষি-প্রজনন-ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক। তাই গো-লোক-পতি বিষ্ণু তাঁর স্বামী, বৃষবাহন শিব তাঁর পিতা, অন্নদা উমা তাঁর মাতা এবং ধান, ঝাঁপি ও ঘট তাঁর প্রতীক।

৪। **সরস্বতী**॥ শিবের অন্যতমা কন্যা সরস্বতী মূলত আর্য নদীদেবী, যাঁর তটে আর্যরা একদা যজ্ঞ সমাধা ও জীবন নির্বাহ করত, যাঁকে উদ্দেশ্য করে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে 'যজ্ঞং দধে সরস্বতী' <১.৩.১১> এবং 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে'। সরস্বান তাঁর স্বামী <৭.৯৬.৪-৬>, তিনি 'পাবীরবী কন্যা', বিদ্যুতের কন্যা <৬.৪৯.৭>। অন্যান্য আর্য দেবদেবীর মত সরস্বতীরও অনার্যা দেবীর সঙ্গে মিলন হয়েছিল।

বেদের সরস্বতী ও দুর্গা একদা অভিন্না হন। উভয়েই গায়ত্রীরূপে সূর্যের শক্তি এবং পৃথিবীরূপে স্তুতা হয়েছেন। সরস্বতী নদী হিমালয়জাতা, পার্বতী হিমালয়কন্যা। সরস্বতী সিংহিনী নগ্নকিশোরী ও অতিরাত্রের কালী, রুদ্রজননী [১২]। দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা সরস্বতী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বেদে সরস্বতী পাবকা [১৩], তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনীও পাবকারূপিণী ; তাই সরস্বতী কুলকুণ্ডলিণী ও শিবশক্তিরূপে উল্লিখিত [১৪]। বৌদ্ধ সাধনার সংযোগেও তাঁর রূপান্তর ঘটেছিল, যার ফল নীল-সরস্বতী। সরস্বতী ও দুর্গা-কালীর সম্বন্ধনির্ণয় আমাদের আলোচ্য নয়, কিন্তু বক্তব্য—এই সম্বন্ধের সেতুপথে শিব ও সরস্বতীর আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আর্যেতর উপাসনা এই যোগকে দৃঢ়তা দান করেছে। সরস্বতী সর্পপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; সাপ লিঙ্গ-উপাসনার সঙ্গে সংযুক্ত। সরস্বতীর হংসটি মানস-সরোবরের নয়, আর্যেতর প্রাণী-উপাসনাজাত। তাই তাঁকে পশুযাগের 'আপ্রীসূক্তে' বন্দনা করা হয়েছে [১৫]। সরস্বতীর কৃষির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ; তিনি 'ইলা' বা পৃথিবীরূপে যজ্ঞের উদ্‌গাত্রী। উত্তর বিহারের 'হলপর্ব' শুরু হয় শ্রীপঞ্চমীর দিন [১৬] ; এইদিন লক্ষ্মী ও স্কন্দে বিবাহ হয় বলে মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে। শস্যদেবী আক্রোদিতে ছিলেন হংসবাহনা [১৭]। কৃষিঘনিষ্ঠ বসন্তোৎসবে বসন্তদূত হংসদেবতার পূজা তাই বিহিত। সরস্বতী পূজায় নবজাত ফল ও পঞ্চশস্য অর্ঘ্যদান বিধেয়। তন্ত্রে তিনি 'কলাবধূ'। জলবতী বলে সরস্বতী নদীমাত্রের বাচক, পৃথিবীকে ফলবতী করতে তাঁর সহায়তা অপরিহার্য। বসন্তকালে যখন সরস্বতীর পূজা, তখন কৃষির

মূলে নদীর জলসেচের পালা ; বসন্তকাল উদ্ভিদজগতের জাগরণের কাল, প্রকৃতি-নির্ভর মানুষেরও মিলনবাসনার উদ্দীপনা এই সময়ে। কৃষি অনুষ্ঠান বসন্তোৎসব একদা পরিণত হয় মদনমহোৎসবে, শেষে রাধাকৃষ্ণের দোললীলায়। এই উৎসব আদিম কৃষকের পরিকল্পিত—শস্যের সুফলনের সহায়ক নরনারীর রতিক্রীড়ারূপে। আর এই কৃত্য যখন 'দোলে' পরিণত হল, তখন অর্থ হল—মানসক্ষেত্রে দৈব প্রেমের স্ফূর্তির সহায়ক। শিবের ইতিহাস এবং এই লোকায়ত (সরস্বতী-উপমা) দেবীদের জীবনলিপি একই সমাজমানসজাত। সুতরাং প্রাণী জীব শস্য পূজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠা এক বা একাধিক 'কলা'-দেবী সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, এ অনুমান নিতান্ত অসংগত নয় এবং সেই পথে তিনি শিবের কন্যারূপে পরিচিতা হয়েছেন।

অন্যদিকে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে শিব 'বাগীশ্বর'; রুদ্রহৃদয় উপনিষদে, 'রুদ্রোঽর্থোঽক্ষরঃ সোমা' <২৩> এবং 'ব্যক্তং সর্বম্ উমারূপম্ অব্যক্তং তু মহেশ্বরম্' <১০>। পার্বতী বাক, রুদ্র অর্থ; উভয়ের মিলনে বাগর্থের অর্ধনারীশ্বরত্ব। সরস্বতীও বাক; অতএব অর্থ-রূপী রুদ্র স্বাভাবিকভাবে তাঁর আত্মীয় হলেন। শিব শুভ্র, সরস্বতী শুভ্রা ; সংগীতে দুজনের সমান অধিকার ; দুজনেরই হাতে বীণা—একটি ললিত, অন্যটি রুদ্র ; দুজনেই নৃত্যের দেবতা—একজন শীতের জড়তা দূর করে সম্ভাবিত করেন বসন্তের মুকুল, অন্যজন ধ্বংসমাধ্যমে জাড্য দূর করে আনেন সৃষ্টির নবাঙ্কুর। তাই সরস্বতীর স্বামী প্রজা-পতি ব্রহ্মা, পিতা কলা-পতি শিব, মাতা জীবপালিনী উমা।

৫। **গঙ্গা** ॥ ভারতে আর্য সভ্যতার আদিতে যেমন সরস্বতী, অন্তে তেমনি গঙ্গা। আর্য ঋষি নদীর বন্দনা গেয়েছেন কিন্তু নদীপূজা ও তীর্থমাহাত্ম্যভাবনা আর্যেতর দান। সরস্বতীতীরে যজ্ঞ আর গঙ্গাতীরে তীর্থ-মন্দিরাদি, উভয়ের মধ্যে ইতিহাসের অনেক পাতার ব্যবধান। তবে পূর্বগামিনী সরস্বতীর উপাসনা গাঙ্গেয় সাধনাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই।

রামায়ণে গঙ্গা অগ্নির স্ত্রী ও কার্ত্তিক-জননী ; মহাভারতে তিনি স্বীয় গর্ভে রুদ্রবীজ ধারণ করেন ও স্কন্দমাতা হন ; পুরাণে তিনি প্রথমে নারায়ণের স্ত্রী, পরে শিবের গৃহিণী [১৮]। অনেক স্থলে গঙ্গা সতী [১৯] এবং রুদ্রাণী [২০]-রূপে আহুত হয়েছেন ; দেহত্যাগের পর সতী উমা ও গঙ্গারূপে পুনর্জাতা হয়েছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে [২১]। ব্রহ্মার কমণ্ডলুস্থিতা গঙ্গা প্রথমে অগ্নি, দ্বিতীয়ে বিষ্ণু, শেষত শিবের ঘরণীরূপে পরিকীর্তিতা। শিবের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতম ঘনিষ্ঠতা। তার অনেকগুলি কারণ আছে। ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করেন, তার আগে তিনি শিবজটার দিকহীন অরণ্যে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আনেন। দুর্গম জটিল হিমালয়শিখর যেন রজতগিরিসন্নিভ শিবের জটিল শিরশ্চূড়া ; হিমালয়ের ঊর্ধ্বদেশে গঙ্গার প্রাথমিক বিহার, তাই গিরিশ-শিবের জটাকলাপে গিরিদরী-বিহারিণী নদীর অবস্থিতি-কল্পনা। গঙ্গার যে তিন রূপ, তার অন্যতমা আকাশ

গঙ্গা মন্দাকিনী ; কালপুরুষ রুদ্রের মাথার ওপর এই দুগ্ধতোয়া ছায়াপথের সঞ্চরণ ; দূর থেকে মনে হয়, শিব-শিরেই দেবীর নিলয়। ফ্রএড শিরোভূষণকে যৌনপ্রতীক মনে করতেন, ইয়ুং কৌণিক কেশবিন্যাস তথা জটাকেও তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন ; অন্যদিকে ঝর্ণাও যৌনপ্রতীক। উভয়ের যোগাযোগকে স্বীকার করা হয়েছে। এইদিক থেকেও শিবজটায় গঙ্গার স্থানলাভের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। অগ্নিকেও একই অর্থে যৌনপ্রতীক মনে করা হয়েছে ; এই প্রকৃতিগত সাদৃশ্যে আদিতে গঙ্গা-অগ্নির মিলন হয়েছিল। প্রজননদেবতা শিব অগ্নিকে গ্রাস করার সময়ে গঙ্গাকেও স্বকীয়া করে নিলেন। গঙ্গায় স্নান ও শিবনামে চৌরঙ্গীতে স্নান দুই-ই সমান পবিত্র ও বন্ধ্যাত্বমোচনের সহায়ক বলে মনে করা হতে লাগল, গঙ্গা-মাটি দিয়ে গঠিত হল শৈব লিঙ্গ ও মূর্তি, গঙ্গাস্নানান্তে শিব উপাসনা হল অবশ্যকরণীয় প্রথা : 'আকে আকন্দ বিল্বপত্র তোলা গঙ্গার জল। তাই পেয়ে তুষ্ট হন ভোলা মহেশ্বর।'

কিন্তু চিরচঞ্চলা নদী তো স্থবিরা গৃহিণীরূপে অন্তঃপুরে অচঞ্চলা হবার নয়। বহতা নদীর চলার পথে পথে কত না নগর রাজধানী, কত শক্তিমান রাজন্যের আধিপত্য ; লোকবিশ্বাসে এঁরাও নদীমাতার স্বামী। তাই গৌরী ও গঙ্গা দুজনেই পার্বতীয়া হওয়া সত্ত্বেও, প্রকৃতিগত বিভিন্নতার জন্যে উভয়ে অভেদ হয়ে যান নি, যদিও প্রয়াসের অন্ত ছিল না। পুরাণে এবং বাংলা কাব্যে গঙ্গা স্বয়ং দুর্গার স্থান অধিকার করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু দ্রুত বিবর্তিত ইতিহাস এই ঐক্য সাধনের সময় দিল না ; অগ্রগামিনী চণ্ডীর প্রতাপ-প্রভাবও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাইগঙ্গার শেষ পরিচয়—গৌরীর ভগ্নী ও সপত্নী।

[বাঙলাদেশে গঙ্গামাহাত্ম্য 'দ্রবব্রহ্ম'রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বাংলা কাব্যে তিনি শিবের পত্নী, তবে শূন্যপুরাণে ধর্ম তথা বিষ্ণুর স্ত্রীরূপেও উল্লিখিত হয়েছেন। মনসামঙ্গলে মনসাকে কেন্দ্র করে গঙ্গা ও চণ্ডীতে এবং কবিগানে গঙ্গাকে মধ্যমণি করে শিব ও দুর্গার মধ্যে বিবাদ বেধে উঠেছে। স্বতঃউচ্ছলা নদী রূপান্তরিত হয়ে গেছেন বিবদমানা নারীতে। আর দুই সতীনের মাঝে পড়ে সংসারের সকল বিষ আকণ্ঠ পান করতে হয়েছে নীলকণ্ঠ শিবকে।]

ঘ। শৈব প্রতীক

১। বৃষ॥ শিবের বাহন বৃষ। উভয়ের যোগ যে কবে থেকে তা সঠিক নির্ধারিত হওয়ার উপায় আজ নেই ; সিন্ধুসভ্যতার শিব পশুপতি, এখানে বৃষমূর্তিরও অভাব নেই ; কিন্তু দুজনের সম্বন্ধ লক্ষ্যগোচর হয় না। বৃষ অনেক পরে শৈব ধর্মে

গৃহীত হয়, মার্শালের এই অভিমত সমর্থনযোগ্য ১। শুধু ভারতে নয়, বাহির-দুনিয়াতেও বৃষ একদা দেবপ্রিয় ছিল। সিরীয়ার হেট্টাইটদের দেব-দম্পতি বৃষ ও সিংহী, অসিরিস বৃষমূর্তি, তামুজ বৃষকণ্ঠ। বাবিলনের দেবাদিদেব একদা ছিলেন Bull of Heaven; সুমেরীয়রা দেবতাদের বৃষভ বলত; মেসোপতেমিয়াতে বৃষ পবিত্র বলে গণ্য হত ২। নিনিপ, এরেক ও অসুর দেবতার প্রতীক ও বাহন ছিল বৃষ ৩। গ্রীস ও রোমের দেবমণ্ডলীতেও বৃষের প্রাধান্য কম ছিল না। ঋগ্বেদে রুদ্র বৃষভ। দশম মণ্ডলে 'বৃষাকপি' এবং অথর্ববেদে 'মহাদেব-বৃষে'র উল্লেখ মেলে ৪। সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র <৪.১৭—২০>, মানব <১.১৩.৯—১৪> ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে <৪.৯.২> ষণ্ডবলি ছিল রুদ্রশক্তি লাভের উপায়। মহাভারতে <অনুশাসন> উপমন্যু 'ঐরাবতবাহন শিবকে' প্রত্যাখ্যান করে 'বৃষবাহন শিবকে' অভ্যর্থনা জানান। কালক্রমে বৃষ শৈব প্রতীকরূপে গৃহীত হয় ও রাজানুকূল্য লাভ করে। স্কাইদীয় তাম্রমুদ্রায় শিব ও বৃষ খোদিত, অনেক ক্ষেত্রে লিঙ্গ-যোনি আলিঙ্গনরত বৃষচিত্র বর্তমান; কুশান রাজবংশ ও মিহিরকুলের মুদ্রায় বৃষের জনপ্রিয় চিত্র উৎকীর্ণ ৫। নানাদিক থেকে উভয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

অ। ক্রুকের অভিমত, বৃষ আর্যেতর সমুদ্র থেকে আর্য দ্বীপে উপনীত হয় ৬। আদি-অস্ট্রেলীয়রা জীবপূজা-প্রাণিপূজাকে দেশে-দেশান্তরে বহন করে নিয়ে গেছে। বৃষের দেবত্ব ও শিব-নৈকট্য-প্রাপ্তি এই অনার্য বহতা সংস্কৃতির দান। নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন, দেবতা এবং তাঁর বাহন ও আয়ুধে অভেদ বর্তমান ৭। প্রাণিপূজা যখন দেবপূজায় উপনীত হয়, তখন সেই পশু কোথাও দৈব বাহন, কোথাও অলংকার, কোথাও দেবতায় লীন, কোথাও-বা স্বয়ং দেবতা হয়ে ওঠে। মেম্ফিসের 'অ্যাপিস্', হেলিওপলিসের 'মনেভেস্', উত্তরাঞ্চলের 'বসিস্'—একই বৃষের বিভিন্ন নাম ৮। হেরোদোতাস ও দিওদোরাস বৃষকে বলেছেন, 'অসিরিসের আত্মা'। আমাদের বৃষও আত্মাযুক্ত, বাহনরূপে বৈদিক যজ্ঞে সম্বোধিত ৯, পুরাণে নন্দীরূপে শিবানুচর পদে বৃত।

আ। টোটেম পূজার মাধ্যমেও বৃষের রূপান্তর সাধিত হয়েছে। ভারতে বহু আদিম জাতির টোটেম বৃষ ১০। ফ্রেজারের Totemism and Exogamy গ্রন্থে টোটেম উপাসনার যে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে, বৈদিক 'শূলগভ' যজ্ঞে তার প্রতিচিত্র দেখি। বিশেষ যজ্ঞে ও বিশিষ্ট দিনক্ষণে এই ষণ্ডবলি বিহিত ছিল ১১। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের 'নীলকুন্তলা'র কাহিনীটিকে এই অনুষ্ঠানের বিবর্তিত রূপক বলে মনে হয়।

ই। বৈদিক দেবতা 'পুষা' ছিলেন অজৈকপাদ, পরে হলেন প্রোষ্ঠপাদ, অর্থাৎ ছাগবাহন থেকে বৃষবাহন ১২; গরুড় পুরাণে <৬ অঃ> রুদ্র ও অজৈকপাদ দুজনেই 'ত্বষ্টা'। ছাগ থেকে বৃষে এই রূপান্তরটি রুদ্র উপাসনার একটি চলমান ইতিহাসের ইঙ্গিত ১৩। পশুপালক আর্যরা একদা পশ্বাহারী ছিল; শীতল জলবায়ুতে

এই উত্তপ্ত আহার্যের ব্যবস্থা। 'পশুযাগ' তার ফল। বস্তুত এই বলি বা যজ্ঞ ব্যাপারটি আর্য ও অনার্য উভয় ধারা থেকে উদ্ভূত হয়ে ক্রমে একটি বিন্দুতে সমাহৃত হয়েছে। আর্যসমাজে নরবলির প্রথা বিদ্যমান ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে <১.৩.৪> বিবৃত হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের কাহিনী তার সংস্কৃত রূপ। অতিথিকে বৃষ দানের কথাও শ্লোকটিতে উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় <১০.২৭.২। ১০.৮৬.১৪। ৮.৪৩.১১> ইন্দ্রকে ষাটটি ষাঁড় দান করা হত, যজমান তার প্রসাদ পেত এবং অগ্নিকে বৃষ ও গো-খাদক বলে আবাহন করা হত। অন্যদিকে মহেঞ্জোদড়োর পশুপতি নর ও পশু-বলিভুক ছিলেন। আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্রে <৪.১০> শূলগব যজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে গ্রামের বাইরে এবং পারস্কর গৃহ্যসূত্রে গোশালায় এই যজ্ঞটির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এইজাতীয় যজ্ঞের মূলে অনার্য সমাজের ছাপ বিদ্যমান। অনেকের মতে, এই যজ্ঞ থেকে শিব পেলেন বৃষ ও শূল, বৃষ হল শিবের নিত্যসঙ্গী বাহন।

ঈ। বৃষ যৌনপ্রতীক ১৪। অ্যাপিস্-এর লিঙ্গ শিবলিঙ্গের মত পবিত্র বলে বিবেচিত হত ১৫। নিনিপের সঙ্গে বৃষ ও লিঙ্গ একত্রে যুক্ত ছিল। পশুপালনের স্তরে গো-রক্ষার প্রয়োজনে বৃষের প্রাধান্যলাভ এর অন্যতম কারণ; যৌনবৃত্তি পরে যুক্ত হয়েছে। শিব যেমন প্রজননদেব, বৃষ তেমনি প্রজনক জীব।

উ। কৃষির সহায় 'বৃষ' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'বর্ষণ', আবার 'শুক্রল জীব'ও; অন্য অর্থ 'মূষিক', 'ইন্দ্র'। দায়োনিসসের বৃষ ছিল embodiment of corn spirit, কোথাও-বা সৌর আত্মা ১৬। এথেন্সে বাৎসরিক 'বৃষোৎসর্গ' হত বর্ষণ-কামনায়, তার মৃতদেহ নিয়ে হত চাষের মহরৎ ১৭। 'বল্' দেবতার কাছে এই উদ্দেশ্যে বৃষ বলি দেওয়া হত। চীনে কাগজের বৃষ দাহ করা হত; পশ্চিম বাঙলায় 'নুয়ে ছাগ'-এর মত লালন অন্তে যথাকালে বৃষ উৎসর্গ করা হত ১৮। সকলেরই মূল উদ্দেশ্য সুফলন-প্রয়াস। গৃহ্যসূত্রের শূলগব যজ্ঞ হত গোমড়কের সময়ও, এখানে শিবের অপর নাম 'ভীম'। ভীম উত্তর ভারতের অনার্য প্রমথ—ভূমি ও গবাদির রক্ষক। এই যজ্ঞটির কৃষি-ঘনিষ্ঠতার কথা আগে উল্লেখ করেছি। গৃহ্যসূত্রে গোবৃদ্ধি ও শস্যসমৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছে। 'বৌদ্ধ-বিহার' অনুষ্ঠানে পলাশপাতা ঝুড়িতে ভরে মাঠের গাছে বেঁধে দেওয়া হত, গরুর ওপর ঢালা হত সুরোদক। 'ক্ষেত্রপতি'র পূজায় গো-পথে পাতায় করে স্থালিপাক অর্ঘ্য দান করা হত, তাঁর প্রতীক একটি বৃষকে আনা হত ঐ স্থানে। শূলগব যজ্ঞ হত সাধারণত শরতে-বসন্তে; কাম্য ছিল গো-সন্তান-সম্পদ। একজোড়া গবী থাকত মাঠে—'ঈশান' ও 'মীঢুষী'র প্রতীকরূপে; মধ্যস্থলে থাকত একটি বাছুর—উভয়ের সন্তান 'জয়ন্ত'র প্রতীক হয়ে; বলির ষণ্ডটি বাঁধা থাকত 'সপত্র একটি বৃক্ষশাখায়' কুশদড়ি দিয়ে, অন্যান্য দেবতার সঙ্গে 'বনস্পতি' আহূত হতেন। নিহত বৃষের পাকস্থলী ইত্যাদি মাটিতে পোঁতা হত, লেজ চামড়া তুষের আগুনে সমর্পিত হত;

আগুনের চারপাশে থাকত একদল গরু ; ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হত—অনুষ্ঠানের স্পর্শলাভ তথা শক্তিবৃদ্ধির জন্যে। যজ্ঞটিতে পশু মাটি ও শস্যের ঘনিষ্ঠতা লক্ষণীয়। কর্ষণ-প্রজননের অভিন্নতার ধারণা থেকে এই বিধি ও কৃত্যগুলি কল্পিত হয়েছে। শ্রাদ্ধে তাই পিণ্ড দেওয়া হত—শুধু শস্য বা অন্নের নয়, সেই সঙ্গে গোমাংসেরও ; 'বৃষোৎসর্গে' যজুর্বেদীয় রুদ্রাধ্যায় এবং রুদ্রমন্ত্রসমূহ অবশ্যপাঠ্য ছিল ; বৈদিক সংস্কারে মৃতদেহের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হত রাজগবীর মাংস।

ঊ। ভগিনী নিবেদিতার মতে, যজ্ঞের অর্ঘ্য বৃষ বহন করত বলে শিবের বাহন বৃষ [১৯]। আধুনিক ঐতিহাসিকের অভিমত, পশুপালক ও কৃষক আর্যদের কাছে গো-বৃষ ছিল প্রধানতম ধন ও দক্ষিণা [২০]। কৃষির সহায়ক ছিল বৃষ <ঋক ৪.৫৭.৪>। আর্য ও আর্যেতর উভয় ক্ষেত্রেই বৃষ সম্পর্কে পবিত্রতার ভাব আসে জীবন-সংগ্রাম ও পার্থিব প্রয়োজনকে আশ্রয় করে। একসময়ে জীব ও দেবে মিলন হয়। তখন ঈসিস-অসিরিস এবং হাথর-নূর মত আমাদের শিব হন বৃষ, শিবানী গোমাতা। সমজাতীয় কৃষিভাবনা শিব ও বৃষকে নৈকট্য দিল। শিব পেলেন স্থায়ী বাহন, বৃষের হল দৈবীকরণ—'নন্দিনাম্ গণাধিপঃ' <মৎস্য ৯৫ অঃ>। কিন্তু এখানেই এই পশুদেবতার বিবর্তনের চাকা থেমে গেল না। বৃষের পরবর্তী রূপ ক্রমে ক্রমে মহাভারতে কৃষ্ণ, পুরাণে চতুষ্পাদ ধর্ম, বৌদ্ধ সাধনায় বুদ্ধ, তন্ত্রে মদ-ক্রোধ ও দেহপিণ্ডে অনাহত নাদধ্বনি, কামসূত্রের অন্যতম প্রবক্তা [২১] এবং লোকবিশ্বাসে নন্দী। তথাপি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'বৃষভ শঙ্করালয়ে' <মহানির্বাণতন্ত্র ১৩.১২>।

২। **সর্প**॥ শিব সর্পভূষণ। সাপ তাঁর উপবীত জটা তাড়ঙ্ক ও কটিবন্ধনী। মাঝে মাঝে এটি তাঁর অস্ত্র হয়, আবার প্রতীকও। শিবসাধনার সঙ্গে নাগপূজার যোগ বিদ্যমান ; শৈব গোরক্ষসংহিতার নাগাধিপ হওয়ার মন্ত্রগুলি স্মরণীয়। বহির্ভারতে বৃষের মত সাপেরও অব্যাহত প্রাধান্য ছিল। মিশরে দেবদেবীর সর্প-অলংকার সর্পমূর্তি ও সর্পবলয়ের কথা জানা যায় [২২]। দায়োনিসস ছিলেন নাগভূষণ [২৩]। এশিয়া-ইউরোপের সর্বত্র সর্প উপাসনার বহুল প্রচলন ছিল [২৪]। কিন্তু সরস্বতী নদীবাসী আর্যরা সর্পপূজার বিরোধী ছিল। ঋগ্বেদে বৃত্রের অপর নাম অহি <৬.২০.২>। এথেকে অনেকে মনে করেন, 'বৃত্র' সর্পপূজারী একটি জাতি, ইন্দ্র-উপাসকরা এদের চিরশত্রু মনে করত [২৫]। শুক্লযজুতে সর্পনাশের উল্লেখ পাওয়া যায় [২৬]। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে <২৫.১৫> 'সর্পোৎসবের' বিধান দেওয়া হয়েছে। অবশেষে, জনমেজয়ের যজ্ঞস্থলে আর্যদের সর্প বা নাগজাতি-বিরোধিতার চূড়ান্ত রূপ ও সেই সঙ্গে আপোষের ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। আর্য সাধনায় সাপের অনুপ্রবেশ ঘটে প্রধানত শিবকে আশ্রয় করে। মহাভারতে দ্রোণপর্বে অর্জুন যে পাশুপতাস্ত্র লাভ করেন, তা ছিল যুগ্মসর্প। ক্রমে, বিভিন্ন দেবদেবীর অলংকার বা অস্ত্ররূপে সাপের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে, সর্পপূজা পুরাণে নাগকাহিনীর আকারে লিখিত হতে থাকে। প্রাচীন

মুদ্রায় বিভিন্ন সর্প-প্রতীক গৃহীত হয় এবং সারা ভারতে 'শ্রাবণী নাগপঞ্চমী' শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভ করে ব্যাপক আকারে দেখা দেয় [২৭]। ভারতের এই সর্প আরাধনার উৎস কেউ বলেন মগদ্বীপীয়, কেউ বলেন স্কাইদীয়। ভারতে এই প্রথা স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হয়ে শিব ও লিঙ্গের সাহচর্যে বিকাশলাভ করেছে, ক্রুকের এই ধারণা [২৮] অধিকতর সমর্থনযোগ্য। ভাণ্ডারকর মনে করেন, শিবের সর্পপ্রীতি আদিম অনার্য সর্পিল প্রভাবজাত [২৯]। সিন্ধুতীরে সাপের পূজা হত [৩০] এবং পশুপতি ছিলেন নাগ-জাতির উপাস্য দেবতা [৩১]। জীব-প্রাণিপূজার আদি উদ্যোক্তা আদি-অস্ট্রেলীয়রা ভারতে সাপের পূজার প্রচলন করে। অন্যান্য আর্যেতর জাতির দান ও আর্য মনন-শীলতা একে নব-রূপায়িত করে তোলে। এবং যে-যে কার্যকারণসূত্রে শিব বৃষবাহন, সেই-সেই পথেই তিনি হয়েছেন নাগভূষণ।

অ। সর্পভীতি মানুষের একটি চিরন্তন বৃত্তি। মানুষের কাছে তাই সে শত্রু, শয়তান, পরম শক্তির অসৎ ভাবজাত [৩২]। একদল তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে অমিত্র ব্যবধানে, আর একদল রত হয়েছে উপাসনার দ্বারা মিত্রতা সম্পাদনে। সাপের আত্মা কল্পিত হয়েছে; তাকে মৃত স্বজনের অতিলৌকিক দেহরূপ বা শব্দহীন কায়া, বাস্তুদেবতা, ভয়ংকর প্রমথ বলে পূজা করা হয়েছে। রুদ্র ভয়ংকরের দেবতা; সাপের অপ্রতিহত আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

আ। সাপ অন্যতম টোটেম। জীবিত আদিবাসীদের মধ্যে আজও এর স্মৃতি বহমান [৩৩]। একদা ভারতে সাপ একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর পরিচায়ক ছিল ঋগ্বেদের 'বৃত্রজাতি' ও পরবর্তীকালের 'নাগজাতি'-রূপে। আজ এই উপমহাদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে সর্প তথা মনসাদেবীর যে উপাসনা হয়ে থাকে, টোটেম-সাপের পূজা তার অন্তর্ভুক্ত।

ই। সর্প প্রধানতম যৌনপ্রতীক [৩৪]। প্রজননের সঙ্গে তার যোগের পরিচয় বাইবেলোক্ত স্বর্গোদ্যানের শয়তান-সর্পরূপের মধ্যে বিদ্যমান। মহাভারতে একই কালে সাপ ও লিঙ্গের পূজা প্রবর্তিত হয়। সায়ণাচার্যের 'শঙ্করবিজয়ে' দক্ষিণদেশে সর্পশোভিত 'কালহস্তীশ্বর' লিঙ্গের কথা জানা যায়। ভারতীয় মুদ্রায় লিঙ্গসহ সাপের ছবি অপ্রতুল নয় [৩৫]। দাক্ষিণাত্যে যুগ্মসর্পের প্রাচীরচিত্র খোদিত বা অঙ্কিত হয় সন্তান লাভের সাগ্রহ কামনায় [৩৬]।

ঈ। সাপ ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত: it was the cause of fertility...and became the embodiment of a fertility demon or earth-spirit [৩৭]। বৈদিক অহি ও বৃত্র বৃষ্টিনিয়ামক ছিল [৩৮]। ফা হিয়ান উত্তরপ্রদেশে শস্যবৃদ্ধির বাসনায় সর্পপূজার অনুষ্ঠান দেখেছিলেন [৩৯]। চীনের ড্রাগন জলদেবতা। বর্ষণ-সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে বৃত্রবধের অনুকরণে জাদুবিদ্যাঘনিষ্ঠ বিচিত্র অনুষ্ঠান আজও উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে

দেখা যায়। সর্পদেবী মনসা ও তাঁর প্রতীক সিজগাছ, ঘট, কোলের শিশুপুত্র এবং কথা-কাহিনীর দ্বারা প্রমাণিত হয়, সাপ ও মনসা কৃষি-প্রজননের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত[৪০]। সাপের 'খোলসছাড়া'-কে মৃত্যু ও নবজন্মের রূপক মনে করা হত। বুদ্ধের 'পরিনির্বাণ' এবং হলধারী বাসুকি বলরামের 'দেহরক্ষায়' সাপের ভূমিকা স্মরণীয়।

ঊ। এই কর্ষণ-প্রজননের মাধ্যমে সাপ শিবের সান্নিধ্য লাভ করেছে। শিব তাকে উপবীত করে গলায় পরেছেন, করেছেন দেহের অলংকার, সাপের রূপান্তরিত দেবীপ্রতিমা মনসাকে গ্রহণ করেছেন আত্মীয়ারূপে। এবং ক্ষীরোদ সাগরে 'সহস্র ফণায় আছে দেব মহেশ্বর' (কৃত্তিবাসী রামায়ণ : কিষ্কিন্ধ্যা)। তাই শিবের অন্যতম নামরূপ 'সংকর্ষণ'—অগ্নিমুখ মহাসর্প।

৩। **লিঙ্গ** ॥ শিবের প্রতীক লিঙ্গ। শিব ও শৈবধর্মের সঙ্গে লিঙ্গ ও লিঙ্গপূজার যোগ বহু প্রাচীন। প্রজননদেবতা শিবের প্রতীক প্রজনক লিঙ্গ[৪১]। কেউ কেউ আলপাইন নৃগোষ্ঠীর উপাস্য জনৈক শিশ্নদেবতাকে শিবের আদিরূপ বলে মনে করেন। কিন্তু সিদ্ধান্তটি যে ভারসহ নয়, আমাদের পূর্ব আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়েছে। তবে শিব-রূপের গঠনে 'শিশ্নদেবতার' অবদান অসম্ভব নয়। বহির্ভারতের প্রধান দেবতাদের সঙ্গে লিঙ্গ যুক্ত থাকত। দায়োনিসস ও ব্যাকাস দেবতার স্বর্ণলিঙ্গের উপাসনা হত[৪২]। ক্যানাইট ও পৌত্তলিক-য়িহুদী লিডীয়ান ফিনীশীয় প্রভৃতি জাতি লিঙ্গপূজা করত[৪৩]। ডঃ গ্রীন্‌স্‌বার্গ পৌরাণিক যুগের আব্রাহামের সময়েও লিঙ্গ উপাসনার প্রমাণ পেয়েছেন[৪৪]। বেদে লিঙ্গপূজার অসদ্ভাব নেই বলে অনেকে মনে করেন[৪৫]। কারও কারও মতে, সিন্ধুতীরের আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় লিঙ্গ উপাসনা করত এবং এই জন্যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ঘৃণার পাত্র ছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে, ঋগ্বেদে 'স্বধা-প্রযতি'র মিলনে পৃথ্বীর জন্মের যে কল্পনা করা হয়েছে <১০.১৯২.৫>, তাই লিঙ্গ-যোনির প্রতীক-প্রকাশ[৪৬]। কিন্তু ঋগ্বেদীয় আর্যদের মধ্যে লিঙ্গপূজা যে আদৌ ছিল না, এ সম্পর্কে অধিকাংশ মনীষী একমত। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে শিশ্ন-পূজকদের হাত থেকে রক্ষা করতে <৭. ২১. ৫। ১০. ৯৯. ৩>। যে শিশ্নদেব নরহত্যা ও নগরলুণ্ঠনে উল্লসিত হয়ে ওঠেন (ঐ), পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী তাকে সলিঙ্গ দেবতা নয়, সলাঙ্গুল দৈত্য বলে মনে করেন[৪৭]। কিন্তু ভাণ্ডারকর একে লিঙ্গ-উপাসক আদিম জাতির দ্যোতক বলেছেন[৪৮]। ডঃ দাস সপ্তসিন্ধুর উত্তর-পশ্চিমে যে লিঙ্গসাধক শিবজাতির অস্তিত্বের কথা বলেছেন[৪৯], তারা সম্ভবত এই আর্যেতর জাতি। দক্ষিণ ভারতের লিঙ্গায়েৎরা এখনও ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়। বস্তুত লিঙ্গ ও লিঙ্গাধিপতি দেবতা দুয়েরই অনার্য-উৎস[৫০]। আর্যেতর মণ্ডলীতে লিঙ্গপূজা ছিল সর্বজনীন—প্রথমে স্বরূপে, দ্বিতীয়ে প্রতীক হিসেবে, তৃতীয়ে অলংকার অস্ত্র বা বাহনরূপে[৫১]। তাই লিঙ্গ উপাসনাকে শুধু 'অবৈদিক

ধর্ম' ৫২ বললে তার পরিধিকে সংকুচিত করা হয়, বরং একে অনার্য সাধ্য ও সাধন বলা যেতে পারে ৫৩। সিন্ধু-সভ্যতায় লিঙ্গ ও যোনি উভয়বিধ উপাসনা যে বর্তমান ছিল ৫৪, এখানে একাধিক লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট থেকে তার সাক্ষ্য মেলে; অন্যদিকে ঊর্ধ্বমেঢ্র শিব একাধারে যোগ ও লিঙ্গপূজার সঙ্গে যুক্ত। মার্শালের মতে, এখানকার যৌনপ্রতীকগুলি পিতৃ-মাতৃ-দেবতার পরিবর্ত ৫৫। কিন্তু সিন্ধুতীরে এইজাতীয় বৈদেহী পিতৃমাতৃ-চেতনার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাই এদের প্রজনন-শক্তির উপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। মহেঞ্জোদড়োর ঊর্ধ্বলিঙ্গ যোগিমূর্তি যেমন দ্রবিড়ভাষীদের উপাস্য, লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট তেমনি অস্ট্রিকভাষীদের উপাসিত। জ্যাঁ প্শিলুস্কী 'লিঙ্গ' শব্দের মূল পেয়েছেন অস্ট্রিক ভাষার মধ্যে ৫৬। সিন্ধুতীরে উভয়ের মিশ্রণ ঘটেছিল।

অ। বস্তুপূজা, বৃক্ষ উপাসনা ইত্যাদি লিঙ্গপূজার অন্যতম উৎস ৫৭। দেবতারা ছিলেন 'বৃহস্পতি' ৫৮ তথা ওষধিপতি। দায়োনিসস ছিলেন বৃক্ষদেবতা এবং তাঁর স্মরণে 'মে-পোল' কল্পিত বাহিত ও পূজিত হত ৫৯। ভারতের বিভিন্ন স্থানের 'দণ্ডপূজা' আন্তর্জাতিক লিঙ্গপূজার অন্যতম আদিম রূপ। উত্তরভারতের 'ভীমগদা' বা 'ভীমলাট' এই লিঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়; বরদার 'লাট' প্রদেশে গদাধারী শিবের মূর্তি আছে ৬০। পর্বত-পূজাও লিঙ্গদেহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ৬১। বহির্ভারতে পর্বত উপাসনার প্রচলন ছিল ৬২। ভারতে সাঁওতালদের মারাং বুরু, কু-দের মৈবাঁত, মুণ্ডারী ও নাগবংশীদের বরদেও, হোসঙ্গাবাদের সূর্যভান, চামারদের পর্বতেশ্বর ৬৩, ভুবরাজপুরের পাহাড়েশ্বর লিঙ্গ এবং ভৈরোঁযতির বিচিত্র প্রস্তর-প্রতীক পার্বত্য উপাসনার প্রসারের স্বাক্ষর ৬৪।

আ। বিস্ময়রস আদিম মানবচিত্তের অন্যতম প্রথম স্থায়ী রস। জনন ও জন্ম-রহস্যকে কেন্দ্র করে তার এই বিস্ময়বৃত্তি আন্দোলিত হত। লিঙ্গকে তাই দেহের পবিত্রতম অঙ্গ বলে গণ্য করা হত ৬৫; এবং 'this creative organ became a symbol of the creator, and the object of worship among all nations of antiquity'। স্রষ্টা ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট নরনারী উভয় কোটির মিলনকে লিঙ্গ ও যোনির প্রতীক মাধ্যমে রূপ দেওয়া হত ৬৬। বিবাহে উৎসবে এইসব প্রতীক বহন ও উপাসনা করা হত। এসম্পর্কে ভলতেয়ারের উক্তি স্মরণীয়: 'The first thought was to honour the deity in the symbol of life and that custom was introduced in times of simplicity'। আদিতে প্রতীকটি ছিল স্বরূপে, সরলমনা মানুষের বলিষ্ঠ মানসের প্রকাশ ও বাস্তব জীবনসংগ্রামের অনিবার্য হাতিয়াররূপে। ক্রমে লিঙ্গযোনির ধারণা তত্ত্বমূলক হয়ে ওঠে, এমন-কি 'ত্রিদেবে' রূপান্তরিত হয় বলেও অনেকে মনে করেন।

ই। ইয়ুং যখন আদিম নরনারীর অবদমিত যৌন বাসনার অণুপরমাণুর সন্ধান

পান এই প্রতীক দুটির মধ্যে ৬৭, আমরা তখন তাকে একদেশদর্শী ও আরোপিত ব্যাখ্যা বলে মনে করি। লিঙ্গ শুধুই যৌনায়নের বস্তুরূপ নয়, কৃষিকার্যের, শস্য উৎপাদনের ও ভূমির উর্বরতাবৃদ্ধির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতম যোগ বিদ্যমান ছিল। যৌনবৃত্তি আরোপিত হয় অনেক পরে। মধ্যযুগের মিস্টিক সাধনায় যৌন সম্বন্ধের ইঙ্গিতকে রূপকমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সাধ্যবস্তুর প্রতি সাধকের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে। 'লিঙ্গ' ও 'লাঙ্গল' দুটিই অস্ট্রিক শব্দ এবং দুয়ের মূল এক। আদিম যুগে লিঙ্গের মত এক ধরণের পাথরের অস্ত্র মাটিখোঁড়া ও কৃষিকাজের জন্যে ব্যবহৃত হত। বৃক্ষ এবং দণ্ডও কৃষির সহায়ক ছিল। অস্ট্রেলিয়ার এক আদিম গোষ্ঠী মাটিতে গর্ত করে দণ্ড দিয়ে তাতে আঘাত বা মন্থন-রূপ জাদুবিদ্যা ও সেইসঙ্গে নৃত্যগীত ভূমির উর্বরতাসাধনের দ্যোতক ও সহায়ক বলে মনে করত ৬৮; অনেকে শস্যসমৃদ্ধির আশায় ক্ষেতে লিঙ্গ পুঁতে দিত। উত্তর ভারতের (পবননন্দন ও দণ্ড তথা গদাধর) ভীম বর্ষণ-অধিপ ছিলেন। স্কন্দপুরাণে <চতুরশীতি লিঙ্গমাহাত্ম্য ২৩'৪৪> 'বৃষ্টিদায়ক লিঙ্গ' থেকে মেঘ বেরিয়ে বর্ষণের সূচনা করত বলে উল্লেখ আছে। আমাদের গাজন-গম্ভীরার চড়ক অনুষ্ঠান কৃষি উৎসব ৬৯; এখানেও মাটিতে দণ্ড পুঁতে মন্থনক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৌনাচার অভিনীত ও দেবদেবীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অনেক স্থানে, উত্থিত দণ্ডটিকে পুরুষ ও শায়িত দণ্ডটিকে স্ত্রী ('বাবা আদম' ও 'মা গাদম্') কল্পনা করা হয়। চড়কের ঘূর্ণী সূর্য ও পৃথিবীর যৌন মিলনকে দ্যোতিত করে; চড়কগাছ তখন লিঙ্গোপম; উভয়ের মিলনে শস্যরূপ নবজাতকের জন্মসম্ভাবনার কামনা প্রকাশ করা হয়। দক্ষিণ ভারতেও সমজাতীয় অনুষ্ঠান-উৎসব লক্ষিত হয়। মারিয়া গোন্দরা আজও গ্রামদেবতাকে দুখণ্ড কাঠের প্রতীকে পূজা করে ৭০ এবং এদের সাহায্যে বারিপাতনের কামনায় অভিনব জাদুবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঈ। কুমারীত্বক্ষয়ের উদ্দেশ্যে ও পুত্রকামনায়, রোগনিবারণার্থে ও বর্ষণবাসনায়, শস্য বপনে ফলনে ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় লিঙ্গ-যোনিপূজা ও বিচিত্র যৌনাচারের প্রয়োগপ্রথা প্রচলিত ছিল (এবং এখনও আছে)। মাঠে লাঙ্গল দেবার আগে ও বীজ ছড়াবার পরে এই যে দুয়ের মিলন-অভিনয় ও প্রতীকপূজা—এই দ্বৈতের ধারণা পুরুষ ও স্ত্রীর নির্বিশেষত্ব থেকে বিশেষ দেবতাদের আশ্রয় করে; তখন দেবদেবীর যুগল রূপ কল্পিত হয়: তার ফল শিব-শিবানী এবং শিব ও লিঙ্গে, গৌরী ও পট্টে অভেদ মিত্রতা। শুধু ধর্ম ও সাধনায় নয়, এই দ্বৈত তত্ত্ব সাহিত্যে সংগীতে ছন্দে তালে লয়ে শিল্পে আয়ুর্বেদে গণিতে অধিকার বিস্তার করতে থাকে। সেই সঙ্গে শিব-শিবানীও এগুলির মধ্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন ভেদরহিত পার্বতী-পরমেশ্বররূপে—প্রতীকচিহ্নে <ঁ> যা চিত্রায়িত, সাংকেতিক শ্লোকে <চন্দ্রার্ধবিন্দু-সংযুক্তা কামবীজমিতীরিতম্ ৭১> যা রূপায়িত, রূপময় প্রতিমূর্তিতে <অর্ধনারীশ্বর> যা প্রতিমায়িত। প. শিলুস্কী যথার্থই বলেছেন: It is more probable that

the Aryans have borrowed from the aborigines of India the cult of Linga as well as the name of the Idol ১২।

ঊ। ওপার্ট, ম্যাকডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে, বৈদিকোত্তর যুগে আর্য কর্তৃক লিঙ্গপূজা গৃহীত হয় ১৩। শুক্লযজুতে <৩.৩৬>, 'নিবর্তয়া ম্যাথুযে প্রাত্যায় প্রজননায় বায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্যায়' এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে <৪.১১> 'যো যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠতি' ইত্যাদি শ্লোকে এই স্বীকৃতির স্বাক্ষর ফুটে উঠতে লাগল। মনস্তত্ত্ববিদ্ ইয়ুং উপনিষদের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ও অপাণিপাদ রুদ্র-ব্রহ্মেও <অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা—শ্বেত ৩'১৩> লিঙ্গশরীর আবিষ্কার করেছেন: Who this Tom-Thumb is can easily be defined—the phallic symbol of the libido ১৪। প্রাথমিক বিরোধিতা-অন্তে আর্য সাধনায় শিব ও লিঙ্গের যোগকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তখন রুদ্রশিব একদিকে প্রজনন-দেবতা অন্যদিকে যোগিরাজ, একদিকে লিঙ্গেশ্বর অন্যদিকে 'যতীনাঞ্চ মহেশ্বরং'। অর্থাৎ লিঙ্গ উপাসনা গৃহীত হল, কিন্তু কর্ষণ-প্রজননের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয়, প্রয়োজনাতীত দার্শনিক চিন্তায় অভিষিঞ্চিত করে। সিন্ধুতীরের ঊর্ধ্বমেঢ্র মহাযোগীর উত্থিত লিঙ্গকে বীর্যস্তম্ভের দ্যোতনা ধরে নিয়ে স্ত্রী-সংসর্গত্যাগী বীর্যস্তম্ভিত এক যতিধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হতে লাগল। প্রজননদেবতা হলেন সৃজন-অক্ষম যতী। শক্তির আধারটিকে নিজেই বিনষ্ট করে সৃষ্টির ভার তুলে দিতে হল আর্যদেবতার হাতে। যিনি স্বয়ং পুত্রদ তাঁর একটি সন্তানও স্বাভাবিকভাবে জাত হল না। অগ্নি রুদ্রে লীন হলে শিবের প্রতীক লিঙ্গ হল জ্যোতির্লিঙ্গ ১৫—ত্রিভুবনবিদারী, কিন্তু সৃজনক্ষমতাবিরহী। যা ছিল ইন্দ্রিয়-রূপ, তা পরিণত হল নির্গুণ স্বরূপে।

বলা বাহুল্য, শিব-লিঙ্গের এই পরিণতি আর্য ভাবনার নিজস্ব সীমায়। আর্যেতর বিপুল জনসমুদ্রের সমাজচেতনায় শিবলিঙ্গ তার আদিম পরিচয়সহ সমাদরে লালিত হতে থাকল এবং আর্য দৈবচিন্তায় বারবার ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করল। কালক্রমে 'লিঙ্গশরীর' সশরীরে সমাজচিন্তার সকল স্তরে বিরাজিত হল। ধর্মসংহিতা বায়বীয়-সংহিতা সুত-সংহিতা নারদপাঞ্চরাত্র নন্দিপুরাণ শিবপুরাণ লিঙ্গপুরাণ স্কন্দপুরাণ মহানির্বাণতন্ত্র লিঙ্গার্চনতন্ত্র রুদ্রযামলতন্ত্র শৈবসিদ্ধান্তসার সিদ্ধান্তশেখর ইত্যাদি শাস্ত্র আশ্রয় করে লিঙ্গের এক বিরাট ও বিচিত্র ইতিহাস গড়ে উঠল। 'লিঙ্গধর্ম' একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করল। সপ্তম শতাব্দী থেকে তার সূত্রপাত, একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের 'বীরশৈব-লিঙ্গায়েৎ'দের আবির্ভাব ও পরশতাব্দীতে 'বসব পুরাণ' লিখিত হল। লিঙ্গ একদিকে লাভ করল ব্রহ্মস্বারূপ্য, অন্যদিকে সংখ্যাহীন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের পথে প্রান্তরে ও পথের প্রান্তে। মহাভারতীয় উপমন্যু-কাহিনীতে স্ত্রীজাতিকে পার্বতীর অংশজাতা তাই 'যোনিচিহ্নিত' এবং পুরুষজাতিকে মহাদেবের অংশসম্ভূত তাই 'লিঙ্গায়ত' বলে বর্ণনা করা হল ১৬। এই ধারণা বৌদ্ধ-

শৈব শাক্ত সাধনরীতিকে গতিবেগ দিল। বিভিন্ন শৈব-শাক্ত সম্প্রদায় শিববেশ ও তাঁর প্রতীক ধারণ করল। নাথপন্থী শৈব বীরশৈব কাণফট যোগী প্রভৃতির দেহে লিঙ্গ (-যোনি) অলংকাররূপে শোভা পেল। ক্রমে শৈবধর্ম ও লিঙ্গধর্ম, শিবপূজা ও লিঙ্গপূজা, শিব ও লিঙ্গ বিবর্তনের পথে এমন এক বিন্দুতে উপনীত হল, যেখানে শিবতনু-ব্রহ্মতনু-নাদতনু-লিঙ্গতনু অভেদ হয়ে গেল। বিশুদ্ধ যোগশাস্ত্র লিঙ্গযোনি উপাসনার সাহচর্যে পরিণত হল মিশ্র হঠযোগে। লিঙ্গযোনি বিভিন্ন বিচিত্র আকার নিয়ে দেখা দিল—ত্রিশূল পঞ্চশূল পর্বত অর্ধচন্দ্র চন্দ্রবিন্দু ত্রিকোণ বিন্দুমণ্ডল মহাদেবপীঠ গৌরীপীঠ ইত্যাদি রূপে। সমকালীন ভারতীয় মুদ্রায় সেগুলি মুদ্রিত রূপ পেল রাজকীয় আনুকূল্য লাভ করে ৭৭। শিব হলেন লিঙ্গ, লিঙ্গ শিব।

৬। ইতিহাস-দর্শন

ঋগ্বেদের ঝঞ্চার দেবতা 'রুদ্র', আর্যেতর কৃষির প্রমথ 'শিব' এবং সেইসঙ্গে আরও অন্যান্য প্রমথ-দেবতা মিলিত হয়ে কিভাবে ভারতশিবের রূপপ্রমূর্তি গঠিত হয়ে উঠেছে, সেই গঠন-ইতিহাসের মৌল উপাদানগুলি আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। ক্রমবিকশিত বিবর্তনের পথে দেশ কাল ও পাত্রের যোগাযোগে তাঁর যে প্রসারণ ও প্রসাধন, তা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। তবে ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বৃত্তময় ও বিবর্তময় শৈব ইতিহাসের বিস্তৃত চিত্রটি সংক্ষেপে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে

অ। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির সংঘাতে-সংশ্লেষে নিরন্তর রূপায়িত ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, ভারতের জীবন ও মনন, সমাজ ও চিন্তা, ধর্ম ও দেবতা, শিল্প ও সাহিত্য। এই অগ্রস্থত আন্দোলনে দোলায়িত হয়েছেন উপাস্য দেবতা শিব। তাঁর প্রাচীনতম প্রকাশলীলা প্রাগার্য সংস্কৃতিতে। প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন, বিরুদ্ধ প্রকৃতি এবং বেঁচে থাকার তীব্র তাগিদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেদিনকার সংগ্রামী ও মাটিঘেঁষা মানুষ স্ব স্ব পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী জাদুবিদ্যাশ্রিত কৃত্য ব্রত মন্ত্র কথা নৃত্য গীত শিল্প ও প্রমথ-প্রমথিনীর পরিকল্পনা করেছিল। অনুষ্ঠানগুলি পরিচালিত হত শস্য-শিশু-শাবকের স্বাস্থ্য-সংখ্যা-সমৃদ্ধির কামনায়। এই আর্যেতর সংস্কৃতিলালিত শিবন্ শেম্বু চেম্পূ অয্যপ্প মহাকাল ভৈরোঁ বটুক—জাতীয় প্রাগার্য প্রমথগণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল শিবের অন্যতম আদিমূল। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং দেবতাবৃন্দ পরস্পর মিলিত হয়েছে, দেখা দিয়েছে মিশ্র সংস্কৃতি, প্রমথ-শিব উত্তীর্ণ হয়েছেন শিব-প্রমথেশে। মূলত দ্রবিড়ী হলেও সিন্ধুসভ্যতা (খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০-২৫০০ অব্দ) এই রকম একটি মিশ্র সংস্কৃতি। এখানকার যোগিরাজ ও লিঙ্গ

শৈব ইতিহাসের অন্যতম উপাদান। খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে ভারতে আর্যরা প্রবেশ করে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সান্নিধ্যে রুদ্র ও শিব-প্রমথেশ মিলিত হলেন, গতি পেল দেবতার ইতিহাস—যার আদিতে রুদ্র, মধ্যে রুদ্র-শিব, অন্তে শিব।

'ভারতে আর্যরা প্রথমে ছিলেন বনচারী, তারপরে ক্রমে হলেন পল্লীবাসী, পুরবাসী। প্রথমে ধেনু ছিল তাঁদের ধন, পশুচারণ ছিল তাঁদের জীবিকা' ১। এই স্তরে আর্যসমাজ ছিল শ্রেণীহীন 'গণের', কর্ম ও ভাবনা ছিল সমষ্টিগত, দেবতা ছিল প্রত্যক্ষ জীবন ও প্রকৃতি, যজ্ঞ ইচ্ছাপূরণের অনুষ্ঠান, মন্ত্র পার্থিব কামনার ভাষারূপ। 'মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্যনৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা' ২। এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করেছে, ভারতের আর্য-অনার্যরাও—'দুজনেরই সম্পর্ক যে পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে, এবং দুজনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ, ধনধানসৌভাগ্য স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস' ৩, তাই 'দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা' ৪। অন্নপ্রাচুর্যের কামনাজাত জাদুকৃত্যের উৎসসন্ধানে আমরা আর্যেতর সংস্কৃতির দ্বারস্থ হয়েছি; একদিন আর্যদেরও এই পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছিল, জন্মলগ্নেই তারা দার্শনিক ছিল না। অতএব দেবতার জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম উপকথার সবটাই ভারতে নিবাসী অনার্যের দান নয়, প্রবাসী আর্য সমাজেও এগুলি কোন-না-কোন আকারে একদা বিদ্যমান ছিল। বৈদিক মন্ত্রে যজ্ঞে শাস্ত্রগ্রন্থে এই লৌকিক বিশ্বাস-বাসনার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে, কোথাও স্বরূপে, কোথাও রূপান্তরিত, কোথাও-বা রূপকায়িত হয়ে। উন্নত দার্শনিকতা এদের দিয়েছে তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি, শিল্পিমন দিয়েছে বিকশিত সৌন্দর্য, যখন 'রণজয়ী ক্ষত্রিয়রা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশু সম্পদের স্থানে কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন ৫।

ঋগ্বেদে (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—১০০০ অব্দ) রুদ্র মরুৎপিতা, বিদ্যুৎগর্ভ ঝঞ্ঝাবাত্যার দেবতা। চন্দ্র বৃষ জটা নীললোহিত্য প্রভৃতি তাঁর রূপলক্ষণ, পশুপালন সন্তানরক্ষা গর্জণ বর্ষণ ইত্যাদি তাঁর গুণলক্ষণ। অনার্য শিবের সঙ্গে মিলনে তাঁর পরিধি বিস্তৃত এবং রূপ-গুণ জটিল হয়ে উঠল। অথর্ববেদে তিনি মহাদেব ও ব্রাত্য দেবতা, নরবলি যাগ ও মৃত্যুর সাহচর্যে ভীষণ। যজুর্বেদে তিনি ভয়ংকর; তাঁর ক্রোধশান্তির জন্যে রচিত হয়েছে আগ্নেয় মন্ত্র ও সজল প্রার্থনা। তিনি চোর ডাকাত পথিক অন্ত্যজদের দেবতা, পর্বতপতি ক্ষেত্রপতি বনস্পতি বণিকপতি। তিনি শিব, অম্বিকা তাঁর ভগিনী ও সহচরী। রুদ্রের জীবনে আর্যেতর প্রভাব যত বাড়তে থাকে, তাঁর আর্যত্বের ভাব তত কমতে থাকে। ব্রাহ্মণ-কর্মকাণ্ডে তাঁকে একদিকে পরিশোধিত করে বৈদিক রীতিনীতির অনুকূল করে তোলার চেষ্টা সুরু হল, অন্যদিকে তাঁর ক্রূররূপকে যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস দেখা দিল। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সফল হল না। আর্য-অনার্য সভ্যতার সংগমে আবির্ভূত

হলেন 'রুদ্র-শিব', নিজ শক্তিতে তিনি যজ্ঞভাগের অধিকারী হলেন, যোগিরাজ মহামাতা লিঙ্গ যোনি ইত্যাদির উপাসনা 'রুদ্রপূজার' অঙ্গীভূত হল। গণসমাজ থেকে আর্যসভ্যতা উপনীত হল শ্রেণীসমাজে (খ্রীঃ পূঃ ৭ম-৮ম অব্দ)। আর্যাবর্তের 'নদীলালিত প্রশস্ত সমভূমির উপরে কুলপতিশাসিত গোষ্ঠীগুলি রূপান্তরিত হয়ে নগরপতিশাসিত রাজ্য আকারে চাক বেঁধে উঠতে লাগল' ৫। ধর্ম হল দর্শনধৃত, উগ্রতা শান্তরসের অভিমুখী। উপনিষদে রুদ্রশিবের উল্লেখ করা হল। অতঃপর মাতৃকাদেবতা এলেন রুদ্রের সহচরী হয়ে। শ্বেতাশ্বতরে রুদ্রশিব পরমব্রহ্ম, প্রকৃতি তথা শক্তিসহ বিরাজমান। মৈত্রায়ণী উপনিষদে তিনি আত্মা, গায়ত্রী মন্ত্রে ভর্গ, প্রশ্নোপনিষদে প্রজাপতি। অন্যদিকে, লোকায়ত প্রভাবে যোগ ও ভক্তিবাদ আশ্রয় করল শিবকে। তিনি হলেন পরমেশ্বর, প্রার্থনা পূজা আরাধনা আত্মনিবেদনে নিকটগম্য। আর্যেতর সৃষ্টিতত্ত্ব দৈবচক্র কাহিনী কৃত্যাদি রুদ্রশিবকে আশ্রয় করে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। সূত্রগ্রন্থে (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—২০০ অব্দ) তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ও হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে ভবানী শর্বাণী ঈশানী রুদ্রাণী তাঁর সঙ্গিনী, বোধায়ন ধর্মসূত্রে স্ব-পত্নী। বিনায়ক ও স্কন্দের সঙ্গে যোগ দৃঢ় হল। গৃহ্যসূত্রে শিব শংকর নামগুলি আরও প্রচলিত, মূর্তিপূজা ও লিঙ্গ উল্লিখিত এবং আর্যেতর 'রুদ্রযজ্ঞ' বিহিত হল। ক্রমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র হলেন ত্রিদেব-তত্ত্ব। উন্নত মনন, যোগ ও ভক্তিরসের অভিষেকে রুদ্র হলেন শিব—শুধু নামান্তর নয়, অর্থান্তরও। আর্য রুদ্র ও অনার্য শিব উভয়েই ছিলেন শান্তোগ্র দেবতা—ভয়ংকর ও কল্যাণকর; আর্যায়িত শিব হলেন শান্ত ও মঙ্গল, অন্যান্য নামগুলি হল তাঁর প্রতীকীবিশেষণ। এই বিবর্তনের মূলে যেমন আর্য দার্শনিকতা ও বৌদ্ধ ধ্যানময়তা, তেমনি অনার্য অবদানও কম নয়। ভারতসংস্কৃতিভূমিতে পরমদেবতারূপে চিরস্থায়ী হলেন শিব—যিনি 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্', যিনি 'চিদ্রূপাহ্লাদপরমঃ', যিনি 'শক্তি-শক্তিমৎ সামরস্যাত্মা'।

বৌদ্ধ দীঘনিকায় ত্রিপিটক ও জাতকে শিব উল্লিখিত হলেন। পাণিনি 'বাগীশ্বর-মহেশ্বর' সূত্র রচনা করলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া গেল তাঁর মন্দির নির্মাণের কথা। রামায়ণে তিনি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর দেবাদিদেব। তাঁর প্রাচীন ও নবীন উভয়রূপের সেতুরচনা হল। তিনি এখন দার্শনিকের কাছে সুদূরের তত্ত্ব, ভক্তের কাছে অদূরগম্য, যোগীর আরাধ্য ধন। শিবের ঘরণী রুদ্রাণী উমা পার্বতী। গড়ে উঠল কথা দুজনকে ঘিরে। মহাভারতে শৈব ভাবনা প্রসারিত বিস্তৃতি পেল; তিনি দর্শনের পরব্রহ্ম, ভক্তি-অধীন ঈশ্বর, রুদ্র হয়েও কল্যাণের দেবতা। শৈব যোগসাধনা 'পাশুপত ব্রত' নামে ও রূপে বিধিবদ্ধ, লিঙ্গপূজার মাহাত্ম্য স্বীকৃত এবং শিব-পার্বতীর মাধ্যমে দাম্পত্য আদর্শ রূপায়িত হল। জনপ্রিয় শিবপূজা ও শিবকথার বিভিন্ন সংস্করণ হল। খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম থেকে শিব-শিবানী বন্দিত হতে থাকলেন ধ্রুপদী সাহিত্যে শাস্ত্রে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক,

ভরতের নাট্যশাস্ত্র, মনুস্মৃতি ও বাৎস্যায়নের কামসূত্রে তার স্বাক্ষর রইল। কুশান গুপ্ত ও অন্যান্য রাজাদের মুদ্রায় লিপিলেখে রচিত হল স্তোত্র ও চিত্র। কালিদাস প্রভৃতি তাঁদের স্থান দিলেন বন্দনা মঙ্গলাচরণ নান্দীতে—বিক্রমোর্বশী অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ মালবিকাগ্নিমিত্রের শিবপ্রশস্তি, মেঘদূতমে উল্লিখিত ভৈরবের তাণ্ডব নৃত্য, কুমারসম্ভবমের দিব্য প্রণয়গাথা, আর রঘুবংশমের : 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।' পৌরাণিক যুগে উপনীত হলেন শিব।

আ। পুরাণ আর্য অনার্য সংস্কৃতির সার্বিক সমন্বিত মিলনের বিচিত্র রূপ। শিব-বিষ্ণু-শক্তি এখানে প্রধান দেবতা। এই ত্রিদেবের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও নিগূঢ় মিলন পাশাপাশি বিদ্যমান—শিব-বিষ্ণুর অভেদে 'হরিহর', শিব-শক্তির অভিন্নতায় 'অর্ধনারীশ্বর', বিষ্ণু-যোগমায়ার ভেদহীনতায় 'বৈষ্ণবী-শক্তি'। পুরাণে শৈব দর্শনতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বিবৃত ও যোগপথিক 'মাহেশ্বর' সম্প্রদায় শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হল, মুখ্য স্থান লাভ করল ভক্তি। শিব হলেন উমানাথ কল্যাণ, শিবানী কল্যাণী হরপ্রিয়া, কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁদের সন্ততি। অন্যদিকে প্রলয়ী শিবের ভয়ংকরত্বের আভাস রইল চণ্ড-ভৈরব-মহাকাল-বাম ইত্যাদির মধ্যে। নকুলীনের প্রচেষ্টায় শৈবমত সুপ্রতিষ্ঠিত হল, শিবের উপাসনাবিধি ও বিভিন্ন প্রতিমার রূপকল্পনা বিহিত, প্রাত্যহিক ও সাময়িক শিবপূজা ও শৈবব্রত শাস্ত্রবদ্ধ হল। তন্ত্রে শিব অন্যতম পরম তত্ত্ব। আর বিকশিত তিনি আখ্যানে। বেদ উপনিষদে যে সব 'কথা' ছিল গুণ ও ক্রিয়াবাচক ভ্রূণরূপে, রামায়ণ-মহাভারতে সেগুলি আকারলাভ করল, পুরাণে পেল পূর্ণ যৌবন। একদিকে তত্ত্ব ও মন্ত্র, অন্যদিকে কথা ও কাহিনী ; অষ্টোত্তর সহস্র নামের মালা দুলে উঠল রজতগিরি-শিবের সুনীলকণ্ঠে। প্রতিটি নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছোটবড় নানা ইতিহাস অপরূপ কথামালা হয়ে। এখানে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হচ্ছে।

শিব 'নিরঞ্জন নিরাকার' : শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শিব ব্রহ্ম ৭ ; তিনি মায়াধীশ 'নেয়ং যোষিৎ ন চ পুমান্' ৮ ; কৈবল্য উপনিষদে তিনি 'অপাণিপাদোয়মচিন্ত্যশক্তিঃ' <২১> ; শারদাতিলকে 'নির্গুণসগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ' <১.৬> ; নারদীয় সূক্তধৃত শূন্যভাবনা ও ঔপনিষদিক নিরঞ্জন ব্রহ্মধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিব হয়েছেন নিরঞ্জন ব্রহ্ম ; কালক্রমে বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও নিরঞ্জনতত্ত্ব এবং আরও পরে ইসলামী শূন্যরূপী ঈশ্বরত্ব তাঁর নিরাকারত্বের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শিব 'মুক্তিদাতা' ও 'মোক্ষপ্রদ' : কেনোপনিষদের পাশমুক্তির সাধনা শৈব আচারের অন্তর্গত ; শ্রীনীলকণ্ঠের টীকায় <২৮> বলা হয়েছে, 'রুৎ' অর্থাৎ দুঃখ-অজ্ঞানতা-মায়া 'দ্রু' বা ধ্বংস করেন যিনি তিনিই রুদ্র ; মায়াপাশ থেকে মুক্ত করে তিনি মোক্ষ দান করেন ; শুক্লযজুর্বেদীয় 'রুদ্রাধ্যায়' মুক্তিকামী শৈবদের অবশ্যপাঠ্য, তাঁর অনুগ্রহে সাধক 'পশুজ্ঞান' থেকে মুক্তি অন্তে 'পতিজ্ঞান' লাভ করে ; জীব শিব হয় <স্কন্দ উঃ

৬.১০> ; বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হন মহাদেবের প্রসাদে <মহাভারত শল্য ১৮.১৬, ১৭>। শিব 'প্রসন্নবদন আশুতোষ' : ঋগ্বেদে রুদ্রের ক্রোধশান্তির জন্যে মন্ত্র উদ্‌গীত হত ; ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে সাধকের হৃদয়ভাবের ক্রমরূপান্তরে, ভারতীয় জীবন ও মননের ক্রমশীতল স্পর্শে তিনি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে উঠলেন, বৌদ্ধ-জৈন ভাবনা তাঁকে আরও স্থিরত্ব দিল ; উগ্র বাত্যাদেবতা ও রুষ্ট রক্তদেবতা হলেন দর্শনের তত্ত্ব উপাস্য ব্রহ্ম। তাঁর এই শান্তরূপ ব্যক্ত হয়েছে কৌষীতকি ও শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে ; ভরতের 'শিবং কল্যাণং বিদ্যতেঽস্য শিবঃ স্যেতি অগুভমিতি বা। শেরতেঽবতিষ্ঠন্তে অণিমাদয়োঽষ্টগুণাঃ অস্মিন্ ইতি শিবঃ' ৯—উক্তির মধ্যে রুদ্রের যে কল্যাণসুন্দর শিবত্বের প্রকাশ, কাব্যে চিত্রিত হয়েছে তার প্রসারিত রূপচ্ছবি। শিব 'জটিল' : ঋগ্বেদে বাত্যাতাড়িত মেঘের প্রতিভাসে এবং অনার্যত্বের আভাসে রুদ্র কপর্দী ও কেশিন্ ১০ ; বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, রামায়ণ ও পুরাণে তাঁর জটাকলাপ যোগিবেশরূপে বর্ণিত হয়েছে। শিব 'নীলকণ্ঠ' : ঋগ্বেদে রুদ্রের অগ্নিত্বকে ১১ যাস্ক ও সায়ণাচার্য স্বীকার করেছেন, অগ্নির নীলিমা শিবকণ্ঠে আগত ; যজুর্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ে সূর্যের লোহিতাঙ্গে কৃষ্ণচিহ্ন ও মেঘের কোলে বিদ্যুৎ থেকে নীলকণ্ঠ প্রাপ্তির উপমা আহৃত হয়েছে ; নীলরুদ্র উপনিষদে রুদ্র নীলগ্রীব ; এ সম্পর্কে মহাভারতে দুটি বিভিন্ন কাহিনী দেওয়া হয়েছে—শান্তিপর্বে, নারায়ণ রুদ্রের কণ্ঠদেশ ধারণ করেছিলেন বলে তিনি নীলকণ্ঠ এবং অনুশাসনপর্বে, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতকে তাঁর কণ্ঠনীলিমার কারণ বলা হয়েছে ; 'শিবতাণ্ডবস্তোত্রে' বিবৃত হয়েছে, বিষপায়ী শিবের কণ্ঠ পার্বতী রোধ করাতে তাঁর কণ্ঠ নীল হয়, আর পুরাণে বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর সমুদ্রমন্থনজাত বিষপানের জনপ্রিয় কাহিনী। শিব 'সাংগীতিক' ও 'নৃত্যবিদ' : ঋগ্বেদে <১.৪৩.৪> এবং ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে তাঁর সংগীত-প্রতিভা স্বীকৃত হয়েছে, শিবতাণ্ডবস্তোত্রে স্বীকার করা হয়েছে তাঁর নৃত্য-দক্ষতা ; ঝঞ্ঝামদমত্ত রুদ্রের গর্জন ও নর্তন বিচিত্র কল্পনার সরণি বেয়ে অপ্রমত্ত শান্ত শিবকে করে তুলেছে সংগীত ও নৃত্যশিল্পী ; তখন তাঁর নটরাজ মূর্তিতে ফুটে উঠেছে রৌদ্র রাগিণী ; ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শিব আদিনট <১.৪৫>, পরমেশ্বর <১.১> ; পরবর্তী ভারতীয় সংগীত-নৃত্য শাস্ত্র তাঁর নাদতনু ও নটতনুকে দার্শনিক তত্ত্বলোকে নিয়ে গেছে ; পুরাণে ১২ শিবের এই নৃত্যগীতের উল্লেখ হয়েছে বহুবার ; তিনি বেদধ্বনি-হরিধ্বনি গান করেন ভক্তরূপে, তাঁর গীত শুনে নারায়ণের দেহবিগলন ও গঙ্গার আবির্ভাব। শিব 'স্থাণু' : ভারতের উত্তরে অতন্দ্র প্রহরী হিমালয়, তার কোলে কৈলাস, রুদ্রশিব বাস করেন সেখানে ; শুধু আবাসস্থান নয়, হিমালয়ের মতই তিনি বিরাট মহৎ ও সর্বলোকাশ্রয় ; এই দৃষ্টিতে শিব কল্পিত হয়েছেন স্থাণুরূপে ; কিন্তু বায়ুপুরাণের ব্যাখ্যা <১০.৬৪>—সৃষ্টির পর শিব তপস্যার্থে প্রলয় অবধি স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব 'ত্রিপুরারি' : বেদের রুদ্র 'রুদ্রপি ত্রিপুরদহনং'১৩ ; বৈদিক 'পুর' ত্রি-পুরে ও ক্রমে ত্রিপুরাসুরের পুরীতে

পরিণত হয়েছে ; তার মধ্যে মহাভারতের (কর্ণপর্ব) ত্রিপুরধ্বংস বর্ণনার কাব্যসৌন্দর্য উল্লেখ্য ; পুরাণেও শিব ত্রিপুরাসুরের অরি ১৪ ; কিন্তু এখানে সর্বাধিক বর্ণিত হয়েছে বাণাসুরের কাহিনী ১৫ ; হয় ত্রিপুরদহনকাহিনী বাণাসুর কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, অথবা এটি একটি নবতর ও জনপ্রিয়তর আখ্যায়িকা। শিব 'কপালী' : তিনি ব্রহ্মার কপাল ছিন্ন করেন, সেই কপাল তাঁর হাতে সংলগ্ন থাকে, কাশীতে এসে তিনি মুক্ত হন ব্রহ্মহত্যা থেকে—'ততঃ কপালী লোকেশখ্যাতো রুদ্রো ভবিষ্যতি' ১৬ ; মহাভারতে <অনুঃ> শিব কাপালিক ; তন্ত্রে মৃত্যুর অধিদেবতারূপে তিনি মহাকাল কপালী ; পৌরাণিক কথার অনুরূপ আখ্যান কথাসরিৎসাগরে আছে, অবশ্য শুধু গল্পরসরূপে ; পুরাণের কাহিনী ভক্তিরসসিঞ্চিত, কাশীশ্বর শিবের মহিমা ও কাশীমাহাত্ম্যের প্রচার তার অন্যতম উদ্দেশ্য১৭ ; মহাভারতের কাপালিক-রূপ সম্প্রদায়কল্পিত, তন্ত্রের মহাকাল আদিম প্রমথকে স্মরণে আনে। পুরাণবর্ণিত শিবের 'গঙ্গাধারণ' কাহিনীও অত্যন্ত জনপ্রিয় : শিব ও গঙ্গার ঘনিষ্ঠতার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি ; গঙ্গার তীরে তীরে শৈবতীর্থ এবং সর্বতীর্থসার কাশী ; তাই শিব-গঙ্গার কাহিনী ভারতবাসীর মনকে ভক্তিভাবে আপ্লুত করেছে। কিন্তু পুরাণগুলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক বর্ণিত হয়েছে 'দক্ষযজ্ঞ' কাহিনী : আখ্যানটি আর্য-অনার্য সংঘাতের, শিব ও আর্যদেবতাদের সংঘর্ষের রূপক-রূপ ; কিন্তু তাকে অতিক্রম করে রৌদ্র-বীররসে অদ্ভুতে-বিস্ময়ে পাতিব্রত্যে-পত্নীপ্রেমে হাস্যে-কারুণ্যে লৌকিকে-অলৌকিকে আশা-নিরাশায় ভরা এই দ্বন্দ্ব-মিলনের গল্পটি যুগে যুগে অগণিত শ্রোতার মনকে বারবার দুলিয়ে দিয়েছে। সতীর পিতৃগৃহে যাওয়ার মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়েছে শ্রোতৃচিত্ত, শিবের অপমানে মন হয়েছে বিক্ষুব্ধ, সতীর দেহত্যাগে হৃদয় খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়েছে, শিবের যজ্ঞবিনাশী ভয়ংকর প্রতিশোধে বিমূঢ় হয়ে গেছে, অশ্রুসজল অন্তরে জেগেছে রৌদ্রজ্বলা আলোছায়া ; তারপর যজ্ঞভাগ পেলেন শিব, প্রাণ পেলেন দক্ষ, যজ্ঞে পড়ল পূর্ণাহুতি, হিমালয়গৃহে নতুন দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন উমা ; মদনভস্ম-তপস্যা-আত্মদান—ভরে উঠল উমানাথের ঘর ও মন, শ্রোতৃহৃদয়ে জাগল আনন্দের প্রবাহ।

শিবের এই নামাবলীর কতকগুলি তাঁর বিশেষণ, কতকগুলি তাঁর ক্রিয়া। বিশেষণগুলির মধ্যে আছে তত্ত্বের প্রাধান্য, ক্রিয়াগুলির পশ্চাতে কথারস প্রধান। বিভিন্ন স্থান কাল পাত্র থেকে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা কল্পনা এসে সমবেত হয়েছে তাঁর চারপাশে ; একই কালে একই নামের নানা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আবার নানা কালে নানা ব্যাখ্যা একই নামকে আশ্রয় করেছে। প্রাগার্য ও বৈদিক যুগে বাস্তব জীবন ও প্রকৃতির প্রতিভাসে রুদ্র-শিবের নামরূপের ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টা প্রধান, উপনিষদের সময়ে তত্ত্বের আলোকে তাঁকে বোঝবার ও বোঝাবার প্রয়াস হয়েছে, যোগ ও তন্ত্রেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে, পৌরাণিক কালে সেই একই গুণ বা ক্রিয়ার বিচারণার কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। সমাজ জীবন মনন

ও তৎসংশ্লিষ্ট সমাজবোধ জীবনবেদ দেববাদ ও ধর্মবোধনার বিবর্তনে শিব প্রকৃতির পট থেকে দর্শনতত্ত্বের ভূমিতে, সেখান থেকে কথাসমুদ্রে অবতীর্ণ হয়েছেন—লৌকিক চিন্তা থেকে অলৌকিক চৈতন্যে, শেষে লোকায়ত চেতনায়। প্রথম ভাগে আর্য-অনার্য মানসের যুগ্ম আলোছায়া, দ্বিতীয় ভাগে আর্য প্রজ্ঞার আলোকসম্পাত, অন্তভাগে অনার্য ভাবনার ছায়াসঞ্চার।

ই। রুদ্র-শিবের গঠনে বৈদিক আর্য রুদ্রের সঙ্গে অবৈদিক অনার্য শিবের যোগাযোগের কথা আগে বলেছি। তার পরেও একাধিকবার উভয়কোটির মিশ্রণ হয়েছে। এই মিশ্রণ ও রূপান্তরের অন্যতম প্রধান অবদাতা দাক্ষিণাত্যের যে আদিম শিব ও শিবপূজা, তা স্বীয় কক্ষপথে স্ব-অঞ্চলে বিবর্তিত হতে থাকে। কাঞ্চিপুর মন্দিরের লিপিলেখ থেকে জানা যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে এখানে শৈব সাধনার সাধারণ রূপ প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে শিব বিষয়ক যে শাস্ত্র রচিত হয় তার নাম 'পদিগম', লেখক তিরুঞনিবন্ধন। উত্তর ভারতীয় শৈব ধর্মের দক্ষিণ ভারতে আবির্ভাবে এখানকার শিবসাধনার উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটতে থাকে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণী রাজাদের উত্থানকাল থেকে বিভিন্ন মত ও পথের তীব্র সংঘর্ষ সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত শৈবধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। দণ্ডীর দশকুমারচরিত, বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিত, ভবভূতির মালতীমাধব প্রভৃতি গ্রন্থে শিব ও তাঁর রূপ-রীতির উল্লেখ করা হয়। ভাস্কর্যে স্থায়ী করে রাখা হয় তাঁর শিল্পমূর্তি। সম্বন্দর-অপ্পর-মাণিক্কবাসগর প্রভৃতি সন্তের আবির্ভাবে জৈন ও বৈষ্ণব মতের পরাজয়ে শৈবমত প্রধানতর হয়ে ওঠে। নকুলীন মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের স্থাপনা করলেন; শৈব দর্শনের নাম হল শৈব সিদ্ধান্ত, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ও সাংখ্যদর্শন তার ভিত্তি; শাস্ত্রগ্রন্থ হল আগম, সাধনা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শংকরাচার্যের সাধনা তাকে নতুন পথে নিয়ে এল, বাঙলাদেশের শৈবাচার্যরা এসে তার শক্তি বৃদ্ধি করলেন।

ঈ। শৈব সাধনার আর এক যোগাশ্রিত ধারা প্রবাহিত হল সুদূর উত্তরে কাশ্মীরে। হিমালয়ভূমিতে শিবের প্রাধান্য এবং হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগের কথা পূর্বে আলোচনা করেছি। তার পরের ইতিহাস নবম শতাব্দীর নিকট-সময়ে শাস্ত্রবন্ধনের মাধ্যমে নতুন রূপ নিল। বসুগুপ্তের 'শিবসূত্র', কল্লটের 'স্পন্দসূত্র', ক্ষেমানন্দের 'শিবদৃষ্টি'র মধ্যে দিয়ে যে তাত্ত্বিক ধারণা ও বিচারণা পুষ্ট হয়ে উঠল, উৎপলের 'প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রে' ও অভিনবগুপ্তের 'দশম শতাব্দী' টীকায় তা পরিপূর্ণ দার্শনিক রূপ গ্রহণ করল। আচার্য শংকর দক্ষিণ ভারতে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। কাশ্মীরে শৈব অদ্বৈততত্ত্ব প্রসারিত হল। অতঃপর দাক্ষিণাত্যের অধ্যাত্মপ্রবণতা প্রবাহিত হল ভক্তিবাদের পথে, কাশ্মীরী শৈব দর্শনে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের পাশে তন্ত্রসহায়ে দেখা দিল শক্তিতত্ত্ব।

উ। আমরা দেখেছি, কোন একটিমাত্র বিশেষ দেবতার মধ্যে শিবের আদিমূল নিহিত নয়, তাঁর আদিরূপ ছড়িয়ে ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর উপাসিত

সংখ্যাহীন প্রমথ ও দেবতার মধ্যে। তাঁর আদি ও আদিমরূপ (যা আমরা ইতিপূর্বে পর্যালোচনা করেছি) অব্যাহত রইল লোকসংস্কৃতির স্বকীয় খাতে; অন্যদিকে আর্যশাস্ত্রমাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন ভারতের বুকে—একবার নয়, একাধিকবার। বহুরূপান্বিত শিবরূপের প্রকাশধারা তাই দ্বিবিধ: অভিজাত ও লৌকিক। পারস্পরিক মিলন-মিশ্রণে উভয় ধারাই জটিলতর হয়ে উঠেছে; তবে অভিজাত শিবের ইতিহাস যতটা গতিশীল, লৌকিক শিবের ইতিবৃত্ত ততটা নয়। এবং উভয়ের সমন্বয় যেখানে নিবিড়তম হয়েছে, সেখানে বিরাজ করছেন পুরাণ-শিব। ইতিহাস-দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই চলমান শৈব জীবনের তিনটি স্বতন্ত্র অথচ সংশ্লিষ্ট প্রবাহের ত্রিবেণীসংগম লক্ষ্যগোচর হয়। প্রথম প্রবাহে, লোকায়ত সংস্কৃতির কৃত্যঘনিষ্ঠ সাধনায় শিব শক্তি ও ভক্তির দেবতা; দ্বিতীয় প্রবাহে, যোগসাধনার জ্ঞানপথে শৈব ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব, তন্ত্রমুখী আরাধনার শিব-শিবানীর দ্বৈত মিথুনতত্ত্ব এবং পুরাণের সহজ ভক্তি, পূজারীতি ও কাহিনীর সমাবেশ; তৃতীয় প্রবাহ শিল্প সংগীত কাব্য নাটক ইত্যাদির সুষম অঙ্কন, যেখানে শিব-শিবানী বিরহমিলনকথার আলম্বন বিভাব তথা নায়ক-নায়িকা। যুগকে অতিক্রম করে আজও রসপিপাসু নর-নারী তাঁদের মধ্যে বার বার খুঁজে পায় নিজেদের দুজনকে। ভারতবাসীর জীবনে ও মননে বহমান এই ত্রিস্রোতা সংগমে অবগাহন করে বৈদিক রুদ্র ও অবৈদিক শিব ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছেন পৌরাণিক শিবে, উগ্র ঘোর থেকে প্রসন্নদক্ষিণ আশুতোষে। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হয়েছেন, পরাশক্তির অধীন ও ভোলানাথ সন্ন্যাসী হয়েছেন, হয়েছেন শিবানীর করতলগত নিরীহ অথচ ব্যাকুলবিবশ স্বামী। রুদ্রের রৌদ্ররস গেছে শুকিয়ে, স্ফূর্তিলাভ করেছে শান্তরস, মধুর-করুণ-হাস্য যার সঞ্চারী। রুদ্র হলেন শিব—ভীতির দেবতা থেকে প্রীতির দেবতা, শক্তিমান প্রমথেশ থেকে ভক্তি-অধীন মহেশ্বর, জনমানসের পরমাত্মীয় দেবাদিদেব। তিনি শুধু শৈব-শাক্তের উপাস্য নন, বৈষ্ণব-বৌদ্ধ-জৈনেরও আরাধ্য। জীবনসংগ্রামের কঠিন ভিত্তি রুদ্র-শিবের উৎসস্থল, ক্রমে পূজা-উপাসনায় শাস্ত্রে-কাব্যে দর্শনে-শিল্পে তাঁর আত্মবিস্তার ও রূপ-রূপান্তর। আর্য সাধ্য ও অনার্য সাধনে, কাব্য শিল্প সংগীত নৃত্য ছন্দ অলংকার বাক্ অর্থ জ্যোতিষ আয়ুর্বেদে তিনি পরমেশ্বররূপে স্মরণীয় ও বরণীয়। সমস্ত বৈচিত্র্য মিলিয়ে তাঁর এই প্রকাশ ও বিকাশ এক সমঞ্জসা সৌন্দর্য, গভীর দার্শনিকতা এবং নিবিড় জীবনময়তার অভিমুখী হয়েছে। ত্রিবেণীর ত্রিতয় ধারা তখন এক মহাসমুদ্রে উপনীত। তখন শিব ও শিবানী: আর্য-অনার্য ভাবনার সমন্বয়, জীবনলীলা ও জীবনদর্শনের সামঞ্জস্য, অদ্বৈত ও দ্বৈতের সমাহার।

ঙ। শিবের আত্মসম্প্রসারণের ইতিহাস ও ভূগোল এখানেই থেমে থাকে নি; উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ভূভাগসীমা অধিকার করেছেন তিনি। তার এক সীমায় কৈলাস (তিব্বত) আর এক সীমায় সিংহল, একদিকে যক্ষ ও কিন্নর অন্যদিকে রক্ষ

ও বানর, উভয় কোটির এবং উভয়ের মধ্যবর্তী কোটি কোটি নরনারীর উপাস্যদেবতা শিব। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের বেলাভূমি অতিক্রম করে তিনি, তাঁর পূজারীতি ও কথাগীতিসহ, পাড়ি দিয়েছেন নেপাল ব্রহ্মদেশ ইন্দোচীন জাভা বলি মালয় এবং ভারত মহাসাগরের বুকে ভাসমান অন্যান্য দ্বীপে-উপদ্বীপে ১৮, অপর মহাদেশেও।

ঋ। মহা-ভারতের শিব অথবা শৈব মহাভারত পরিক্রমা আমাদের সমাপ্ত হল। সংস্কৃতিসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে মহাসাগর-উপম ভারতশিবের রূপমূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। তাঁর রূপ ও চরিত্র বিকাশের পশ্চাতে কত দেশ-কালের কত জীবন-মানসের বিচিত্র অবদান বর্তমান। কী অপূর্ব জীবনমমতা দার্শনিকতা সৌন্দর্যবোধ কল্যাণচিন্তা ও শিল্পদৃষ্টির রূপরেখারঙরস দিয়ে তাঁর তিলোত্তম প্রতিমা একটু-একটু করে গড়ে উঠেছে ভারতবাসীর হৃদয়বেদীতে। রুদ্রশিবের এই অপূর্বসুন্দর মহিমান্বিত স্বরূপকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হলে প্রয়োজন এক সত্য সমগ্র ও অখণ্ড ভারতীয় দৃষ্টির। সেই ভারতদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথে: 'ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল। শিব যদিচ রুদ্র নামে আর্য সমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাঁহার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই মূর্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী, গঞ্জিকা ও ভাঙধুতুরায় উন্মত্ত।…শৈবধর্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিসগুলি মিলিত হইল তাহা নিরাভরণ এবং নিদারুণ; তাহার শান্তি এবং তাহার মত্ততা, তাহার স্থাণুবৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য উভয়ই বিনাশের ভাবসূত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তিবন্ধন ছেদন ও মৃত্যু, অন্তরের দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়—ইহাই আর্যসভ্যতার অদ্বৈতসূত্র। ইহাই নেতিনেতির দিক, ত্যাগই ইহার আভরণ, শ্মশানেই ইহার বাস' ১৯।

শিবতত্ত্বের এই অননুকরণীয় দার্শনিক ব্যাখ্যার পরেই উল্লেখনীয় শিবরূপের অপরূপ ভাষ্য, যা অভিব্যক্ত হয়েছে ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্তের আবেগস্ফূর্ত লেখনীতে: "শিবের প্রত্যেকটি ভূষণ ও আচারের রূপকাশ্রয়ে অপূর্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা ঋষিগণ তাঁহাকে এমন মহিমান্বিত করিলেন যে, তিনি হইলেন হিন্দুস্থানের প্রধান দেবতা, দেবাদিদেব মহাদেব।…এ দেবতার বাহন বৃষ হইতেছে চতুষ্পাদ ধর্ম। পৃথিবীর ভয়স্থান বিষধর সর্প—পৃথিবীর যত দুঃখ, যত ব্যাধি, বিপদ ও অমঙ্গল, সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া, জটার কিরীটভূষণ করিয়া পরম শিব তিনি নির্বিকার রহিয়াছেন। শ্মশানের চিতাবিভূতি অঙ্গে মাখিয়া সংহারের দেবতা তিনি সৃষ্টির ক্ষণভঙ্গুর সত্তা, সংসারের নশ্বরত্ব, এই জগতের চরম পরিণাম, পরম বৈরাগ্যভরে ঘোষণা করিতেছেন। মঙ্গলের দেবতা তিনি, সৃষ্টির সমস্ত অমঙ্গল-বিষকে পান করিয়া হইয়াছেন নীলকণ্ঠ, নীললোহিত। শিবের তৃতীয় নেত্র প্রজ্ঞানেত্র,

যোগিরাজের যোগসিদ্ধির ফলে যে জ্ঞাননেত্রের আবির্ভাব ঘটে, ইহা তাহাই। এই জ্ঞাননেত্রের উপরিভাগেই ভক্তের প্রতি অমৃতবর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রকলা দীপ্যমান।...তিনিই তন্ত্রের মহাভৈরব, তিনিই বেদের মহারুদ্র, তিনিই নটরাজরূপে বিশ্বে সৃষ্টিলীলার অভিনয় করিয়া আবার প্রলয়তাণ্ডবে ধ্বংসের আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। বামে উমাকে সঙ্গিনী করিয়া তিনিই সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হন। তিনি আদর্শ গৃহী, মহাশক্তি দুর্গা তাঁহার গৃহিণী, ঋদ্ধি ও বিদ্যাস্বরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁহার দুই কন্যা, বল ও সিদ্ধিরূপী কার্তিকেয় ও গণেশ তাঁহার দুই পুত্র। সর্বভাব সর্বধর্ম সর্বজ্ঞান ইঁহাতেই সমন্বয় লাভ করিয়াছে, মানুষের কল্পনার চূড়ান্ত পরিস্ফূর্তি এইখানেই [২০]।

বস্তুলোক থেকে উদ্ভূত ও পরিকল্পিত হয়ে শিব-শিবানী উত্তীর্ণ হয়েছেন মনন-লোকে ও শিল্পলোকে। ভারতবাসীর শিব-দর্শন শুধু শাস্ত্রে ও তত্ত্বে নয়, ধর্মে ও কর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে, জীবনে ও মানসে। তার হৃদয়ালোকে উদ্ভাসিত হয়েছে রুদ্র-শিবের ত্রৈত অভিব্যক্তি। একরূপে তিনি অদ্বিতীয় ধ্যানী ও নটরাজ, সৃষ্টি-প্রলয় যুগল কর্মসিদ্ধি, জ্ঞানপথিক তপস্বীর বিশ্বদেবতা: the embodiment of renunciation and the destroyer of evil. He is, besides, the personification of contemplation and divine consciousness[২১]। অপররূপে তিনি শিবানীসহ দ্বৈত, 'মিত্রাক্ষর জগৎকাব্য', ভক্ত উপাসকের জীবন-দেবতা: She stands on the still prostrate form of Siva, the representation of the absolute[২২]। অন্যরূপে শিল্পিসাধকের ধ্যানলোকে তিনি প্রেমময় অন্তরদেবতা:

> Birds in the flowering green-branched punnai tree,
> Love writeth clear its marks on me, for He,
> Who cured my grief, yet left unending pain...

এবং If only Hara by me stand,
> Stronger am I than all their band. [২৩]

এই ত্রিতয় উপলব্ধি মুখর হয় ঐক্যমুখী বন্দনায়:

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥ (বেদানুক্রমণিকা: আচার্য সায়ণ)

বঙ্গশিব

বর্তমানে প্রায়-নিশ্চিহ্ন নিগ্রোবটু বাঙলার পলিমাটিতে যে প্রথম ও ক্ষীণ পদচিহ্ন এঁকেছিল, তার ওপর এসে পড়ল অস্ট্রিক, আল্পীয়, দ্রবিড় এবং মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বহুবিচিত্র পদছায়া। অবশেষে আবির্ভাব ঘটল দার্শনিক আর্যজাতির। বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাতে-সমন্বয়ে বাঙলার ধর্মকর্ম সাহিত্য-শিল্প নতুন উচ্ছলতায় পথ কেটে এগিয়ে চলল ১।

আর্যপূর্ব বাঙলার প্রাথমিক অধ্যায় আদিম জন ও কৌমের সাধ্য-সাধনের ইতিহাস। স্থানীয় জীবন ও স্বকীয় কৃত্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এদের কর্ম-তৎপরতা ও মানসচিন্তা। ধর্ম ছিল লৌকিক, প্রমথ তথা দেবতা অবৈদিক অপৌরাণিক। এইসব কৌম বিশ্বাস ও সাধনা সারা দেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল, এক-এক অঞ্চলে তার এক-এক রূপ। প্রাকৃতিক বিভাগ, জলবায়ু ও পরি-বেশগত পার্থক্যে এদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য ছিল; কিন্তু অন্তরঙ্গ স্বরূপ ছিল প্রায়-অভিন্ন। আর্য সংস্কৃতি এগুলির সংস্পর্শে এসেছে, সংঘাত ও সমন্বয় দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে এই মিলমিশ দানা বেঁধে উঠেছে, আবার একই অঞ্চলে একাধিকবার মিশ্রণে বিচিত্র জটিলতা দেখা দিয়েছে; কৌম সাধনা পৌরাণিক ধর্মের আশ্রয়লাভ করেছে। সর্বত্রই যে সে পুরাণায়িত হয়ে উঠেছে, তা-ও নয়। মিলন হয়েছে কোথাও অন্দরমহলে, কোথাও বাইরের ঘরে, কোথাও বা মিলন হয় নি। গৌড়ীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির এই বিচিত্র ধারায় পুষ্ট হয়েছে বাঙালীর জীবন ও মানস, সাধ্য ও সাধনা। তার একদিকে ব্রহ্ম উপাসনা ও আত্মশুদ্ধি, অন্যদিকে পশুপূজা ও দেহশোধন; একদিকে বেদ স্মৃতি পুরাণ তত্ত্বজিজ্ঞাসা, অন্যদিকে জাদুবিদ্যা কৃত্যকল্পনা ভূতশান্তি; একপক্ষে তপস্যা ও দার্শনিকতা, অন্যপক্ষে অভিচার ও বস্তুজাগতিকতা।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতিসমুদ্রে অবগাহন করে পুরাণের তটে এসে উঠেছিলেন যে 'ভারতশিব', ঐতিহাসিক বিবর্তনের আর এক দোলায় তিনি উপনীত হলেন কৌম-অধ্যুষিত বাঙলার আর্যেতর বন্দরে। স্থানীয় ধর্ম ও প্রমথ-প্রমথিনীর সংস্পর্শে তাঁর আবার রূপান্তর ঘটল, তিনি হলেন 'লোকশিব'। এই পরিবর্তন একদিনের বা একস্থানের নয়; প্রাগার্য বঙ্গসংস্কৃতি তার পটভূমিকা, কালের বিবর্তন তার স্রোত, বাঙালীর জীবন ও মানস তার অববাহিকা।

ক। বাঙলার ভারতশিব

বাঙলায় আর্য অনুপ্রবেশ সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান। অনেকের মত, চতুর্থ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বাঙলায় আর্যরা প্রথম প্রবেশ করে। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই উপ-

নিবেশ বিস্তারের ইতিহাস ভালোভাবে জানা যায় না ২। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে বিক্ষিপ্ত উদাহরণ কিছু কিছু মেলে। মোটামুটিভাবে, খ্রীষ্টীয় শতকের আগেই বাঙলায় আর্য সভ্যতার বিস্তার; এই সময় থেকে পৌরাণিক ধর্ম দেবতা ও পুরাণ-শিবের সপরিবারে গৌড়ে প্রবেশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রসার-সূচনা ৩। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে বাঙলার আর্যীকরণ পূর্ণতা লাভ করে।

বাঙলাদেশে ভারতশিবের আত্মপ্রকাশের প্রাচীনতম পরিচয় মেলে বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপে ৪। প্রত্নতাত্ত্বিক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর মতে, এখানকার শৈবচিহ্ন নন্দিপদ মৌর্য ও সুঙ্গ যুগের। এর সঙ্গে একটি শিবমূর্তিও পাওয়া গেছে। গুপ্ত রাজত্বকালে (৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দী) পুরাণশিব বাঙলায় প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকেন। রাজা শশাঙ্ক (৬ষ্ঠ-৭ম) ছিলেন শৈব। তাঁর স্বর্ণমুদ্রায় নন্দিবাহন মহাদেব খোদিত থাকত। বর্মা-খড়্গা-ভরদ্বাজ প্রভৃতি রাজবংশও শৈবধর্মের পোষকতা করতেন। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপিতে 'নীলকণ্ঠ শিব' উল্লিখিত হয়েছেন। হুগলীর মহানাদ গ্রামে গুপ্তযুগের একটি একপাদ ভৈরবমূর্তি পাওয়া গেছে ৫। পাহাড়পুরের ত্রিনয়ন জটিল বৃষভ ত্রিশূলী উর্ধ্বমেঢ্র ও অক্ষমালাকমণ্ডলুধারী চন্দ্রশেখর মূর্তিকে প্রাক্-পাল-যুগের মনে করা হয় ৬। সুন্দরবনাঞ্চলে কেয়ূরকুণ্ডলধারী দিগম্বর শিবমূর্তিটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৭। এ যুগের লিঙ্গ সংখ্যায় কম ছিল না। সুন্দরবন প্রদেশের গৌরীপট্টবিহীন বালিপাথরের লিঙ্গ, হুগলীর স্তম্ভলিঙ্গ, পাহাড়পুরের বস্ত্র ও মুখ-লিঙ্গ, মুর্শিদাবাদ-বড়নগরের চতুর্মুখ ভৈরব ও মুখলিঙ্গ ইত্যাদি এই সময়ের বলে অনুমান করা হয়।

আর্যাবর্তের শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাহেশ্বর-পাশুপতদের নাম বাঙলায় পাল আমল (৮ম-১২শ) থেকে শোনা যেতে থাকে। এই সময়ে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ও শাক্তধর্মের তান্ত্রিক বিবর্তনের ফলে শক্তিসহ শিবের যোগ প্রাধান্য পেতে থাকে। পালরাজাদের ধর্মনীতি এই বিবর্তনের গতিকে প্রকারান্তরে বাড়িয়েই দিয়েছিল। খালিমপুর লিপি ও গরুড়স্তম্ভ লিপিতে শিব-শিবানীর উল্লেখ, কেশবপ্রশস্তির মহা-বোধি লিপির ফলকে খোদিত 'মহাদেবঃ চতুর্মুখঃ' মূর্তি, হরগৌরীস্তম্ভের লিপিতে সতীর দেহত্যাগ ও শর্বাণীর পাতিব্রত্য কাহিনী, বিভিন্ন পালরাজা কর্তৃক শৈব উপাধি গ্রহণ, পাশুপতদের জন্যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সমকালীন অন্যান্য উপরাজদের পোষকতা ৮ পূর্বাঞ্চলে ভারতশিবের আত্মসম্প্রসারণের ইতিহাস বহন করে। এ যুগের শিবমূর্তি মূলত শাস্ত্রানুমোদিত। উত্তরবঙ্গে পাওয়া পাথরের ও ধাতুর একমুখী লিঙ্গের অধিকাংশের চারদিকে চারটি করে শক্তিমূর্তি বিরাজিত। বরাকরের অষ্টম শতাব্দীর শিবমন্দিরটি সম্ভবত প্রাচীনতম। বরেন্দ্রমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির, পাণ্ডুয়ার কনকশিবের মন্দির, বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর সিদ্ধেশ্বর সরেশ্বর বা সল্লেশ্বরের মন্দির এই পর্বে স্থাপিত ৯। এই সময়ে বাঙালী শৈবগুরু দক্ষিণ ভারতে যান ১০। পালরাজাদের উদারনীতির সহায়ে শিব সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে-

ছিলেন। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের পতন এবং সেনরাজাদের (১২শ-১৩শ) প্রত্যক্ষভাবে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারের ফলে শিবের প্রতিষ্ঠাভূমির পরিধি বিস্তৃততর হল। বাঙলায় বৈষ্ণব মতের বহু আগে শৈব মতের প্রাদুর্ভাব; বৌদ্ধযুগের অবসানে পুরাণ-ধর্মের প্রতিষ্ঠাকালে নেতৃত্ব করে শৈবধর্ম ১১। সেন রাজবংশের কুলোপাধি ছিল 'পরমমাহেশ্বর', কুলদেবতা ছিলেন 'সদাশিব', কুলমন্ত্র ছিল 'ওঁ নমঃ শিবায়'। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, তাম্রশাসনে শিব বন্দনা ও প্রণাম, লেখ ও মুদ্রায় শিবমূর্তির চিত্রণ এঁদের শৈব পোষকতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। সেন রাজসভায় রচিত গ্রন্থাবলীতে শিবের উল্লেখ এবং আঞ্চলিক উপরাজাদের শিব উপাসনা ১২ তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির স্বাক্ষর। শৈব প্রতিমাও আগের চেয়ে সংখ্যাগুরু। সদাশিব নটরাজ কল্যাণসুন্দর উমামহেশ্বর প্রভৃতি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক শিবমূর্তির বাহুল্য সহজেই চোখে পড়ে। সেনরাজাদের লিপিলেখে হরিহর অর্ধনারীশ্বর গঙ্গাধর পঞ্চানন পুত্রদ ইত্যাদি শৈব নামগুলি উল্লিখিত ও বন্দিত হয়েছে। শিবমন্দিরও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে বরাকরের মন্দির আজও বর্তমান ১৩। বলা বাহুল্য, লিঙ্গ ও অন্যান্য শৈব প্রতীকের ব্যবহার এসময়ে ক্রমেই বেড়ে গেছে।

শুধু ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নয়, বাঙালীর সাহিত্যিক শিল্পায়নেও শিব স্থানলাভ করেছেন। পালরাজাদের লিপিলেখের ১৪ সুষম অলংকরণে তার সূচনা, সেনরাজ-দরবারী কাব্যলিপিতে তার অলংকৃত সৌষম্য। 'গীতগোবিন্দের' শিব সম্পর্কীয় উক্তি অলংকারশাস্ত্রসম্মত। সমকালীন অন্যান্য কাব্যের খণ্ডচিত্রগুলিও মূলত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণ। সংস্কৃত রচনায় শিব সম্পর্কীয় যে প্রকীর্ণ কবিতা, খণ্ড-চিত্র ও বন্দনা (যেমন কাদম্বরীর 'কথামুখ') আছে, সেগুলির প্রভাবও উল্লেখনীয়। ধ্রুপদী সংগীতে রাগের মূর্তিকল্পনায় রাগধ্যানের প্রয়োগ সম্ভবত সপ্তম শতাব্দী থেকে ১৫। এই সাংগীতিক ধ্যানমন্ত্রে শিবের (ও শিবানীর) অনেক খণ্ডচিত্র বিদ্যমান। ভৈরব রাগ ও ভৈরবী রাগিণীকে শৈব সংস্কৃতির অনুগত করে রাগ নিরূপণ করা হল: ভস্মাঙ্গলিপ্তারাবঃ সুগাত্রো ভালস্থলে শোভিতশীতরশ্মি। ত্রিশূলহস্তো বৃষভাধিরূঢ়ঃ স ভৈরবো যঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ। পরে রাগধ্যানে চিত্রিত হল: সীস জটানিমে গঙ্গ তরঙ্গিণী। লোচন চন্দ ললাটহি উপর লাল বিশাল ফণি শিরক মণি। এইজাতীয় চিত্র-ভগ্নাংশ দিয়ে বাংলা কাব্যে শিবের জীবনী সূচিত হয়েছে। পরবর্তী কালে ছবির পরিধি ক্রমেই বেড়ে গেছে। তার দেহে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য।

শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' কাব্যগ্রন্থে১৬ শিবের পৌরাণিক রূপগুণ এবং সেই সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। শিরোনামা থেকে সংকলয়িতার দৃষ্টি-ভঙ্গি ও বক্তব্যের পরিচয় মেলে: মহাদেবঃ—হরশৃঙ্গারঃ—হরহাস্যম্—হরকপালঃ—হরনয়নম্—ত্রিপুরদাহনারম্ভঃ—হরবাণঃ—ভৈরবঃ—হরনৃত্যম্—হরপ্রসাদনম্ ইত্যাদি। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' গ্রন্থেও শিবের বিবাহ দারিদ্র্য প্রভৃতি গৃহচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

একপক্ষে পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্য, অন্যপক্ষে বাঙালীর ঘরোয়া জীবন—উভয়ের সংমিশ্রণে এই শৈব কবিতাগুলি রচিত হয়েছে। উদাহরণত উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাকৃতপৈঙ্গলের 'জামাতা কোঽত্র? যোঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী', সদুক্তিকর্ণামৃতের 'যোগীন্দ্রাস্তু সদাশিবঃ স ভবতাং ভূত্যৈ পরার্থব্রতী' অথবা সৎপদ্যরত্নাবলীর 'স্বামাশ্রিতোঽসি করুণানিধিমন্নপূর্ণাং ত্রৈলোক্যনাথগৃহিণীং গিরিরাজকন্যাম্। যাচে নিজোদরদরিভরণার্থমন্নং স্ত্রীণাসি নাত্র জননীতি পরং বিচিত্রম্।' এই শ্লোকগুলি থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় ও বঙ্গীয় মানসের মিশ্রণ ইতিপূর্বেই সুরু হয়ে গেছে, আর্য ভাবনার পাশে স্থান করে নিচ্ছে লোকায়ত মেজাজ ও দৃষ্টি, উভয়ের অন্তরঙ্গতা ক্রমেই নিবিড়তর হয়ে উঠছে। তাই এই কল্পচিত্রগুলিতে শিবকে কৈলাসবাসী হয়েও 'ঐশ্বর্যেণ চ ভিক্ষয়া' জীবন কাটাতে হয়, 'খট্টাঙ্গীকৃতধূমকেতুসদৃশ' হয়েও হাস্যাস্পদ হতে হয় আপন সন্তানের কাছে।

তবু এ-শিব প্রধানত পুরাণ-অনুগত, সংস্কৃত সাহিত্যের আলোয় অলংকৃত, উচ্চকোটির ভাব-ভাষায় সিঞ্চিত অভিজাত দেবতা। লোকায়ত ধর্ম ও গীতি-প্রবাহে জনগণের শিব বহুকালাবধি ক্রমরূপান্তরিত হয়ে চলেছেন শাস্ত্ররূপের অন্তরালে, শাস্ত্রীয় নির্দেশকে অবহেলা করে। তার রূপ ভিন্নতর, তার প্রকাশ বিচিত্রতর। উচ্চকোটি ও লোকায়ত—সমাজ-সংস্কৃতির দ্বিবিধ স্তরেই ভারতশিব আবর্তিত-বিবর্তিত হয়েছেন একই কালে, সমান্তরাল রেখায়। স্তর দুটি যেখানে ও যখন মিলিত হয়েছে, তখন এই দুই ধারার শিবের মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণ এবং গ্রহণ-বর্জন ঘটেছে। এবং এই মিলনের মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছেন বাঙলায় 'লোকশিব'। আলোচ্য পর্ব পর্যন্ত তাঁর কোন সুবিহিত রূপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি, তার বিকাশ হল পর-পর্বে—শুধু ধর্মে-কৃত্যে নয়, শিল্পে-সাহিত্যেও। এই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির দ্রুতি ও দীপ্তির জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি সমাজক্রান্তির। তুর্কী অভিযান সেই অবশ্যম্ভাবী ক্রান্তিকালকে ত্বরান্বিত ও অন্বিত করে তুলল।

খ। বাঙলার লোকশিব।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙলায় তুর্কী অভিযান ও বিজয়। বাঙালীর তখন অবনতির কাল। নৈতিক অধোগতি অনৈক্য জড়তা অভিচার ব্যভিচার ইত্যাদির সহায়ে ভাববিলাস ও দেহবিলাস অন্তর-বাহিরকে কলুষিত ও রোগগ্রস্ত করে তুলেছে, ঠিক তখনই বিদেশী শাসন ও বিজাতীয় ধর্ম তার সমস্ত ভালো-মন্দ নিয়ে বাঙলার মাটি ও মনের ওপর এসে পড়ল। নড়ে উঠল অচলায়তনের ভিত্তি, তার সমাজব্যবস্থা মানস-অবস্থা এবং ধর্মকর্মের গতানুগতিক কাঠামো।

রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ-কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত

হয়নি। সুতরাং এখানে পালযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের নির্বিবাদ সহ-অবস্থান বজায় ছিল, একথা বলা যেতে পারে[১৭]। মিলন-মিশ্রণ চলছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আত্মপ্রসারের প্রয়াসে ফল্গু হল নদী, সহাবস্থান পরিণত হল সংঘাত-সংমিশ্রণে; আভিজাত্যচ্যুত বৌদ্ধধর্ম তার লোকায়ত ধারাগুলিকে পুষ্টতর করার কাজে সচেষ্ট হল। ইসলামী অভিঘাতে ভিন্‌দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির মধ্যস্থতায় এই সংঘর্ষ দ্রুতগতি পেল, আবর্তন তীব্রতর হয়ে বিবর্তিত হল সমন্বিত উপসংহারে। বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতি এক অখণ্ড রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। অবশ্য তুর্কী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই এই রূপান্তর ঘটেনি; তার জন্যে প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন সমাজশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের, মিলন-মিশ্রণের। তুর্কী শাসনের প্রথম দেড়শো বছর যেন ঐ প্রয়োজনেরই বিপুল আয়োজন। বিদ্রোহ-কলহ-ষড়যন্ত্র-অনাচারের ঘূর্ণাবর্তে কেটেছে অন্ধকার দিনগুলি-রাতগুলি। এই সময়টুকু বাঙালীর প্রস্তুতির কাল—যেন আলোর পিপাসায় অন্ধকারের সাধনা, ভাঙার মধ্যে দিয়ে ভাবীকালের গড়ে-ওঠা। সৃষ্টির ঘরে বিরাট শূন্য, জমার ঘর ভরে উঠছে অলক্ষ্য লক্ষ সঞ্চয়ে, দুঃখের সরোবরে জন্ম নিচ্ছে নতুন শতদল।

বিদেশী রাজশক্তির আঘাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজসভা ও অভিজাত-ধর্মসভা থেকে বিচ্যুত হল। তাকে নামতে হল জনতার জনসভায়। লোকসমাজ এতদিন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে দূর থেকে দেখেছে, কিছু কিছু গ্রহণও করেছে; এখন উভয়ের গভীর সংঘাত এবং তার মাধ্যমে ব্যাপক মিশ্রণের সুযোগ এল। সেই সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে নগরবাহিরে বহমান লোকসংস্কৃতির উজ্জীবনের পথ খুলে গেল। তার প্রমথ-প্রমথিনীর আভিজাত্য এবং পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে সংযোগ ঘটল; তাঁদের মহিমা ও পূজা বিস্তৃত হল, কাহিনী স্বীকৃতি পেল; সেই সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে পারস্পরিক কলহও সুরু হল। উচ্চকোটি ও লোকায়ত ধ্যানধারণার বিরোধ-মিলনে গড়ে উঠল বাঙালী সংস্কৃতি—তার একদিকে ধর্মচেতনা, অন্যদিকে জীবনচেতনা। বাংলা কাব্যেও এই মিশ্রণের পরিচয় ও স্বাক্ষর ফুটে উঠল। বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে এই রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী ছিল। বিদেশী অভিযানের মধ্যে দিয়ে বাইরের আঘাত একে দ্রুততর করে তুলল, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত করে তুলল চৈতন্যদেবের (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রীঃ) সমাজমুখী সাধনা। এইভাবে নানা ওঠাপড়া-ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল বাঙলার মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি। অন্ধকার রাত্রি-অন্তে শান্তির মৃদু আলো দেখা দিতেই নতুন সংস্কৃতি ও সর্জনের ইশারা জেগে উঠল, ক্রমে তা স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হতে থাকল। রূপ নিল বাঙালীর জীবন, বাঙালীর হৃদয়[১৮]।

বাঙলার আকাশে এই ঘূর্ণী ঝড়ের আঘাতে শিবও আন্দোলিত হয়েছেন; ঝড় যখন থেমে গেল, দেখা গেল তাঁরও রূপান্তর হয়েছে। এতদিন বিভিন্ন অঞ্চলে-স্তরে-শ্রেণীতে তাঁর যে গঠন চলছিল, এখন তা সুবিহিত ও সুসংহতরূপে প্রকাশ পেল। ভারতশিবের ছবি ম্লান হল না; কিন্তু যে লোকায়ত স্তরে তিনি এখানকার

দেবতা ও উপাসনার সঙ্গে এতদিন ধরে মেলামেশা করছিলেন, ডঃ তারাচাঁদ কথিত সেই 'half-suppressed ancient cults' তথা জনগণের সংস্কৃতি সহস্রবাহু মেলে শিবদেবতাকে অধিকার করল। ভারতশিব বাঙলার জনসমুদ্রের বিচিত্র তরঙ্গচূড়ায় আরূঢ় হলেন ; বাঙালীর অনুভবে ও অনুভাবে তিনি হলেন 'লোকশিব' —উপাস্য দেবতা ও অন্তরের আত্মীয়, ধর্মের সম্পদ ও সাহিত্যের সামগ্রী।

শিবরূপের এই মিশ্রণ ও রূপান্তরের আলোচনায় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, উচ্চবিত্তদের সুখসমৃদ্ধিই নিম্নবিত্তদের পুরাণ-অনুগামী করে তুলেছিল। ফলে, উভয়ের নৈকট্যজনিত সংঘাত ও মিলন ঘটে [১৯]। কিন্তু শুধু এই একটি কারণ নয়। দুটি সংস্কৃতি পাশাপাশি প্রতিবেশী হলে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ও গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে দুয়ে মিলে এক হয়ে ওঠে। তখন ওপরতলার উন্নত মানসকল্পনা ব্রতকৃত্যের নতুন 'তত্ত্বব্যাখ্যা' সৃজন করে, নীচেরতলার অনুন্নত মানস-কল্পনা দর্শনতত্ত্বের নতুন 'কথারূপ' দেয়। তার দোলায় দেবদেবীর রূপ ও গুণের অদলবদল ঘটে যায়। ভারতশিব বাঙলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন যোগাশ্রিত শৈবধর্ম ও পুরাণকথার আশ্রয়ে। কিন্তু বিশুদ্ধ যোগ বোধ হয় বাঙালীর ধাতুসহ নয়। তাই শৈব যোগ অচিরে অবসিত হল শৈবশাক্ত তন্ত্রে, আর পুরাণশিব নির্গুণ নিরুপাধিক ঈশ্বরত্বকে 'বন্দনা'য় বন্দী করে কথা সার করে বাঙলার মাটিতে দৃঢ়মূল হলেন। বৌদ্ধ-জৈন দেবদেবী ও সাধনভজনের ছায়াপাতও হল অনেকখানি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-থাকা কৌম উপাসনা ও প্রমথবৃন্দ দেবতা-শিবকে বিচিত্র রূপ দিতে থাকল, প্রচলিত লৌকিক সাহিত্য শিবকে মধ্যমণি করে নব নব কথার সৃষ্টি করে চলল। উচ্চকোটি ও লোকায়ত, অলৌকিকত্ব ও লৌকিকতার সমাবেশে বাঙালীর ধর্মে ও কাব্যে আর্যশিব পরিণত হলেন জনপ্রিয় বঙ্গজ দেবতায়। অবশ্য তাঁর চরিত্রের মূল স্বরূপ—রুদ্র ও শিব, ঘোর ও অঘোর, উগ্র ও শম্ভু, বামদেব ও প্রসন্নদক্ষিণ, এই ভাববৈপরীত্য অক্ষুণ্ণ থেকে গেল। বাঙালী তাঁকে রূপ দিল নিজের মত ক'রে, অঙ্গনা ও আঙিনার নিরাপদ আশ্রয়ে।

১। শিব-প্রমথেশ

জ্যাস্ট্রো বলেছিলেন, গ্রামীণ সভ্যতার কৃষিতান্ত্রিক পরিবেশে এক-একটি 'গাঁওদেওতা' কল্পিত হন। তাঁরা গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে রক্ষকের স্থান গ্রহণ করেন এবং তাঁদের আশ্রয় করে এক একটি সাধনরীতি কৃত্য কথা গড়ে ওঠে। রাজচক্রবর্তী যেভাবে উপরাজদের ওপর সার্বভৌমত্ব লাভ করেন, প্রবলতর শক্তিমান গ্রামদেবতাও তেমনি দুর্বলতর প্রমথদের আত্মসাৎ বা অধিনত করে সার্বভৌম রূপ লাভ করেন। বাইরে থেকে আসা দেবতাদের সঙ্গে এইসব প্রমথ ও প্রমথেশের সংঘাত বাধে এবং মিলন ঘটে। বাঙলাদেশেও শিবের এইভাবে রূপান্তর সাধিত হয়েছিল। তাই সংস্কৃতিসন্ধানী যখন বলেন 'বাঙলাতেও…প্রাক্-আর্য শিব ছিলেন' [২০], তখন সিদ্ধান্তটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। বরং বলা যেতে পারে, দেশের

বিভিন্ন অঞ্চলে (দ্রবিড় অস্ট্রিক মঙ্গোলদের) শিব-সদৃশ প্রমথ-প্রমথেশবৃন্দ বিরাজিত ছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলমিশে ভারতশিব নবরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর দেহে ইতিপূর্বেই আর্যেতর কৃষ্ণ মৃত্তিকার প্রলেপ ছিল, গৌড়ীয় পলিমাটি সেখানে সহজেই স্থান করে নিল। অতএব তাঁর সন্ধানে আমাদের যেতে হয় ওপাড়ারই প্রমথিনী-প্রমথেশদের মণ্ডপে তথা 'থানে'।

অ। আর্য সংস্কৃতি সম্প্রসারিত হয়ে প্রথম বাসা বাঁধে উত্তর বাঙলায় [২১]। সুতরাং আমরা এখান থেকেই যাত্রা সুরু করতে পারি। দিনাজপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত প্রমথেশ 'মহাকাল' বা 'মহারাজা' [২২]। ভারতশিবের প্রথম মিশ্রণ লোকসমাজের উপাস্য এই মহাকালের সঙ্গে। মহাকাল শিবনামে ভূষিত হলেন, রুদ্রশিবে মহাকালের রূপগুণ ও রক্তসিক্ত পূজারীতি আরোপিত হল। 'শিবার্চনতন্ত্রে' বলা হয়েছে, 'আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে বন্য নরভুকদের মহাকালই শিব' [২৩]। উত্তর বাঙলায় ও আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে উপাসিত মহাকাল গোত্রীয় প্রমথ এবং শিবের সঙ্গে তাঁদের মিলনকে শাস্ত্রধৃত করে রাখা হয়েছে। আজও মহাকাল-রূপী শিবের উপাসনা ও লিঙ্গে রক্তদান দিনাজপুর ও উত্তর বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান। দিনাজপুর রঙপুর, মৈমনসিংহ, কামরূপ, দারাং প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে কোচপলমেচথারু বোদোমিকিরদের উপাস্য দেবতা 'ঐ' [২৪]। ইনিও মহাকাল-প্রমথ ও শিবের সঙ্গে যুক্ত হন। 'যোগিনীতন্ত্রে' কোচদের বলা হয়েছে 'কুবাচ' বা 'কবচ'; সিনর গোরেসিও বলেছিলেন, Siva, a deity, as I believe, of the Cush or Hemetic tribes (হাণ্টার-উদ্ধৃত)। এগুলি থেকে কোচদের উপাস্য দেবতার সঙ্গে শিবের মিলমিশের গভীরতা বোঝা যায়। কোচদের সাধনায় বৌদ্ধ উপাসনারও ছায়াপাত ঘটেছিল, এখানকার মহাকাল মন্দিরের অধ্যক্ষ বৌদ্ধ লামা। শৈব ধর্মের মিশ্রণে পূজারীতি জটিল হয়েছে [২৫]। কোচপলদের 'ভূতনাথ' বৃক্ষতলবাসী গ্রাম-দেবতা। বংশ তাঁর প্রতীক, সাময়িক মণ্ডপ রচনা করে তাঁর উপাসনা হয়, সেই সঙ্গে সদলবলে নৃত্যগীত; আত্মবলিদান এখন পশুবলিতে রূপান্তরিত। শিব ও ভূতনাথ যখন একাত্ম হলেন, তখন স্থানীয় পূজারীতি এবং ভূতনাথীয় রূপগুণ শিবকেও আশ্রয় করল, ঠাকুরের পাট ও শিবলিঙ্গে রক্তদান বিহিত হল। তার সঙ্গে আদিম জাতি-সুলভ আত্মনির্যাতনমূলক ক্রিয়াকলাপ ও হাতে 'কপু' বা ডোর বাঁধার প্রথাগুলিও গৃহীত হল [২৬]। কালক্রমে কোচরা শৈবধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, পুরাণেও তার উল্লেখ হয়। 'কালিকাপুরাণে' শৈব অসুর ভগবতীর সঙ্গে যুদ্ধে তৃষ্ণার্ত হয়ে শিবের প্রার্থনা করে; পুরাণখ্যাত কামরূপরাজ নরকাসুর ছিলেন শিবভক্ত। কোচরাজারা নিজেদের শিবগোত্রীয় বলে আজও মনে করেন। এখানে শিবমন্দিরও নিতান্ত অল্প নয়। এই প্রসঙ্গে রাজবংশীদের বুড়া ঠাকুর, জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর লিঙ্গ, বাঘদুয়ারের মহাদেব মূর্তি উল্লেখ্য [২৭]।

আ। এর পরে আমাদের আসতে হয় পশ্চিম সীমানায়। মগধ ও

গৌড়ে যাতায়াতের পথে আর্য সংস্কৃতি তার মালা থেকে যে বীজ ছড়িয়ে চলেছিল, তার ফল স্থায়ী হয়ে আছে বাঙলা-বিহারের সীমান্তবর্তী সংস্কৃতির মধ্যে। সেকালে বাঙলার সীমানা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে, মিলন ঘটেছে বিভিন্ন সংস্কার ও সংস্কৃতির। অগ্রগামী ইতিহাস-সন্ধানীগণ তার পরিচয় বিস্তৃতভাবে রেখে গেছেন। বাঙলার এই পশ্চিম প্রান্ত বরাবর পর্বতদেবতার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। ওরাওঁদের 'বরপাহাড়ী', ধীমলদের 'ওরাং বেরাং', নাগবংশী ও মুণ্ডারীদের 'বরদেও'র মতো সাঁওতালদের জাতীয় দেবতা পর্বতেশ্বর 'মারাং বরু'। এঁর আদি প্রতীক পর্বতস্তূপ, পরে হয় লিঙ্গ [২৮]। কিভাবে এই পর্বতদেবতা শিবস্বরূপে লীন হয়ে গেলেন, 'বৈজুনাথ'-এর উপকথার মাধ্যমে হাণ্টার তার দৃষ্টান্ত এঁকে রেখেছেন [২৯]। তাঁর মতে এই মিলন হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে। ফলে, শিব ও শিবপূজা সাঁওতালী ভূতশান্তির অঙ্গীভূত হয়ে যায় [৩০]। এরাও আগে ইষ্টদেবতার কাছে নরবলি দিত, এখন দেয় মহিষ, শ্বেতছাগ ও মোরগ বলি। মারাং বরু যখন হলেন 'মহাদেও' বা শিব, তখন শিবপূজাতেও ঐসব পশু বলিদান ও শিব-লিঙ্গে রক্তদান বিহিত হল। শিব হলেন বলিকামী রক্তপিপাসু 'মহাদেও', তাঁর আবাসের নাম হল 'মহাদেও-আস্থান'।

গ্রাম্য কৃষি-পরিবেশে সূর্যদেবতার পরিকল্পনা স্বাভাবিক সংস্কার ও সংস্কৃতি। দক্ষিণ মধ্য ও পূর্ব ভারতের আর্যেতর সূর্যপূজা উপাসকদের জীবনসংগ্রামের অনুগামী :—A sun-god is at the head of the pantheon of the most, perhaps all, the Munda-speaking tribes of Chhoto Nagpur and the Santals at all events [৩১]। লোকায়ত সমাজে এই সূর্য বিভিন্ন নামে বিরাজমান। ওরাওঁ মালার খোন্দদের মতো সাঁওতালী সূর্যদেবতা 'চান্দো'। এই অনার্য সূর্যদেব ও শিব অভিন্ন হয়ে যান। 'সুরজাহি'-দেবতার পূজারীতি রূপগুণ এবং শ্বেত মোরগ ও শ্বেত ছাগ শিবের প্রাপ্য হল।

ওরাওঁদের সূর্যদেবতা 'ধর্মেশ' নামে পরিচিত [৩২]। উড়িষ্যার 'ধরমদেওতা' [৩৩] ও পশ্চিম বাঙলার 'ধর্ম ঠাকুর' এঁর আত্মজ। 'ধর্ম' সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে তা থেকে জানা যায়, এই আদিম দেবতার পূজারীতির শাস্ত্রবন্ধন ও শাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠা দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এবং এঁর উপাসনায় বৌদ্ধশৈব নাথ ও তান্ত্রিক আচারাদির মিশ্রণ ঘটেছিল [৩৪]। ফলে, আদিম সৌরদেব হলেন ধর্ম থেকে বুদ্ধ, শেষে শিব, ধর্মপূজা থেকে বুদ্ধপূজা, শেষে শিবপূজা। শিবের চরিত্রে ও উপাসনায় উপরি-উক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচারের মিশ্রণও সহজাত হল। 'শূন্যপুরাণ' ও 'ধর্মপূজাবিধানের' তুলনামূলক আলোচনায় এই রূপান্তর ও মিশ্র রূপের পরিচিতি ধরা পড়ে, যেমন মিশ্রণ দেখা যায় উড়িষ্যার বৌদ্ধ-বৈষ্ণব কাব্যগুলির মধ্যে। শিব হলেন শূন্যমূর্তি প্রস্তররূপী বিচিত্র প্রতিমা আর চিত্রিত লিঙ্গ। শিবপূজার নাম হল 'ধরমভরা', বলি হল তাঁর অর্ঘ্য। স্থাপনডাক

তাম্রধারণ বারমতী পাটভাঙ্গা বেড়ামনঞ্চি ইত্যাদি জাদুবিদ্যাশ্রয়ী আধাভৌতিক ও যৌনোপাসনার প্রথা ও রীতি তাঁর মূল স্বরূপকে আবৃত ও অস্পষ্টতর করে তুলল।

লোকসমাজবাহিত এই সূর্যপূজার বৃহত্তম আদি অনুষ্ঠান গাজন-গম্ভীরা। বিহারের 'ছটপরব', ময়ূরভঞ্জের 'উড়াপরব', ছোটনাগপুরের 'মাণ্ডাপরব', উড়িষ্যার 'সাহীযাত্রা', কূর্মীমাহাতোর 'বিধুপরব', বাঙলাদেশের 'গাজন-গম্ভীরা' চড়ক পাট দেল এবং দাক্ষিণাত্যের সমজাতীয় অনুষ্ঠান সৌর উপাসনাজাত কৌম উৎসব ৩৫। কোচবিহারে সূর্যপূজা হুতোমপূজায়, জলপাইগুড়িতে গমীরায়, অন্যত্র সূর্যের বা ধর্মের গাজন বুদ্ধের ও পরে শিবের গাজনে পরিণত হয়। ধর্মের শিবত্বলাভই এর মূল বলা যেতে পারে। 'পাল রাজাদের আমল হইতেই শিবের গাজনের উদ্ভব'৩৬, এ সম্পর্কে নিঃসংশয়িত হওয়া না গেলেও ত্রয়োদশ শতকের আগেই যে ধর্ম শিবে রূপান্তরিত হন, তা অনুমান করা যেতে পারে। গাজনের প্রধানতম অঙ্গ চড়কপূজা। আকাশপথে সূর্যের বৃত্তাকার ভ্রমণের অনুকরণে চড়ক ঘোরে। একদা সূর্য-সাযুজ্যলাভের বাসনায় আদিম মানুষ ঘুরত চড়কে, আজ শিবের নামোচ্চারণ করে তাঁর প্রীতিকামনায় ভক্তরা চড়কে ওঠে। শূন্যমার্গে সূর্য-পরিক্রমার আর একটি প্রতীক রথ। ভারতের দক্ষিণ উপকূল বরাবর অনুষ্ঠানে ও মন্দির গঠনে (সূর্য) রথের ব্যবহার সর্বজনীন। এই আদিম রথযাত্রা-রীতি লোকায়ত সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ, যা পুরীর জগন্নাথ, নেপালের মৎস্যেন্দ্রনাথ, জৈনদের পরেশনাথ ইত্যাদি যাত্রায় পরিণত হয়েছে। বিষ্ণু <২·৮> প্রভৃতি পুরাণে সূর্য এবং অন্যান্য দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ মেলে। বাঙলাদেশেও অনেক স্থানীয় দেবদেবীর রথযাত্রা হয়। সৌর স্পর্শে শিবেরও 'পুষ্পরথ' উৎসব হয়। মালদহে বৈশাখী বৃহস্পতিবারে 'রথাই' অনুষ্ঠান অবশ্যকরণীয়। লৌকিক গানে শিবের রথযাত্রা ও মালঞ্চবাড়ী গমনের কথা আছে। কোচবিহারে কৃষ্ণ রথারোহণে এসে শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তারপর দোল-উৎসবের সূচনা হয়। অর্থাৎ শৈবরথ এখন কৃষ্ণে সমর্পিত, প্রথাটি তার স্মরণিকা।

গাজনের সবচেয়ে উল্লেখ্য অংশ এর আত্মনির্যাতিত আত্মনিবেদন। বাণফোঁড়া ঝাঁপান ভর পাটভাঙা তামাকটীকা হনুমানমুখা মশাননৃত্য শবনৃত্য কাঁটাঝাঁপ বঁটিঝাঁপ ইত্যাদি 'গাজুনে সন্ন্যাসী'দের করণীয় প্রথা—যা দেখে হরিদাস পালিত বলেছিলেন, 'ইহাতে ভূতের পূজারই ঘটা বেশি'। এগুলি জাদুবিদ্যাশ্রিত আধা-ভৌতিক ক্রিয়া। ভূতনাথ-শিবের গাজনমেলায় উপনীতির সঙ্গে সঙ্গে আর্যেতর ভূতশান্তির এই আঙ্গিকগুলি তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। গাজনে সাময়িক মণ্ডপ রচনা করে যে উপাসনা হয়, তাও আদিম রীতি ৩৭। রাজকীয় আনুকূল্যে যখন একে একে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, তখন গম্ভীরায় অস্থায়ী মণ্ডপতলে তাঁর পূজা হয়। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে গুজরাট পত্তনকালে 'মহেসমণ্ডপ' স্থাপনার একটি চিত্র পাওয়া যায় ৩৮। আজও শিব একদিকে মন্দির অন্যদিকে মণ্ডপে সমভাবে বিরাজমান। আর তারই আশেপাশে গাছের তলে পাহাড়ের কোলে তাঁর

সংখ্যাহীন প্রতীকচিহ্ন শিবলিঙ্গরূপে পথচারিণীদের কমণ্ডলু থেকে কয়েক গণ্ডূষ জলের জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। এইভাবে বাঙলাদেশে 'আদিম সূর্যপূজার বহু উপকরণ লৌকিক শৈব ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে' ৩৯, বহু সূর্যব্রত ও সূর্যকথা শিবব্রত ও শিবকথায় পরিণত হয়ে গেছে।

ই। এর পর নিম্নবঙ্গ। বাঙলার গ্রামে গ্রামে যে সব স্থানিক প্রমথ সীমিতগণ্ডী লোকসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, তাঁরাও অনেকে কালক্রমে শিবের সঙ্গে মিলিত হন। এইরকম একজন প্রমথশিব হলেন চব্বিশ পরগণার স্বনামখ্যাত 'পঞ্চানন' ও তাঁর বিভিন্ন রূপমূর্তি। এঁর প্রণামমন্ত্রে আছে: পঞ্চানন্দ জটাধারী শৃঙ্গ-ডমরুবাদনঃ। ভূতনাথঃ জরাসুরঃ পঞ্চানন্দঃ নমোঽস্তু তে ৪০। ভূতনাথ-জরাসুর মারীদেবী শীতলার নিত্যসঙ্গী অন্যতম মারীদেবতা। শীতলার সঙ্গে যুক্ত থাকায় শিব অন্যতম মারীদেবরূপে পরিচিত হলেন। গাজনে পাই 'নন্দী-মহাকাল'কে, চেতলা-বেহালা অঞ্চলের 'গোমুখ-পঞ্চানন্দ' এঁরই আরেক রূপ। মিশ্রণ এখানেও হয়েছে। পাইকানের 'পঞ্চানন্দ' নরবাহন। এঁদের সকলের কেন্দ্রীয় রূপ অর্থাৎ প্রমথেশ হাওড়ার 'পাঁচুঠাকুর'। ইনিও শিবের সঙ্গে মিলিত হন। 'সারদাতিলক'ধৃত 'নীলকণ্ঠ পঞ্চানন' ইনি নন, পুরাণের তিলোত্তমা-মুগ্ধ পঞ্চাননও নন। 'পঞ্চানন মঙ্গল' কাহিনীতে পাঁচুঠাকুর বৃক্ষাধিষ্ঠিত ভৈরব বা ক্ষেত্রপাল। রক্তপাল শিশুগ্রীব প্রভৃতি দ্বারপাল তাঁর অনুগামী, 'গোমুখ দ্বারপালঞ্চবেষ্টিত নাগভূষণং'। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান দৈত্যদানারা সাধারণতঃ দ্বারপাল নিযুক্ত হন। পঞ্চাননের আদি উৎস বৃক্ষ ও প্রস্তর উপাসনা, উৎপত্তিস্থল রাঢ়দেশ। ধর্মঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর মিলমিশ হয়েছে এবং শিবের ধ্যানে দুজনেই আহূত হয়েছেন। শীতলাপুত্র বসন্তরায় পঞ্চানন-সঙ্গী, তাঁর প্রতিমা শিব-সদৃশ ৪১। এইভাবে 'ব্যাধীনামীশ্বরঃ' দেব-পঞ্চানন গ্রহণ করেছেন ধন্বন্তরি পঞ্চানন্দ-শিবের প্রতিমূর্তি ; তাঁর পূজা আজ 'শিবের পূজা'।

ঈ। পূর্ব বাঙলায় শিবের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল স্থানীয় প্রমথদের মধ্যে, কথায় ও ব্রতে। যশোহর-ফরিদপুর জেলার 'হ্যাঁচড়া' ফোড়া-পাঁচড়ার ধন্বন্তরি। ইনি মারীদেবতা ও কৃষিঘনিষ্ঠ। এঁর সঙ্গে শিবের যোগ হয় ; হ্যাঁচড়ার গানে শিব বন্দিত হয়েছেন। নদীয়ার 'হাজরা'র সঙ্গে এই 'হ্যাঁচড়া' দেবতার সম্পর্ক হয়ত ছিল ; দুজনেই কৃষিদেবতা। 'ঘণ্টাকর্ণও' সমজাতীয় প্রমথ।

চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথের সঙ্গে শিবের মিলন অনেক পরে হয়। চন্দ্রনাথ যে মূলত কৌম দেবতা, তাঁর কাহিনীর অন্তর্গত ব্যাধ ও মৃগ-মৃগীর আখ্যায়িকা তার স্বাক্ষর। পরবর্তীকালে ইনি বৌদ্ধ দেবতায় রূপান্তরিত হলেন ৪২। চট্টগ্রাম বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল ; এখানে বৌদ্ধ-অবশেষ যেমন আজও ছড়িয়ে আছে, তেমনি চৈত্র-শেষের সংক্রান্তিতে এখানে ভীড় করেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দল। মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তারানাথ চন্দ্রনাথে ও আদিনাথ আদিনাথে পর্যবসিত হলেন। কালপ্রবাহে পুরাণের আশ্রয়ে দুটি প্রতিমাই শিবরূপে লীন হয়ে যায়। এখন চট্টগ্রাম অন্যতম

প্রধান শৈবতীর্থ। তাঁর 'কথা'য় বলা হল : কাশীতে ব্যাসদেব তপস্যার্থে এলে অন্যান্য মুনি তাঁকে জারজ বলে বিতাড়িত করেন ; ব্যাসের বন্দনার আকর্ষণে শিব এসে তাঁকে পাঠালেন চট্টলে শ্রীচন্দ্রশেখরে : 'মোক্ষপ্রদ শিবময় অতি স্বাস্থ্যকর। সিদ্ধপীঠ বলে খ্যাত বলিমু বিস্তর। যদিও পার্ব্বতীনাথ বহুস্থানে রাজে। কলিতে সম্পূর্ণ অংশে চট্টলে বিরাজে'। চট্টলেশ্বরী এঁর স্ত্রী ৪৩।

উ। ইসলাম ধর্ম যখন আত্মসম্প্রসারণে তৎপর, বাঙালীর মননশীলতা তখন স্মৃতিশাস্ত্র রচনার মাধ্যমে গৃহবন্ধনে প্রবৃত্ত। কিন্তু এই কূর্মবৃত্তি ইসলামের প্রভাব থেকে দেশকে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারল না, কালক্রমে তার অনেক ভাবনা বাঙালীর নব্য সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। কারও কারও মতে, ত্রয়োদশ শতকের আগে বাঙলায় সুফী ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ৪৪। কিন্তু এবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণাভাব। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে বাঙলায় সুফী প্রভাবের সন্দেহাতীত সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তবে তুর্কী বিজয়ের প্রথম থেকে দেউল-দেহারা ভাঙার মধ্যে দিয়ে যে ইসলাম ধর্মের আত্মবিস্তারের চেষ্টা সুরু হয়, সে তথ্য স্বীকৃত। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল (১২৬৬—৮৭ খ্রী:) থেকে ইসলামের 'আধ্যাত্মিক জয়াভিযানের' যথার্থ সূত্রপাত বলে ইতিহাসের ধারণা। কালক্রমে এখানে একাধিক সুফী সম্প্রদায়ের আগমন হয়। ভারতের অন্যান্য অংশে যখন সুফীপ্রভাবে অন্তরঙ্গ মরমীয়া সাধনায় আত্মনিবেদনমূলক ভক্তিবাদ, শাস্ত্রীয় রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা এবং জাতিভেদবিরোধী সাম্যমূলক মনোভাবের নবীন চেতনা বহমান, তখন বাঙলায়ও তার প্রতিধ্বনি শোনা যেতে থাকে ৪৫।

অন্তরঙ্গ দেবতাবাদ ইসলামের দান, কিন্তু শুধুই ইস্‌লামের নয়। উপনিষদ পুরাণ যোগ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র ও সাধনায় অন্তরঙ্গ উপাসনা দুর্লভ নয় ; লৌকিক ধর্ম-সাধনায়ও আছে অন্তরঙ্গতার সুর। অভিজাত দর্শন এবং লোকায়ত কল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই সাযুজ্যের মাধ্যমে ইষ্টদেবতা হন ভক্তের পরমাত্মীয়। বস্তুত উপাসনার এই বিশেষ ধারাটি সর্বজনীন, দেশে-দেশে তার বিবিধ রূপ। তাছাড়া সুফী ধর্মে বেদান্তের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। আদিম মানব জীবনলীলার প্রয়োজনে প্রমথসহ একাত্ম হওয়ার কল্পনা করেছিল, এখন সে প্রবৃত্ত হল মানসলীলার আয়োজনে দেবতাসহ অন্তরঙ্গতায় ; আত্মরক্ষা থেকে আত্মনিবেদনে, মরসাধনা থেকে মরমীয়া সাধনায়। ইসলামপূর্ব বাংলা সাধন-সাহিত্যে তার তির্যক প্রকাশ দুর্লভ নয়। এমন-কি চর্যাপদাবলীর চলার পথে কান পাতলে তন্ত্রসাধনার রূপকব্যঞ্জনার পাশে-পাশে মরমী প্রেমসাধনার অরূপধ্বনিও শোনা যায়। কারণ মরমীয়া উপাসনা কেবল প্রেমনির্ভর নয়, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও তার আর এক বিকাশ। বঙ্গীয় (তথা ভারতীয়) বাসনালোকে ছিল অন্তরঙ্গ ভাবের বীজ, সুফীসাধনা তাকে প্রাণবন্ত ও উদ্দীপ্ত করে তুলল। শাস্ত্রীয় দার্শনিকতাকে পাশ কাটিয়ে বাঙালী হৃদয়ে বরণ করে নিল ইষ্টদেব-ইষ্টদেবীকে ; সেই সহৃদয়তার অভিব্যক্তি তার ধর্মে সাহিত্যে

শিল্পে, বৈষ্ণব শাক্ত আউল বাউল সাঁই দরবেশ সহজিয়া প্রভৃতি তত্ত্বে। অন্যদিকে এই অন্তরঙ্গ সাধনার স্পর্শে দেবতা হলেন মানব—গৃহলীলা ও প্রেমলীলার সপ্রাণ পুত্তলিকা।

বাঙলায় ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণে ডঃ তারাচাঁদ বলেছেন, এখানে বহুপ্রচলিত শিবপূজা ব্যাহত হল, অন্তরঙ্গ আরাধনার সামনে অবনত হল শিব-উপাসনা ৪৬। এই মন্তব্য সর্বাংশে সমর্থন করা যায় না। সেন রাজাদের পৌরাণিক ধর্মের পোষকতা, পুরাণশিবের জনপ্রিয়তা এবং বাঙালীর স্বভাব-বিরোধিতার ফলে এখানে যোগাশ্রিত শৈবধর্ম ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। স্থানীয় লোকায়ত মেজাজও যোগসাধনাকে যথাযথ গ্রহণ করতে পারে নি, আর 'বাঙালীর বাচ্চা হাড়ে হাড়ে লোকায়ত' ৪৭। সুতরাং বাঙলায় যে-শিবপূজা ব্যাহত হয়েছিল, সে এই দার্শনিক যোগধর্ম, যা শিব-উপাসনার একটি বিশিষ্ট মার্গ মাত্র। পৌরাণিক শিবপূজা যে অব্যাহত ছিল, কাব্যে বন্দিত শিব ও শৈবতীর্থগুলি তার প্রমাণ। তবে শিব ও শৈবধর্মকে কেন্দ্র করে বাঙালী নতুন কোন গৌড়ীয় গোষ্ঠী সম্প্রদায় বা তত্ত্বরূপ গড়ে তোলে নি, যেমন হয়েছিল বৈষ্ণব শাক্ত ও তন্ত্রের ক্ষেত্রে। কিন্তু ইসলামী প্রভাবই এর জন্যে একমাত্র দায়ী নয়, অন্যান্য কারণও আছে।

সেন রাজারা প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে হলেন বৈষ্ণব। শিবকে সরিয়ে বিষ্ণু পেলেন রাজকীয় আনুকূল্য। বাঙলার নিজস্ব দেবতা চণ্ডী মনসা প্রভৃতির প্রতাপ ও প্রভাবে নির্বিরোধ শিবকে সরে যেতে হয়েছিল ধর্মকলহের প্রান্তর থেকে। একদিকে পুরাতন সহযাত্রী বিষ্ণু-কৃষ্ণ অন্যদিকে দেশজ গণদেবতা, উভয়পক্ষের আত্মপ্রসারণের চাপে মধ্যবর্তী পুরাণশিবের চলার পথ কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল। তিনি দেব-সার্বভৌম হতে পারেন নি; তা ব'লে প্রধান দেবতাদের আসন থেকে বিচ্যুতও হননি। যে চাঁদ সদাগর দক্ষিণ হস্তে শিবের সেবা করতেন, তিনি মনসার পূজা করলেন বামহস্তে। লোকশিব এবং পৌরাণিক শিবপূজাকে আশ্রয় করে বাঙালী মাহেশ্বর-পাশুপত সম্প্রদায় ও সাধনাকে সরিয়ে রাখল। সুফী সাধনার পরোক্ষ প্রভাবে বাঙালীর শিব তত্ত্ব হয়েও ভক্তের হৃদয়দেবতা, আরাধ্য হয়েও আত্মীয়; কিন্তু যে অর্থে সুফীর 'আসীক', বৈষ্ণবের 'বঁধু', বাউলের 'মনের মানুষ', সে অর্থে নয়। তিনি রাহস্যিক তত্ত্ব বা প্রিয়তম প্রেমিক নন, মাটির মানুষের প্রিয়তম আত্মীয়, অতি নিকটের ও অতি সুগম। ধর্মভূমির এই সাধনদৃষ্টি সাহিত্যভূমিতে প্রতিফলিত হয়েছে। ভক্ত-কবি দেবতার ছবি এঁকেছেন ভালবাসার তুলি দিয়ে, ভালবাসার গভীরতায় দেবতা হয়েছেন মানব, তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে ঘরের কথা, ভাবের কথা, অন্তরের কথা। অন্তরঙ্গ দেবতাবাদ উপনীত হয়েছে জীবনবাদ ও মানবতাবাদে: বাস্তব তার উপচার, কল্পনা তার মন্ত্র, সাহিত্য তার আধার, কবিচিত্ত পুরোহিত।

কোর্‌আন শরীফে আল্লাহ্‌র যে 'শক্তি-জ্ঞান-করুণা'র কথা বলা হয়েছে, শিবের

মধ্যেও সেইসব বিভূতি বিদ্যমান। তাই তিনি বিরোধিতা সত্ত্বেও আত্মবিলোপ করেন নি, আত্মসাৎ করেছিলেন। পরাজিত ভক্তের পক্ষে থেকেও তিনি অপরাজিত, ধর্মসমুদ্র মন্থনের সকল বিষ পান করে নীলকণ্ঠ। প্রবল স্থিতিস্থাপক গুণের জন্যে শিব যেমন বিরোধীপক্ষীয় দেব-দেবীর কাছে নির্জিত হয়েছেন, তেমনি তাদের আশ্রয়ও দিয়েছেন; একদিকে যেমন তিনি শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে 'আদম' রূপ গ্রহণ করেছেন ৪৮, অন্যদিকে তেমনি বৃষ-ত্রিশূল সমেত সশরীরে ও স্বরূপে প্রবেশ করেছেন ইসলামী বেহেস্তে৪৯। সর্বত্রই তিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

উ। প্রধান প্রধান দেবতা ছাড়াও বাঙলার সংখ্যাহীন কৌম প্রমথ শিবদেহে লীন হয়েছেন, স্বল্প পরিধির মধ্যে যাঁদের প্রভাব সীমাবদ্ধ ৫০। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের ভৈরব-গোষ্ঠী, বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর রত্নেশ্বর দুগ্ধেশ্বর শিব, উত্তর ও দক্ষিণ বাঙলার ক্ষেত্রপালাদি, রাঢ় ও চব্বিশ পরগণার বৃক্ষ-প্রস্তররূপী ভূতনাথ ভৈরব প্রভৃতি এই কৌম-শৈব মিশ্রণের স্বাক্ষর। বহিরাগত পৌরাণিক লিঙ্গ উপাসনা যেমন বাঙলায় জনপ্রিয় হয়েছে, তেমনি এখানকার কৌম প্রস্তর-প্রতীকও শিবলিঙ্গে লীন হয়ে গেছে এবং এগুলির সঙ্গে যুক্ত কৃত্য ও কথা শিব ও লিঙ্গপূজা বিধিতে বিধৃত হয়েছে।

ঋ। জিন তীর্থংকরের জীবনাদর্শ (গৌতমবুদ্ধ এবং) শিব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল না। ফলে জৈন ও শৈবধর্মে অচিরে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বাঙলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আদিপুরাণমতে, জিন ঋষভনাথের নির্বাণ হয় কৈলাসে, চৈত্র মাসে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়; জিন পার্শ্বনাথ চৈত্রে জন্মগ্রহণ করেন; এই মাসে শিবেরও গাজন হয়, কারণ 'চৈত্রমাস মধুমাস শিবের জন্মমাস'। শৈব সন্ন্যাসীদের আত্মনির্যাতন এবং জৈনদের কায়োৎসর্গ সমজাতীয় কৃত্য। প্রতিমার ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য দেখা যায়। শিলাপট্টের মাঝে বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট জিন ঋষভনাথ ধ্যানী শিবকে স্মরণে আনে; জিন পার্শ্বনাথও যোগাসনে উপবিষ্ট। সর্পফণাছত্রধারী ঋষভের দিনাজপুরী মূর্তিটি শিবের মত বৃষভলাঞ্ছন ও যোগী, বাঁকুড়ার পার্শ্বনাথও তাই ৫১। বাণগড়ের বৃষকে জৈন ধর্মের প্রতীক বলেও মনে করা হয় ৫২। কেবলমাত্র উচ্চকোটির উপাসনাজগতে নয়, লোকায়ত স্তরেও শিব ও জৈন তীর্থংকরদের মিলন হয়েছিল, উভয় ধর্ম নিকটতর হয়েছিল ৫৩। দিগম্বর নিগ্রন্থ জৈন এবং নির্ঘৃণ অঘোরী শৈব সাধকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, বায়ু-সাধনা উভয়েরই লক্ষ্য। অবধূত কপালী নাথ ইত্যাদি ধর্মে উভয়ের মিশ্রণ বিচিত্র রূপ লাভ করেছে।

বুদ্ধদেবের প্রভাবে নটরাজ রুদ্র পরিণত হয়েছিলেন ধ্যানী শিবে। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম এবং বৌদ্ধমূর্তি ও শৈবমূর্তি পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। রাজশাহীর চিত্রশালায় রক্ষিত ষড়ভুজ লোকেশ্বরের হাতে দেওয়া হয়েছে বরমুদ্রা অক্ষমালা কমণ্ডলু ত্রিশূল। মহাস্থানের মঞ্জুশ্রীর জটায় ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য বিরাজিত,

যেমন গঙ্গা বিরাজমানা শিবের জটায়। ত্রিপুরার বজ্রযানী-হেরুক ভৈরব-রুদ্রেরই বৌদ্ধ রূপায়ণ ; ইনিও নৃত্যপর কপালী বজ্রী নরমুণ্ডমাল খট্বাঙ্গধারী এবং মঞ্জুশ্রীর মত অক্ষোভ্যশির। অন্যদিকে শিব মূর্তিতেও বৌদ্ধ প্রতিমায়ন বিদ্যমান। মহাদেব এবং মহাকাল-লোকেশ্বরের পূজা অপৃথক, প্রতিমাও। দ্রংষ্ট্রাকরাল নৃত্যপরায়ণ হেরুক-বজ্র বাঙলার নটরাজকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে, ধ্যানীবুদ্ধ শিবের রুদ্রত্ব ও যাযাবরত্ব লুপ্ত করে তাঁর দেহে স্থিতধী ধ্যানশীলতা এনে দিয়েছে, অবলোকিতেশ্বরের অনুকরণে রুদ্রশিব হয়েছেন আশুতোষ-শংকরমূর্তি। অনেক স্থানে বুদ্ধমূর্তি বর্তমানে শিবরূপে পূজিত হচ্ছেন। হাজারীবাগের কলুহা পাহাড়ের ভৈরোনাথের ৫৪ মত খুলনা জেলার শিববাটি গ্রামের শিবমূর্তি ৫৫, দিনাজপুরের ভৈরোবাবা, মুর্শিদাবাদ-কান্দীর রুদ্রেশ্বর, দার্জিলিঙের দুর্জয়লিঙ্গ এবং গুহাস্থিত ধর্মরাজ ধর্মঠাকুরের মতই বুদ্ধ-শিব দেবতা। বাঙলায় শিব-বুদ্ধের নিবিড়তর মিশ্রণ লোকসংস্কৃতির আসরে, যার ফলে শিবের রূপ হল 'গোসাঞি নিরঞ্জন নৈরাকার শূন্যরূপ'। নাথধর্মের আধাভৌতিক কৌম সাধনাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ জৈন শৈব শাক্ত এবং বেদ পুরাণ যোগ তন্ত্রের এক অভিনব সমাবেশ হয়েছিল ৫৬। নাথদের গুরু বজ্রযানী কিন্তু উপাস্য নাথশিব। ফলে শিব হলেন 'নাথ নিরঞ্জন অলেক সহজ বিন্দু শূন্য'। তাঁর থেকে জাত হন গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ ৫৭। কালক্রমে মৎস্যেন্দ্রনাথ হলেন শিবসদৃশ, অন্যজন 'শিব-গোরক্ষনাথ' ৫৮। কাঠমণ্ডুতে মচ্ছিন্দ্রনাথের রথযাত্রায় মহাদেব জলদ ৫৯, গোরক্ষপুরে তিনি গোরক্ষনাথের ভৈরব প্রহরী, 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহে' 'শিবাদ্ ভৈরবঃ এতস্মাৎ শ্রীকণ্ঠোহত সদাশিবঃ'। অর্থাৎ নাথধর্মে শিব একাধারে ইষ্টদেবতা, নাথ যোগীদের গুরু, স্বয়ং প্রধানতম নাথ-সিদ্ধাই এবং অধীনস্থ জনৈক ভৈরব—কখনও দ্বারপাল, কখনও সারমেয়সঙ্গী কালভৈরব নন্দভৈরব বা একলিঙ্গ। গাজন-গম্ভীরায় বুদ্ধ-শিবের মিলনের উল্লেখ আগে করেছি। আরও অনেক ক্ষেত্রে এই মিলন লক্ষিত হয়।

৯। বাঙলাদেশে এসে বেদ-পুরাণের দেবতার সঙ্গে শিবের আবার মিশ্রণ ঘটেছিল। বৈদিক সূর্য ধর্মঠাকুরের মাধ্যমে শিবকে প্রভাবিত করেন 'শূন্যরূপম্ দিবাকরম্' রূপে ৬০। গুপ্তযুগ থেকে বাঙলায় সূর্যমূর্তি মেলে এবং শিবসহ তাঁর মিশ্রণের পরিচয় আছে কেশবপ্রশস্তির মহাবোধিলিপিতে ৬১। সূর্যপুত্র রেবন্তও শিবের নিকটবর্তী হয়েছিলেন পুরাণোক্ত 'রেবন্তেশ্বর শিবলিঙ্গ' রূপে। শাকদ্বীপী সূর্য ও ও রেবন্ত কুষ্ঠরোগ নিরাময় করেন। আমাদের ধর্মঠাকুর (এবং রাজদুর্গাও) কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করেন। এঁদের সহায়ে শিব হলেন কুষ্ঠরোগহর। একদা নালন্দার সূর্যমন্দির কুষ্ঠরোগীদের তীর্থস্থান ছিল, এদেশে হল শিবমন্দির। তারকেশ্বর এক্তেশ্বর রাঢ়েশ্বর প্রভৃতি শিব মগী সূর্য ও তাঁর পুত্রের মত শ্বেতিরোগহর। বেদ থেকে পুরাণ অবধি রুদ্রশিব ও বাসুদেব-কৃষ্ণের মধ্যে বহুবার

সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারও পরে, দক্ষিণ ভারতের মত বাঙলায়ও শিব ও বিষ্ণু পরিভ্রমণপথে মিশ্রণের সম্মুখীন হয়েছেন। কেশবপ্রশস্তির মহাবোধিলিপির সূর্য-বিষ্ণু-ভৈরব এবং দিনাজপুরে পাওয়া বুদ্ধ-বিষ্ণু-শিবের ত্রিমূর্তি এই সংমিশ্রণের স্বাক্ষর।

পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে ওপরতলায় এই যে মিলনের সেতু রচনা, লৌকিক সাধনার ক্ষেত্রে তা আরও ব্যাপক ও গভীর। কোম ধর্মঠাকুর পুরাণের স্পর্শে প্রথমে বিষ্ণু, পরে শিব হন। ঢাকার লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তিতে উমা-মহেশ্বরের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তামিল শৈব সংগীত যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর মত প্রেমভক্তি-রসাশ্রিত, তেমনি বিদ্যাপতির শৈবপদ তাঁর লেখা বিষ্ণু-পদকে স্মরণীয় করে তোলে। বিদ্যাপতির হরিহর বন্দনা, বাঙলার হরিহর প্রতিমা, বৈষ্ণব সাহিত্যে শিব-বিষ্ণুর মিলন—প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমকালীন ভাবনার অনুগামী ৬২। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব সমজাতীয় শিব-কথায় প্রকাশিত ৬৩; শিব এখানে লীলারত প্রেমিক-পুরুষ।

এইভাবে বাঙলাদেশে শিব এবং অন্যান্য দেবতা ও প্রমথের মধ্যে মিশ্রণ সম্পাদিত হয়েছে। এই সংমিশ্রণের রূপ পুরাণ তন্ত্র যোগ ইত্যাদি সাধনা ও শাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করেছে। গ্রামতান্ত্রিক লিঙ্গপূজাবিধি ৬৪ এবং আর্যেতর সাধনাচারের বহুতর অঙ্গ শাস্ত্রীয় হয়ে উঠেছে ৬৫। কিন্তু বাঙলায় এই মিশ্রণের আগে মূল পুরাণগুলি রচিত হয়ে যাওয়ায় দেশজ শিব-প্রমথেশবৃন্দের অনুমোদন কয়েকটি অর্বাচীন পুরাণ তন্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রে দেখা যায়, তাও সর্বাংশে ও সবগুলিতে নয় ৬৬। তথাপি জনসাধারণ তাঁর সকল রূপের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে শ্রদ্ধানতচিত্তে আজও ধ্যান করে চলেছে : ওঁ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভায় চ॥ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। (রুদ্রাধ্যায় ৪১)।

২। শিব-শক্তি

ঋগ্বেদে একটি সূক্তে (১০. ৭১. ৯) 'তন্ত্র' শব্দের উল্লেখ আছে। তার 'তন্বতে তন্ত্রম্'-এর ব্যাখ্যায় আচার্য সায়ণ বলেছেন, 'কৃষিলক্ষণম্ বিস্তারয়তি কুর্বন্তি'; অর্থাৎ তন্ত্রের বিস্তার অর্থ কৃষির বিস্তার। এখানে তন্ত্রের প্রবক্তা বলা হয়েছে 'সিরী'দের, যার অর্থ করা হয়েছে—চাষী, তাঁতি। সুতরাং তন্ত্র ও কৃষি শব্দ দুটিকে সমার্থক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। লোকায়ত সংস্কৃতির গণ্ডীতে মাতৃকা, তন্ত্র ও কৃষির ঘনিষ্ঠ যোগ এবং বিবর্তনের যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। বাঙলা কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে তন্ত্রের সমধিক প্রাধান্য, মাতৃকাশক্তির উপাসনা প্রবলতর। বাঙালীর আদিম সংস্কৃতিতে যে জাদুবিদ্যাশ্রিত সাধনা, তার একদিকে বিভিন্ন কৃষিঘনিষ্ঠ কৃত্য ও উৎসব, অন্যদিকে পৃথ্বী-শস্য-নারী

প্রভৃতি দেবীদের সর্বজনীন পূজাবিধি। আর্য ধর্মের সংস্পর্শে এসে অনেকগুলি রূপান্তরিত হয়েছে, অনেকে স্বরূপে বিগুমান থেকেছে। বঙ্গসমাজে আবির্ভূত শিব এইসব কৌম দেবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নূতন 'শক্তি' লাভ করলেন। এই মিলনের পশ্চাতে অনেকগুলি কারণ একই কালে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, বৌদ্ধ প্রভাবের অস্তগমনের পর শিবের সীমাহীন জনপ্রিয়তা তাঁর বহুবল্লভা লাভের পথকে সুগম করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পুরাণের যে শিব লোকমনে প্রভাব বিস্তার করেছেন, তিনি শিবানীসহ দ্বৈত রূপাশ্রিত। অতএব তাঁর উত্তরাধিকারী বঙ্গীয়-শিবও অদ্বিতীয় থাকতে পারেন না। তৃতীয়ত, পূর্ব আলোচনায় লোকশিবকে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রমথেশদের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখেছি; অধিকাংশ মাতৃকা এইসব প্রমথের স্ত্রী বা শক্তিরূপে বিরাজিতা ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সঙ্গিনীরা শিবের শক্তি-রূপে প্রকীর্তিতা হলেন। চতুর্থত, লোকসংস্কৃতির উজ্জীবনের মুখে গ্রাম্য দেবীরা যখন আত্মবিস্তারে প্রবৃত্ত হলেন, তখন নিজ নিজ পূজা ও মহিমা প্রচারের সুবিধার জন্তে তাঁরা শিবকে আশ্রয় করলেন। পঞ্চমত, কৃষক বাঙালীর দৃষ্টিতে দেবদেবীর যুগনদ্ধ রূপই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য। অতএব একক-শিবের আরাধনা তার চিত্তে স্থায়ী আসন পায়নি, অচিরেই যুগলরূপ অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে 'পুরাণ-শিবের' আবির্ভাবে মরীঅম্ম, মীনাচীঅম্ম, কালীঅম্ম অম্মবরু প্রভৃতি আদিম দেবীগণ তাঁর স্ত্রী, ভগিনী ইত্যাদি আত্মীয় সম্বন্ধে যুক্ত হয়েছিলেন। বাঙলাদেশেও আর্যেতর দেবীগণ শিবের স্ত্রী, কন্যা অথবা শুধুই শক্তিরূপে সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। কোথাও সম্পর্কটি স্পষ্ট, কোথাও বা আবছায়া। দাক্ষিণাত্যে পৌরাণিক শিব ও বিষ্ণু দুজনেই একই কালে পদার্পণ করেছিলেন কিন্তু শিবের শক্তির সংখ্যাই বেশি। বাঙলাদেশে যখন এই ধরণের মিশ্রণ ঘটতে থাকে, তখনও বিষ্ণু জনগণের মধ্যে শিবের মত প্রসারিত হন নি। পরে যখন 'কানু ছাড়া গীত নাই'-অবস্থা সূচিত হল, তখনও তিনি কৌম দেবতাদের সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠতা করেন নি। তাঁর শক্তি রাধা বাঙালী কোমের উপাস্যা কোন প্রত্যক্ষা দেবী নন, অবাঙালী ও বাঙালী কবি-সাধকদের মিলিত মানস-কল্পনাজাত দৈবীশক্তি ও বৈদেহী নায়িকা মাত্র; তাঁর মূর্তিগঠনও পর-কালের। কিন্তু শিবের সঙ্গে যুক্তা প্রমথিনীগণ ছিলেন লোক-সমাজবাহিতা, প্রত্যক্ষ বস্তুজগতের উপাস্যা। তাই আর্য-আর্যেতর সংস্কৃতির মিলনসংগমে মূলত তাঁরই অবগাহন। বিষ্ণুর মধ্যেও অবশ্য বস্তুতন্ত্রের ছায়া ছিল; কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ মূলতঃ ভাবভিত্তিক অতীন্দ্রিয় কল্পনা।

বাঙলাদেশে ভারতশিবের যে নবরূপান্তর, তা দুইপথে হয়েছিল। একদিকে তিনি পরিণত হচ্ছিলেন লোকশিবে, অন্যদিকে স্থানীয় মাতৃকাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছিলেন। একই সময়ে একই কারণে শিবের এই দ্বৈধ রূপান্তর ঘটেছিল। দুটি

কারণে আমরা পুরুষদেবতার পরে মাতৃদেবতার আলোচনার স্থান নির্দেশ করেছি। এক, আর্যভারতে মাতৃকাচক্রের মধ্যে থেকে আদিতে গৃহীত হয়েছেন একক প্রমথ-শিব। বাঙলাতেও আর্য মননের এই বৈশিষ্ট্য নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। দুই, একক শিবের রূপটি অসম্পূর্ণ, শিব-শিবানীতেই সম্পূর্ণতা ; দুজনকে 'আলম্বন' করে কর্মগত কৃত্যকল্পনা, ধর্মগত দার্শনিকতা এবং কাব্যগত লীলাবিলাস। তাই শিবের অদ্বিতীয় রূপের পরিচিতি লাভের পরে তাঁর দ্বিতীয়াসহ চিত্রটি ধ্যেয় হল।

অ। চণ্ডীঃ শাক্ত সাহিত্যের সর্বাধিক প্রিয় দেবী চণ্ডী। বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরাধ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডী। ইনি বন্যপশু ও ব্যাধ-পূজিতা। বণিক-সদাগর উপাসিত কমলেকামিনী বা গজলক্ষ্মীকে এঁর প্রকীর্তিত রূপ বলে গণ্য করা হয়েছে। কালকেতুর কাহিনী থেকে অনুমিত হয়, মঙ্গলচণ্ডী অনার্যা দেবী, বন ও পশুর পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী। ওরাওঁদের শিকার ও যুদ্ধের দেবী 'চাণ্ডী' বা 'চান্দী' পশ্চিম বাঙলার মঙ্গলচণ্ডিকার অন্যতম উৎস। মার্কণ্ডেয়-দেবী-শিব-কালিকা প্রভৃতি পুরাণে যে চণ্ডীদেবীর সাক্ষাৎ মেলে তিনি ছিলেন বিন্ধ্যাচলবাসিনী, অর্থাৎ অবাঙালিনী আর্যেতর দেবী ৬৭। বঙ্গবালা চণ্ডীর শাস্ত্রীয় রূপায়ণে তাঁর প্রভাব কম ছিল না। বিভিন্ন তন্ত্রে চণ্ডিকা সদৃশা 'শান্তোগ্রা' দেবী পরিকল্পিতা হয়েছেন। তাঁরাও স্পর্শ রেখেছেন। চণ্ডীকাব্যের দেবী তাই একদিকে যুদ্ধের রুদ্রা দেবী এবং পূজাগ্রহণে তৎপরা, অন্যদিকে বরদাত্রী দুর্গার মত অভয়া ও ভক্ত-বৎসলা। উত্তরবাঙলায় মঙ্গোলদের প্রতাপশালিনী দেবী কালী। এই অঞ্চলের পালযুগীয় শবাসনা 'উগ্রতারা' মূর্তি শ্যামারূপের পূর্বগা ; সেনপর্বের গোধিকাবাহনা চতুর্ভুজা দেবী-প্রতিমায়ও তাঁর রূপ আভাসিত। আবার ইনি চণ্ডীরও আদিরূপ। চণ্ডী ও কালীর এইসব বিভিন্ন রূপের মধ্যে যে গভীর মিলমিশ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এছাড়া বিভিন্ন প্রস্তররূপিণী প্রমথিনীও শিবানীরূপে গণ্য হয়েছেন। উত্তর বিহারের ঢেলহা গোঁসাইয়ের স্ত্রীর ৬৮ মত মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে আছেন ঢেলাই চণ্ডী ৬৯, উড়িষ্যার বাসলীর ৭০ সগোত্রীয়া বাসলী দেবীও এদেশে দুর্লভ নন। ব্রতকথায় পাই ওলাইচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, শুভচণ্ডী প্রভৃতি দেবীদের। ওলাইচণ্ডী মারীদেবী, ইসলামস্পর্শে হন ওলাবিবি ; অন্যান্য দেবীরা স্থানীয়া, ঘরোয়া প্রয়োজনে কল্পিতা। তারা, আর্যতারা, আম্বা, বজ্রেশ্বরী, বিশালাক্ষী, নীলসরস্বতী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবীও চণ্ডী বা কালীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। বাঙলার প্রমথিনীদের এই মিশ্র রূপ বিভিন্ন শাস্ত্রে বিধৃত ও বিবৃত হয়ে ব্রাহ্মণ্য অনুমোদন লাভ করেছে ৭১।

মাতৃতান্ত্রিক কোচরা যে দেবীর পূজা করত, তাঁকে কালীর আদিমূল বলে অনেকে মনে করেন ৭২। ইনি আগে নরবলি গ্রহণ করতেন, ভক্ত 'ভোগী' হয়ে বৎসরান্তে আত্মোৎসর্গ করত। পাহাড়পুরে এই রকম আত্মদানের একটি খোদাই-চিত্র আছে এবং কিছুদিন আগে পর্যন্তও এঁর কাছে নরবলি দান প্রথা চলিত ছিল ৭৩। ওরাওঁদের ভগত্ এবং গাজনের সন্ন্যাসীদের আত্মনিপীড়ন

এই প্রথার সগোত্র। কোচ-মহাকাল এই কালীর রুদ্র স্বামী ; এবং মহাকালী তন্ত্রের কৃষিঘনিষ্ঠা। তন্ত্রের সর্বতোভদ্র প্রভৃতি মণ্ডল, দেবিপূজায় নবপত্রিকা ঘটাদির ব্যবহার এবং কুলবৃক্ষের মাহাত্ম্য ৭৪ এই ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ। সুতরাং মহাকাল শিব স্বাভাবিক-ভাবে কালীর পতিত্বে বৃত হলেন। এই প্রসঙ্গে রাজবংশীদের বুড়ী ঠাকুরাণীও উল্লেখযোগ্য। ওরাওঁদের ধর্মেশ-গৃহিণী 'ধর্‌তিমাই' পৃথ্বী-দেবী। ব্রাহ্মণ্য স্পর্শে তিনি হলেন পার্বতী, 'মহাদেও—ধর্মেশের' স্ত্রী। 'দেবী-আস্থানের' পাশে 'মহাদেও-থান' নির্দেশিত হল এবং ভৌতিক মন্ত্রপাঠ ও আচারাদির মাধ্যমে দুজনে একত্রে পূজা পেতে লাগলেন। সাঁওতালী শিব বা মহাদেও একইভাবে ভগত্‌দের কুলদেবতারূপে দেবীর পাশে স্থান পেলেন ; দুর্বোধ্য মন্ত্র ও জাদুবিশ্বাসংবলিত তন্ত্রের সাহায্যে উভয়ের উপাসনা সূচিত হল, নতুন নামকরণ হল 'কালী' ও 'ভৈরব', ধর্মের কামিন্যা হলেন তন্ত্রের কালী। ওরাওঁদের যৌনপ্রতীক 'চাণ্ডীপাথর'-এর পাশে এল শিবলিঙ্গ, সাঁওতালী 'মহাদেওপাথর'-এর পাশাপাশি রইল গৌরীপট্ট, উড়িষ্যার ধর্‌মদেওতা-ধর্‌তিমাইয়ের মাঝখানে যেমন এলেন 'নাগেশ্বর-মহাদেও' ৭৫। ধর্মপূজার 'আদ্যা' কৃষিদেবী, প্রতীক ঘট। কালক্রমে ইনি দুর্গা অভয়া ইত্যাদি নাম গ্রহণ করলেন, সঙ্গিনী হলেন নীলাবতী। শিব ধর্মের স্থান অধিকার করলে আদ্যাদেবীর সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হল। দুজনকে ঘিরে যে পূজা, তাইই এখন হল ধর্মপূজা, 'দেবীর মনক্রি' নামক দুর্বোধ্য অনুষ্ঠানাদি শিবকে প্রত্যক্ষ করতে হল। গাজনে থাকে ঘট ও লিঙ্গ, কোথাও কোথাও হরগৌরীর প্রতিমাও পূজিত হয়। কাছাকাছি থাকেন দ্বারপাল ভৈরবেরা ; ভক্তরা ভূতপ্রেত ডাকিনী যোগিনী সেজে নাচগান করে, 'তামাকটীকা' ও 'ধূনা জ্বালান'-র আবছায়া পরিবেশে মিলিয়ে যান পুরাণের কাশীশ্বর শিব ও হিমালয়কন্যা শিবানী।

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে অন্নদা-অন্নপূর্ণার বন্দনা গেয়েছেন। চণ্ডীপুরাণে দেবীর 'ভ্রামরী' রূপের মধ্যে তাঁর শস্য-সংশ্লেষ প্রমাণিত হয়। অন্নপূর্ণা এই 'শাকম্ভরী' দেবীর স্থানীয় রূপ একথা বলা চলে না ; ইনি বঙ্গীয় কৃষিদেবী চণ্ডী-কালীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিবের গৃহে স্থান পেয়েছেন। এইরকম আর একজন দেবতা হলেন চৈত্র মাসে পূজিতা বাসন্তী দেবী। ইনি ও অন্নপূর্ণা আজ অভিন্না হয়ে গেছেন। নাথসাহিত্যে শিবের স্ত্রী পার্বতীকে গোরক্ষনাথ রাক্ষসীরূপে প্রস্তরীভূত করে রাখেন। ময়নামতী ত্রিপুরায় নৃমুণ্ডমালিনী দেবীরূপে এখনও পূজা পান। ময়নামতী পাহাড়ে চতুর্ভুজ শিব ও পার্বতী একত্রে বিরাজ করেন ৭৬। এই কাহিনী ও মূর্তিগুলি কৌম প্রভাবের লক্ষণ ; উত্তরবঙ্গীয় কালীর প্রভাবও এখানে বিদ্যমান। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ তন্ত্রের 'কায়াছায়া শিবশক্তি হৈলা তত্তক্ষণ'। ক্রমে বাঙলাদেশে সংখ্যাহীন অখ্যাতনাম্নী স্থানীয়া গ্রামদেবী চণ্ডী-কালী-দুর্গার বিভিন্ন রূপ এবং শিবের স্ত্রী বলে পরিগণিতা হলেন। বাঙলার উত্তর ও পশ্চিমের গ্রামে গ্রামে এইরকম চণ্ডী কালী দুর্গা অম্বিকা বা অন্নপূর্ণা দেবী শিবসহ আজও বিরাজিতা।

আ। মনসা: চণ্ডীর পরেই উল্লেখযোগ্যা পূর্ববঙ্গের প্রতাপান্বিতা কৌম দেবী মনসা। মনসা নামকরণে কনাড়ী ও তেলেগু তথা দ্রবিড় ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয় [৭৬]। অনেকে তাই বাঙলার মনসাকে দক্ষিণাগতা বলে মনে করেন। আর এক মতে, অস্ট্রিকরা যে নাগের পূজা করত, শক্তি-উপাসক মঙ্গোলীয়রা তাকে দিল নারী-রূপ এবং আল্‌পীয় শৈবরা একে গ্রহণ ও প্রচার করল [৭৭]। অভিমতটি সমর্থনযোগ্য কিনা তা আমাদের আলোচ্য নয়, আমাদের বক্তব্য, জলাভূমি বাঙলার সর্পবাহুল্যই সাপের পূজার কারণ, দক্ষিণীদেবী তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। কৃষিভিত্তিক পরিবেশে মারী ও পশু অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীরূপ গ্রহণ করে, তাই মনসা সর্পদেবী। সাপ যে কৃষি ও প্রজননের সঙ্গে যুক্ত, তার আলোচনা আগে করেছি। মনসার কোলে শিশু, প্রতীক ঘট এবং মনসা-কথার মধ্যে তাঁর কর্ষণ-প্রজনন ঘনিষ্ঠতা সহজেই লক্ষিত হয় [৭৯]। দেবীর প্রাচীনতম মূর্তিটি সেন আমলের বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে [৮০]। শিব সাপ-কৃষি-প্রজননের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সহজেই মনসার নিকটতম আত্মীয় হয়েছেন। চণ্ডীর সঙ্গে শিবের সম্বন্ধ-বন্ধন যত সরল, মনসার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তত জটিল। ভবিষ্য পুরাণে মনসা নাগপিতা কশ্যপের কন্যা ও শিব-আরাধিকা, কৃত্তিবাসের রামায়ণে তিনি শিব-ভগিনী 'কন্দিনী', মনসামঙ্গল কাব্যে শিবের কন্যা। অবশেষে 'শিবকন্যা' রূপটি স্থায়ী হল। গঙ্গার মত চণ্ডী-কালীর প্রতাপের আলোয় বিলীন হয়ে যাওয়ার বাসনা হয়ত তাঁর ছিল না, তার চেয়ে দুহিতারূপেই নিজ কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা অধিকতর। মনসার জন্মকোষ্ঠীকে মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত কার্তিকের বিচিত্র জন্মের দেশীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। একজন জাত হন স্বুবর্ণ পর্বত থেকে শরবনে, অপরজন পদ্মবন থেকে পাতালে; একজনের পালয়িত্রী কৃত্তিকাগণ, অন্যজনের পালক সপরিবার বাসুকি। বৌদ্ধ প্রভাবও লক্ষণীয়; নাথদের সৃষ্টিপত্তনে আদিদেবের দেহ বা ছায়া থেকে যে 'কাকেতুকা' বা 'কেতুকা' দেবী আবির্ভূতা হন, 'কেতকা-মনসার মধ্যে তিনিও বিরাজমানা। দাক্ষিণাত্যের অম্ম-দেবীরাও শিবকন্যা হন এবং দুই দেশেই এই কন্যাকে কেন্দ্র করে শিব ও শিবানীর মধ্যে বিবাদ বেধে উঠেছে।

ই। মারীদেবী শীতলাও কৃষিপ্রজনন ঘনিষ্ঠা [৮১]। সারা ভারতে এই ভয়ঙ্করী 'মাতুল'-এর উপাসনা প্রচলিত [৮২]। ইনি আত্মপ্রকাশ করেন শিবের শক্তিরূপে এবং মনসার মতই শিব-সহায়ে অথচ শিবের বিরোধিতা করে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে থাকেন। দক্ষিণ বাঙলার আরণ্যক দেবী 'বনবিবি' এবং অসংখ্য স্থানীয়া দেবী লৌকিক উপকথা ও মেয়েলী ব্রতকথায় শিবের স্ত্রীরূপে পরিচিতা হয়েছেন। কৃষিদেবী ষষ্ঠী হয়েছেন শিবের অন্যতমা শক্তি, উভয়েই প্রজননদেবতা; এবং কার্তিক শিবের পুত্র ও ষষ্ঠীর স্বামী [৮৩]।

ঈ। বাঙলার শক্তি-দেবীরা যখন শিবকে নানা দিক থেকে ঘিরে ধরলেন, তখন তাঁদের আশ্রয় করে দেশীয় শিল্প-সাহিত্য নতুনভাবে বিকাশলাভ করল। পাল-

সেন যুগে পুরাণের অনুগমন দিয়ে এর সূচনা ; বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় এই শিল্পদৃষ্টিকে ক্রমে সুষম ও সর্বজনীন করে তুলল।

শিব-শিবানীর উমা-মহেশ্বর মূর্তি বাঙলায় প্রচুর গঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে উত্তর বাঙলার প্রতিমার সংখ্যা বেশি। সুন্দরবন অঞ্চলের পাথরের ও ধাতুর আলিঙ্গনমূর্তি এবং হুগলীর জটেশ্বর মন্দিরে একদাস্থিত হর-পার্বতী মূর্তি এই শ্রেণীর। কল্যাণসুন্দর মূর্তি ঢাকা ও বগুড়া জেলায় সর্বাধিক। অর্ধনারীশ্বর মূর্তির মধ্যে ঢাকা ও জয়নগরের প্রতিমা উল্লেখ্য। বাঙলার নটরাজ মূর্তিও সর্বদা একবচনান্বিত ছিল না, তাঁর দুপাশে থাকতেন গঙ্গা ও পার্বতী। শ্যামা মূর্তির মধ্যে দু-একটির কথা আগেই বলেছি। দিনাজপুরে শ্মশানকালিকার মন্দিরে ভৈরব আজও বিরাজমান, বিক্রমপুরের পাষাণলিঙ্গের উধ্বভাগ থেকে আবির্ভূতা দেবীমূর্তিটি মহামায়া বা ত্রিপুর-ভৈরবী নামে চিহ্নিত। অনেক স্থানে দেবীর হাতে ত্রিশূল ও শিবলিঙ্গ দেখা যায়। ভদ্রশীলার অঘোর-রুদ্র পূজিত হন দুর্গা নামে [৮৪]। চণ্ডীরূপের বন্দনা পাওয়া যায় ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লল্লাচার্য প্রণীত টীকায় ; মঙ্গলাচরণে দেবী সুরাসুরের আরাধ্যা জগদ্ধাত্রীরূপে বর্ণিত ও স্তুত হয়েছেন [৮৫]। সেন আমলের একটি চণ্ডীমূর্তি ঢাকায় পাওয়া গেছে—চার হাতে পদ্ম ঘট অস্ত্র বরাভয়, দুপাশে সখী, পায়ের তলে সিংহ, মাথার ওপর জলদানরত হাতী [৮৬]। ভুবনেশ্বর লিপিতে ভট্ট ভবদেব যে রিপুরুধির-চর্চিত চণ্ডীর বন্দনা করেছেন [৮৭], তিনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুগামিনী। কিন্তু ঢাকার প্রতিমাটি কমলেকামিনী ; মূর্তি ও বন্দনাগুলি চণ্ডীর বিবিধ ও মিশ্র রূপের পরিচয়িকা। শিব এইসব মাতৃকাদেবতার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, মিশ্রণ ও বিবর্তন একই সঙ্গে অগ্রগত হয়েছে। শুধু সাহিত্য নয়, প্রতিমাগুলির সাহায্যেও শিব ও শক্তিদেবীদের ঘনিষ্ঠতার পরিচয়সূত্র পাওয়া যায়। এই সব মূর্তির অনেকগুলি শাস্ত্র এবং ইতিহাসস্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া বাঙলার গ্রামে-গ্রামে পথে-প্রান্তরে লোকায়ত সমাজে শিব ও কালী নিকট-প্রতিবেশী [৮৮]। খোলা আকাশকে মাথায় নিয়ে গাছের কোল আশ্রয় করে কত শিব-শিবানী যে বিভিন্ন মূর্তিতে-প্রতীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম পাচ্ছেন, তার ইয়ত্তা নেই। বাঙলার যেখানে চণ্ডী-কালীর 'থান', সেখানেই লোক-শিবের 'আস্থান', দুজনে অন্বয়ভাবে যুক্ত পার্বতী-পরমেশ্বরৌ।

উ। কিন্তু শুধু মন্দিরে ও মণ্ডপে নয়, বাঙালী এঁদের স্থান দিয়েছিল হৃদয়েও। তাই কল্পসৌন্দর্যের কাব্যজগতে স্থায়ীরূপ দিয়েছে শিব-শিবানীর। এক্ষেত্রেও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট পাল-সেনযুগের রচনা অগ্রগামী। ধর্মপালদেবের খালিমপুর লিপিতে গোপালদেবের স্ত্রী 'সর্বাণীশিবস্য' দেদ্দা দেবীকে এবং গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে 'শিব ইব করং শিবায়া' রল্লাদেবীর পাণিগ্রাহক দেবপালদেবকে বন্দনা করা হয়েছে। বিদ্যাপতির কীর্তিলতায় 'ইতি রুদতি গণেশে স্মেরবক্ত্রে চ শম্ভৌ গিরিপতিতনয়ায়াঃ পাতু কৌতূহলং বঃ' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'হর আর্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে' ঐতিহ্যেরই অনুসরণ। সেনরাজদরবারী কাব্যের খণ্ডচিত্রের পটভূমিকায় মনে আসে

পুরাণকথা ও রাগসংগীতের ধ্যানরূপ। ভৈরবী রাগিণীর ধ্যানে বলা হয়েছে: করতলধৃতবীণা পীতবর্ণায়তাক্ষী শুকবির্ভিরিয়মুক্তা ভৈরবী ভৈরবস্ত্রী। 'বঙ্গালী'র চিত্রণে: কক্ষনিবেশিত করস্তধরায়তাক্ষী ভাস্বত্রিশূলপরিমণ্ডিতবামহস্তা। ভস্মোজ্জ্বলা নিবিড়বদ্ধজটাবলাপা বঙ্গালিকেত্যভিহিতা তরুণার্কবর্ণা। সদুক্তিকর্ণামৃতের হরগৌরীর মিলনমূলক ছবিগুলি এমনই এক একটি মুক্তার দানা: প্রৌঢ়প্রেমরসাদভেদঘটিতামঙ্গে দধানঃ প্রিয়াং, দেবঃ পাতু জগন্তি কেলিকলহে তস্যাঃ প্রসাদায় যঃ। ব্যাহর্তুং প্রণয়োচিতং নময়িতুং মূর্ধানমপ্যক্ষমো, ধত্তে কেবলমেব বামচরণাম্ভোজে করং দক্ষিণম্। অথবা প্রাকৃতপৈঙ্গলের: খেদস্তে কমনীদৃশঃ প্রিয়তমে স্বন্নেত্রবহ্নের্বিভো কস্মাৎ কল্পিতমেতদিন্দুবদনে ভোগীন্দ্রভীতের্ভব। রোমাঞ্চঃ কমনেষ দেবি ভগবন্তং গঙ্গাভ্যাং শিকরৈর্বিশ্বং ভর্তরি ভাবগোপনপরা গৌরী চিরং পাতু বঃ [৮৯]। এই কাব্যকলা উচ্চকোটিতে আবদ্ধ। সাধারণ মানুষের কাব্যদৃষ্টিতে শিবের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আদিম কোমদের গীতে, গাজনগম্ভীরার গানে, পটুয়াসংগীতে, যুগীর কাচে, নাথগীতিকায়, লোকগাথায়, ব্রতকথায় বাঙলার লোকশিব জনপ্রিয় ইষ্টদেব ও আত্মীয়রূপে চিত্রিত হয়েছেন। মূর্তিশিল্পে যে কাজ অতি সহজে সম্পাদিত হয়েছিল, সাহিত্যশিল্পে তার জন্যে বিচিত্র কাহিনীর অবতারণা করতে হয়েছে। একদিকে পুরাণ-অনুগামী উচ্চকোটির কাব্য, অন্যদিকে লোকায়ত সাহিত্য, এ দুয়ের মিলন সম্পাদিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যের সুষম আধারে। এবং এখানেও ভারতশিব পরিণত হয়েছেন লোকশিবে।

গ। সমন্বয়

ইতিহাসের অগ্রগতি হয় দ্বন্দ্বজটিল বক্ররেখায়। দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতি যখন নিকটবর্তী হয়, তখন দেখা যায়—একদিকে সংঘাত, অন্যদিকে মিলন, একই সঙ্গে পাশাপাশি আবর্তিত হয়ে চলেছে, অবশেষে সমন্বয়ের একটি বিন্দুতে উপনীত হয়েছে। সমাজ-সংস্কৃতির এই গতি-চিত্র সাহিত্য-শিল্পে বিধৃত হয় স্বরূপে অথবা রূপকথায়, রূপান্তরিত অথবা রূপকায়িত হয়ে। ভারতশিব এবং বাঙলার প্রমথ-প্রমথিনীদের মিশ্রণের ইতিবৃত্তেও দেখি বিরোধ-মিলনের এই বিচিত্র ছবি—একই সময়ে, একই অঞ্চলে; এবং সেই ছবি বিধৃত হয়েছে বাঙলার কাব্যে-মূর্তিশিল্পে। এই প্রকাশের পশ্চাতে ছিল বিভিন্ন ধর্মের মানসের মেজাজের জটিল ঘূর্ণাবর্ত, সামাজিক শক্তিগুলি তাতে কার্যকারণরূপে ক্রিয়া করেছে [৯০]। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, 'রাজবৃত্ত হচ্ছে কঙ্কাল আর লোকবৃত্ত তার রক্তমাংস' [৯১]। রাজবৃত্তের পটভূমিকায় লোকবৃত্তের শৈব চিত্রটি এখন একবার সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

অ। সওদাগরী ধনতন্ত্রের আওতায় লালিত নাগরসংস্কৃতি স্বভাবত উদার। গুপ্তযুগের বাঙলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ক্রম-ক্ষীয়মাণ হয়ে এলেও পালযুগে তার রেশবেশ থেকে গেল। তাই উত্তরাপথস্বামিদের প্রয়াসী পালরাজাদের মধ্যে

পূর্বধারাগত উদার মনোভাবের ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল। তাঁরা মূলত বৌদ্ধ হয়েও পরধর্ম-অসহিষ্ণু ছিলেন না। বৌদ্ধ জৈন শাক্ত বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি শৈবধর্ম ও শিব নির্বিবাদে বিরাজমান ছিল। স্তম্ভলিপি মন্দির ও মূর্তিশিল্পে এই বিরোধহীন সহ-অবস্থানের স্বাক্ষর প্রকাশিত। উচ্চকোটি ও নিম্নকোটির মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবধান ছিল, আঘাতের একটি মনোভাব 'চর্যাপদের' বিদ্রোহী সুরের মধ্যে দিয়ে ঝলকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিরোধিতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপকরূপ লাভ করতে পারেনি। অন্যপক্ষে লোকসমাজেও সহাবস্থানের নীতি অনুসৃত হয়েছে। কৃষিপ্রধান গ্রাম্য সংস্কৃতি স্বভাবত রক্ষণশীল, বহিরাগত ধর্ম ও দেবতাকে সে সহজে স্বীকার করে না। তার নিজস্ব এলাকার প্রমথ ও মাতৃকাগণ পরস্পর বহিরঙ্গ পার্থক্য সত্ত্বেও মূলত অভিন্ন, একের সঙ্গে অপরের সংঘাত তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠেনি; তাছাড়া এইসব স্থানিক ধর্ম নানা কারণে তখনও পরস্পরের নিকটে আসার সুযোগ পায়নি। গোষ্ঠীগত মনোভাব অবশ্যই ছিল, কিন্তু সম্প্রদায়গত মনোভাব জাগেনি। তাই কৌম প্রমথদের আসরে পুরাণশিব নিমন্ত্রিত অতিথি অথবা নির্বিবাদ সহযাত্রী মাত্র। এই সহ-অবস্থানকে এক হিসাবে সমন্বয়ধর্মা বলা যেতে পারে, প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা। আবার এরই মধ্যে ছিল বিরোধের বীজও, কারণ নৈকট্য সংঘাত নিয়ে আসে। এ পর্বে পারস্পরিক প্রভাববিস্তার হয়ত তেমন উগ্র ছিল না কিন্তু সচল ছিল কালের নিজস্ব নিয়মে, অতি ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে। পরবর্তী পর্বে তার ফল বহমান হল।

আ। সেন রাজত্বকালে বাঙলার বহির্বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। ভারত-বুদ্ধি ও উদারতার স্থান গ্রহণ করল আঞ্চলিক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষুদ্রবুদ্ধি। রাষ্ট্র শুধুই কৃষিনির্ভর হওয়াতে সমাজের শক্তি ও প্রাণকেন্দ্র হল গ্রাম। রাজতন্ত্র-আশ্রিত আমলা ও পুরোহিততন্ত্র গ্রামের প্রত্যন্ত কোণে হস্তপ্রসারণে উদ্যত হল, রাজদরবার-আশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যধর্ম আত্মপ্রসারণে প্রবৃত্ত হল; উচ্চকোটি ও নিম্নকোটি নিকটতর হল। বাঙলার ভৌগোলিক সীমা এবং তার সঙ্গে বাঙালীর চিন্তাকাশের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে এল; সুরু হল ধর্ম তথা আত্মকলহ। অবশ্য পালযুগীয় মৈত্রী-চেতনার মিলনমুখী ধারাটিও বহমান ছিল। রাষ্ট্রশাসনের সুবিধার জন্যেও প্রয়োজন ছিল সমন্বয়ের মনোভাবকে জাগিয়ে রাখার, রাজদরবারের নাগরিক বিলাস এতে সহায়তা করল। সবার ওপরে ছিল পুরাণের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকপাত। তাই এ পর্বে বিরোধ যেমন উচ্চকিত, মিলনও তেমনি সচকিত। বৌদ্ধ-জৈনধর্ম শৈবধর্মের অনেকখানি গ্রাস করে নিল, বুদ্ধ লোকেশ্বর ঋষভনাথ পার্শ্বনাথ শিবের রূপগুণবাহনলাঞ্ছন অধিকার করলেন। শিব হলেন বৌদ্ধ মারীচীর পদানত, বিষ্ণুর পদাশ্রিত, শক্তির পদদলিত। শিবও বৌদ্ধ জৈন দেবতা ও কৌম প্রমথেশদের আত্মসাৎ করলেন, সেইসঙ্গে গ্রহণ করলেন নিরঞ্জনের শ্রী আদ্যাদেবীকে, সূর্যাণী গৌরীকে, ধর্মেশপত্নী ধর্মতি মাঈকে, জরৎকারুপত্নী মনসাকে, অমাসুরসঙ্গিনী

শীতলাকে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' কাব্যসংকলনে, তাম্র লিপিতে শিব ব্রহ্মার সঙ্গে উল্লিখিত এবং বন্দিত হলেন বিষ্ণু গৌরী প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে, 'গীতগোবিন্দে' উদ্ধৃত হলেন অলংকাররূপে। বৌদ্ধজৈনপ্রভাবে তিনি হলেন যোগী সন্ন্যাসী, পদ্মাসন ধ্যানী, অনাসক্ত নির্বাণপ্রিয় ও কর্মবিমুখ ভিক্ষাব্রতী। তাঁর প্রভাবে বৌদ্ধমূর্তিরও রূপান্তর ঘটল। কৌম উপাসনায় তিনি আবদ্ধ হলেন মাতৃকাদেবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবন্ধনে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী বাঙলাদেশে নিয়ে এল বিদেশী শাসন ও বিশৃঙ্খলার বীজ। অত্যাচার অনাচার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সামরিক শক্তিনির্ভর স্বৈরাচারী শাসন প্রায় দেড়শো বছর দেশকে স্থিতি ও শান্তি দিতে পারে নি। রাজদরবার থেকে ব্রাহ্মণ বহিষ্কৃত, সামন্ত বিশ্বাসের অপাত্র, রাষ্ট্র অরাজক, সমাজ বহুরাজক। দ্বন্দ্ব ও দুঃখ, কলহ ও ষড়যন্ত্র নিত্যসঙ্গী। সদরে ইসলামের সবল আত্মঘোষণা এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সমাজপতিদের বর্ণবিন্যাস-মাধ্যমে গৃহবন্ধনের প্রয়াস। এই অবস্থায় সুস্থ ও সৃজনশীল রচনা সম্ভবপর নয়। অবশেষে এই বিপর্যয়-অন্তে ইলিয়াসশাহী (১৩৪৫ খ্রীঃ), কংস-যদু (১৫শ ১ম ভাগ), তারপর হুসেনশাহী (১৪৯৩ খ্রীঃ) আমলের শান্তিশৃঙ্খলা ও পৃষ্ঠপোষকতা যেন আশীর্বাদের মত নেমে এল। শাসন ব্যবস্থায় এল অচপল স্থিরতা, ফিরে এল দেশের স্বাস্থ্য ও যৌবন, সংস্কৃতির চলতাশক্তি। রাজসভা থেকে জনসভায় নেমে এসে ব্রাহ্মণ্যধর্ম মিলিত হল লোকায়ত সংস্কারের সঙ্গে, গ্রামীণ সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে জেগে উঠল মধ্যযুগের বাঙলা, ঘরভাঙা মানুষ আবার ঘর বাঁধতে প্রয়াসী হল। চৈতন্যদেবের ভাবমুখী আন্দোলন ও অধ্যাত্মমুখী মানবতা বাঙালীকে দীক্ষা দিল আত্মোপলব্ধিতে, ধর্মবোধ দিল স্থিতধী দৃষ্টি, তাতে শক্তি নিধান করল ঐসলামিক সাম্যবাদ। বহুবিচিত্রের সমন্বয়ে বাঙালীর সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠল। তার একদিকে মননপ্রধান নব্য ন্যায়-স্মৃতি; যা দিয়ে সুরু হল ঘর বাঁধা; অপরদিকে আবেগপ্রবল কাব্যগীতি, যা দিয়ে সূচিত হল মনের মুক্তি। লোক-সাহিত্যের উজ্জীবনের পথ খুলে গেল। পূর্বকালীন সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার সুযোগ এখন কম, রাজভাষা ফার্সী বিদেশী ও অপরিচিত, একমাত্র অবলম্বন কথ্য ভাষা; বাঙালী কবি কথ্য ভাষার বাহনে লোকসাহিত্যের সঙ্গে মিলিত হল, সেই মিলনের ফল মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের বিপুল ও বিচিত্র প্রবাহ।

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় মোগল শাসনের সূত্রপাতে শান্তির এই আমেজ অশান্তির ঝড়ো হাওয়ায় আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। বারভুইঞার প্রতিরোধ, তুর্কী-আফগানের বিদ্রোহ, মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচার, বিদেশী ধর্মের আত্মপ্রসারণের প্রয়াস ইত্যাদি বিপর্যয়ে দেখা দিল অন্তর্বিরোধ, অনিশ্চয়তা, শক্তির যদৃচ্ছ লীলা। উদার সাম্যবোধের বিলুপ্তিতে বর্ণবিন্যাস কঠোর হয়ে চেপে বসল, উগ্র হয়ে উঠল সম্প্রদায়চেতনা ও পরমত-অসহিষ্ণুতা। তবু ওরই মধ্যে প্রথম একশো বছর (১৫৭৫-১৬৭৫ খ্রীঃ) শাসনব্যবস্থার দৃঢ়তায় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের একটা ছাঁচ গড়ে উঠেছিল, অর্থ-

নৈতিক মান মোটামুটি স্থির ছিল, গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। সংস্কৃত ও ফার্সীর চর্চা, সুফী ও মহাজনবাণী এবং বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ-আঙ্গিকের 'পল্লবগ্রাহিতা' তথা সর্বজনীনতা[২২] অন্ধকারের মধ্যে দীপশিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছিল। জনজীবনের এই সমন্বয়ধর্ম রাজশাসনেও প্রতিফলিত হয়েছিল। ফলে বিরোধ-ঝঞ্ঝার মধ্যেও বিভিন্ন মত-পথের বিনিময় হয়েছে, আভিজাত ও লোকায়ত সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতা আরও নিবিড় হয়েছে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে, 'সত্যপীর-সত্যনারায়ণ' যার অন্যতম ফলশ্রুতি। কিন্তু এ অবস্থাও চিরস্থায়ী হয় নি। মোগল শাসনের শেষ পর্বে অন্তর্বিবাদ ও অধঃপতনে, বর্গী-ফিরিঙ্গির অত্যাচারে, ইংরেজ-ফরাসীর গোলযোগে বাঙলা ত্রস্ত হয়ে উঠল, গ্রামসমাজের ভিত্তি ভেঙে পড়ল। বিলাস ও নাগরিকতা, দুঃখবাদ ও অসুস্থতা ছড়িয়ে পড়ল জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে। সাহিত্যে শিল্পে তার অভিব্যক্তি দেখা দিল, 'তা নিপীড়নের বেদনাজাত, অসুস্থ সমাজের প্রতিক্রিয়া-লব্ধ' (কালান্তর)।

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলাদেশের এই একটানা ইতিহাস—কখনও সমতল, কখনও অসমতল, কখনও-বা একসঙ্গে দুইই : সংঘর্ষ ও শান্তি, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, মেঘ ও রৌদ্র পাশাপাশি। তার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালীর সংস্কৃতি-ভাবনায় দেখা দিয়েছে নিরন্তর জটিল আবর্তন, ধর্মগত কলহ ও সন্ধি, দেব-দেবীর বিরোধ ও মিলন—বৈষ্ণবে ও শাক্তে, চণ্ডী ও মনসায়, ধর্মঠাকুরে ও চণ্ডীঠাকুরাণীতে। শিব প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে বীতরাগ, পরবাদ ও পরিবাদে নিস্পৃহ ; তথাপি যেহেতু তিনি আছেন সর্বধর্মে, সকল কাব্যে, তাই এই দোলাচল আবর্তে তাঁকেও আন্দোলিত হতে হয়েছে। যাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, 'সুমঙ্গল শিব মোহাশয়। বর দেন যেই জনে, সেই ত্রিভুবন জিনে, শিববরে থাকয়ে নির্ভয়', তিনিই আবার ধর্মায়ণে ধর্মের অধীন, রামায়ণে রামের অধীন, মনসামঙ্গলে মনসার, চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীর, মহাভারতে কৃষ্ণের, বৈষ্ণব চরিতে চৈতন্যের, নাথসাহিত্যে গোরক্ষ-ময়নামতীর। একই কাব্যের এপিঠে বিরোধ, ওপিঠে মিলন একই লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিপরীত চিত্র-সমন্বয়ের এই কারুকার্যটি পুরাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বাঙালী কবি তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন ; সমকাল তাকে দিয়েছে উদ্দীপনা, কবিমানস দান করেছে শিল্পরূপ।

প্রথমে সংঘাত, পরে মিলনমুখী চিত্রগুলির পর্যালোচনা আমরা করব। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই পঞ্চদশ শতকের পর থেকে রচিত বলে পূর্বকালীন কাব্যগুলিকে সংযোজিত করে সমগ্র কাব্যপ্রবাহের আলোচনা এখানে একত্রিত করা হল।

চণ্ডীকাব্যে শিবের চণ্ডী থেকে জন্ম ও গুণাদিলাভ। তিনি দেবী কর্তৃক নির্জিত ও তাঁর অনুগত—তন্ত্রের 'জগজ্জননী'র অধীন, তরুণী ভার্যার বৃদ্ধ স্ত্রৈণ স্বামী। দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' শিব ইন্দ্রপুত্রকে শাপ দেন কর্তব্যচ্যুতির জন্যে ; দেবী

তাঁর কাছে নিবেদন জানান : 'নীলাম্বরের তরে হর শাপ দিতে চাহে। হরের ক্রোধ দেখিয়া ভবানী ধরে পায়ে। ইন্দ্রের নন্দন নীলা অতি শিশুমতি। তার তরে শাপ দিতে না আইসে যুকতি।' কিন্তু মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে শিব চণ্ডীর প্রয়োজনে নীলাম্বরকে অভিশাপ দেন। এখানে এবং মানিকদত্তের কাব্যে চণ্ডী আদ্যাশক্তি, শিব তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী। ভারতচন্দ্রের অন্নদা আদ্যাদেবী, তিনিই ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর। ভিক্ষান্নপেয়ে, 'জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া। নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া।' রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গলে জয়ৎসেনের শৈব অভিশাপ দুর্গার পূজা প্রচারার্থে; রামনারায়ণের ভবানীমঙ্গলে শিব মহিষাসুর রূপে দেবীর কাছে পরাজিত হন; দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয় কাব্যে শিব শক্তির পদলীন; শাক্ত পদাবলীতে শ্যামার জয়গান, যেখানে শিব বলেন, 'প্রকৃতি বিহীনে আমার বিধবা আকৃতি'; শক্তির চরণ লাভ করে তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী যোগী। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর লেখনীতে

নন্দী বলে, আমার প্রভু জগতের পতি,
জয়া বলে, জগৎপতির মা আমার প্রসূতি।
আদ্যাশক্তি যে মা ॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যে শিবকে শক্তির চেয়ে দুর্বল করে আঁকা হয়েছে। কানড়া-কাহিনীর তবু একটা সার্থকতা আছে কিন্তু 'কামদল' বাঘের ভয়ে যখন 'রুদ্র ডাকে রুদ্রানি গো রক্ষ এইবার' (মা. গা.) আর গণেশের মা 'বাঁ পায়ের ঘায়ে তার ভাঙ্গিল কাঁকালে' (রা. আ.), তখন শিবের দুর্গতি হাস্যের সঙ্গে করুণ রসেরও সৃষ্টি করে। মনসা শিবকন্যা, তথাপি শিব তাঁর কাছে পরাজিত। মনসার কোপদৃষ্টিতে শিব জ্ঞানহারা, তাঁকে ও চণ্ডীকে বাঁচান মনসা। সমুদ্রবিষপানে অজ্ঞান শিব, মনসার অনুগ্রহে 'চৈতন্য পাইয়া শিব বলে রাম রাম। ক্ষীর খাও অষ্টনাতি সাধিলাম কাম' (বি. গুপ্ত)। শৈব চাঁদ সদাগরকে ঘিরে মনসা ও চণ্ডীতে বিবাদ বেধে উঠলে বিরক্তিভরে একবার মাত্র, 'মহাদেব বলে মোর কন্যার নাহি সাধ। এক পদ্মা দিয়া মোর এতেক প্রমাদ (ঐ) ; কিন্তু 'মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া'র মধ্যে তিনি বরাবর নির্বিকার ছিলেন। ভক্তকে সাহায্য তো করলেনই না, বরং মনসাকে, 'আজ্ঞা দিল ঝাটে যাও, ডুবাও গিয়া চান্দের নাও' (না. দে.)! বছাই মনসার পূজা করলে শিব আনন্দে নৃত্য করেন, আর স্বর্গসভায় বেহুলাকে আদেশ দেন দেশে ফিরে লক্ষ ছাগবলি দিয়ে মনসার পূজা করতে। কারণ 'মনসার পূজা যথা, লক্ষ্মী অধিষ্ঠান তথা, তাতে তুষ্ট আমি আশুতোষ' (দ্বিজ বংশী)।

রামায়ণে শিব রামের চেয়েও দুর্বল। শৈব রাবণ রামের কাছে পরাজয় বরণ করে চাঁদবেনের মত। অপিচ 'শিঙা বলে শ্রীরাম, তম্বুরে বলে হরি। পঞ্চমুখে স্তুতি গান করেন ত্রিপুরারি' (কৃত্তিবাস, আদি)। শ্রীকৃষ্ণবিজয় বিশুদ্ধ ভাগবতকথার অনুবাদ কিন্তু পরবর্তী কৃষ্ণকথায় পুরাণের সেইসব কাহিনীও গৃহীত হয়েছে যেখানে শিব বিষ্ণুর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ও পরাজিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাহ্ন বললেন, 'আজে হরী আজে

হয় আছে মাহাযোগী'। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, শ্রীমদ্‌ভাগবতসার প্রভৃতি গ্রন্থে শিব নিজ ধর্মকে অবনত করে বৈষ্ণবী মতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, কৃষ্ণের প্রসাদলোভী ও হরিভক্ত তিনি। শ্রীকৃষ্ণবিলাসে কংসগৃহে কৃষ্ণ 'হরপিনাক' ভঙ্গ করেন। বৈষ্ণব-জীবনীতে কৃষ্ণ 'রুদ্ররূপ ধরি করে জগত সংহার। ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব তাঁর গুণঅবতার' (চৈ•চ•)। প্রেমবিলাসে দুর্গা চাঁদ রায়কে কৃষ্ণে আত্মনিবেদনের উপদেশ দিয়ে বলেন, 'আমার ঠাকুরের হবে তুষ্টি তাতে মন।' ধর্মমঙ্গল কাব্যে, 'হর কয় হৈমবতি হরিকথা কও' (মা•গা•)। তিনি জগন্নাথের প্রসাদ পেয়ে উল্লসিত এবং 'পঞ্চমুখে গায় শিব রাধার বিষাদ' (রূপরাম)। কবিগানে তিনি আদ্যন্ত 'কৃষ্ণপ্রেমভোরা'। শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে ধর্ম-পুত্র শিব ইষ্টদেবের জন্যে ফুল তোলেন, জল আনেন, 'অনাগু-কথা' শোনেন এবং 'ধর্ম খিআইআ সিব বাজাইছে গাল' (শূ.পু.) বা 'শনিবার ব্রত করিল বল্লুকের তীরে' (ধ•বি•)। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে সমাগত রায়তদের ধর্মপূজার উপদেশ দিয়ে শিব বলেন, 'জীও জীও রায়ত ধর্ম দেউক বর।' নাথসাহিত্যে স্ত্রীহারা শিব গোরক্ষের কাছে সানুনয় আবেদন জানান এবং 'বুড়া শিবক নাগি মএনা হুঙ্কার ছাড়িল। ডাক মধ্যে বুড়া শিব আসি খড়া হৈল' (গো• গান ১ম); ভীত হয়ে তিনি পালাতে গেলে 'হোলা ব্যাঙের মতন মএনা নিগার ন্যা দিয়া' শিবকে ধরে ফেলে এবং বৈতরণীর ঘাটে নৌকা পূজা করিয়ে নেয়। বৈষ্ণবসাহিত্যে মানুষের অধীনস্থ করা হয়েছে দেবতা শিবকে। ভক্তি-রত্নাকরে চৈতন্যের অন্যতম ভক্ত তিনি, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তাঁর নিত্যসেবক, 'চৈতন্যভাগবতে' গৌরলীলা দর্শনে 'নাচে প্রভু শঙ্কর হইয়া দিগম্বর' এবং বলেন, চৈতন্যের 'সেই পাদপদ্ম লাগি আমিও পাগল' (আগমসার)। চৈতন্য-পার্ষদদের মধ্যে অদ্বৈতকে শিবের অবতার, নিত্যানন্দকে রুদ্র-অবতারী, চৈতন্যকে 'মহেশভাব'-আবিষ্ট (চৈ•চ•) এবং (নরোত্তমবিলাসে) নরোত্তমকে শিবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। অদ্বৈতপ্রকাশে বলা হয়েছিল, 'উপধর্ম শিব প্রচারিলা কৃষ্ণাজ্ঞায়', সহজিয়া কবি শোনালেন, 'মাতাপিতা তোমা আমা সর্বজনে বলে। অন্যের কি কথা দুর্গে পণ্ডিতে সে ভুলে। তাহাতে তোমারে লইয়া করে উপযোগ। বলে শিবশক্তি পূজি ইথে সর্বভোগ।' শিবশক্তি এখানে রাধা-কৃষ্ণের ভগ্নাংশ এবং সহজিয়া সাধনপথের প্রেমভক্ত সাধক-সাধিকা তথা মানব-মানবী।

মিলনের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে মনে পড়ে বাংলা কাব্যের 'বন্দনা' অংশের কথা। কথাশরীরে শিবের যে ছবিই থাক, বন্দনায় তিনি সর্বত্র সমভাবে সকলের সঙ্গে একত্রে পূজিত। এই মিলনের ভাব কাব্যকাহিনীতেও ফুটে উঠেছে। মুকুন্দরাম শিব সম্পর্কে বললেন, 'অণিমা লঘিমা যাঁর অষ্টসিদ্ধি'; অন্যান্য চণ্ডীকাব্যে তার প্রতিধ্বনি শুনি। ভারতচন্দ্রে তিনি 'জগতের পতি', ভবানীমঙ্গলে 'রূপে আলো দেব শূলপাণি।'। পাঁচালী-কবিগানেও শিবের এই মহিমা অক্ষুণ্ণ। দক্ষযজ্ঞনাশ ও ব্যাসকাশী-কাহিনীর মাধ্যমে পুরাণগামী

কবি যে মৈত্রীর দ্যোতনা জাগিয়েছেন, শাক্ত পদাবলীতে তার অনুরণন, 'ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধা শ্যাম। সবে এক একে সব একের বলে সবাই বলী।' জগজ্জননী স্বয়ং বলেন, 'মরমে রেখেছি বেঁধে মহেশের পা' (মা০গা০)। তাই সাধক শক্তির উপাসনায় শিবত্ব কামনা করেন এবং সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেন, 'শ্রীশ্রীশিবদুর্গা চরণ ভরসা। অন্তকালে চরণ পাব এহি মনে আশা' (চ০বি০)। মনসামঙ্গলেও শিব বন্দিত হয়েছেন। যেমন নারায়ণ দেবে, 'বাপ তোমার পশুপতি অবিলম্ব দাতা। সংসারে বোলে তাকে ছিষ্টির দেবতা।' অথবা পালাশেষের প্রার্থনা, 'সবাসদেরে বর দেউক উমা মহেশ্বরে।' বিজয় গুপ্তেও পাই 'জগত ঈশ্বর শিব নাহি যার মূল।' পদ্মা বিষমোচনকালে বলেন, 'শিবের স্মরণে বিষ ঘা মুখে মর।...আর যদি নিদ্রা যাও শিবের দোহাই' এবং সকলের কাছে অহংকার করেন, 'মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী।'

শিব ও বিষ্ণুর অভেদ-কল্পনা বাংলা কাব্যে দুর্লভ নয়। যেমন বিদ্যাপতির : 'ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা। খন পিত বসন খনহি বঘছলা॥ এক শরীর লেল দুই বাস। খনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাশ॥ ভণই বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী। ও নারায়ণ ও শূলপাণি।' এই রূপ কৃত্তিবাসে ও দ্বিজবংশীতে প্রতিচিত্রিত এবং কাশীরাম্ দাসে বিস্তৃত হয়েছে : 'আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক। অর্দ্ধ ভস্মভূষা হইল কস্তুরী অর্দ্ধেক॥ অর্দ্ধ জটাজুট অর্দ্ধ চিকুর চাঁচর। অর্দ্ধেক কিরীটি অর্দ্ধ ফণী দণ্ডধর॥ কস্তুরী তিলক অর্দ্ধ অর্দ্ধ শশিকলা। অর্দ্ধ গলে হাড়মালা অর্দ্ধ বনমালা। একভিতে দুর্গা এক ভিতে লক্ষ্মী সাজে।' শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শিব ও কৃষ্ণ অভিন্ন; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা শিবপূজা-ব্রতিনী। নারায়ণ স্বয়ং বলেন, 'আমি নারায়ণ যাঁর তত্ত্ব নাহি জানি' (শ্রীকৃ প্রে০ত০); তাই বাণকে পরাজিত করে কৃষ্ণ শংকরের অনুমতি নিয়ে পুরপ্রবেশ করেন (শ্রীমদ্‌ভা. সার)। বৈষ্ণব জীবনীতে 'আদিবারাহ' প্রভৃতি গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হয়েছে শিবের মাহাত্ম্য প্রকটনের জন্যে; বলা হয়েছে, 'মহাবিষ্ণু সদাশিব হরিহর মূর্ত্তি' (প্রে০বি০), তিনি 'জগৎগুরু সদাশিব, জগতের মূল, ঘটে ঘটে আছ নিত্য হঞা বহুজীব' (অ. প্র.)। চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ভক্তগণ বিভিন্ন শৈবতীর্থ দর্শনে কৃতার্থ জ্ঞান করতেন। অদ্বৈতাচার্যকে শিবজ্ঞানে স্তব করা হত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শিবকে দুই রূপে কল্পনা করা হয়েছে, 'জীবকোটি শিব' এবং 'ঈশ্বরকোটি শিব'। 'শিব' পঞ্চমুখ ত্রিনেত্র ও দশভুজ, 'সদাশিব' পরমব্যোমের আবাসিক, কৈলাসের 'গুণময় শিব' এঁর অংশ [১৩]। বাঙালীর হরি-হরে মিলনের ভাবনা পুরাণ থেকে গৃহীত [১৪], কবির প্রীতিমুগ্ধ চিত্ত তাকে শিল্পরূপ দান করেছে। ধর্মপূজায় শিব ও নিরঞ্জনের পূজা মিশে গেছে। ধর্মকে শিবাত্মক বলা হয়েছে, তাঁর মন্ত্র হল, 'ওঁ নিরঞ্জনং নিরাকারং মহাদেবং মহেশ্বরং'। ধর্ম-মঙ্গলের সদাশিব জীবের উদ্ধারকর্তা। তাই 'শিব আরাধিলে পূজা পণ্ডিত সমাজে' (রূপরাম)।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি লিখিত কাব্যে 'নিরঞ্জনের রুষ্মার' বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। দৌলৎ কাজীর লোর-চন্দ্রানীতে বিরহিণী ময়নাবতী স্বামীকে ফিরে পাবার আশায় শিবদুর্গার আরাধনা করেন, সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতীতেও শৈব উপাসনার সমজাতীয় চিত্র আছে। সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপে তান্ত্রিক যোগ বিবৃত এবং নবীবংশে শিবকে 'নবী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৯৫। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয়সাধনের সাধু উদ্দেশ্যে এইসব কবি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এইভাবে বিরোধ-মিলনের মধ্যে দিয়ে শিব বিষ্ণু ও শক্তি অগ্রসর হয়েছেন বাংলা কাব্যের অববাহিকায়, অবশেষে কবি উপলব্ধি করেছেন, 'সবে এক এই দেবী দেবা'।

ঈ। আদি ও মধ্যযুগে বাঙালীর সংস্কার ও সংস্কৃতিতে সংঘাত-সমন্বয়ের যে আবর্তন ক্রমবিবর্তিত, অন্তিম পর্বে এসে তার একটি চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে আধ্যাত্মিকতা ও বৈদগ্ধ্যের চরম উন্নতি, অন্যদিকে ধর্মবিকৃতি নাস্তিক্য ও নীতিহীনতায় পরম অবনতি; একপক্ষে নিরুদ্বেগ গ্রাম্যতার স্বাভাবিক সরলতা, অন্যপক্ষে উদ্বিগ্ন নাগরিকতার পালিশকরা কৃত্রিমতা; একক্ষেত্রে মধুর ও বাৎসল্য রসের পরিশীলন, অন্যক্ষেত্রে আদিরসের উচ্ছল অনুশীলনী। বাঙালীর সংস্কৃতিতে বিপরীতের বিচিত্র সাধনার এ এক অভিনব পটভূমি, যার পরিপ্রেক্ষিতে আবর্তিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী জীবন ও মানস, এগিয়ে এসেছে মধ্যযুগের শেষ লগ্ন এবং তারই মধ্যে থেকে নবযুগের প্রথম প্রভাত।

এসময়ে বাঙলায় শিবপূজা বিস্তৃততর হয়েছে, স্থানীয় প্রমথবৃন্দ দেবতা-শিবে লীন হয়ে গেছেন, প্রমথিনীগণ শৈব শক্তিরূপে প্রকীর্তিতা হয়েছেন। কোম 'থান' শৈব 'তীর্থে' পরিণত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ শৈব সাহিত্য আবির্ভূত হয়েছে। উপাসনা ও কাব্য উভয় জগতেই শিবের মহিমা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অপরদিকে তাঁর চরিত্রে ও রূপে হীনতা ঘটিয়ে তাঁকে দেহলোলুপ রসলোলুপ রসনা-লোলুপ অতি সাধারণ মানুষরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস চলেছে। বন্দনা ও দিগবন্দনায় তিনি যথাযথভাবে বর্ণিত ও স্তুত হয়েছেন কিন্তু স্বর্গ (খণ্ডের একাংশে) ও মর্ত্যখণ্ডে কাব্যবস্তু এবং কাব্যনায়ক আদিরসের পঙ্কিল স্রোতে নিমজ্জিত হয়েছে। রামেশ্বরের 'শিবায়নে' বিষ্ণু ও শক্তির কাছে শিব নির্জীব, কৃষিকাজে নেমেও তিনি কোচনীপাড়ার মোহ ত্যাগ করতে পারেন না। ভারতচন্দ্রের পুরাণশিব নির্জীব নন কিন্তু নিন্দিত এবং যেখানে তিনি মানুষ, সেখানে সকল দেবত্ব হারিয়ে বিদ্রূপ-হাস্যের তরল রসে ভাসমান। বাঙালী দেবতা-শিবকে করেছিল মানব, এখন গড়ল বিদূষক। তাই যখন তিনি উদরান্ন সংগ্রহের আশায় ভিক্ষার্থে পথে নামেন, তখন 'শিব বুড়া কাপ'কে দেখে পথচারী রজচিটার দল তাঁকে নিয়ে আমোদ-কৌতুকে প্রবৃত্ত হয়। এই ধূলিধূসরিত মনোভাব ক্রমে আখড়াই হাফ্-আখড়াই তরজা কবি-গানে বিবর্ধিত ও বিলসিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই মনোভাবের অন্য দিকও আছে। জীবনের সবটাই নিরাশার অন্ধকার নয়, তারও মধ্যে জলে ওঠে আশার-আলো, অসুন্দরের মধ্যেও রূপ নেয় শিল্পের সুন্দর। মানুষের অন্তরে উপবন, অন্তরেই তপোবন, সামাজিক কার্যকারণগুলি মাটি-জল-আলো-বাতাস। তার নিরন্তর স্পর্শে ধূলিমলিনতার মধ্যেও ফুটে ওঠে সবুজের আভাস, আদিরসের স্রোতে উছলে ওঠে অধ্যাত্ম ও মানবরস। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপ্ত করে বঙ্গশিবের এই বিচিত্র লীলা, অষ্টাদশ শতকের সন্ধিক্ষণে তা রসলীলায়িত হয়েছে। ভারতচন্দ্র-রামেশ্বরের কাব্যেও তার পরিচয় আছে, কিন্তু তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত শাক্ত পদাবলীর উমা-পতি শিব।

উপাসনা ও সাহিত্যসাধনা উভয়ই হৃদয়ভাবের আবেগান্বিত, তথাপি উভয়ে পার্থক্য আছে। শিল্পীর কাছে ধর্মবোধ ও গোষ্ঠীভাবনার চেয়ে শিল্পচেতনা অনেক বড়ো। তার চোখে সুন্দরের দৃষ্টি ; সুন্দরের সামনে ব্যক্তিগত রসবোধই একমেব ইষ্ট। সেই রসচেতনার গভীরে অবগাহনরত প্রতিমাশিল্পীর কাছে সম্প্রদায়গত ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়, ভৈরব রাগ ও ঠুংরি অথবা কৃষ্ণকীর্তন ও কালীকীর্তনে একই গায়ক আলাপচারী হতে পারেন, সাহিত্যের নিজস্ব আধারে ধর্মগত সীমানা নিশ্চিহ্ন হয়, ফুটে ওঠে মানুষের-জীবনের রূপরেখা। কৌমকথা পুরাণকথা উপকথা ব্রতকথায় এই মানবতার ইঙ্গিতে প্রকাশ থাকে, গীতি ও কাব্যকথায় তার ভঙ্গিতে বিকাশ ঘটে। তখন বাঙলা কাব্যের ষড়ঙ্গ আঙ্গিকে শিব ও অন্যান্য দেবদেবী একইভাবে রূপায়িত হন, প্রতিস্পর্ধী দেবতাদের সঙ্গে বিরোধসত্ত্বেও মিলনের আকাশ দেখা দেয়। তখন সাহিত্যে আসে সমদৃষ্টি, যেমন সাধনায় আসে সাম্যরস ; শিব প্রাতিষ্ঠিত হন জনগণের হৃদয়সরোবরে। সেই সরোবরে ময়ূরকণ্ঠী পাপড়ি মেলে চেতনার শতদল, শিবের সকল রূপবৈচিত্র্য ঐক্য লাভ করে—'হরি হর হৈমবতী তিন তনু এক' (রামেশ্বর)। একদিকে অনুভূত হয় 'জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিম্ অত্যন্ত নেতি' <শ্বেত ৪.১৪>, অন্যদিকে জীবনপাত্র উচ্ছলিত হয়ে ওঠে মানবতায়—সে সুধা পান করে সমকাল, তুলে দেয় কালান্তরের হাতে।

ঘ। শৈবসাধনা

শৈবধর্মে [১] শিবই পরম পুরুষ—জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, উৎস ও লয়স্থান, বরদ মোক্ষদ আরাধ্য। শৈবদের বিশ্বাস, স্বয়ং শিব শৈব সাধনা প্রকটিত করেন। সাধনক্ষেত্রে বিভিন্ন শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও একমাত্র তিনিই সকল সম্প্রদায়ের সাধ্য। শৈবগণের উদার মন্ত্র 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ।' তাঁরা বলেন, 'মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।'

অ। 'পাশুপত-মাহেশ্বর' সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্য-কারণ-যোগ-বিধি-দুঃখান্ত এই পঞ্চ তত্ত্বের মাধ্যমে জ্ঞান-কর্ম-শক্তি লাভ ও চরম মোক্ষপ্রাপ্তি মৌল উদ্দেশ্য।—'শৈব' সম্প্রদায়ের বিশ্বাস তিনটি তত্ত্বে—পতি-পশু-পাশ। চিরমুক্ত শিব হলেন পতি,

কর্মমায়ামলযুক্ত জীবাত্মা পশু এবং মল কর্ম মায়া রোধশক্তি হল পাশ। ক্রিয়াযোগচর্যার মাধ্যমে মুক্তিলাভান্তে জীব শিবত্ব লাভ করে। 'কাশ্মীরী শৈব'র দ্বিবিধি—স্পন্দনশাস্ত্র ও প্রত্যভিজ্ঞানশাস্ত্র। স্পন্দনশাস্ত্র বলে, ঈশ্বর স্বাধীন; তিনি স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেন এবং নিজ শক্তিতে জীবাত্মারূপে আবির্ভূত হন। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মা-শিব অভিন্ন। কিন্তু আনব-মায়িক-কার্ম এই ত্রিবিধ মলের প্রভাবে জীব তা বুঝতে পারে না। ধ্যানাদির সাহায্যে সাধকমন ভৈরবের স্পর্শ লাভ করে, সীমার জ্ঞান লোপ পায় এবং অশুদ্ধিমুক্ত হয়ে শিবে লীন হয়ে যায়। অন্যপক্ষে প্রত্যভিজ্ঞানশাস্ত্র স্বীকার করে, জীব ও শিব অভিন্ন। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে তার আত্মোপলব্ধি হয় না; গুরুর সাহায্যে আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে জীবের শিবত্ব জ্ঞান লাভ হয়। 'কাপালিক'-দের মতে, 'ছয় মুদ্রিকা'র অর্থ যে সাধকের জানা আছে, সে আত্মায় মনকে নিবিষ্ট করে মহাসুখ পায়; যার দেহে এই ছয় মুদ্রা আছে, সেই মুক্ত। 'কালামুখ'-দের মতে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বাসনা চরিতার্থতার জন্যে চাই কপালে আহার, মৃতদেহের ভস্মলেপন, বিভূতি-আহার, যষ্টিধারণ, কারণপাত্র ও ঈশ্বর-উপাসনা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 'বীরশৈব' বা 'লিঙ্গায়েৎ'দের কাছে লিঙ্গই শিব। সচ্চিদানন্দ শিব হলেন লিঙ্গস্থল, জীব হল অঙ্গস্থল। শক্তি জীবকে বিশ্বযুক্ত করে, ভক্তি আনে মুক্তি। তখন জীব ও শিব অভেদ এবং জীবাত্মা ও লিঙ্গ সামরস্য প্রাপ্ত হয়। 'শৈব'রা মূলত অদ্বৈতবাদী, তাদের লক্ষ্য 'কেবলঃ শিবঃ'। 'জীবন্মুক্তস্য শান্তস্য ভবেদ্বীরস্য যোগিনঃ' (শি. সং.) উপলব্ধি করে, 'অহং শিবশ্চেৎ পরমার্থতত্ত্বং। সমস্তরূপং গগনোপমঞ্চ' (ঐ)। তবে এই উপলব্ধি বিশুদ্ধ শাংকর অদ্বৈতবোধ নয়। শিবের সঙ্গে জীবের সাযুজ্যের মাত্রাভেদ নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান বর্তমান। শৈব মতে মায়া ঈশ্বরের অন্তরঙ্গা শক্তি নয়, পরিগ্রহ শক্তি; অশুদ্ধমায়া সীমার বন্ধন, শুদ্ধমায়া প্রকৃত জ্ঞান ও মোক্ষদাত্রী। শক্তিতত্ত্বই বিন্দুতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্বই নাদতত্ত্ব, দুইই আবার শুদ্ধতত্ত্বের অন্তর্গত। শৈব সাধনায় তাই অদ্বয় শিবই লক্ষ্য হলেও মহামায়া বা শক্তির সঙ্গে পরোক্ষ যোগ বর্তমান। সৃষ্টিতত্ত্বকে শিবতত্ত্বের বিকাশ বলে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা শক্তির প্রাধান্য প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সেই পথেই শৈবধর্মে শাক্তধর্মের তথা তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ২। অথর্ব উপনিষদে যোগ ও শক্তি পূজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়; তাহলে, এখানে উভয়ের মিলনের একটি সংকেত পাওয়া যায়।

প্রাথমিক স্তরে, বাঙলায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন যে শৈব সাধকরা, তাঁরা ছিলেন পাশুপত-মাহেশ্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু এই বিশিষ্ট মত বেশিদিন বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারেনি। কৌম বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে মিলিত হয়ে শৈবযোগ অচিরে মিশ্র সাধনাচারে পর্যবসিত হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'নাথ' সম্প্রদায়। গোরক্ষনাথ 'কাণফট্' সম্প্রদায়ের যোগী ছিলেন। রংপুরের নাথগীতি-গায়ক সাধকেরা ছিলেন 'পাশুপত-শৈব' ৩। 'বল্লালচরিতে' যে যোগী পুরুতদের 'রুদ্রজব্রাহ্মণ' বলা

হয়েছে, তাঁরা আজও নিজেদের শিবগোত্রীয় মনে করেন ৪। এছাড়া যোগী জাতযোগী সন্ন্যাসীযোগী অওঘরযোগী চুণোযোগী পানাতিযোগী হেলেয়একাদশী ভুলুয়া হালোয়া ধর্মযোরী প্রভৃতি বিভিন্ন শৈবযোগী বাঙলা দেশে দেখা যায়। বাংলা কাব্যে শৈব যোগীদের বর্ণনা আছে কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অনিলপুরাণ, অথ মানাত্ত দেশ বিবরণম্ প্রভৃতি গ্রন্থে, শৈবতান্ত্রিক যোগের বিবরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। বৃন্দাবনত্যাগী কৃষ্ণ রাধাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : অহোনিশি যোগ ধেআই। মনপবন গগণে রেহ্লাই ॥ মূল কমলে কয়িলে মধুপান। এবেঁ পাইঞা আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥…ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী। মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥ দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট। এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥ গেআন বাণে ছেদিলোঁ মদন বাণ। তে আর না ভোলোঁ তোহ্মার যৌবন ॥ এবে দেহে মোর নাহি বিকার। আসার দেখীলোঁ সব সংসার ॥ রাধাক বুলিল নিঠুর বাণী। নাগরবর দেব চক্রপাণী ॥ ধেয়ানে থাকিল নিচল মনে।

আলাওলের পদ্মাবতী এবং দ্বিজ রামচন্দ্রের হরপার্বতীমঙ্গলে শৈব যোগের বর্ণনা ছাড়া সৈঅদ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ বা জ্ঞানচৌতিশা গ্রন্থটিতেও তান্ত্রিক যোগ ব্যাখ্যাত হয়েছে। শিবায়ন এবং বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও কেউ কেউ তন্ত্রসাধনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছেন। দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে শিব নীলাম্বরকে যে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান শিক্ষা দেন, তাও শৈব তান্ত্রিক যোগসাধনা। সংক্ষিপ্ত হলেও এটি উদ্ধৃতিযোগ্য : 'হৃদিপদ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি। কর্ম্মযোগে জানি করে পিণ্ডের বলাবলী ॥ কর্মযোগে বহু যোগ আর নাহি আটে। সে সব কারণ কহি বৈসয় নিকটে ॥ শুন শুন কহি তত্ত্ব অয়ে নীলাম্বর। আপনা শরীর চিন্ত হইতে অমর।। সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে। ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে ॥ জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরসান। ভাটি বন্দী করিয়া জোয়ারে দিব টান।। সে জোয়ারে ঠেকি হংস হইব সুস্থির। কায়া পিণ্ডে হইব দেখা নিশ্চল শরীর ॥ শিরে সহস্রদল পদ্ম বাহি তার তত্ত্ব। অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত ॥ সে অমৃত রহে ভাল পুরুষের স্থান। নহি টলিবেক পথ সুস্থির পরাণ ॥ মেরুদণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান। নবদ্বার বন্দী কৈলে জিনিবা শমন ॥ হরের চরণ দ্বিজ মাধবে গায়ে। কমলে ভ্রমর মধু অবিরত পায়ে ॥

আ। রীস্ ডেভিড্স্ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার বিচারণায় বলেছিলেন, Men varied but never dreamed of rejecting the soul-theories ৫। বাঙলাদেশেও তেমনি দলমতনির্বিশেষে সাধনগত একটি ঐক্য বিদ্যমান ছিল - দ্বৈত সাধনা। একক দেব বা দেবীর আরাধনা বাঙালীর ধাতুসহ নয়। শৈবধর্মে শক্তির যেটুকু আভাস আছে, তাকে গ্রহণ করে অদ্বয়মুখী উপাসনা পরিণত হল দ্বৈতবাদী আরাধনায়। তার ওপর 'মধ্যযুগের চিন্তাধারায় ছিল একটি সমন্বয়ের প্রবণতা, যাহার দ্বারা ঘটিয়া গিয়াছিল বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির পরস্পর সংযোগ ও-সমীকরণ' ৬। শৈবধর্ম একের পর এক বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্গত হয়ে পড়ল, শৈবমত শৈবশাক্তমতে পরিণত হল।

তন্ত্র যোগসাধনার বিকৃত রূপ [৭] অথবা যৌনবিকৃতিপ্রসূত [৮] কিনা, তা আমাদের আলোচ্য নয়। তন্ত্র বহু প্রাচীন একটি বিশিষ্ট সাধনপ্রণালী [৯]। শাক্তদর্শন এর অন্যতম ভিত্তি হলেও কোন বিশেষ দেবদেবীকে আশ্রয় করে গড়ে-ওঠা নয় বলে সকল দেবদেবীই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন [১০]; তাই সকল ধর্মের মূলে এই তন্ত্রের স্পর্শ বিদ্যমান। পালরাজদের আমলে তন্ত্রের স্পর্শে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হতে থাকে [১১], সেনরাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ও শাক্ত তন্ত্র মিশ্রিত হয় [১২]। ক্রমে শৈবধর্ম এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বুদ্ধমূর্তি শিবমূর্তি পরিগ্রহ করে [১৩]। শৈবযোগ তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তন্ত্রের সহায়ে শিবশক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশজ ধর্মাচারে স্থান ও প্রাধান্য লাভ করেন। পরববর্তীকালেএই শৈবশাক্ততন্ত্র বৈষ্ণব সাধনায়ও প্রবেশ করে এবং দেহসাধনাকে প্রবল করে তোলে [১৪]। তন্ত্রপ্রভাবে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরে শিব-শক্তির প্রতিভাসে বুদ্ধ ও শক্তি, অবলোকিতেশ্বর ও তারা, অমিতাভ ও পাণ্ডরা ইত্যাদি 'যুগনদ্ধ' দেব-দেবী কল্পিত ও 'যামলতত্ত্ব' বিহিত হয়েছে। তিব্বতের বৌদ্ধ বজ্রযানে লামাতন্ত্রের গুরু পদ্মসম্ভব কথিত একটি উপকথায় অবলোকিতেশ্বর ও তারাসহ রুদ্র (রুদ্র) ও তাঁর শক্তি ক্রোধেশ্বরীর অদ্বয় মিলনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে [১৫]। নেপালী বৌদ্ধতন্ত্রে শিবশক্তির সাক্ষাৎ মেলে—কুল শক্তি, শিব অকুল [১৬]। বজ্রযানীদের 'বজ্র-কমলই' লিঙ্গ-যোনি। এই তন্ত্র যেখানে চীনাচারী হয়ে উঠেছে, সেখানে শিবশক্তি 'তাও-তেই' নামে খ্যাত হয়েছেন। ডাকার্নব তন্ত্র ও সরোজবজ্রের 'দোহাকোষে' বজ্রডাক ও বজ্রবারাহী এবং হেরুকবজ্র ও তাঁর শক্তিকে বলা হয়েছে, 'হরগৌরী সমাক্রান্তমণ্ডলকসংস্থকং'। চক্রে চক্রে হেরুক ও বজ্রবারাহীর আলিঙ্গিত রূপের ভাবনা, গগনকুহরে 'হর-গৌরীসমাক্রান্তমালীঢ় পদসংস্থিতঃ' অদ্বয়রূপ ধ্যান এবং তার ফলে 'নিখিলং পশ্যেৎ সমরসং সর্বমণ্ডলম্'<তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত, অদ্বয়যোগে যুক্ত শিব-শক্তিকেই স্মরণে আনে। মনে পড়ে কমলাকান্তের সাধকরঞ্জনের [১৭] ষট্চক্রে শাকিনী-হাকিনী-কাকিনী প্রভৃতিসহ শিবের অবস্থিতির কাব্যিক প্রকাশের কথা। ফলে একদিকে পঞ্চবুদ্ধ পঞ্চশক্তিসহ আবির্ভূত হলেন; অন্যদিকে শিবরূপী অক্ষোভ্যের কাছে 'তারামন্ত্র' উদ্‌ঘাটিত হল [১৮]। আলিঙ্গিত মিথুন-মূর্তিশিল্পে বৌদ্ধ ও শৈবশাক্তে বিশেষ কোন প্রভেদ থাকল না, অবলোকিতেশ্বরের অঙ্কে উপবিষ্টা তারা এবং শিবকোলে উমার প্রতিমায়নে ব্যবধান রইল না [১৯]। তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব চর্যাপদে 'শূন্যতাকরুণাভিন্না' রূপ নিল, নৈরাত্মা ও বজ্রসত্ত্ব ধমণ-চমণ বেণীর মধ্যপথে মিলিত হয়ে প্রজ্ঞা-উপায়-এর সমরসতা এনে দিল—শিবশক্তির সামরস্য থেকে তার দূরত্ব খুব বেশী নয়। তখন 'এক সো পদুমা চৌষট্টি পাখুড়ি। তহিঁ চড়ি নাচএ ডোম্বী বাপুড়ী।' অন্যদিকে, বুদ্ধদেব (নৈরাত্মাদেবীর অন্যতর রূপ) আদ্যাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বিদলাত্মক রূপ গ্রহণ করলেন। শূন্যপুরাণে 'সত্ত নামে শিবশক্তি'র একত্রে পূজা হল।

আর ধর্মপূজাবিধানে শিব বললেন, 'সুন পার্বতী কাগ্নার নিতি। রজ বিজ্জে স্থির হয় জেন প্রকারে॥ গগনদেশের মদ্ধে মায় পুরুষ আচ্ছন্তি, জ্যোথি হইতে নিদ্রা য়াছাদন করন্তি। হে দেবি, মস্তকে তোলি মোকাবলি। মেরুডাণ্ডার মদ্ধে ভূদেব বৈসন্তি। রজগুণে ব্রহ্মা সতগুণে বিষ্ণু তমগুণে মহাদেব।' ধর্ম ও আত্মার যুগলপূজা শৈবশাক্ত মত আশ্রয় করল। নাথধর্মেও এইজাতীয় মিশ্রণ লক্ষ্যগোচর হয়। মীননাথ হাড়িপা ও কানুপা শৈবতান্ত্রিক যোগী ছিলেন; অপভ্রংশে লিখিত দোঁহার কবিরাও ছিলেন বৌদ্ধ-শৈব তন্ত্রের সিদ্ধাচার্য ২০। নাথমতে, শিবশক্তির সম্মিলনে বিন্দু, বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে সৃষ্টি; মহাশূন্য নির্গুণ শিবে ইচ্ছাময়ী শক্তির উদয় ও নাদবিন্দু রূপ ধারণ এবং বিন্দুভেদে শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি হয়। মহাযানও নাথসাধনার যোগাযোগের মাধ্যমে বৌদ্ধ ও শৈবশাক্ত তন্ত্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এবিষয়ে অনেকে একমত ২১। শৈব বিন্দুবাদ ও বৌদ্ধ শূন্যবাদ নাথধর্মে তাই অভিন্ন।

শাক্ত তন্ত্রে শক্তির একমেব প্রাধান্য। তিনিই মূলাপ্রকৃতি, সৃষ্টির আদ্যেব ধাতু। সৌন্দর্যলহরীতে ঈশানী-ত্রিপুরসুন্দরীর আসন শিব, আবরণ মহেশ, উপাধান সদাশিব; আসনের চতুষ্পদ ব্রহ্ম-হরি-ঈশ্বর-রুদ্র ২২। শিব ব্যতীত শক্তি 'একভোগ্য' নন, শক্তি-বিরহে 'শিবোঽপি শবতাং যাতি'। শাক্তধর্মে সাধক শক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে 'সাহম্' উপলব্ধি করে। সাধকের আত্মা শিব, শক্তি দেহমন; শিব অহম্, শক্তি ইদম্। কামকলার প্রতিটি বিন্দুতে শিবশক্তি পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে বিরাজমান। দুজনের সমশক্তিতে বন্ধন। সাধনায় বামাকে জাগ্রত করলে শক্তির প্রাধান্যে শিবমায়া-বিষ্ণুমায়া-ব্রহ্মমায়া লয় পায়। তাই তন্ত্রে অদ্বয় সত্যের দুইরূপ—'একরূপে গুণাতীত নিবৃত্তিস্বরূপ, এইরূপই চিন্মাত্রতনু শিব; অপররূপে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি, তিনি প্রবৃত্তিস্বরূপিণী, সংসারপ্রপঞ্চের কারণ-ভূতা' ২৩। তন্ত্রের প্রবক্তা শিব। প্রপঞ্চসার কুলার্ণব কালী কুব্জিকা প্রভৃতি তন্ত্রে শিবের অনাদ্যত্ব স্বীকৃত হয়েছে। শাক্ত-শিষ্য মন্ত্রলাভ করেন, 'তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞঃ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়' (মহানির্বাণ ৮. ২৬৫)। শারদাতিলকে বলা হয়েছে, 'পিণ্ডং ভবেৎ কুণ্ডলিনী শিবাত্মা পদং তু হংসঃ সকলান্তরাত্মা। রূপং ভবে-দ্বিন্দুরনন্ত মন্দক্রান্তিরতীতরূপং শিবসামরস্যম্' (২৫।৬২)। শিববিন্দু এবং শক্তি-বীজ, উভয়ের 'সমবায়' সকল আগমে কথিত হয়েছে (ঐ ১।৮)। কৌলমার্গরহস্যে কৌলগণকে বলা হয়েছে, 'অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ' ২৪ এবং শিবশক্তির সামরস্যই কৌল ২৫। শক্তি ও শিব অভিন্ন, তাঁর শক্তি-অংশই সৃষ্টি করে। গাছ ও ছায়া, আগুন ও ধোঁয়ার মত শিব ও শক্তি পরস্পর সম্বন্ধিত। তখন 'শিবমধ্যে গতা শক্তিঃ ক্রিয়ামধ্যস্থিতঃ শিবঃ। জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তি ইচ্ছয়া॥ ইচ্ছা শক্তির্লয়ং যাতি যত্র তেজঃ পরঃ শিবঃ' (কৌলজ্ঞাননির্ণয় ২,৬-৭)। তখন 'সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনম্ শিবে। মৈথুনং পরমং দ্রব্যং যতীনাং

পরিকীর্ত্তিতম্' (যোগিনীতন্ত্র ৬ অঃ)। তখন শিব-শক্তির সমযোগে 'সংযোগা-জ্জায়তে সৌখ্যম্ পরমানন্দলক্ষণম্'।

শৈবযোগ ও শাক্ততন্ত্রের মিলন-মিশ্রণে শৈবশাক্তমত রূপায়িত হয়ে উঠল। ফলে কাপালিক কালামুখ পশুপতি অঘোর দিগম্বর কৌল চীনাচারী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধানরেখা অনেক কমে গেল। কাপালিক কালামুখরা যে ভৈরবের উপাসনা করে, তিনি স্ত্রী চণ্ডিকাসহ বিরাজমান, শাক্তের ইষ্টদেবী শিবের বক্ষে ও বামভাগে বিরাজমানা। শিব তখন ত্রিপুরভৈরব। আনন্দ-ভৈরব ও আনন্দভৈরবীর সহযোগে যে তুরীয় চিৎশক্তির স্ফূর্তি, তা তত্ত্বাতীত পরাসম্বিৎ, শিবশক্তির যামলরূপ—'নেয়ম্ যোষিৎ ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়স্মৃতঃ। একের সহায়ে অপরকে লাভের এবং দুয়ের সম্মেলনে এক পরম সম্বিদ্‌লাভই শৈবতান্ত্রিক সাধন তত্ত্বের শেষতম লক্ষ্য।

শিবের সঙ্গে শক্তির এই যে মিলন ২৬, বাংলা কাব্যে নানাভাবে তার ছবি ফুটে উঠেছে। মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে সতীর দেহত্যাগান্তর একান্ন পীঠ-স্থানের আবির্ভাবের কথায় বললেন, 'সিদ্ধপীঠ যত স্থান, শঙ্কর সাধয়ে জ্ঞান, কার্য সিদ্ধ হয় জপগুণে'। ভারতচন্দ্র স্বল্প কথায় ব্যক্ত করলেন, 'শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব।' শাক্ত পদাবলীতে ভক্ত গান করলেন, 'সেবিব শিবশক্তি'; তাঁর দৃষ্টিতে, 'কখন শঙ্কর বামে, কভু হরহৃদিপরে'; কখনও 'শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা'; আর চরম অবস্থায় অনুভূত হয়, 'কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।' নাথসাহিত্যে শুনি এর প্রতিধ্বনি। গোরক্ষবিজয়ে গোরক্ষ মীননাথকে বায়ুসাধনার মন্ত্রদানকালে বলেন: ইঙ্গলাপিঙ্গলা দুই উজান বাহিয়া। আনন্দে সুনহ ধ্বনি চৈতন্ত রহিয়া॥ সরীর সঙ্গোগ বাউ কমলসাধন। সটচক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান॥ ধুন্ধুমার শব্দ আর ইন্দ্রবাদ্য বাজে। ভ্রমর ভ্রমরী আছে কমলের মাঝে॥ সে টঙ্গির মৈদ্ধেতে জে আছে হরগৌরী। পঞ্চ শব্দী বাদ্য বাজে নিতি বাজে ঘরী॥ আঁখিতে মিলন হৈয়া রহিছে স্বরিত। শক্তিহীন হৈয়া শেষে পড়িব ভূমিত॥ শিবশক্তি চলি গেলা প্রভু দরশনে। আপনে প্রহরী জেন রহিল আপনে॥ গোরক্ষনাথ-বিবৃত এই সহজানন্দময় তান্ত্রিক যোগের কথা সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে সমর্থিত: 'সৈব শক্তি র্যদা সহজেন স্বস্মিন্ আলিঙ্গ্যাং নিরুত্থানদশায়াং বর্ত্ততে তদা শিবঃ সৈব ভবন্তি'॥ ৪।১

বৈষ্ণবী মধুর সাধনা যখন শক্তিতত্ত্ব ও তন্ত্রসান্নিধ্য পেল, তখন সহজানন্দ পরিণত হল সহজ সাধনায়। 'রসকদম্ব' তার একটি ফল। সুফী ধর্মের তন্ত্র-ঘনিষ্ঠতাও সহজিয়া সাধনের অন্যতম উপাদান; চক্র সেখানে 'মকাম'। তাই 'আনন্দভৈরব' গ্রন্থে, 'শক্তি জানে রসতত্ত্ব আর জানে শঙ্করে। সহজ বস্তু আস্বাদিল কুচনীনগরে'। শক্তির দেহজাত চৌষট্টী যোগিনী প্রকৃতিরূপে 'হরকে ভজয়ে সবে

ভাব উপপতি।' শিব শক্তিকে পেলেন 'কামবীজ'-এর অনুগত হয়ে; দেবীর দেহভাণ্ডে শিব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করলেন২৭; দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে দিতে শক্তি হলেন 'অমৃতময়ী', আর 'চন্দ্রগুণে বিহ্বোল হর ললাটে পারল।' শিবানী তাঁকে চেতনা দিয়ে নিজ অঙ্কে বসালেন। তখন দেবীর দেহদেবালয়ে 'কি জানি মন্দির, নহে সে গোচর, রস কোন হয় তার। তাহার ভিতর, কিশোরী কিশোর, না হয় গোচর কার।' তান্ত্রিক শক্তিতত্ত্ব, ষট্চক্রভেদ এবং সমরসতা রূপান্তরিত হয়ে জ্ঞানের স্থানে এল রস, শক্তির স্থলে প্রেম এবং শিবশক্তির বদলে কিশোরী-কিশোর তথা রাধাকৃষ্ণ। এখন রাধা-শক্তিকে সহস্রারস্থ কৃষ্ণ-পুরুষে নীত করলেই সহজানন্দ-লাভ। তন্ত্রমতে, প্রত্যেক পুরুষ শিবস্বরূপ, প্রত্যেক নারী শক্তিস্বরূপা২৮। বৈষ্ণব দেহ-সাধনার ক্ষেত্রে নেমে শিবশক্তি পরিণত হলেন দেহধারী নরনারীতে। সাধনার মাধ্যমে সহজতত্ত্ব যখন নরনারীর চিত্তে সম্যক্ স্ফুরিত হয়, তখনই উভয়ের দেহযোগে মন বিলসিত হয় মহাসুখে এবং অদ্বয় সত্যের প্রকৃত স্বরূপ-উপলব্ধি ঘটে২৯। তখন এই দেহযোগের সামরস্যই অবলোকিতেশ্বর-তারার, রাধাকৃষ্ণের বা শিব-শক্তির যুগনদ্ধ রূপ বলে পরিগণিত হয়।

ই। শুধু বাঙলা নয়, সমগ্র ভারতীয় ধর্মের মূলে যে যুগল দেবদেবী এবং দ্বৈতবাদের ভাবনা, 'আসলে তো উহা পুরুষ-প্রকৃতি, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত শিব-শক্তি ···ইহা যেন ভারতীয় গণমনেরই একটি মূল সিদ্ধান্ত' ৩০। গণমনের এই সিদ্ধান্তের উৎস কোথায় এবং তার স্বরূপ কি, 'ভারতশিব' অধ্যায়ে আমরা তার পর্যালোচনা করেছি। বাঙলাদেশের ইতিহাসেও তার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই—লোকায়ত সংস্কৃতির বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে ধর্মে কাব্যে শিল্পে সংগীতে আত্মবিস্তার করেছে, কৃষকের যুগল দেব-দেবী দার্শনিকের 'যামল' দেবতায়, মৃত্যু-পুনর্জন্ম ভাবনা নিরাকার-সাকার তত্ত্বে, কর্ষণকালীন যৌনসংযম বীর্যস্তম্ভিত যোগসাধনায় এবং যৌনসংগম পঞ্চমকারধৃত তন্ত্রসাধনায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। রূপান্তরিত দেবতা-দর্শনে-সাধনায় এই বিবর্তনের পরিচয় আজ আর সহজে লক্ষ্যগোচর হয় না; ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে এই ক্রমবিকাশের বিচিত্র গতিপথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণভারতের গ্রামদেবীরা যেমন শিবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'popular worship of Siva'কে প্রবল করে তুলেছিল ৩১, তেমনি বাঙলার জনগণও পুরাণবাহিত শিব ও শৈবধর্মকে লৌকিক সাধনার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। ফলে এখানেও ধর্ম নবভাবে বিকশিত হয়ে উঠল (শুধু শিবের ক্ষেত্রে নয়, সকল দেব-দেবীর ক্ষেত্রেই), বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সাদৃশ্য দেখা দিল। এই সাদৃশ্যের পশ্চাতে তন্ত্রের অবদান সর্বাধিক। তাই দেখি—মধ্যপথ বেয়ে শূন্যতা ও করুণা, উপায় ও প্রজ্ঞাকে মিলিত করাই হল বৌদ্ধ সাধনা; মূলাধার থেকে জাগ্রত করে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ষট্চক্রমাধ্যমে সহস্রারে শিবের সঙ্গে মিলিত করাই হল

শৈব-শক্তি আরাধনা ; রাধাহৃদয়ে মধুরা রতির আলো জ্বালিয়ে কণ্টকপিচ্ছিল পথে অভিসরণের মধ্যে দিয়ে বৃন্দাবনকুঞ্জে কৃষ্ণসহ ভাবসম্মিলিত করাই হল বৈষ্ণব উপাসনা। সম্প্রদায়ভেদে নাম-রূপ বিভিন্ন কিন্তু তত্ত্ব সেই এক—জন্ম-মৃত্যু-পুনরুজ্জীবন, পূর্বরাগ-বিরহ-মিলন, এক থেকে দুই, দুই থেকে আবার এক। তখন শৈবশাক্তবৈষ্ণববৌদ্ধে কোন ব্যবধান নেই, বিহার-পীঠ-মন্দির-আলয়ে কোন পার্থক্য নেই ; তখন পরমজ্ঞান ও পরমসিদ্ধি, পরাসুখ ও পরাভক্তি অভেদ অনুভূতি, আমরা যোগী-ভক্ত-সাধক তথা দাস-সখী-সন্তান মাত্র !

ঊ। বাঙলার বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে শৈবধর্মের এবং দেশজ প্রমথেশদের সঙ্গে শিবের যে মিশ্রণ, আমাদের নিত্যপূজায় তার পরিচয় আজও বাহিত হয়ে চলেছে। প্রাত্যহিক ও সাময়িক পূজা-অনুষ্ঠানে 'নারায়ণশিলা শালগ্রামের' পাশাপাশি 'শিবশিলা লিঙ্গ' সমান আদরে বিরাজমান। বিভিন্ন তিথিতে বারব্রতে মানস কামনায় (প্রধানতঃ) মৃত্তিকার শিব ও লিঙ্গমূর্তি বরেণ্য। মহিম্নস্তব শিবকবচ মৃত্যুঞ্জয়-কবচ বটুকভৈরবস্তোত্র প্রভৃতি শৈব পুরাণাচার মিশ্ররূপে সর্বদুঃখহর সর্বপাপনাশক। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে আচমনে ভূতশুদ্ধিতে ভৈরবী-গায়ত্রীতে শিবনাম উচ্চারিত। নীলকণ্ঠ শবরূপ-মহাদেব মহাকাল বৈদ্যনাথ শিবাষ্টকমূর্তি বাণলিঙ্গ চণ্ডেশ্বর প্রভৃতির নামেরূপেধ্যানে আছে এই সংমিশ্রনের পরিচিতি। শিব কৃষিদেব 'ক্ষেত্রপাল' ও বাস্তুদেব 'শস্যপাল'রূপে' পূজিত হন। পুরাণস্বীকৃত ব্রতাচারেও তিনি সমন্বিত। পাশুপত শিবমুষ্টি উমা-মহেশ্বর সর্বজয়া বিপৎতারিণী সাবিত্রী-চতুর্দশী চম্পক-চতুর্দশী অঘোর-চতুর্দশী হরিতালিকা মানচতুর্থী কুক্কুটী ব্রতের অধিদেবতা তিনি। এগুলি পতিকামনা বন্ধ্যাত্বমোচন বৈধব্যখণ্ডন পুত্রবাসনার ব্রত অথবা বৃক্ষ-কৃষি-গো-পূজার স্মরণিকা[৩২]। এছাড়াও আছে সংখ্যাহীন অশাস্ত্রীয় মেয়েলী ব্রত[৩৩]। অরণ্য বৃক্ষ ক্ষেত্র নদী পুকুর ঋতু ইত্যাদির পূজা, স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনা, সৌভ্রাত্র ও সমাজ-বন্ধনের মধুর আগ্রহ, সুফলনের বাসনা এবং ব্যক্তিগত কামনা পরিপূর্তির প্রয়াস ব্রতগুলির মূল সূত্র [৩৪]। শিবের সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীর এখানে বিরোধহীন সমতা ও সহ-অবস্থান। শিবব্রত অশ্বত্থপাতার ব্রত ও সন্ধ্যামণির ব্রতে শিবের একক প্রাধান্য। পূর্ববঙ্গের বুড়া ঠাকুরাণী বা বনদুর্গার ব্রত এবং ময়মনসিংহের পাঁচুঠাকুরের ব্রতে শিব প্রধান দেবতা। প্রথমটিতে তিনি বনদেবী এবং দ্বিতীয়টিতে পঞ্চশস্যের অধিদেবতার সঙ্গে যুক্ত। অন্যত্র দুর্গা তাঁর নিত্য সঙ্গিনী, নীলব্রত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই নীল একদিকে নীলকণ্ঠ, অন্যদিকে বৌদ্ধ নীলসরস্বতী তথা নীলাবতীর দেবীরূপ। রালদুর্গা বা ইতু, মাঘমণ্ডল ও ভাতুলী নামা সৌরব্রতের কথা-অংশে শিব যে সমুপস্থিত, তার পরিচয় যথাস্থানে দিয়েছি। পূর্ববঙ্গে শিব-সংক্রান্তির ছাতুসংক্রান্তি নামে পরিচিতি কোম কৃষিব্রতে তাঁর স্থানলাভের ইঙ্গিত দেয়। সমশ্রেণীর সেঁজুতি ব্রতে চন্দ্রসূর্য ধান্তাকাতা ত্রিকোণী প্রদীপ অশ্বত্থগাছ ও দশপুতুলের সঙ্গে শিব একত্রে পূজা পান। সেঁজুতির গঠনভঙ্গিমা শিবালয়কে

স্মরণ করিয়ে দেয়, এর প্রার্থনায় 'হে হর শঙ্কর দিনকর নাথ' মন্ত্রটি শিব-সূর্যের অভিন্নতার স্বীকৃতি এবং পুতুলগুলি শিবের প্রজননক্ষমতার পরিচায়ক।

উ। শিব-উপাসনার সব চেয়ে বড় অনুষ্ঠান শিবরাত্রি ব্রত [৩৫]। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে রাত্রিকালে সোপবাস ও নিশিজাগরণসহ এই পূজা বিধেয়। রাত্রে চারবার শিবের ঈশান-অঘোর-বামদেব-সদ্যোজাত এই চারিটি রূপের পূজা করতে হয়। এই নামগুলি উপনিষদ ও তন্ত্রখ্যাত। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও মহানারায়ণীয় উপনিষদে শিব সম্পর্কে যে 'পঞ্চমন্ত্র' আছে, তা থেকে শৈব সম্প্রদায় পঞ্চাননের মূর্তি কল্পনা করে—সদ্যোক্ত চারটি ও তৎপুরুষ। ব্রতের কথা-অংশে ব্যাধের শিবপূজার যে কাহিনী আছে তা শিব-মৎস্য-গরুড়-ব্রহ্ম ও ভবিষ্যপুরাণে পাওয়া যায়। গঙ্গাস্নান ও পরদিন ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থাটি পুরোহিত-প্রবর্তিত। কৌম ব্রতের স্বাক্ষরও এর মধ্যে বিদ্যমান। শিবপুরাণে বলা হয়েছে, এটি ব্যাধের প্রবর্তিত ; গরুড় পুরাণে (পূর্ব ১২৪ অঃ) সুন্দরসেন নামে এক নিষাদরাজকে এই ব্রতের প্রবর্তক বলা হয়েছে ; সনৎ সংহিতায় (১৪ অঃ) শিব ম্লেচ্ছ ও স্ত্রীজাতি-পূজিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাধকাহিনী ব্রতটির নিষাদ-উৎসের ইঙ্গিত-বহ, উপাসিকা নারী। মহাভারতের (বন) কিরাত-শিবও ছিলেন নিষাদী দেবতা। দ্রবিড় দেশে কৌমপূজা হয় সাধারণত রাত্রে। আমাদের দেশে কালী কোজাগরী লক্ষ্মী ইত্যাদি কৌম দেবী রাত্রে পূজিতা হন ; সন্ধ্যায় একমাত্র বৈদ্যনাথ ছাড়া দিনান্তে আর কোন শিবদেবতার পূজা হয় না। শিবরাত্রি রাত্রিকালীন ব্রত। উপবাস জাগরণ প্রভৃতি শারীরিক ক্লেশ কৌম আচারঘনিষ্ঠ। কোথাও কোথাও এই রাত্রে যৌনক্রীড়া বিধেয়। মেয়েদের ব্রতে 'আকে আকন্দ বিল্বপত্র তোলা গঙ্গার জল। তাই পেয়ে তুষ্ট হন ভোলা মহেশ্বর'-এর মত শিবরাত্রি ব্রতের আশুতোষ ভোলানাথও জল ও বিল্বপত্রে সন্তুষ্ট। অগ্রহায়ণে ওরাওঁদের 'সূর্জাহি' ও কোচদের 'মহারাজা' পূজিত হন কৃষির সুবিধার্থে ; লৌকিক কথায়, শিব চাষে নামেন মাঘ মাসের শেষ দিকে, ফাল্গুনে শিবরাত্রি ব্রত, চৈত্র সংক্রান্তিতে তাঁর চড়ক, বৈশাখে গাজন-গম্ভীরা-গমীরা অনুষ্ঠান। এগুলি পরম্পরঘনিষ্ঠ একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা। শিবরাত্রি ব্রত সেই ধারারই কৃষি-প্রজনন ব্রত।

উ। **শৈবতীর্থ :** সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আলোচনায় লোকধর্মের সঙ্গে লোকতীর্থকেও স্বীকৃতি দান করতে হয়। তীর্থ-মাহাত্ম্যের বিস্তৃতি পুরাণে। একদিকে পুরাণের প্রভাব, অন্যদিকে ধর্মগত সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ বাঙলায় তীর্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আঞ্চলিক ভূতপতি প্রমথেশবৃন্দ যখন একে-একে শিবস্বরূপে লীন হলেন, তখন সেই সেই স্থানের গ্রাম্য মণ্ডপ বা ''থান্' এক-একটি শৈব তীর্থ হয়ে দেখা দিল। এগুলির অধিকাংশই রোগহর, অসংখ্য রোগীর জনতা নৈমিত্তিক ঘটনা। শিবের এই ধন্বন্তরিত্বের মূলে একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্য [৩৬] অন্যদিকে বাঙলার মারীদেবতা প্রমথেশদের প্রত্যক্ষ প্রভাব [৩৭] বিদ্যমান। বৌদ্ধদের দ্বারপাল বর্ণনা এবং তন্ত্রের

অঙ্গন্যাসে যে দিগ্‌বন্ধনের রীতি আছে, বাংলা কাব্যের দিগ্‌বন্দনা তার অনুরূপ। পাল-সেন যুগের অভিজাত শিবমন্দির নয়, লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত শিবালয়গুলিই এইসব দিগ্‌বন্দনার আলোচ্য বিষয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাশী বদরী বটেশ্বর উল্লিখিত এবং মালদহের গম্ভীরা গানে নদী সাগর পর্বতের পাশে জগন্নাথ ভানু কামরূপ বন্দিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বাঙলার নিজস্ব তীর্থগুলি উল্লিখিত হতে থাকে, এমন-কি মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে পাই, 'ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈব চ। বীরভূমে সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ'। ধর্মমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে বাঙলার কৌম দেবতারা যখন শিবনাম গ্রহণ করতে লাগলেন, কবিদের দৃষ্টিতে সেই রূপান্তর ধরা পড়ল। পশ্চিম বাঙলায় শৈব তীর্থের সংখ্যাগুরুত্বের জন্যে চণ্ডী এবং ধর্মমঙ্গলে তার বর্ণনা ও বন্দনা সব চেয়ে বেশি। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে (১৫৭৭ খ্রীঃ ? ১৫৮৯ খ্রীঃ ?) গৌড়ীয় শৈবতীর্থের প্রথম স্বীকৃতি ও বিস্তৃতি। কোডঞ্চিনগরের কামেশ্বর, চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর, নীলপুরের নীল, পলাশনের অগ্নিমুখা শিব, কাইতির বাণেশ্বর, মহানাদের সদাশিব, দামিন্যার চক্রাদিত্য প্রভৃতি তাঁর কাব্যে বন্দিত হয়েছেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে (১৫৭১ শক) শিওড়ের শান্তিনাথ, কামারহাটির পঞ্চানন্দ, মানিক গাঙ্গুলীতে (১৭৮১ খ্রীঃ) ফুল্লরের ফুল্লেশ্বর, নেড়াদেউলের কামেশ্বর, ব্রাহ্মণভূমের ঝাড়েশ্বর, বেতারের কেতিরেশ্বর, ভদ্রেশ্বরের ভদ্রেশ্বর, থানাকুলের ঘণ্টেশ্বর, বালিগড়ের তারকেশ্বর, মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকায় (১৭৭৯ খ্রীঃ) চন্দ্রনাথ এবং তাঁর পাশে 'মাঠমাঝে শিবলিঙ্গ করিছে স্থাপন' ইত্যাদি উল্লেখনীয়। ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ, জলেশ্বরের জলেশ্বর শিব (চৈ. ভা.), সিমুলিয়া ও রুদ্রদ্বীপের শিব এবং একাম্রক বনের ঊনকোটি শিবলিঙ্গ ও কপালেশ্বর দেউল চৈতন্য ও তাঁর অনুগামী সহচরদের প্রিয় তীর্থস্থান ছিল। লোচন দাস একাম্রক বনের বিস্তৃত বর্ণনাসহ হরিহরের অভেদ ঐক্যও সংঘটিত করেছেন।

কতকগুলি শৈব তীর্থ ক্রমে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেগুলিকে আশ্রয় করে নানা কথা কাহিনী ও ক্ষুদ্রদেহী কাব্য লেখা হতে থাকে। মুকুন্দরাম রূপরাম মানিক গাঙ্গুলী সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি কবি তারকেশ্বরের উল্লেখ করেছেন। ইনি তাড়েশ্বর টাড়েশ্বর তারকনাথ নামেও খ্যাত, পুরাণান্বিত হয়ে 'অনাদিলিঙ্গ' ও 'অনাথলিঙ্গ' নাম গ্রহণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের দিগ্‌বন্দনায় ইনি উল্লিখিত হলেও অনেকে তীর্থটি সপ্তদশ শতাব্দীর বলে মনে করেন [৩৮]। তারকমঙ্গল ও লৌকিক ছড়ায় তারকেশ্বরের যে জন্মকাহিনী বিবৃত হয়েছে, অন্যান্য অনেক শৈব তীর্থের উদ্ভবের ইতিহাসের সঙ্গে তা অভিন্ন। রাজা ভারা-মল্লের গাভীরক্ষক মুকুন্দ ঘোষ। তার সর্বশ্রেষ্ঠ গাভী ভারতী একবার প্রসূতির পর দুধ দেওয়া বন্ধ করল। অনুসন্ধানে জানা গেল, তাড়পুরের জঙ্গলে এক শিলাদেহে সে প্রত্যহ দুধ দেয়। রাত্রে শিব মুকুন্দকে দেখা দিয়ে পূজাপ্রচারের

নির্দেশ এবং বর প্রদানান্তর অন্তর্হিত হলেন। পরদিনও তিনি স্বপ্নে এলেন এবং জানালেন, রাখালরা শিলার ওপর ধান ঝাড়ায় লিঙ্গমস্তকে 'মহাবিল' হয়েছে, তিনি শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। পরদিন মুকুন্দ রাজাকে সমস্ত জানাল, দুজনে গোপনে থেকে ভারতীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করল। রাজা তখন লিঙ্গটি ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটি কেটে লিঙ্গ তোলবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু লিঙ্গমূল কিছুতেই পাওয়া গেল না, 'দ্বাদশ দিবস খুঁড়ে অন্ত নাহি পায়। যত খুঁড়ে তত শম্ভু পাতাল দিকে ধায়'। রাত্রে শিব আবার স্বপ্নবাহনে এসে জানালেন, তাড়পুরের জঙ্গলেই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হোক। সেই নির্দেশমত কাজ হল। শিবশিলার নাম হল 'গোয়ালার ঠাকুর'। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরা এই লিঙ্গের পূজায় রাজী হলেন না। শেষে শিংটা-শিবপুরের চতুর্ভুজ গাঙ্গুলি পৌরোহিত্য গ্রহণ করলে তারকেশ্বর সর্বস্বীকৃত দেবতা বলে গণ্য হলেন।

কাহিনীটি স্পষ্টত স্থানীয় কৌম দেবতার শিবত্ব-প্রাপ্তির ইঙ্গিত বহন করে। গাভীর দুগ্ধদান, রাখালদের ধানঝাড়া, লিঙ্গের অরণ্যবাস এবং গোয়ালার ঠাকুর-এর প্রতি ব্রাহ্মণদের প্রাথমিক অবজ্ঞা তার সাক্ষ্য। দক্ষিণ ভারতের বদগ্‌দের মধ্যে এই জাতীয় প্রবাদকথা প্রচলিত আছে ৩৯; বাঙলার কৌমপ্রমথ ও লিঙ্গাদিও এইভাবে মিলিত হয়েছে পুরাণশিবের সঙ্গে। তারকেশ্বরের পূজারীতিতে এই মিশ্রণ লক্ষণীয়: একদিকে পুরাণসম্মত নিত্য পূজাপদ্ধতি, অন্যদিকে সন্ন্যাস গাজন বৃষপূজা হত্যা-দেওয়া কেশদান কপালে তিলকধারণ ইত্যাদি। পুরোহিত ব্রাহ্মণ কিন্তু প্রধান সন্ন্যাসী রামনগরের গোপরা। দেবতা একপক্ষে মহাদেব মহেশ্বর, অন্যপক্ষে কুষ্ঠব্যাধি চক্ষুঃশিরোরোগ অম্লশূলাদির আরোগ্যকর্তা এবং ধনদ ও পুত্রদ। এথেকে বোঝা যায়, তাড়পুরের জঙ্গলে কৃষক ও গোপ উপাসিত রক্তস্নাত কৌম লিঙ্গ শিবরূপে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করেন; আদিম রক্তদান আজ দুগ্ধদানে পরিণত হয়েছে। কালক্রমে তারকেশ্বর অন্যতম প্রধান তীর্থ হয়ে ওঠে, নিকটবর্তী অন্যান্য কৌম প্রমথ তখন তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন—গুণগড়ের শিবশম্ভু, গড়ভবানীপুরের মণিনাথশিব, ঘুঘুড়ির মহাকাল ভৈরব, গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র, বড়শির শিব। কয়েকটি শক্তিপীঠও তারকেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। সংখ্যাবিহীন জনতার কণ্ঠের শিবগীতি তাঁর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছে। আমরা দুটি গান উদ্ধৃত করছি: তারকব্রহ্ম তারকনাথে ডাক রে আমার মন। ভক্তিভাবে ডাকলে পরে দয়া করবেন পঞ্চানন॥ পরাণ দাসের এই বাসনা, মন আমার চেতন হল না, মায়ার বসে রইলি ভুলে বাবায় ডাকলি না—ডাকলে পরে সদয় হয়ে দিতেন বাবা শ্রীচরণ॥ বাবা মক্কায় মক্কেশ্বর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, কলিতে এই জীব তরাতে তুমি তারকেশ্বর। গিরিবালা গৌরিরূপে বসেছে ভব বামে॥ ভক্তিভাবে ভাব রে মন বাবার ঐ চরণ।...(ভক্তের) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ভোলা ত্রিলোচন॥ ভক্তবৎসল নামটি ধরে, ভক্ত ডাকলে রইতে নারে,

পাপী তাপী উদ্ধার করেন দিয়ে বাবার শ্রীচরণ॥ মুখে বল ব্যোম্ব্যোম্ ভোলা, রবে না রবে না ভবের জ্বালা, জাহ্নবীর জল শিরে লয়ে ঢাল, কদাচ বাবায় করো না হেলা॥ আমার একান্ত এই মন, যদি না হও দরশন, এ জনমের মত দেহ করিব পাতন। গোপাল দত্ত বলে, ভয় কি মলে, চলে যাব কৈলাশে॥

মেদিনীপুরের কানাসোলগ্রামে মানিক গাঙ্গুলী কথিত স্বয়ম্ভূ শ্রীঝাড়েশ্বর দেবের অধিষ্ঠান। এঁর আবির্ভাব-ইতিবৃত্ত তারকেশ্বরের মতই। আড়রার রাজা আলালদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। কথিত আছে ১০৩৬ সালে এঁর স্থাপনা হয়[৪০]। ইনি বৌদ্ধ প্রভাবিত ধর্মঠাকুর। উপাসনায় ধর্মের প্রভাব অধিক। চৈত্রে গাজন হয়। রোগীরা আসে প্রতি সোমবার, মানসিক করে, হত্যা দেয়। খঞ্জ অন্ধ পঙ্গু বন্ধ্যা মৃতবৎসা ও শূলব্যাধিগ্রস্তরাই বেশি ভিড় করে। ইনি যে একদা কৌম মারীদেব ছিলেন, 'ঝাড়েশ্বর' নামটি তাঁরই দ্যোতক। ভেষজদাতা শিব সহজেই এঁকে আত্মসাৎ করেন। এমনি আর একজন ভেষজ-দেবতা রাঢ়ের গাজনগীতি ও কেতকাদাস বন্দিত আরূঢ়ের বৈদ্যনাথ। এখানে সতীর হৃদয় পড়েছিল বলা হয়। মৎস্যপুরাণে এই পীঠের নাম 'অরোগা'। তন্ত্রচূড়ামণির পীঠনির্ণয় প্রসঙ্গে 'হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ' উল্লিখিত হয়েছে। এই বৈদ্যনাথ রুদ্রের বৈদ্যত্ব গুণ থেকে আহৃত বলে অনেকে মনে করেন[৪১]। কিন্তু ইনিও স্থানিক মারীদেবতা, রুদ্রজ বৈদ্যনাথ পরে এঁর সঙ্গে যুক্ত হন। ইনি রক্তবাত শূলবাত অন্ধত্ব নিরাময় করেন।

শ্রীহট্ট থেকে দ্বিজ সুন্দর লিখিত 'বৈদ্যনাথমঙ্গল'-এর যে পুঁথি পাওয়া গেছে[৪২], তাতে বৈদ্যনাথ-প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। রাবণ প্রত্যহ কৈলাসে গিয়ে শিবপূজা করেন কিন্তু তাতে নানা অসুবিধা; তাই তিনি শিবকে স্বদেশে নিয়ে যেতে চান। শিবের সম্মতিতে ও গৌরীর অজ্ঞাতে উভয়ের নিদ্রার অবকাশে রাবণ কৈলাস পাহাড় তুললেন। কিন্তু গৌরী বিনিদ্র হয়ে বিশ্বম্ভরীমূর্তি ধারণ করে বাধা দিলেন। রাবণের স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব একাকী যেতে রাজী হলেন। শর্ত হল, পথে তাঁকে নামানো চলবে না। কিন্তু বরুণদেবের কৃপায় রাবণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারলেন না; যেখানে তিনি শিবকে নামালেন, সেখানেই দেবতা অচল হয়ে গেলেন। ইনিই বৈদ্যনাথ। শিব কৈলাসে ফিরে গেলেন। রাক্ষসপুরবাসী বলে গৌরী তাঁকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ হলেন। অবশেষে দুজনে মিলন হল। এই কাহিনী প্রমাণ করে, বৈদ্যনাথ স্থানীয় দেবতা[৪৩]। গৌরীর প্রত্যাখ্যান দ্বারা বৈদ্যনাথের কৌমত্ব প্রমাণিত হয়। তাঁকে পুরাণের পরিচ্ছদে ভূষিত করে[৪৪] শাস্ত্রীয় রূপ দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে। চট্টগ্রামের যে শৈবকাব্যগুলি আমরা পরে আলোচনা করেছি, সেগুলি চন্দ্রনাথ তীর্থকে কেন্দ্র করে গড়েওঠা শিবমাহাত্ম্যগীতি।

খ। শুধু তীর্থগুলিতে নয়, শিব ছড়িয়ে গেছেন সারা বাঙলাদেশে, মন্দিরে

ও বৃক্ষতলে, গৃহে ও প্রান্তরে; পাশে আছেন সহযাত্রিণী মাতৃকাবৃন্দ। এই ছড়িয়ে-থাকার মধ্যেও একটা সীমাবন্ধনী আছে। হাওড়া হুগলী চব্বিশ-পরগণা পঞ্চানন্দ-তারকেশ্বরের এলাকা, বাঁকুড়া বীরভূম বর্ধমান এক্তেশ্বর-ত্বক্ষেশ্বরাদির অধিকারে, মেদিনীপুরে ভৈরবের রাজত্ব, মুর্শিদাবাদে রুদ্র-শিবের—ভৌগোলিক দিক থেকে এইরকম একটি শৈব সাংস্কৃতিক মানচিত্র রচনা করা যায়। বলা বাহুল্য, একের এলাকায় অপরের প্রবেশ নিষেধ নয়, দুর্লভও নয়। এ ছাড়া শিব-শিবানীর বিভিন্ন রূপমূর্তি বাঙালীর গৃহে মন্দিরে মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত এবং শৈব প্রতীক লিঙ্গ আকাশী তারার মত সংখ্যাগণনার অতীত হয়ে বিরাজ করছেন বাঙলার পথে প্রান্তরে ও পথের প্রান্তে।

আর একদিকে শিব-শিবানী কাব্যরসে অভিষিক্ত হয়ে নবরূপ লাভ করেছেন বাঙালীজীবনের সদরে অন্দরে ও অন্তরে। ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র পরিভ্রমণান্তে আমরা এসে পড়েছি সেই কাব্যক্ষেত্র-কারুক্ষেত্রের শৈল্পিক সীমানায়॥

শিবরূপ

ক। কাব্যে দেবতা শিব

পরিপার্শ্বকে জেনে জয় করার শক্তি বিজ্ঞানে, তাকে না জেনে জয় করার চেষ্টা জাদুবিদ্যায়। আদিম মানুষ পরিবেশ-অচেতন ছিল না কিন্তু অনভিজ্ঞ ছিল; তার পর্যবেক্ষণ ও কর্মশক্তি ছিল, ছিল না সচেতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। ফলে বিজ্ঞানের কলাকৌশলকে হাতের কাছে পেয়েও জীবনযুদ্ধের হাতিয়াররূপে সে প্রয়োগ করেছে জাদুবিদ্যাকে। শত্রুকে বধ করা চাই, প্রকৃতিকে খুশি রাখা চাই, অন্নের অধিকতর সঞ্চয় চাই; এই চাওয়াকে সফল করে তুলতে মানুষ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছে, প্রকৃতির নিয়মকে বোঝবার চেষ্টা করেছে, অন্নসংগ্রহের বাস্তব পন্থা অবলম্বন করেছে। কিন্তু এতেই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, জয়পরাজয়ের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহায় আঁকা ছবি, পাথর ও হাতীর দাঁতের মূর্তিগুলি শিকার এবং ফলাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক ছিল বলে বৈজ্ঞানিকগণ মত প্রকাশ করেছেন। যখন মানুষ অন্ন উৎপাদন অর্থাৎ চাষ করতে শিখল, তখন জাদুর রূপ বদলে গেল; শুধু ছবি আর মূর্তি নয়, সেই সঙ্গে এল অভিনয়—যেমন, শিকারে যাবার আগে শিকারের অথবা টোটেম পশু-পাখীর মিথুনের হুবহু রূপাভিনয় মানুষ করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই জাদুর সাহায্যে বনে শিকার মিলবে, পশু-পাখীর বংশবৃদ্ধি হবে। বাস্তব কর্মের পাশাপাশি এই জাতীয় অনুষ্ঠান বা 'ব্রতকৃত্য' প্রযোজিত হত। কৃষিকালে একদিকে যেমন যথারীতি চাষ হত, অন্যদিকে তেমনি হত 'চাষপালা'—নরনারী কৃষক বলদ লাঙ্গল শস্য ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলত কর্ষণের সমগ্র ব্যাপারটিকে। জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন দিকের প্রয়োজনে নানাবিধ ব্রতকৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। এগুলির মূল লক্ষ্য ছিল দুটি: বনের পশু, গাছের ফল, মাঠের শস্যে যে প্রাণশক্তি আছে, তাকে করতলগত করা এবং কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করে তোলা। আদিম সমাজে মানুষ কাজ করত সমবেতভাবে, 'সমষ্টিমন' নিয়ে; সেই সমষ্টিমনকে জাগাতে হবে, কাজের পথে এগিয়ে যেতে হবে একসঙ্গে পা মিলিয়ে মন মিলিয়ে, একমন হয়ে কাজ করতে হবে, তারপর সিদ্ধিঅন্তে ঘরে ফিরে এসে একত্রে উৎসব পালন করতে হবে—যাতে থাকবে বর্তমানের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা, আগামী সংগ্রামে জয়লাভের শক্তি ও সাধনা। কর্মের এই বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে ব্রত বা জাদুকৃত্য ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ ছিল। সে সমষ্টিমনে জাগাত 'সমষ্টি-আবেগ', প্রতি পদক্ষেপে দিত শক্তি সাহস উদ্দীপনা, সফলতা লাভের জন্যে যেগুলি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এই আদিম কৃত্যে অভিনয়ের সঙ্গে একত্রে এক আধারে মিলেমিশে ছিল নৃত্য-গীত-বাদ্য-কাহিনী-চরিত্র এবং তত্ত্ব। এই কৃত্য-কলা যেমন নৃত্য গীত সাহিত্য শিল্পের উৎস, তেমন ধর্ম ও দেবদেবীর উদ্ভবমূল।

প্রথমদিকে কৃত্যগুলি সরল ছিল, ক্রমে জটিল হয়ে ওঠে, বিবিধ রীত্‌কানুন বিধিবদ্ধ হয়। পশু-শস্যের স্থানে এলেন প্রথম-প্রমথিনী। তাঁরা হলেন শাবক-শস্য-পৃথিবী-প্রকৃতির প্রতীক ও প্রতিনিধি, তাঁদের রূপে ও চরিত্রে ঐসব লক্ষ্যবস্তুর লক্ষণগুলি আরোপিত হল। যেমন—শস্যের জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের স্পর্শে প্রমথ-প্রমথিনীও হলেন মৃত্যু-পুনরুজ্জীবনের অধীন ; শস্যের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে কেউ শ্যামল, কেউ বা কাঁচা সোনালী। তাঁদের ঘিরে যে উপাসনারীতি এবং কথাকাহিনীর আবির্ভাব হল, সেগুলি ছিল এই কৃত্যানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সহগামী : the gods live for the primitive in the collective festivals and the collective emotion ১। মূল কাঠামো প্রায়-অভিন্ন হলেও দেশেদেশে কাল ও পাত্রের পার্থক্যে এগুলির রূপ বিভিন্ন। উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতি এবং উৎপাদনসম্বন্ধের জটিলতায় আদিম গণসমাজ যখন উপনীত হল 'সভ্যযুগে', শ্রমবিভাগ দেখা দিল কর্মক্ষেত্রে, সেইসঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রেও। দাসতন্ত্রের দৌলতে একদল মানুষ কর্মক্ষেত্র থেকে মুক্তি পেল, নতুন পরিবেশে জাগল নবীন আবেশ। কাজের গুরুভার এখানে হালকা, অবসরভরা মুহূর্তে কল্পনাবিলসনের আকাশভরা অবকাশ। ফলে তত্ত্বচিন্তা হল কর্মমুখী নয়, মর্মমুখী। জাদুকৃত্য পরিণত হল ধর্ম-সাধনায়, তার বিধিবিধান-প্রার্থনা-মন্ত্র ধরে রাখা হল শাস্ত্রে, প্রমথ-প্রমথিনী (spirit) হলেন দেব-দেবী এবং তাঁদের কেন্দ্র করে যে সব উপকথা 'মুখেমুখে' বিদ্যমান ছিল, সেগুলি পরিশোধিত রূপ নিল 'লিখিত' শাস্ত্রকথায়। নতুন গল্পও লেখা হল। কালপ্রবাহে আধ্যাত্মিকতা গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠতে লাগল, দেবতার আসন আরও কারুকার্যমণ্ডিত হতে থাকল, তাঁদের নাম-রূপের পরিধি ও বৈচিত্র্য বেড়ে গেল; আদি প্রতীক-লক্ষণগুলি পর্যবসিত হল বাহন-অলংকার-বিশেষণে এবং পশুপ পুত্রদ অন্নদ অন্নপূর্ণা ক্ষেত্রপতি বনস্পতি ইত্যাদি শক্তিত্বে। দার্শনিক তত্ত্ব এবং সাধন উপাসনা দেব-দেবীকে যে নবরূপ দান করল, ধীরে ধীরে তা প্রবল ও জটিল হয়ে উঠল মধ্যযুগে।

অন্যপক্ষে সাহিত্য-শিল্পের অববাহিকা দিয়ে আর একজাতীয় বিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক মূর্তি ও চিত্রে আদিম মানবের কলা-কৌশল ছিল 'অনুকরণ'। কৃষিপরিবেশে অনুকরণের পাশে এল 'অধ্যাস,' যে অধ্যাস জন্ম দিল কৃত্যকে, কথাকাব্যনৃত্যগীতকে। এগুলি বাস্তব প্রয়োজনে পরিকল্পিত কল্পনার আয়োজন, পাওয়ার আগেই পাওয়ার ছবি আঁকা। বাস্তবতার দিকে এগুলি কর্মসিদ্ধির জাদু এবং সমষ্টি-আবেগের উদ্দীপন বিভাব ; কাল্পনিকতার দিকে এগুলি অপূর্ণ কামনার স্বপ্নিল পূর্ণতা, শ্রমের অরণ্যে শিল্পের ফুল। শিল্পের স্বধর্ম জীবনময়তা মানবমমতা। তার এলাকায় যা-কিছু আসে, যারা আসে, সকলকেই সে প্রকাশ করে বাস্তবের প্রতিচ্ছায়ায়, কল্পনার ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যের তুলিতে। আদি কৃষকের মানসলোকে যে ব্রতকথার জন্ম সে জাদুমন্ত্র ও জাদুকথা-সমাজের সম্পদ ও

কৃত্যের অঙ্গ, জীবনসংগ্রামের অবশ্যপ্রয়োজনীয় হাতিয়ার ; তবু ওরই মধ্যে (অবচেতনে) প্রকাশ পেয়েছে জীবনের ছবি, কল্পনার আনন্দ, শিল্পের আলপনা। নিরন্তর অনুশীলনে আদিম ব্রতকথা ক্রমশ রূপসমৃদ্ধ হয়ে পূর্ণায়ত উপকথায়, মাটিঘেঁষা এবং কৃত্যঘনিষ্ঠ হয়েও সে তখন একটি বিশিষ্ট শিল্প : প্রমথ-প্রমথিনী তার কুশীলব, তাঁদের গৃহকথা তার আখ্যান, কোরাস তার সংগীত-সংলাপ, রাস বা যূথবদ্ধ অঙ্গভঙ্গী তার নৃত্য, (সমষ্টি) আবেগের স্ফূর্তি ফলশ্রুতি এবং পৃথিবী-প্রকৃতি অভিনয়মঞ্চ। সভ্যযুগে ধর্ম ও শাস্ত্রের সংলগ্ন হয়েও ধ্রুপদী সাহিত্য ধরে রেখেছে জীবনের এই ছন্দ, মানসের এই ছবিকে। তার শিল্পসুন্দর সীমানায় উপকথা হয়েছে দেবকথা, দেব-দেবী হয়েছেন নায়ক-নায়িকা, লৌকিক ভাব লোকাতীত রসরূপ লাভ করেছে। মধ্যযুগে যখন ধর্ম ও সাধনা প্রবল হয়ে উঠেছে, শাস্ত্র শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তখনও লেখা হয়েছে ধর্ম-সাহিত্য—যেখানে চরিত্রগুলি একাধারে দেবতা ও মানব, ইষ্ট ও প্রিয়। তাঁদের চারপাশে যে কাহিনী রূপায়িত হয়েছে, সেখানে পুরাণকথার মধ্যেই আছে ঘরের কথা মনের কথা। এমন-কি শাস্ত্রের মধ্যেও সাহিত্যের এই জীবনমুখী শিল্পরীতি বারেবারে প্রকাশিত হয়েছে ; বেদ উপনিষদ বাইবেল কোরাণ থেকে পুরাণ অবধি ছড়িয়ে আছে তার স্বাক্ষর-লিপি।

ধর্ম দেবতা কাব্য শিল্পের এই বিবর্তন সবদেশে সমকালে সমভাবে হয়নি, সকল স্তরে হয়নি। লোকায়ত সমাজে সেই গতানুগতিক জীবন ; অতএব সেই সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি। তবু বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে এখানেও জীবনের বাহিরে-অন্তরে রূপান্তর হয়েছে, জটিলতা দেখা দিয়েছে, আদিম স্বারূপ্য ক্ষীণ হয়েছে। মাঝে মধ্যে এপাড়ার কর্মে ওপাড়ার ধর্ম এসে মিলেছে, মিলনে-মিশ্রণে নবরূপ পেয়েছে লোকসংস্কৃতি। এইভাবে পাশাপাশি চলতে চলতে উচ্চকোটি ও লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা বারবার পরস্পরকে স্পর্শ ও প্রভাবিত করে, বাইরে থেকেও নতুন প্রবাহের ধাক্কা এসে লাগে, জীবন ও মানসের রূপ-রূপান্তর হতে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর যেমন বিভিন্ন সাহিত্য রচিত হয়, তেমনি পরস্পর-মিলনজাত মিশ্র সাহিত্যও দুর্লভ নয়—সেখানে অভিজাত মনন ও লৌকিক মানস, নাগরভাবনা ও গ্রাম্যভাব পরিপূর্ণভাবে সমন্বিত হয়।

এই পরিবর্তমান অগ্রস্থিতির একটি পরিচয় আমরা 'ভারতশিব' অধ্যায়ে পেয়েছি। বাঙলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। প্রাগাধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির একটি প্রবাহ লোকায়ত কর্ম ও কামনালালিত, অপর প্রবাহ উচ্চকোটির ধর্ম ও এষণাপালিত। উভয়কোটির স্বতন্ত্র সাহিত্য-শাস্ত্র বিদ্যমান, আবার উভয়ের সংমিশ্রণে জাত 'মধ্যবিত্ত সাহিত্য'ও বর্তমান—যেখানে সম্প্রদায়চেতনার মধ্যেও আছে সহৃদয় চৈতন্য, ধর্মনিষ্ঠ ভক্তিরসের মধ্যেও মনোহর কথারস, ব্যক্তিভাবনার কারুশিল্পে সমাজভাবনার চারুশিল্প। অবশ্য এই লক্ষণগুলি অন্য দুটি শাখাতেও দুর্লভ নয়, যেখানে লেখক ও

মানবত্ব, ব্রতকথা উপকথা- রূপকথা পরস্পর সংশ্লিষ্ট, যেখানে উপাস্য দেবতা ইষ্ট হয়েও মানব, স্বর্গীয় কাহিনী পৃথিবীরও কাহিনী। মঙ্গলকাব্যের সুরু বন্দনায়, শেষ মর্ত্যখণ্ডে; বৈষ্ণব পদাবলীর আদ্যন্ত ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয়ের লীলাবৈচিত্র্য। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের সহায়ে এবং স্বীয় জীবনধর্মের যোগে বাঙালী কবি বিপরীতের সমন্বয় ঘটিয়েছে। সে দেবতার মধ্যে দেখেছে প্রিয়কে, সেই দেবতা রাধা-কৃষ্ণ শিব-শিবানী; সে প্রিয়ের মধ্যে দেখেছে দেবতাকে, সেই প্রিয় চৈতন্যদেব।

বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের গানে আখ্যানে কবিলেখনীতে শিবের খণ্ড চিত্রাবলী অঙ্কিত হয়েছে, শৈব সাহিত্যে তাঁর পূর্ণচিত্র অঙ্কনের প্রচেষ্টা হয়েছে। অপূর্ণ ও অখণ্ড সমস্ত ছবি মিলে তাঁর একটি সমগ্র রূপ বিকশিত হয়ে উঠেছে, যেন খণ্ড কাব্যের সমবায়ে একটি মহাকাব্য। ছবিগুলির রূপরঙরেখা অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিন্তু মৌল স্বরূপ ও রস অভিন্ন; সামাজিক রসিক মনের কাছে সব মিলে একটি সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম, স্বাতন্ত্র্য যেটুকু সে কেবল তুলির টানে লেখনীর গুণে। বাঙলার কৌম সমাজে লোকশিবের যে আদিম উৎসরূপ, তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বহিরাগত ভাব। যেমন সাধনক্ষেত্রে তেমনি কাব্যক্ষেত্রেও তিনি জনপ্রিয় দেবতা, তাঁকে ঘিরে বিবিধ তত্ত্ব উপাসনা কাহিনীর জনতা। বাঙালী কবির দৃষ্টিতে তিনি মহাযোগী চিন্ময়স্বরূপ পরমতত্ত্ব, ধনদ পুত্রদ অন্নদ দেবতা, আবার ক্ষুদ্র সুখেদুঃখে বিচলিত দরিদ্র কৃষক গৃহীও। বুদ্ধিজীবী চিত্তে অভিজাত চেতনা এবং জনমনে লৌকিক চিন্তার সংস্কারই প্রবল, আবার অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের সার্থক মিলও হয়েছে।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা শিবের বহুসঞ্চারী ইতিহাস অনুসরণ করেছি; এখন আমাদের লক্ষ্য তাঁর কাব্যধৃত চিত্র—যে চিত্র দেবতা-শিবের এবং মানব-শিবের। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে, সমাজের ঘরে বাইরে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠেছে পড়েছে, তার দোলায় দেবতার ক্রমরূপান্তর হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দেবতা ও মানব-শিবের যে রূপ অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে, তাকে সমগ্রভাবে সামনে রেখে আমরা তাঁর প্রতিমার সৌন্দর্য বিশ্লেষণে ব্রতী হব। কোন এক বিশেষ স্থান ও কালের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুধ্যান করব না, প্রাক্‌পলাশী বাংলা কাব্যপ্রবাহের সমগ্র ধারাকে শৈব প্রকাশের চলমান ও বহমান আধার বলে গ্রহণ করব। এবং প্রথমে দেবতা-শিবের প্রতিমা দর্শন করে তারপর মানব-শিবের লীলাপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হব।

১। শিব-বন্দনা

অ। বাংলা কাব্যের 'বন্দনা'গুলি মূলত পুরাণ-অনুগামী এবং মোটামুটিভাবে প্রায় একরূপ; পার্থক্য কেবল কাব্যিক প্রকাশভঙ্গীতে। চণ্ডীকাব্যে শিব-বন্দনা বিস্তৃত; কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই তার প্রতিষ্ঠা: বন্দো নিরঞ্জন নারায়ণ সবাহনে। বৃষোপরে শিব বন্দ বিধি হংসবানে (কাইতি গ্রামের পুঁথি)। বন্দো প্রভু

ভূতনাথ, ভবেশভবানীসাথ, ভবভীত ভজে পরায়ণ। ভবভয়ে করি কৃপা, ভীতিভঞ্জ মহাতপা, ভবনাথ ভবানী চরণ॥ (ক. বি. সংস্করণ)। পরবর্তীকালের কাব্যে এই ধারার অনুসরণ হয়। শাক্ত পদাবলীতেও পাই 'মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব, আজু তনু জুড়াইব আনন্দ সমীরে' বা 'দিয়ে বিল্বদল যদি আশুতোষে আশুতোষ—হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হরের কৃপায়'। ভারতচন্দ্রের শিব-বন্দনা ভাবে ভাষায় ছন্দে অলংকারে দরদে ও কবিত্বে তুলনারহিত :

হর হর মোর দুঃখ হর। হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ, হিমকরশেখর শঙ্কর॥ গলে দোলে মুণ্ডমাল, পরিধানে বাঘছাল, হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়। ডাকিনীযোগিনীগণ, প্রেত ভূত অগণন, সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়॥ অতি দীর্ঘ জটাজুট, কণ্ঠে শোভে কালকূট, চন্দ্রকণা ললাটে শোভিত। ফণী বালা ফণী হার, ফণিময় অলংকার, শিরে ফণী ফণী উপবীত॥ যোগীর অগম্য হয়ে, সদা থাক যোগ লয়ে, কিজানি কাহার কর ধ্যান। অনাদি অনন্ত মায়া, দেহ যারে পদছায়া, সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান॥ মায়ামুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব, কে বুঝিতে পারে তব মায়া। অজ্ঞান তাহার যায়, অনায়াসে জ্ঞান পায়, যারে তুমি দেহ পদছায়া॥ নায়কের দুঃখ হর, মোর গীত পূর্ণ কর, নিবেদিনু বন্দনাবিশেষে। (ব সা প সং)

মনসাকাব্যে কোম উত্তেজনা সফেন, তাই শিব-বন্দনা অনুল্লিখিত। বিজয় গুপ্তের সামান্য উল্লেখ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দে 'বৃষভে বন্দিল জটাধর। বন্দো শিব শশিচূড়, শূল শিঙ্গা বৃষারূঢ়, অক্ষিমালা বিভূতিভূষণ'-এ প্রসারিত হয়েছে। দ্বিজ বংশীর কাব্যের একটি সংস্করণ 'দেবদেব মহাদেব দেবতানাং গুরোর্গুরো। বক্তা ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মন্ত্রাণাং সাধনস্য চ' শ্লোকের বন্দনা দিয়ে সুরু হলেও মনসাকবির ঐতিহ্য-অনুগামী তিনি। অবশ্য তাঁর নামে একটি শিব-বন্দনা পাওয়া যায় কিন্তু তাকে প্রামাণ্য বলে অনেকে গ্রহণ করেন না। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে মহেশ্বর অন্য দেবতার সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুরাণ-অনুগত শিবমাহাত্ম্যের স্বল্প উদ্ধৃতি পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির শিব সম্পর্কীয় রচনা উল্লেখ্য। কীর্তিলতায় ২ রাজা শিবসিংহ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ বীরসিংহদেবকে চন্দ্রচূড়চরণসেবকরূপে বর্ণনা করে তিনি ক্ষান্ত হননি, ভূমিকায় শম্ভুকে বন্দনা করলেন এবং দোহায় লিখলেন : বাল চন্দ্র বিজ্জাবই ভাসা। দুহু ন হি লগ্ গই দুজ্জন হাসা॥ ও পরমেসর হরশির সোহই। ঈ নিচ্চই নাঅরমন মোহই॥ শৈবগীতে ৩ তিনি শিবকে শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে করেন : কোন বন বসথি মহেস। কেও নঁহি কহথি উদেস॥ তপোবন বসথি মহেস। ভৈরব করথি কলেশ॥ (৮৬০ নং পদ)

নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসের 'না দেব কামুক, না দেবী কামুকী, কেবল প্রেম পরকাশ। গৌরীশঙ্কর, চরণে কিঙ্কর, কহতই গোবিন্দদাস' এই ত্রিপদী বন্দনায় যে বৈষ্ণবী দৃষ্টির দ্যোতনা, শিবরহস্যাগমে তা 'কেবল প্রেম পরকাশ' রূপে

বর্ণিত হয়েছে। ধর্মপূজাবিধানে 'স্থাপনডাক' পালাই বন্দনাংশ : 'কৈলাস ছাড়িয়া গোসাঞি করহ গমন। দানপতিকে আশীর্ব্বাদ কর অনুক্ষণ'। গ্রন্থটিতে শিবের প্রাধান্য আছে বলে আমরা শ্লোকটিকে তাঁর স্তুতি বলে মেনে নিতে পারি। নমস্কারাদি ক্ষেত্রেও শৈবস্তব আছে। গাজনে শিববন্দনা প্রচুর ; ব্রতকথার শিববন্দনা ব্রতিনীর শিবানুরাগের সরল প্রকাশ। বাঙালী কবির 'বন্দনা'য় নিজস্ব বক্তব্য সত্বেও ভারতশিব প্রাধান্য ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন ; তাঁর সহস্রনামাবলীর মালা থেকে বিশেষণের এই ফুলগুলি আহরণ করা। সেই কৃত্তিবাস বৃষবাহন ত্রিলোচন ত্র্যম্বক বাসুকিভূষণ শূলী দেবদেব শিবশম্ভু রুদ্র হর গিরিশ চন্দ্রশেখর ইত্যাদি নাম বিভিন্ন কাব্যে পুষ্পার্ঘ্যের মত ছড়িয়ে আছে।

আ। কিন্তু শুধু নামের কথামালা নয়। উপনিষদের অদ্বিতীয় ব্রহ্মধারণার পাশাপাশি পুরাণের ভক্তিবাদ বাংলা কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, বৈষ্ণবের আত্ম-নিবেদিত ভক্তিরস তাকে মধুরতা দিয়েছে। তামিল শৈব সাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী না হলেও বিদ্যাপতির শৈব ভক্তি সংস্কৃত শিবস্তোত্রের মতই শরণাগতির মাধুর্যে কমনীয় : আন চান গণ, হরি কমলাসন, সবে পরিহরি হমে দেবা। ভক্ত বছল প্রভু, বাণ মহেসর, ঈ জানি কৈল তুঅ সেবা॥ এই আনুগত্যের ধারা মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পথ বেয়ে উপস্থিত হয়েছে শাক্তপদের তান্ত্রিক ছায়াঞ্চলে : শিবকে পূজব বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে, ভুলবে ভোলার মন। অমনি সদয় হবেন সদানন্দ আনতে দিবেন হারা তারাধন (রাম বসু) ;—সেখান থেকে দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে[৪], 'কৃপানয়নে হের, কি করি শঙ্কর, শমনকিঙ্কর বান্ধে করহে কি কর' ; এবং কবিগানে[৫], 'প্রাণনাথো মোরো, সেজেছেন শঙ্কর, দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে। অপরূপ দরশনো আজু প্রভাতে' (রাসু নৃসিংহ) ; আর লোকগীতিতে :

প্রাণ কাশীনাথ, মনে
প্রাণ ভোলানাথ, মনে
মনে লয় আসিও আবার।

পুরাণের ভীতিবোধিত ভক্তি জনগণের প্রীতিমুগ্ধ ভক্তিতে আত্মনিবেদিত হয়েছে।

ই। যোগীর আরাধ্য দেবতা স্বয়ং যোগিরাজ। যোগী শিবের বর্ণনা পুরাণে অপ্রতুল নয়। সৌর পুরাণের (২২. ২) 'অভেদো শিবয়ো সিদ্ধো' এবং বামন পুরাণের (৬২.২৯,৩০) 'সার্দ্ধ ত্রিনেত্রং কনকাহি কুণ্ডলং। জটাগুড়কেশ……॥ কপর্দ খট্বাঙ্গ কপালঘণ্টং। সশঙ্খটঙ্কারবরং মহর্ষে'-র অনুসারী যোগিশিবের চিত্র বাংলা কাব্যে পাওয়া যায়। অন্যদিকে আলাওলের পদ্মাবতীতে সিদ্ধার সিদ্ধা শিব শৈবযোগের আদি দেব। এ দুয়ের মেলনে ভারতচন্দ্রের 'মায়ামুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব' এবং রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের যোগী—'উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে যাঁর'। নাথগীতিকায়ও শিবের যোগিরূপ চিত্রিত হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র গীতে 'জ্ঞান গুরু শিব বন্দো ত্রিজগতে জানি' ও 'সকলের প্রধান সিদ্ধা বলিব

ভোলানাথ' (গো. গান ২য়)-এর যে রূপকল্পনা, তার উৎস নাথদের বৌদ্ধ-যৌগিক সাধনার মধ্যে নিহিত। এলোরার মহাযোগী কুণ্ডলী শিবমূর্তির সঙ্গে 'কুণ্ডলী' নাথদের সাদৃশ্য বর্তমান। গোরক্ষসংহিতার 'কেবলঃ শিবঃ' জ্ঞান ও সিদ্ধিদাতা; এই মহাজ্ঞান ও মহাসিদ্ধি নাথসাধনার বৈশিষ্ট্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রামদাস আদক বলেন, 'শিব তুমি সভাকার গুরু। জ্ঞেয়ানে প্রধান তাই জানকল্পতরু।' ভারতশিবের যোগী রূপের পশ্চাতে সিন্ধু সভ্যতার যোগিমূর্তি থেকে শুরু করে আর্যেতর ব্রাত্য জীবন ও যোগ, উপনিষদের সাধনা, যোগাচার, বৌদ্ধ-জৈন সাধনরীতি ইত্যাদির প্রভাব বিদ্যমান। বাঙলার যোগিশিবের পটভূমিতে এই অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থানীয় জীবন ও সাধনধারার বিশিষ্ট রীতিপদ্ধতিগুলি।

ঈ। লৌকিক শিবের বন্দনায় বাঙালীর স্বকীয়তা ও অভিনবত্ব ফুটে উঠেছে। মালদহের গম্ভীরায়:

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়া শিবের গম্ভীরা বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান;
বাসুয়া বাহনে শিব তাঁর চরণে প্রণাম।

এখানে সরস্বতী ও বৃষ ধার-করা। 'বুড়া শিব' পুরাণেরই বৃদ্ধ শিব শুধু নন, কৌম সংগীতেরও। ধান ঝাড়াইয়ের সময় শেষ আঘাত যে দেয়, আদিম মানুষ তার নাম দিয়েছিল 'বাবা' ৬। গাজনগানে 'বাবা' শব্দের প্রাচুর্য এবং ওরাওঁদের গানে 'বাবা' 'সুরজবাবা' কিংবা 'টানা বাবা টানা ভূতানিকে টানা' অথবা 'মহাদেও বাবারি আরোজি চেলা'[৭] ইত্যাদি উল্লেখ 'বাবা'র কৃষিঘনিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে এবং এগুলি 'বাবাশিব' ও 'বুড়াশিব'-এর অন্যতম উৎসস্থল। বর্ধমানে, চব্বিশ পরগণায় এবং অন্যত্রও এখনও আছেন 'বুড়োরাজ' ও 'বাবাঠাকুর'। আদিতে শিবের এই উপাধি কৃষকের দেওয়া, পরে তা নিরাহত্ব ও ভোলানাথত্বে পরিণত হয়েছে। কথা-শরীরে অবহেলা করেও কাব্যশিরে 'বন্দনা'য় বাঙালী কবি ও শ্রোতা দেবাদিদেব শিবকে সশ্রদ্ধ প্রণামী অর্পণ করেছে। সে শ্রদ্ধা শুধু ঐতিহ্যাশ্রয়ী বা ঐশ্বর্যান্বিত নয়, দেশজ ভাবনায় সিঞ্চিত, ভক্তিভাবে সুরভিত, আন্তরিকতায় রসান্বিত।

২। শিবের জন্ম

পৃথিবীর সকল ধর্মে 'সৃষ্টিপত্তন' অবশ্যবর্ণনীয় বিষয়। এর মধ্যেই থাকে দেব-দেবীর জন্মকোষ্ঠী, বহু ভাবনার মিশ্রণে যার রূপায়ণ। পুরাণের কথাভাগের প্রধান অংশ সৃষ্টিপালা। বাংলা কাব্যেও সৃষ্টিপালা বিবৃত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে শিবের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে।

অ। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে শিবের যে জন্মকথা বিবৃত হয়েছে, তার মূল পুরাণে এবং ফল পরবর্তী কাব্যসরণিতে। অন্ধকারের পরপারে শূন্যনির্ভর আদিদেব নিরঞ্জন 'সৃষ্টির উপায় কারণ' চিন্তা করতে থাকেন; তাঁর তনু থেকে জন্ম নিলেন 'আদি

দেবরাজ কীর্ত্তি' আত্মাদেবী মহামায়া এবং 'প্রভুর ইঙ্গিত পায়্যা' তিনি সৃষ্টিতে মন দিলেন ; তখন 'গুণভেদে একভেদ হৈল তিনজন' ; রজগুণে দেবরাজ, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, 'তমগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ।' পরম ব্রহ্মের শক্তি সঞ্চার এবং উভয়ের মিলনে গুণভেদে ত্রিদেবের এই জন্ম-কাহিনী আর্য ভাবনাপ্রসূত। শিবের আর এক নাম 'নীললোহিত'। বরাহপুরাণে (২.২১) ইনি রুদ্র, স্কন্দপুরাণে পঞ্চানন দশভুজ শূলী কপর্দী সিংহচর্মাবৃত ও চন্দ্রমণ্ডিত। এঁর জন্ম বিধাতার ললাট থেকে৮। এই কাহিনীর অনুসরণে মুকুন্দরাম লিখলেন, জাতমাত্র 'বাল্যভাবে মহাদেব করেন রোদন। নামধাম জায়া মোর কর নিয়োজন ॥ বিচারিয়া রুদ্র নাম থুইল প্রজাপতি' এবং একাদশ নাম, ভূমি ও ছয় নারী দিলেন ; তারপর 'ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টি করিল শঙ্কর। সৃজিল প্রমথ ভূত দানা নিশাচর ॥ জটাভস্ম হাড়মাল বিভূতিভূষণ।' বিধাতা তখন তাঁকে ক্ষান্ত করে নারায়ণের তপস্যা করতে উপদেশ দিলেন, 'পিতৃবাক্যে দিল হর তপস্যায় মন'। অনুরূপ কাহিনী রূপরাম, ঘনরাম, মানিক গাঙ্গুলী, রামদাস আদকও বিবৃত করেছেন। এই আখ্যায়িকাটিও পুরাণ থেকে গৃহীত ৯। বায়ু ও লিঙ্গ পুরাণে শিব জরামরণশীল প্রজাসৃষ্টিতে অরাজী হন এবং সতীকে ধ্যান করে আত্মতুল্য সহস্র 'পিঙ্গলান্ সনিষঙ্গাশ্চ সকপর্দ্দান্ বিলোহিতান্' সন্তান জাত করেন। অর্থাৎ তিনি প্রমথপতি, দেবপতি নন। চৈতন্যচরিতামৃতে শিব কৃষ্ণের গুণাবতার অংশকলা, 'নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গী করি। সংহারার্থ মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি।' প্রেমবিলাসে কৃষ্ণের দুই বিলাস, বলরাম ও সদাশিব, 'সৃষ্টিকার্যার্থে সদাশিব স্বাংশরুদ্রসহ। মহাবিষ্ণু হইতে প্রকট নিশ্চয় জানিহ।' অদ্বৈতপ্রকাশে সাতশো বছর তপস্যান্তে বিষ্ণু দেখা দিলেন, 'মহাবিষ্ণু কহে তুহুঁ নহ আর কেহ। তোর মোর এক আত্মা ভিন্নমাত্র, দেহ ॥ এত কহি পঞ্চাননে কৈলা আলিঙ্গন। দুই দেহ এক হৈল কে জানে তার মন। শিবাভিন্ন মহাবিষ্ণু জীব উদ্ধারের জন্যে অদ্বৈতরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এই শেষ অংশটি বাঙালী কবির কল্পিত, বাকীটুকু পুরাণ থেকে নেওয়া। পদ্মপুরাণে (ক্রিয়াযোগসার ২) 'একো বিষ্ণুস্ত্রিধা ভূত্বা সৃজত্যতি চ পাতি চ।' তাঁর দক্ষিণ ভাগ থেকে ব্রহ্ম, বামাঙ্গ থেকে বিষ্ণু ও মধ্যভাগ থেকে অব্যয় রুদ্রদেব প্রসূত। ব্রহ্মবৈবর্তে (ব্রহ্ম ৩) মহাদেব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বামভাগজাত। ইনিই বৈষ্ণবের সদাশিব।

আ। শূন্যপুরাণে শিবের জন্ম বিচিত্ররূপী। রূপরেখহীন অন্ধকারে শূন্যে ভ্রাম্যমান আদি প্রভুর ঘাম থেকে আদ্যাশক্তির জন্ম হল, 'প্রথম জৌবন'-এর চাঞ্চল্যে তিনি 'বিষমধু' পান করলেন। তাঁর গর্ভে তিন দেবতা জন্ম নিলেন : গর্ভে থাকি তিন দেব ভাবিতে লাগিল। বস্তুতল ভেদ করি বম্ভা বাহিরিল ॥ তাহা দেখিয়ে বিষ্টু ভাবে মনে মন। বিষ্টু বাহির হইলেন নাভি করিএ ছেদন ॥ সদাশিব বোলে আদ্মি কি বুদ্ধি করিব। জোনিছেদ করিএ আদ্মি বাহির হইব ॥ বজ্রনখ দিয়া শিব জোনিছেদ কৈল। জোনিদুআর দিয়া শিব বাহির হইল। ধর্মপুজাবিধান

ধর্মমঙ্গল ও নাথগীতিকায় অনুরূপ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। গোরক্ষবিজয় এবং গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে আদ্য-অনাদ্যের মিলনে 'বদনে জন্মিল শিব জোগিরূপ ধরি।' রতিরাম দাসের সারগীতায় 'অনাদি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া তবে লিঙ্গ নিকলিল। তবে কেতকা দেবী মূহশ্চিত হৈল' ১০। কেতকা দেবী থেকে ত্রিদেবের জন্ম হল। উড়িষ্যার বৌদ্ধবৈষ্ণব কাব্যেও একইভাবে অনাদ্য ও দেবীর দেহ-ছায়া মিলনে শিবাদির জন্ম বিবৃত হয়েছে ১১। এবং দেবীকে দেখে কাতর প্রভু 'সে বিন্দু হস্তরে ঠেলি। ত্রি অঙ্গুলে গলাইলি॥ সে বিন্দু ত্রিয় ভাগা হেলা। ত্রিবীজ রস বলাইলা॥ ত্রিবীজরু ত্রিয় দেব হোইলে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব' ১২।

শিবের এই বিচিত্র জন্মকথার পশ্চাতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অবদান লক্ষণীয়। উপায় ও প্রজ্ঞার সংযোগে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের জন্ম, এই তান্ত্রিক ভাবনা ক্রমশঃ সহজিয়া রূপ নিয়েছে। সহজ-সাধনায় যুগনদ্ধ দেবদেবী এবং তাঁদের কামকলা সাধ্য বিষয়। এই যুগনদ্ধ দেবতত্ত্বের ভাষ্যরূপ পাওয়া যায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্যে। বাংলা কাব্যে এইসব সাহিত্যকথার প্রভাব নিতান্ত কম নয়। আলোচ্য কাহিনীটি তার একটি দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে ডঃ কল্যাণী মল্লিক বিবৃত বৌদ্ধ সৃষ্টিকাহিনীটি উল্লেখযোগ্য ১৩—অলেখনাথের দেহ থেকে নিরঞ্জন গোসাঁই, তাঁর থেকে অনাদি ধর্মনাথের জন্ম হল, তিনি সৃষ্টি করলেন কেতুকা দেবীকে, কেতুকার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম হল, উভয়ের মিলনে শিবাদির জন্ম। বৌদ্ধ সৃষ্টিধারণার আর একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, অনাদি থেকে আদিনাথ, তাঁর ঘাম থেকে আদিদেবী কেতকার জন্ম; আদিদেবের কামানুভব এবং কেতকা কর্তৃক তাঁর বীর্য পানের ফলে শিব জন্মগ্রহণ করেন। স্পষ্টত এই বৌদ্ধ বিশ্বাস ধর্ম নাথ প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রভাবিত সাধনাচারে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে উপরের শৈব কাহিনীর জন্মদান করেছে। পুরাণের প্রভাবও বিদ্যমান। 'ঘাম' থেকে দেবতার জন্ম ও ত্রিদেবের জাতক-কাহিনী তার সাক্ষ্য। আর বৌদ্ধ ধারণার অন্তর্গত বীর্যপান (তুঃ মহাভারতে কার্ত্তিকের জন্মমুহূর্তে অগ্নির মহাদেবিক বীর্যপান) পরবর্তী কাব্যে 'বিষমধুপান'-এ পরিণতি লাভ করেছে। অদ্ভুত রামায়ণে (৮.১৫.৩৭) ঋষিদের দেহনিঃসৃত শোণিত মন্ত্রপূত ও ঘৃতমিশ্রিত কলস থেকে বিরহিণী মন্দোদরী পান করার ফলে সীতার জন্ম হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাই, আদ্যাশক্তি পরাৎপরা পরমা প্রকৃতির 'বিনা গর্ভে প্রসব হইল,' তাঁর থেকে ত্রিদেবের জন্ম হল, শিব তাঁদের অন্যতম। এখানে পৌরাণিক বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধারণা একত্রিত হয়ে শিবের জন্মপত্রিকা রচিত হয়েছে; তন্ত্রের সর্বেশ্বরী ত্রিপুরভৈরবী এই শিবমাতা। সহজিয়া সাহিত্যে এর সঙ্গে বৈষ্ণবী প্রেমভক্তি ও সহজসাধনা যুক্ত হয়েছে (আনন্দভৈরব)।

ই। মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকার ১৪ জন্মকথায় নূতনত্ব আছে। একক 'নিরঞ্জন ভগবন্ত' সৃষ্টিমানসে 'এক গোটা ডিম্ব ধরি, তাহা তিনভাগ করি, ত্রিজগৎ করিলেন সৃজন'। ব্রহ্মা বিষ্ণুর জন্ম হল, কিন্তু শিবের কথা নেই। অথচ পরে, 'হর স্থানে

অনাদিএ বলে কুতূহলে। অন্তে সংহারিবা সৃষ্টি দৃষ্টি কোপানলে।' সুতরাং শিবের জন্মকথা মুদ্রিত গ্রন্থে উদ্ধৃত না হলেও মূলে ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সারগীতায় প্রভু অক্ষয় বটপত্রে ডিম ভাসালেন, তা ভেঙে হল ব্রহ্মজ্ঞান ও অপাণিপাদ অনাদিকুমার, তাঁর থেকে ত্রিদেব জাত হলেন। দুটি কাহিনী একই উৎস-প্রসূত। স্বভাবতই পুরাণের কূর্মাবতার ও ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির কথা মনে পড়ে। আবার মালদহ ও রাধানগরের গীতিতে কাঁকড়ার আনীত মাটিতে পৃথিবীর জন্ম ও কূর্মপৃষ্ঠে স্থিতি, ডিমের দ্বিধাবিভক্তি এবং তা থেকে সৃষ্টির সূচনা বর্ণিত হয়েছে। সাঁওতালী উপকথায়, কাঁকড়া কচ্ছপ শূককীট একত্রিত হয়ে পৃথিবীকে জল থেকে তুলে পদ্মপত্রে রাখে। তার ওপর ডিম পাড়ে হংস ও হংসী, তা থেকে আদিম নরনারীর জন্ম হয়। 'ভেল্‌বা ফাড়ী' অনুষ্ঠানে এই বিশ্বাসের অনুকরণ করা হয়।

বাঙলা কাব্যধৃত শিবের এই জাতকনামায় আর্য ও আর্যেতর ভাবনা একত্রে স্বাক্ষর দান করেছে, সাধারণ মানুষের বহুপুরুষ প্রচলিত বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর পৌরাণিক ও বৌদ্ধ কোষ্ঠিপত্র (কোথাও স্বতন্ত্র, কোথাও সমবেতভাবে) নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে, তান্ত্রিক দর্শন তাকে আলোকিত করে তুলেছে। বাঙলাদেশে শিবের জন্মমুহূর্তটি বিবিধ ভাবনার বর্ণালিসম্পাতে ময়ূরকণ্ঠী রঙ ধারণ করেছে।

৩। কৃষক শিব

আর্যভারতে রুদ্রশিব কৃষিদেবতা ও ক্ষেত্রপালরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, শুধু বেদ উপনিষদে নয়, পুরাণেও ১৫। দক্ষ তাঁকে 'অন্নদ-অন্নদাতা-অন্নভব' বলে স্তব করেছিলেন ১৬। তথাপি পুরাণে তাঁর ভিক্ষুকরূপ প্রাধান্য লাভ করেছে, যেহেতু তিনি ব্রাত্যপতি, যাযাবর ও সংসারবিরাগীদের অধীশ্বর। বাংলা কাব্যেও শিব মূলত ভিক্ষাচারকে বরণ করে নিয়েছেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে হিমালয় প্রদত্ত জমিতে ধান, কার্পাস, মাস, সরিষা উৎপন্ন হয়, তবু শিব নির্বিকার। মেনকা যখন অভিযোগ করেন, 'মিছে কাজে ফিরে পতি নাহি চাশ বাস। অন্নবস্ত্র কত যোগাইব বারমাস', তখন শিবদুর্গা হিমালয় ত্যাগ করে কৈলাসে চলে আসেন এবং সংসার চালাতে 'ভিক্ষা সে মাগেন মহেশ্বর।' দ্বিজ বংশীর কাব্যে ১৭ হিমালয় যৌতুক হিসাবে ধনরত্ন দিলে শিব বলেন, 'কেবল ভিক্ষার অন্ন ঘরে নাহি কড়া। কিমতে পুষিব আমি এই হস্তিঘোড়া।' হাল লাঙলও তিনি নিলেন না, চাষীনন ব'লে। যদি দিতেই হয় তো 'ভাঙ থুইয়্যা খাইবারে দেও এক ঝুলি॥ ভোলা কত বিষ দাও জটা ভাঙের গুড়া। যারে খাই যুবা হয় আজকালের বুড়া।' ভারতচন্দ্রের চিরদরিদ্র ভিখারী শিবের অন্নে অসন্তুষ্টা শিবানী যখন বলেন, 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাস', তখনও শিব ভিক্ষাত্যাগে বিরত হলেন না। অবশেষে দুর্গা অন্নপূর্ণা মূর্তিতে শিবকে ভিক্ষা দিলেন, 'জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া। নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া।' অর্থাৎ প্রতিবাদিনী দুর্গাও স্বয়ং শেষ পর্যন্ত ভিক্ষাচারকে মেনে নিলেন।

বাঙলাদেশে এই 'ভিখারী শিব'-এর জনপ্রিয়তার মূলে পুরাণ ১৮। আজীবক নাথ যোগী প্রভৃতি বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের ভিক্ষামুখিনতা এই ভাবনাকে পুষ্টি দান করেছে। সবার ওপর, উচ্চকোটি নাগরিকতার মনোভাব স্বভাবতই ভিখারী শিবের মধ্যে অধিকতর কাব্যিকতার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু রাজদরবার থেকে বহু দূরে শিবের কৃষিরূপের ভাবনা বিদ্যমান ছিল। বাঙলার প্রায় সকল প্রমথ-প্রমথিনী কৃষিসংশ্লিষ্ট ; এঁদের আখ্যান কৃষিকথা, যা স্থানীয় লৌকিক গীতির অন্যতম প্রধান বিষয়। পশ্চিম বাঙলার গাজন, গম্ভীরা, বোলাকী, বোলান, মাঘমণ্ডল, পৌষালী, পূর্ব বাঙলার গাজী, বাল্লা, হালদাকাটা, হাঁওলা, ফুলপাট, ভাদুলী ইত্যাদি গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ভারত-শিবের অন্যতম মৌল রূপ 'কৃষক', বাঙলার লোকসমাজেও তিনি কৃষিজীবী। ফলে তাঁর নিজস্ব কৃষিকথা এবং বাঙলার কৃষিগীতি তাঁর মাধ্যমে পরস্পর মিলিত হয়েছে, রূপায়িত হয়েছে লোকায়ত শিবগীতির ধারা। রামেশ্বরের 'শিবায়নে' তার কাব্যরূপ প্রকাশ পেয়েছে : শিব-শিবানীর বিবাহান্তে জ্ঞানালোচনায় অনেকদিন কেটে গেল। ভবানীর ভাণ্ডার নিঃশেষপ্রায় হয়ে এল। দুর্গা স্বামীকে বললেন, 'পূর্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হৈলে এবে। আর নাকি ভিখমাগা শোভা করে শিবে॥ ...চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন। নহে উদাসীন হও ছাড় পরিজন।' উত্তরে শিব বললেন, 'ভিক্ষাদুঃখে সুখে আছি অকিঞ্চন পণে। চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥ ...চাষ বলে ওরে চাষী আগে তোকে খাব। মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব।' তার ওপর 'গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা। বাব করে সকলি বেচিয়া লয় রাজা।' কাজেই অন্য ব্যবসায়ে তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু 'পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল'—দুটোর কোনটাই শিবের নেই। অতএব দেবীর উপরোধে শিবকে চাষেই নামতে হল। ইন্দ্রের কাছে জমির পাট্টা নিলেন, কুবের দিলেন বীজ ধান, শূল ভেঙে হল হাল, যাঁড় ও বৃষকে তাতে জুড়ে ভীমের সাহায্যে শিব পৃথিবীর ওপর দেবীচক দ্বীপে চাষ সুরু করলেন। মাঘে বৃষ্টি হল, বৈশাখে দেখা দিল কচি ধান—'হর্ষ হয়ে হর ধান্য দেখে অবিশ্রাম। কালিন্দীর কূলে যেন নবঘনশ্যাম॥ হাপুত্তির পুত্র যেন নির্ধনের ধন। ধান্য দেখি রহিলা পাসরে পরিজন।' ক্রমে বর্ষা এল ; ব্যাঙের লাফালাফির সঙ্গে দেখা দিল উঁওানি মশা মাছি ডাঁশ মশা জোঁক ; শিব ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিষেধকের যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। এল পৌষ মাস, 'পৌষীকৃত্যে'র সময়। বৃকোদর ক্ষেতে নামলেন। কিন্তু ধান হল মাত্র 'আড়াই হালা'। শুনে শিব তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে বললেন। বারো বছর ধরে সেই আগুন জ্বলতে থাকে। শেষে শিবদুর্গার দৃষ্টিপাতে অগ্নির নির্বাপণ ও বরদান—'এক শস্য দিলে লোকে, নানা শস্য হবে লোকে।' নানারকম ধান হল তাই থেকে, 'শস্যপূর্ণ পৃথিবী হইল সেই হৈতে। শুনিলেন শৌনকাদি শুনাইয়া সূতে।'

বর্ণিত কাহিনীর কিছু অংশে পুরাণের স্পর্শ বাদ দিলে বাকী সমস্তটাই কবি

দেখেছেন চাষীর চোখ দিয়ে। চাষীর সমস্যা ও চাষের বিপদের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি দেবতার ত্রিশূল ভেঙে হাল করে তাঁর দৈব ক্ষমতাকে কৃষিতে নিযুক্ত করেছেন। এর উৎস সম্পর্কে রামেশ্বর বলেছেন : যেকথা নৈমিষারণ্যে দীর্ঘসত্রে দীর্ঘ পুণ্যে শৌণকাস্তে শুনাইল সূত ॥ আর বৃদ্ধপরম্পরা যেকিছু বলেন ধাঁরা তাহার করিয়া সারোদ্ধার। গাইব সঙ্গীতরসে।—বৃদ্ধপরম্পরায় শ্রুত এই কাহিনী জনসমাজ থেকে আহরণ করা, 'বঙ্গভূমি এককালে শস্যশ্যামলা ছিল। শস্যই ছিল তার সম্পদ আর সম্পন্ন ও সাধারণ শ্রেণী সকল গৃহস্থই ছিল চাষী গৃহস্থ। তাই দেবতাও ছিলেন কৃষকবেশী ও কৃষিকাজে নিপুণ ১৯। এই দেবতা কৃষকশিব; তাঁকে চাষে প্রবৃত্তি দেন যিনি তিনিই শিবানী, অন্নদা-অন্নপূর্ণা, লোকায়ত কৃষি তথা পৃথ্বী দেবী। বিভিন্ন কৃষি ও মেয়েলী ব্রতে অনুষ্ঠানে ভাবনায় ভারতশিবের কৃষিদেবত্বের উৎস ও পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি; বাঙলার কৃষি-কৃত্যে কর্ষণদেবতার রূপ ও কথা আদিমকাল থেকে প্রচলিত ছিল, শিব তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সভাকবি সেই গ্রাম্যকথার কাব্যরূপ দিয়েছেন।

অ। শিবের কোচনী-সংস্পর্শের কথা উল্লিখিত হয়েছে কৃষিকার্যের ফাঁকে ফাঁকে। কোচপলরা কৃষক, কোচনারীরাও স্বামীকে চাষে সাহায্য করে। স্থানীয় 'মহাকাল' বা 'মহারাজ' কৃষিদেবতা এবং হুতুম, কাতি ও মদনপূজা এখানকার কৃষি-অনুষ্ঠান। রাজবংশীদের খেতিপূজা, পাটপূজা এবং বর্ষাকালে হরগৌরী উপাসনাও উল্লেখ্য। এইসব কৃষিকৃত্য ও কৃষিকথার সঙ্গে শিব যুক্ত হলেন। লৌকিক গীতিতে তিনি শ্রমজীবীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন।

আ। পশ্চিমবাঙলার প্রান্তবাসী আদিম উপজাতিদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। এদের বিভিন্ন ঋতু-পার্বিক অনুষ্ঠানগুলি শস্যনির্ভর। এখানকার কৃষির উৎপত্তি-বিষয়ক আখ্যায়িকাকে রামেশ্বরের শিবায়নের পূর্বগা বলে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। ওরাওঁদের উপপুরাণে বলা হয়েছে ২০, ধর্মেশ পৃথিবীকে একবার দগ্ধ করলেন কিন্তু ধানের অভাবে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। পার্বতীর সাহায্যে তিনি আদিম নর-নারীকে পাটবীজ ও ধান দিলেন। মকাই গম মশুরি সরিষা রহড় ইত্যাদি জন্মাল কিন্তু পোকামাকড় ও ইঁদুর সব খেয়ে ফেলল। ধর্মেশ তখন নিজে বালকবেশে পৃথিবীতে এসে ধানভানা সুরু করে দিলেন। সেই থেকে ধানের জন্ম হল। সাঁওতালী উপকথায় ২১ মারাং বরু প্রথম নরনারীকে দিলেন কাপড় ধান ও হাঁড়িয়া। অতঃপর তারা সেই ধান বুনে জীবিকার উপায় খুঁজে পেল। গোন্দদের সৃষ্টিতত্ত্বেও এইজাতীয় কাহিনী মেলে ২২। ধর্মঠাকুর প্রজা ও শস্যরক্ষার দেবতা, অনাবৃষ্টিরোধের কামনায় তাঁর পূজা হয়ে থাকে। এইসব কৃষি-দেবতার সঙ্গে যোগাযোগে বাঙলার লোকশিব হলেন কৃষক। কৌমকথা হল শৈবকথা। তখন পার্বতী ও গঙ্গা সুতা কাটেন, মহাদেব বোনেন তাঁত।

ই। গাজন-গম্ভীরা কৃষি-উৎসব বলে বিভিন্ন স্থানে 'ঢেঁকিমঙ্গল' অনুষ্ঠান হয়

এবং সন্ন্যাসীরা কৃষক লাঙল বৃষাদি সেজে চাষের অভিনয় করে, গান গায় 'অথ চাসপালার'। শূন্যপুরাণে ভিখারী শিবের অনটন দেখে পার্বতী (?) অনুরোধ করেন, 'আহ্মর বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাস। কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।' মুগ তিল সরিষা কার্পাস ইক্ষু ইত্যাদি চাষের সুবিধা ভেবে শিব সোনার লাঙল রূপোর হাল নিয়ে মাঘ মাসে মাঠে চললেন। শিব-শিবানীর মিলনজাত 'কামদ ধান' থেকে হল বীজ ধান, হরিণের ছাল থেকে হল জাঁতা, বিশাই গড়লেন সোনার কাস্তে। ভীম এলেন ধান কাটতে, হনুমান রইল পাহারায়। কিন্তু আড়াই হালা ধান শুনে শিব ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর আদেশে ভীম হিঙ্গুলা দেবীকে নিয়ে ধানে আগুন দিলেন। পার্বতীর অনুরোধে, ইন্দ্রের বর্ষণে ও শিবের স্পর্শে আগের ধান ফিরে এল। শিব আবার ধান বুনলেন; পৃথিবীতে নানাবিধ ধানের জন্ম হল। ধর্মপূজাবিধানেও অনুরূপ কাহিনী আছে। তবে এখানে একা ভীম শিবকে সাহায্য করেন, ধান পোড়ে বারো বছর এবং নেভাতে বলেন শিব। তাঁর ত্রিশূল দিয়ে হাল হয়, টানে বাঘে-বৃষে। দুর্গা অনুরোধ করেন, 'তখন ছিলে দুই প্রাণী এখন পাঁচ সাত। আর নাঞি আটে গোসাঞি ভিক্ষার ভাত। চাষ চস মহাপ্রভু সুখে অন্ন খাব। বড় বড় মুনিগণের দ্বারে নাগ পাব॥ কার্পাস চাস কর প্রভু পরিবে কাপড়। দেবতা হয়্যা পরবে কত কেঁউদা বাঘের ছড়।' কামদ ধানে ক্ষীর না থাকাতে ধান হল না; তখন দেবী শ্রীফল গাছ নির্মাণ করলেন। তা থেকে পাতালে হল বিষ, গাভীতে দুধ, ধানে ক্ষীর।

ঈ। শূন্যপুরাণের চাষপালার কাহিনী অধিকতর কোমবনিষ্ঠ, ধর্মপূজাবিধানের কথা আরও প্রগত, পুরাণঘেঁষা ও রামেশ্বরের আখ্যায়িকার নিকটবর্তী। 'পটুয়া-সঙ্গীতে' কৃষকশিবের গৃহচিত্র আরও লৌকিক এবং এর কয়েকটি গীতিতে জেলেনীরূপে দুর্গার শিবকে ছলনার বর্ণনা আছে[২৩]। রামেশ্বরের কাহিনী গাজন পটুয়া প্রভৃতি লোকগীতি থেকে সমাহৃত। এছাড়াও অন্যত্র শিবের কৃষি-সান্নিধ্যের ছবি আছে। গোপীচন্দ্রের গানে (১ম) অত্যাচারিত চাষীরা শিবের কাছে বিধান নিতে যায়। সংখ্যাহীন খণ্ডগীতিতে শিবের চাষপালার একই কথা নানাভাবে বিবৃত হয়েছে। এমন-কি অনেক ছড়ায়ও কৃষকশিব জীবন্ত। যেমন মুর্শিদাবাদের 'পোবালি ছড়া'র রাখালরা আজও বাড়ী বাড়ী গিয়ে গান ধরে, 'সোনার লাঙল রূপার থাল। গাই বলদে জুড়হু হাল॥...বোলো ভাই শিবো। একসের চাল লোটা ভরি লিবো।'

উ। বঙ্গশিবের কৃষিনিষ্ঠতার আর একটি পরিচয় আছে তাঁর সঙ্গীর মধ্যে। পুরাণে শিবানুচর নন্দী, মনসামঙ্গলে হনুমান, শিবায়নে ভীম। নাম তিনটি, উৎস একটিই। নন্দী-বৃষের কথা আগে আলোচিত হয়েছে; পুরাণমতে, শিব হনুমানরূপে রামকে সাহায্য করেছিলেন[২৪]; অন্যত্র নন্দী বানরানন[২৫]। এই হনুমান বা মহাবীর উত্তর ভারতের উর্বরতার দেবতা[২৬]। পবন মৌসুমীবায়ু—ভীম ও হনুমান দুজনেই পবননন্দন, অর্থাৎ কৃষির সহায়ক। মহাভারতের অমিতবল ও অমিতাহারী ভীমও

উর্বরতার দেবতা। মধ্যপ্রদেশে ভীমকে নতুন শস্য উৎসর্গ করা হয় ২৭। গোন্দরা ভীমকে বৃষ্টিদেবতারূপে পূজা করে এবং বাঁশ পাথর কাঠ তাঁর প্রতীক; 'ভীমলাট' বা 'ভীমগদা' শিবলিঙ্গ সদৃশ ২৮। উত্তর প্রদেশের 'গোরবাবা' বা শিবের মত ভীমও ক্ষেত্রপাল; 'কালভরো' ও 'ভীমসেন' কালভৈরবরূপে শিবমন্দিরের রক্ষক, অপর নাম 'লাটভৈরো' ২৯। চামারদের কাছে ভীম শস্যরক্ষক ৩০। বেগ বোদা খোন্দদের প্রবাদে ভীম মহুয়ারসের আবিষ্কারক বলে খ্যাত ৩১। মাদকসেবী ও কর্ষণজীবী শিব ও ভীম একই ভিত্তিতে নিকটতর হয়েছেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে শিবের অন্যতর নাম 'ভীম', স্কন্দপুরাণে (প্রভাস ৪০) ইনি শিবাংশজাত। রামসীতা কাহিনীর ঘনিষ্ঠ এবং নবদূর্বাদলশ্যামের সহায় হনুমানও কৃষির সঙ্গে যুক্ত; মহাবীরজীর পূজা হয় বৃষ্টিকামনায়; তাঁর হাতেও ভীমের মত গদা, কর্মশক্তি তাঁর অমিত, শস্য রক্ষণ-অরক্ষণ ক্ষমতা প্রচুর। উর্বরতার অধিপতি ভীম ও হনুমান কৃষিকথা ও উৎসবের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছেন মালদহের গম্ভীরায় পটুয়াসংগীতে শূন্যপুরাণে ধর্মপূজাবিধানে শিবায়নে ৩২। শিব-হনু-ভীমের মৌল যোগ কৃষিক্ষেত্রে ও কৃত্যানুষ্ঠানে, যেখানে তিনজনেই আহার্যদানের অধিকারী এবং আহারগ্রহণ সম্পর্কে সমান উদার; একজন ভোজনপটু, অন্যজন ভোজনবিলাসী, আরজন ভোজনবিশারদ। এইসব পশু-প্রমথের যোগে শিব 'বানরানন নন্দী' ও 'ভীম' নাম পেয়েছিলেন। ভীম স্বরূপে থেকে গেলেন, হনুমানের হল শিব-অবতারত্ব।

ঊ। আদিতে শিব ছিলেন কর্ষণ-অধিপতি প্রমথ, ব্রাত্যদের উপাস্য ব্রাতপতি। আর্য মনন তাঁর কৃষকরূপ গ্রহণ না করে ব্রাত্য দেবতাকে ভিখারী করে তুলল এবং ঔপনিষদিক যতিধর্ম, বৈদান্তিক সন্ন্যাস ও বৌদ্ধজৈন ভিক্ষুত্বের প্রতিভাসে ভিখারী শিবের নানা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিল। লোক-সমাজে ভিখারী-শিবের প্রভাব সত্ত্বেও (বাস্তব কারণে) তাঁর কৃষিঘনিষ্ঠ রূপটি অম্লান রইল। বাঙলায়ও শিবের ভিক্ষুক এবং কৃষক রূপের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ব্যবধান দেখা যায়। ধর্ম ও কল্পনার আভিজাত্যকে যারা প্রশ্রয় দিয়েছে, অনাসক্ত বৈরাগ্যের উপায়হিসাবে ভিক্ষাচারকে যারা পবিত্র জ্ঞান করেছে, তারা শিবকে পাঠিয়েছে ভিক্ষায়; কর্ম ও কল্পনার বাস্তবতাকে যারা আশ্রয় করেছে, মাটির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সোনাফসল তুলে আনতে হয় যাদের, তারা শিবকে পাঠিয়েছে চাষে। কবিচিত্তের যোগ ও প্রবণতা যেদিকে, তাঁর কাব্যে সেই জাতীয় শৈব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কালপ্রবাহে কাব্যপ্রবাহে ভাসমান ভিখারী-শিব হয়ে উঠলেন হাস্যরসের আধার, কৃষক-শিব হলেন আদিরসের আধেয়। মার্জিত ছন্দে, প্রসাধিত ভাষায়, অলংকৃত চিত্রে প্রকাশিত হল রসের দুই ধারা।

যথার্থ শিল্পী যিনি তিনি ধর্ম ও কর্ম উভয় জগৎ থেকেই তাঁর শিল্পের উপাদান আহরণ করেন, বিচিত্র বিশরীতকে সমন্বিত করেন। তাঁর লেখনীতে ভিখারী এবং কৃষক সামঞ্জস্যে উপনীত হয়। যেমন ঘটেছে বিদ্যাপতির শৈবগীতিতে, যেখানে

শিবের ছুটি চিত্ররূপই গৃহীত হয়েছে অবিনাভাবে অভিন্ন ভাবদৃষ্টিতে। শিবের উন্মত্ততায় যখন সবাই ভয়ে পলায়মান, তখন কবি বিনম্র উপদেশ দেন: ভিক্ষায় গৌরবের হানি, উপহাসের পাত্র হওয়া, অতএব—'খটক কাটি হরে নে বঁধাওল ত্রিশূল তোড়িঅ করু ফারে। বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ পাটএ সুরসরি ধারে।' কবি বারবার অনুরোধ করেন, হে হর মন দিয়ে চাষ কর, 'ফিরসি করিঅ মন লাই'; কিন্তু 'জগৎভিখারী' হর লাঙ্গলের বদলে চিমটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন নির্বিকার মনে, বিনা-মূলধনের নিশ্চিন্ত ব্যবসা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে। তথাপি কৃষির প্রতি কবির অবজ্ঞা প্রকাশ পায় নি, ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি অতি-আসক্তিও না। এই সমদৃষ্টি রামেশ্বরের শিবায়নেও স্ফূর্ত হয়েছে। কিন্তু কালের ব্যবধানে তাঁর শিবকথা বিদ্যাপতির শিবগীতির মত শিল্পসৌন্দর্য লাভ করতে পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর অসংযমের স্রোত থেকে দূরে থেকেও সমকালীন রুচি ও রসবোধকে তিনি সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেন নি। শ্রদ্ধা নিষ্ঠা এবং সহৃদয়তা সত্ত্বেও তাঁর শিব আদি ও হাস্যরসে অবগাহনরত।

খ। ভারতশিবের ভিক্ষুরূপ এক নিঃশব্দ অট্টহাস্য, বাঙালী বুদ্ধিজীবী তা কান পেতে শুনেছে; বঙ্গশিবের কৃষকরূপ এক শব্দহীন কান্নাহাসি, বাঙালী শ্রমজীবী তা প্রাণ দিয়ে বুঝেছে। লৌকিক কৃত্যে-কাব্যে কৃষকশিব আজও প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন, শুধু বাঙলা নয়, সারা ভারতে। কৃষিকার্যে ও উৎসবে তিনি সভাপতি দেবতা, শস্য বপনে ও চয়নে তাঁর গান গাওয়া হয়, সন্তানার্থে তাঁর কাছে 'হত্যা দেওয়া' ও 'মানৎ করা' হয়। জীবন-সংগ্রামের এই বাস্তব পটভূমিকায় কোন্ সুদূর অতীতে ছড়া তৈরী হয়েছিল—'ধান ভান্‌তে শিবের গীত'। আজ আমরা প্রবচনটির বিপরীতার্থ করে নিয়েছি; তার কারণ ধান ভানার সঙ্গে শিবের গানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বাস্তব ছবিটি আমাদের মন থেকে মুছে গেছে, সেখানে ভিখারী শিবের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যটি গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। কিন্তু শ্লোকটি আক্ষরিক অর্থে একান্ত সত্য তাদের কাছে—যারা ধান ভানতে ভানতে আজও শিবের গীত গায়।

৪। শিবের বিবাহ

বাঙলায় কৃষকশিব প্রজনন-দেবতা। শুধু লিঙ্গরূপে নয়, বাঙালীর অসংখ্য শিবদেবতার অন্যতম প্রধান গুণ বন্ধ্যাত্বমোচন ও পুত্রদান। 'পাঁচুঠাকুরের দোরধরা' বহু মানবক-পঞ্চানন শিবের বরে দুর্লভদর্শন নন। তাই প্রজনন তথা মিথুনতত্ত্ব বাঙলাদেশের শিবকথার অন্যতম প্রধান অঙ্গ, বিবাহ যার পূর্বগা। বাঙালীর লৌকিক কথা ও গানে তার অনেক ছবি আছে।

বিদ্যাপতি 'জগৎকিসান' শিবের বিবাহ বর্ণনা করেছেন। তপস্যারতা গৌরীর কাছে শিব এলেন যতিবেশে। গৌরীর মন তরল হল, 'ডিমি ডিমি কর ডমরু

বাজএ এহে আএল তপসী।' এবার শিব এলেন ভিখারীবেশে; উমা মেনকাকে জনান্তিকে বলেন, যোগী তাঁর মন হরণ করেছে, 'সুন্দর গান গাত অজর পতি সে মোহে। চিত সোঁ নই ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে।' তারপর শিবগৌরীর বিবাহ, বিবাদের ফলে সংসারত্যাগ এবং উমার স্বামীসন্ধানে যাত্রা। বিদ্যাপতির রচনায় একই কালে পুরাণ, কুমারসম্ভব ও কৃষ্ণলীলার সম্মিলন ঘটেছে। কালিদাসের ভাব ও পৌরাণিক প্রভাব [৩৩] লৌকিক রসে জারিত হয়ে বাংলা কাব্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। দেবগণের মন্ত্রণায় যোগী শিবের ধ্যানভঙ্গের জন্যে পার্বতীকে উপলক্ষ করা হল। তারপর 'ইন্দ্রবাক্যে শঙ্করে এড়িলা কামশর। ঈশ্বত চঞ্চল শিব হইল অন্তর।' যথারীতি মদনদহন, উমার তপস্যা, দ্বিজবেশে শিবের আগমন, আত্মনিন্দা, স্বরূপ প্রকাশ ও শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ। নারদের মাধ্যমে বিবাহ স্থির হল (ক. চ.)। শিবের বিবাহ, বরযাত্রায় ত্রিদশের অধিবাসীবৃন্দের যোগদান: 'চলে কোটি যোগিনী ডাকিনীগণ লয়ে। সর্ব্বভুক শীঘ্র আইল সমাচার পেয়ে॥ দীপ্ত করে দিগন্ত দেউটি ধরে দানা। ভূতগুলা মারে ডেলা শুনে নাই মানা॥ খোশাল হইয়া পেতি মশাল যোগায়। কৌতুকে কুষ্মাণ্ডগণ গড়াগড়ি যায়॥ দপ্ দপ্ দীপক জ্বলিছে ধূনা মড়া। হাজার হাজার চলে হয়ে হাতী ঘোড়া॥ চরখি হইয়া চলে কেহো সাথে সাথে। হাউই হইয়া অন্য ধায় শূন্যপথে॥ অনেক আতসবাজী করে যত ভূত। শঙ্কর সাবাসি দেন বটে মোর পুত॥ বরযাত্র শব্দ শুনে স্তব্ধ হিমালয়' (রামেশ্বর)। কন্যাযাত্রীরা হতবুদ্ধি; হিমালয় বসলেন বরাসনে, আর 'ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া। গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া।' মেনকা জামাই বরণ করতে এলে কৃষ্ণের কৌশলে গরুড়ের আবির্ভাবে শিবের সর্পবন্ধন খসে পড়ল। পলায়মানা মেনকা স্বামী, নারদ ও শিবের নিন্দা করতে লাগলেন; সমবেত এয়োরা তাতে যোগ দিল, 'আই আই এই বুঝি মোর গৌরীর বর লো' এবং মাতার 'আমার উমা মেয়ের চুড়া ভাঙ্গড় পাগল ওইনা বুঢ়া' ইত্যাদি খেদোক্তির মধ্যে শিবের মোহনরূপ ধারণ। তখন নাচেগানে আমোদে আহ্লাদে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল। পরদিন কৈলাসে 'সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার' (ভারত)। অন্যান্য বাংলা কাব্যে এই একই ছবি ফুটে উঠেছে এবং সর্বত্রই বাঙালী তাকে স্বকীয় করে নিয়েছে। এই চিত্রায়ণের পশ্চাতে স্থানীয় কৃষিনির্ভর কৃত্য-অনুষ্ঠান এবং কথাভাগের অবদানও কম নয়। দ্রবিড় ভাষায় 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ 'বিবাহ' এবং বিবাহে নাচগানের নাম মঙ্গলগীতি; দেবদেবীর বিবাহগীতিই মঙ্গলকাব্যের আদি রূপ। এইদিক থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্যের উৎসসন্ধান করলে আমরা সেই একই বিন্দুতে উপনীত হব, যেখানে কর্ষণ প্রজনন সংস্কৃতির লোকায়ত আসরে দেবদেবীর বিবাহ-বাসর ও নাচগান কথাকৃত্যের সামষ্টিক সমারোহ।

৩৩। উত্তর ভারতের কৃষি-অনুষ্ঠানে দেবদেবীদের বিবাহ অবশ্যকরণীয় প্রথা।

ক্ষেত্রপাল 'ভূমিআ' ও 'ভুক্রিরাণী' বা গ্রামদেবতা 'ভৈরোঁ-ভৈরবী'র বিবাহ [৩৪], মজঃফরপুরের কর্ষণক্ষেত্রে 'সোম' ও 'চকো'র বিবাহ [৩৫], সাঁওতালদের 'দাণ্ডীকাট্টা' বা দ্বিধাবিভক্ত কাঠির মধ্যে ডিম রেখে দুইখান করার প্রথা (যা এই বিবাহবাসরের একটি আদিম রূপ), কুকিদের 'বল-প্রি' এইজাতীয় কৃত্য; বাঙলার নানাস্থানে এর বিচিত্র রূপ আজও দেখা যায়। সাঁওতালদের আরও কয়েকটি সমশ্রেণীর অনুষ্ঠান আছে—'ছতা বোঙা' ও 'ছাতোম্ পরব'-এ বিবাহনৃত্য [৩৬], 'ফাগুয়া-সরহুলে' সূর্যপৃথিবীর বিবাহানুষ্ঠান [৩৭]। ফাগুয়ায় গ্রামের মোড়ল ও মোড়লনী বরকন্যা সেজে বিবাহের অভিনয় করে, আর্চারের 'দি ব্লু গ্রোভ'-এ তার সুন্দর ছবি আছে। সরহুলে পাহান ও তাঁর স্ত্রী বিবাহাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে, উৎসবান্তে কৃষি ও ফলাদিসংগ্রহ সুরু হয়। ফাগু দোলোৎসব, এর দেবতা 'গোসাঁই', ইনি পরে হন 'কামদেব'—ফলন-দেবতা থেকে মিথুনদেব। জলপাইগুড়ির 'মদনকামারু', রাজবংশীদের 'মদনকাম' প্রভৃতিতে হরগৌরীর বিবাহ এবং মদনের জন্মানুষ্ঠান হয়। কোচবিহারের 'নমলাকাতি' কার্ত্তিক ঠাকুরের পূজা ও কৃষিব্রত। তাঁর বরে 'শষ্'-ধান বৃদ্ধি পায়, চাষের অভিনয় হয় জমিতে লাঙল দেওয়া থেকে ঘরে ধান তোলা পর্যন্ত। শিবের বিবাহ-পালা এখানে গীত হয় [৩৮]। বসন্তকালে কৃত্য 'উমা-মহেশ্বর' এবং এই জাতীয় ব্রতও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাঙলার কৃষকের কল্পিত কৃত্যসংশ্লিষ্ট এই যুগল দেব-দেবীর ধারণা বাঙলার বিভিন্ন ধর্মকে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর যুগলরূপ অবিনাভাবে আলিঙ্গিত এবং একমাত্র তখনই এঁরা বরদ; বৈষ্ণব 'ঠাকুর-ঠাকুরাণীর' যামলরূপের এবং তন্ত্রের যুগনদ্ধরূপেরও মূল এখানে।

বাঙলার এই কৌম বিবাহ অনুষ্ঠান লোকশিবকে আশ্রয় করেছে। তিনি ধর্মকে সরিয়ে হলেন অম্বিকাপতি, ধর্মেশকে স্থানচ্যুত করে ধর্মতিমাইপতি, সূর্যকে বিচ্যুত করে গৌরীপতি। এ ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে তিনি পৃথিবী এবং গ্রামদেবীদের অনেককে বিবাহ করেছেন। কোচবিহারের হারীয়া মেচের কন্যা 'গোসানীদেবী'রও স্বামী হন মহাদেব [৩৯], পশ্চিমবঙ্গের 'চাণ্ডী' তাঁর স্ত্রী; পূর্ববঙ্গে নীলপূজায় 'নীল'-এর পাশে গৌরীর মূর্তি রেখে শিবের বিবাহ গীত ও অভিনীত হয় [৪০]। এখানে নীল হলেন নীলকণ্ঠ, তিনি পুত্রদ (তুঃ নীলের ঘরে দিয়ে বাতি। জল খাওগে পুত্রবতী)। বরিশালের নীলপূজার গানেও হরপার্বতীকে নিয়ে গান রচিত হত [৪১]। গাজন-গম্ভীরায় দণ্ডায়মান দণ্ডটিকে শিব, শায়িত দণ্ডটিকে কারতি (পার্বতী) কল্পনা করে উভয়ের মিলনদ্যোতক অনুষ্ঠানাদি অবশ্যকরণীয় অঙ্গ। দুর্গার পূজায় ষষ্ঠী বা 'ব্রীহি' ধানের ব্যবহার, ঘটের গায়ে সিঁদুরের পুতুল, তন্ত্রের কামকলায় যৌনক্রিয়াতত্ত্ব, সর্বতোভদ্র মণ্ডলে যোনি প্রতীক ও কল্পলতার চিত্রাঙ্কন বঙ্গদেবীর কৃষি-প্রজনন ঘনিষ্ঠতার স্বাক্ষর। শিবের সঙ্গে এঁদের মিলনের ফল—বাঙলার 'উমা-মহেশ্বর' এবং 'কল্যাণসুন্দর' প্রতিমার অত্যধিক বাহুল্য।

আ। কথা-অংশে প্রথমেই স্মরণীয় সূর্যের গান [৪২]। যোগী, চাষী এবং

(মাঘমণ্ডল ও ভাতুলী নামক কৃষিব্রতে) মেয়েরা এইসব গান গেয়ে থাকে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান সমাপন ও পূজা গ্রহণান্তে সূর্য বেরুলেন প্রাত্যহিক আকাশ-পরিব্রাজনায়। নৌকা থেকে নামতেই 'ওপারে দুইটা বাওনের কন্যা মেল্যা দেছে সাড়ি। তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী'। প্রতিবেশীরা এসে বলে, 'ও সূর্যার মা। তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না।' ঘটক পাঠানো হল, দেশ-দেশ ঘুরে এসে সে সমাচার আনল, 'হাত দেখলাম পাও দেখলাম দেখলাম দীঘল চুল। প্রদীপের রোসনাইতে দেখলাম বধূর চন্দ্রমুখ।' সূর্যমাতা বরসজ্জা কেনা কাটা করেন। তারপর একদিন শুভলগ্নে 'সুন্দর বানিয়ার ছাওয়াল নগর দিয়া যায়। ...ছাওয়াল সূর্যাই বিয়া করেন বড় সুন্দর বৌ॥ সখী চল্ গিয়া মোরা দেখি।' সূর্য শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করেন, 'সূর্যাই যাবেন শশুরবাড়ী সঙ্গে যাবেন কে। সঙ্গে যাইবে সূর্যাইর বাপ সাজতে লাগযে সে॥ মামায় ভাইগ্নায় হালবার বামে ঠেল্যা বাইও।' বিবাহ নির্বাহিত হল।...গৌরীর শ্বশুরালয়ে যাত্রার সময় হয়ে আসে, 'গৌরীর মায় কাঁদে কাটে। হাজার টাকা গাঁইড়ে বাঁধে।' সমবেত সকলের চোখে জল ফুটে ওঠে, ছল ছল চোখ গৌরী নায়ে ওঠে, নৌকা যাত্রা করে হেলেদুলে। গৌরী ভিজে গলায় অনুরোধ করে, 'ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানি। ধীরে ধীরে বাওরে মাঝিভাই ভাইয়ের কাঁদন শুনি। ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানি। ধীরে ধীরে বাওরে মাঝিভাই বুইনের কাঁদন শুনি।' কিন্তু শ্বশুরালয়ে এসেও সুখ নেই। দরিদ্র স্বামী, তার ওপর সতীন-কাঁটা। যাকে কাছে পায় গৌরী তাকেই বলে, 'আমারে নি নাইয়র দিবা'—আমাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাবে!

ই। কাহিনীটির মধ্যে মাতার প্রাধান্য লক্ষণীয়। এখানে শিবকেও পাই, 'সূর্যাই আইল শিবাই আইল পড়্যা গেল সারা' এবং 'শিবাই ঠাকুর যাত্রা করে দুই কানে ধুতুরা'। অন্য একটি গানে, 'লাউলের ছোট ভাই শিবাই কাটে পাত।' পরবর্তীকালে শিব আর সূর্যসংগী নন, স্বয়ং গৌরীনাথ। বরিশালের নীলের গানে ৪৩ 'প্রাণ কাশীনাথ রৌদ্রে, প্রাণ ভোলানাথ রৌদ্রে, রৌদ্রে শরীর হইল কালো'-য় এই রূপান্তরটি স্পষ্ট। এখানে সূর্যের গানের অনুকরণে এবং পৌরাণিক বৌদ্ধ প্রভাবে একই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই সূর্য পরে হলেন শিব—পটুয়া প্রভৃতি লোক-সংগীতে তার ইঙ্গিত আছে। সূর্যের বরযাত্রা ও বিবাহ শিবেরও ললাটলিখন হল, 'শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা। পাড়াপড়শী দেখতে এল বিয়ার কথা শুইনা। টিপ্ টিপ্ টিপ্ ডম্বুরা বাজে শিঙ্গায় শুণ্ শুণ্ করে। খইস্যা পড়লো ব্রগোচর্ম শিব ল্যাঙ্গটা হইয়া নাচে।' মেনকা এল, সঙ্গে এয়োরা, 'পাগলা জামাই দেখ্যা সবে আউয়াছিয়া করে।' ক্রুদ্ধা মেনকা ঘোষণা করেন, 'না দিব গৌরারে বিয়া কারবা বাপের ডর। ডঙ্কা মাইর‍্যা পাগল জামাইর বাড়ীর বাইর কর।' বাস্তবানুগ সরল বর্ণনায় হাস্যমুখর কাব্যরস ধীরে ধীরে আত্মপ্রসারণ করতে থাকে; মঙ্গলকাব্যে, কবিগানে ও পাঁচালীতে তার সরস চিত্র আছে, রসান্বিত চিত্র তার

ছড়ায় : এপার গঙ্গা ; ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর। তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর॥ শিব গেলেন শ্বশুরবাড়ি বসতে দিল পিঁড়ে। জলপান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে॥ শালিধানের চিঁড়ে নয় রে বিন্নিধানের খই। মোটা মোটা সবরি কলা কাগমারে দই।

ধর্মপূজাপদ্ধতিতে⁴⁴ এই বিবাহ আর (কর্মধৃত) লৌকিক নয়, সামাজিক ও রীতিমত শাস্ত্রীয়। রুদ্র ও দুর্গাকে আহ্বান জানান হল ; অধিবাস প্রসাধন স্ত্রীআচার বেদপাঠের মাধ্যমে গ্রন্থিবন্ধন হল, পাটে উপবিষ্ট মহেশকে দুর্গার চারদিকে ঘোরান হল। গৌরী বসলেন তাঁর পাশে। সমাগত ভক্ত গান ধরল, 'নিরন্তর গৌরী রাখহ বামভাগে'। হাস্যরসের পরিবর্তে এখানে বাস্তব রসের আগমনী সূচিত হয়েছে। সূর্য-গৌরীর সরল বিবাহ থেকে শিব-দুর্গার সামাজিক বিবাহের এই বিবর্তিত ঐতিহ্যকে স্মরণ করেই বাঙালী ছড়া বেঁধেছিল :

রোদ উঠেছে বৃষ্টি পড়ছে। শিবঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে॥ এবং
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান। শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন এক কন্যা খান। এক কন্যা রাগ করে বাপের বাড়ী যান॥

ঊ। শঙ্খ পরিধান পালা :

শিবের চাষপালা ও বিবাহলীলার সঙ্গে শঙ্খ পরিধান পালা বাংলাকাব্যে বিবৃত হয়েছে। রামেশ্বরের শিবায়নে এটি কাব্যের শেষতম আখ্যান এবং শিব-দুর্গার পুনর্মিলনের সেতু। দুজনের তখন মনকষাকষি চলছে, নারদ দুর্গাকে পরামর্শ দিলেন, 'সুসার না হয় শঙ্খ দুটা বাই বিনে॥...যদি শঙ্খ পরতো যেরূপ তুমি মেয়ে। তিনচক্ষে ত্রিলোচন থাকিবেন চেয়ে।' দেবী যথাকালে স্বামীর কাছে দরবার করেন, 'দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটি বাই। কৃপা কর কান্ত আর কিছুই না চাই।' শুনে শিব কটূত্তর করেন, 'ভিখারির ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ। কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥ বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তাঁরে। জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে।' শুনে শিবানী পিত্রালয়ে চলে গেলেন, শিবের অনুরোধ ব্যর্থ হল। তখন শক্তিহীন শিব যোগপথে 'দিব্য দুই বাই শঙ্খ করিলেন সৃষ্টি' এবং শাঁখারীবেশে হিমালয়ে গেলেন। হিমালয়কন্যারা শাঁখা দেখে 'হুলাহুলি' করতে থাকে। শিব বলেন, 'এই শঙ্খ আমার পরিবে যেই মেয়ে। করিব শঙ্খের মূল্য তার মুখ চেয়ে।' দুর্গা সুসজ্জিতা হয়ে এসে বসলেন, 'সেই দুটি গাছি শঙ্খ পরিবার কালে। ভাসিলেন ভগবতী লোচনের জলে॥...সইকে সাজিল শঙ্খ সবে দেখে চেয়ে। থাকুক মর্ত্যের দায় মোহ যায় মেয়ে।' অবশেষে এই শাঁখাপরার সেতুপথে শিব-শিবানীর কপটতা-ত্যাগ ও মিলন।

শঙ্খ ধর্মপূজার অন্যতম অঙ্গ। অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধ সংঘ থেকে এই শৈব শঙ্খের বিবর্তন হয়েছে। রংপুরের হরপার্বতীর গানে, 'উঠ উঠ ধর্মমাতা ধর্ম কর সার। শিব শঙ্খ দুইটি পূজা ধরমভুল্লার'—উক্তির মধ্যে এই মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

আবার শঙ্খ বিষ্ণুরও অলঙ্কার ও প্রতীক। অতএব ধর্মপূজার মাধ্যমে শিব ও বিষ্ণুর নৈকট্যে এটি শৈবকথার অন্তর্গত হতে পারে। সদ্য উদ্ধৃত 'সূর্যের গানে' বিবাহান্তিক যাত্রাপথে গৌরী সূর্যকে বলেন, 'তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু।' নীলপূজার গানেও গৌরী শাঁখা পরার কামনা জানান। তদুত্তরে শিব বলেন, 'বৃদ্ধ হইয়াছি গৌরাই কখন যেন মরি। কিসের লাইগ্যা কর বেশ দরবার সুন্দরী।' অবশেষে রাগিণী রুদ্রাণীর জন্যে কাতর হয়ে নারদকে 'শিব বলেন শুন ভাইগ্না আমার কথা রাখ। শঙ্খবণি কহইয়া গৌরাইর মন বুঝতে যাও।' সূর্যের গানে যে পালা সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, শিবের গানে সেই পালা মধুর ও হাস্যরসে সিঞ্চিত হয়েছে। বিভিন্ন খণ্ডগীতিতে তার প্রকাশ লক্ষ্য করবার মত। পটুয়াসঙ্গীতে এই পালাটির একটি চূড়ান্ত রূপ ফুটে উঠেছে (পালা নং ১৯—২২) ৪৫।

শঙ্খ বিবাহোত্তর মিলিত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক, এয়োতির পবিত্রতম চিহ্ন। বাঙলাদেশে শঙ্খ পরিধান একটি মাঙ্গলিক উৎসব, '—শুদ্ধাচারে শঙ্খ পরিধান করিতে হয়। পরিধানের পূর্বে শঙ্খকে ধান্যদূর্বা সহকৃত গঙ্গাজলে বা হরিদ্রাক্ত জলে ধৌত করিয়া লওয়া হয়। পরে ইষ্টমন্ত্র অনুসারে রাধাকে না হয় দুর্গাকে তাহা উৎসর্গ করা হয়। পরিধানের পরে আশীর্বাদ প্রয়োগ হয়' ৪৬। শাঁখাপরা দুটি হাত আর কুমারী নয়, মাতৃত্বের অধিকারিণী। এই মাতৃত্ব পৃথিবীকেও উর্বরা করে তোলে, যে পৃথিবীর প্রতীক-প্রতিমা দুর্গা। উভয়েই অভিন্না; তাই শাঁখা দুর্গাকে উৎসর্গ করা হয়; গৃহ্যসূত্রে দুর্গাকে বলা হয়েছে 'মহাপৃথ্বী' ও 'শঙ্খধারিণী'। 'যোগাস্থা' ও সমজাতীয় দেবীকথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শস্য উৎসবে বিবাহাচারে পতিপুত্রবতীদের একচ্ছত্র আধিপত্য। মেয়েলী ব্রতে শঙ্খ সর্বত্র উল্লিখিত। যে কৃষকের দৃষ্টিতে পৃথিবী জায়া ও জননী, যাঁর সূর্য বা শিবের সঙ্গে বিবাহ সুফলনের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তারা যে সেই দেবীকেও শঙ্খবিভূষিতা করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! বাঙালীর কুলবধূর মত বাঙালীর পৃথিবীবধূ গৌরীরও দুটি কল্যাণী হাতে 'আজা উলি শঙ্খ পরতে বড় সাধ লাগে।' শিবও তাই সগর্বে ঘোষণা করেন, 'বঙ্গদেশে ঘর আমার নাম হয় শিব শাঁখারী।' তখন শিবগৌরীর কথোপকথন বাঙালীর ঘরের আঙ্গিনা বেয়ে চলে: 'তবে পার্বতী বলেন গো তত বিধাতারি কাম। তোমার নামের নাম কি আমার বাড়ীর মানবির নাম॥ তুমি মিতে আমি মিতিন কেউ না কারো পর। আমার হাতে দিবা শঙ্খ কত নিবা দর॥ তুমি মিতিন আমি মিতে কেউ না কারো পর। তোমার হাতে দিব শঙ্খ তার কি নিব দর' (পটুয়াসংগীত)। চাষপালার অচ্ছেদ্য অঙ্গ এই শঙ্খপালা। সূর্যগৌরী থেকে তা শিবদুর্গায় আশ্রয় লাভ করে, বিভিন্ন লোকগানে প্রকাশ পায়। রামেশ্বর এবং অন্যান্য মঙ্গলকবিদের রচিত শঙ্খপরিধান পালা এই লৌকিক সংস্কার ও সংস্কৃতি থেকে আহৃত এবং শিল্পীর তুলিতে কাব্যায়িত হয়েছে। তখন দুজনে দুজনকে নতুন করে চিনলেন: 'পঞ্চভাত ব্যাকুল করিলেন রন্ধন। শিবদুর্গা দুজনাতে করিলেন

ভোজন॥ তবে এই পর্যন্ত কবিতা সাঙ্গ হইয়ে গেল। শিবদুর্গা মিলন হলো শিবর ধ্বনি বল' (ঐ)।

৫। শিবের মৃত্যু ও পুনর্জন্ম

বরিশালের সূর্যের গানে একাধিক কাহিনী আছে যেগুলি একই গল্পের বিভিন্ন সংস্করণ, যদিও চরিত্রগুলি সর্বত্র অভিন্ন নয়। প্রথম আখ্যানটি সূর্য-গৌরীর বিবাহ, দ্বিতীয়টি সূর্য ও চন্দ্রকলার (গৌরী তখন তাঁর সতীন), তৃতীয়টি রাওল ও হালামালার—রাওল সূর্যপুত্র, হালামালা পৃথিবীকন্যা; আবার রাওলও একটি পুত্রসন্তান রেখে চলে যান আগামী বছর ফিরে আসার আশ্বাস দিয়ে। ব্রতিনীরা তখন বলে, 'কই যাওরে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া; তোমার ঘরে ছেইলা হইছে বাজনা জানাও গিয়া।' একই আখ্যান, সেই বিবাহ এবং সংসারজীবনের সজীব ছবি, অথচ বারেবারে পিতার স্থানে পুত্র, মাতার স্থানে কন্যা, পুরাতন নায়ক-নায়িকার স্থানে নবাগত নায়ক-নায়িকার অভিনয়লীলা। এই লীলা কাল্পনিক নয়, কৃষিঘনিষ্ঠ সৌর (ও শস্য) দেবতার' মৃত্যু-পুনর্জন্মের অলংঘ্য নিয়তি। কৃষক বাঙালীর কৃত্যে ও কাব্যে লৌকিক সূর্য-পৃথ্বী তথা লৌকিক দেব-দেবী স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়তিকে অতিক্রম বা অস্বীকার করতে পারেন নি। সূর্যের গানটি ভাদুলি ও মাঘমণ্ডল ব্রতের সঙ্গে যুক্ত। এত বিস্তৃতভাবে না হলেও বাঙালীর অন্যান্য ব্রতে এবং তার কথায় মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের আদিম ভাবনা নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্ম-চিন্তা মিশে গেছে। বাংলা কাব্যে শিব-শিবানীর মৃত্যু-পুনরুজ্জীবনের যে ছবি আছে, তার ভিত্তিমূলে বাঙালীর এই জীবনসাধনা এবং কল্পভাবনা অনেকখানি সহায়তা দিয়েছে।

অ। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, গোরক্ষবিজয়, শিবায়ন, কবিগানে শিবকে 'অস্থিমাল' এবং অন্যান্য কাব্যে 'মুণ্ডমাল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গৌরী প্রশ্ন করেন, 'কি কারণে ধর প্রভু গলে মুণ্ডমালা?' মুকুন্দরামে এর উত্তরে বলা হয়েছে, সতীর শেষ অস্থিটি শিব কণ্ঠে ধারণ করেন। পুরাণে এই কাহিনীর মূল পাওয়া যায়। দেবীপুরাণে (১১৯অ:) শিব ভৈরব মূর্তি ধারণ করে দেবতাদের বলেন, তাঁর 'গলে বিষ্ণুশিরাদিজড়িত ব্রহ্মমুণ্ডমালা'। স্কন্দপুরাণে (প্রভাস ৯ অ:) পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'এই মালা নারায়ণ ও ব্রহ্মার মুণ্ড দ্বারা রচিত।' কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৩৬ অ:) বলা হয়েছে, সতীর ভস্মই শিবের বিভূতি, সতীর অস্থি তাঁর গলে। মূল পুরাণের যে মালায় ব্রহ্মাহরির মুণ্ড, অর্বাচীন পুরাণে তা সতীর দেহাস্থিতে পরিণত। পুরাণটি অর্বাচীন কিন্তু তথ্যটি অর্বাচীন নয়, প্রাচীন ও জনঘনিষ্ঠ। কবিকঙ্কণ ও অন্যান্য বাঙালী কবির বক্তব্যের সঙ্গে এই পৌরাণিক বিবৃতির সাদৃশ্য আছে।

আ। গোরক্ষবিজয়ে [৪৭] শিব গৌরীকে এই প্রশ্নের যে উত্তর দেন তাতে দক্ষযজ্ঞের উল্লেখ না করে তিনি বলেন, 'শতবার মর যদি হও শতবার। একবার

ময় তুমি একখানি হাড়।' মানিকদত্তের চণ্ডীতে সাতজন্মের পর আদ্যার সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। দ্বিজ বংশীর শিব সতীকে পেয়ে বলেন, 'জন্মে জন্মে সতীর মরণ। কি মতে লইয়া যাইব বল নারায়ণ।' তখন অনাদির আজ্ঞায় শিবের সামনে সতীর ছ'বার মৃত্যু হল। শিব ছটি মুণ্ড নিলেন, দক্ষযজ্ঞে দেবীর দেহত্যাগের পর মুণ্ড হল সাতটি ; এর পর দেবী অমর হলেন। সহজিয়া সাহিত্যে, 'এইমত জন্ম মৃত্যু একশত আটবার। একশ আটবারে নিলো একশো আট হাড়। গাঁথিয়া গলায় পরে তার হাড়মালা ;' গোর্খবিজয়ের আর একটি সংস্করণে ৪৮, শিবের আদেশে শক্তি 'শতবার দেহত্যাগ তখনি করিল' ; শূন্যপুরাণে এর পুনরুক্তি, 'মহেস করিব বিভা জন্ম জন্মান্তরে॥··· পুরুষ প্রকৃতি বোলিঅ হইব খিআতি।' পুরাণে সতীহারা কাতর শিবকে দেবী দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি আমার প্রতি জন্মের স্বামী' ; কালিকাপুরাণে (১৯ অঃ) ব্রহ্মা শিবকে জানিয়েছিলেন, 'তুমি সহস্র সহস্র সতী বিসর্জন দিয়াছ, সহস্র সহস্র সতী মরিয়াছেন, আবার চরাচর জগতের হিতের জন্য পুনরায় তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছ।' স্কন্দপুরাণে (প্রভাস ৩ অঃ) পার্বতী শিবকে বলেন, 'জন্মকোটিসহস্রাণি জন্মকোটিশতানি চ। সেবিতস্ত্বং জগন্নাথ ময়া প্রাণনচিন্তয়া।' পৌরাণিক এবং স্থানিক বিশ্বাসকে যেন যুক্ত করেই রামকৃষ্ণ তাঁর 'শিবায়নে' শিবের উত্তরমাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন, 'তোমার অস্থির মালা যেন মুক্তাহার। ব্রহ্মার কপালমালা যেন কণ্ঠমাল।'

ই। শিবের মৃত্যুর উল্লেখ বাংলা কাব্যে দুর্লভ নয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আদ্যাশক্তি ত্রিদেবের তত্ত্ব বোঝবার ও বোঝাবার জন্যে শবরূপে তাঁদের ছলনা করেন। বিষ্ণু উঠে স্থানত্যাগ করেন, ব্রহ্মা মুখ ফেরাতে ফেরাতে চতুর্মুখ হন, নির্গুণ শিব দেবীদেহে শবাসনে বসেন। তখন ভবানী হলেন তাঁর ভার্যা। একে সতীর দেহত্যাগের তান্ত্রিক রূপ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর মূল আছে বৌদ্ধ ধর্মে ও সাহিত্যে। শূন্যপুরাণে নিরঞ্জন-প্রভু স্বয়ং শবরূপে তপস্যারত সন্তানদের ছলনা করতে গেলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তিন অঞ্জলি জল দিয়ে শব ভাসিয়ে দিলেন ; কিন্তু শিব ধ্যানে সব জানতে পেরে 'দুহাতে ধরিআ মড়া তুলিআ লইল। দুর্গন্ধিত সব অঙ্গএ সিব নাচিতে লাগিল।' প্রভুর বরে শিব (ও অন্য দুই দেবতা) চক্ষুষ্মান হলেন। শিব পেলেন আদ্যাকে আর সংহারের ভার। গোরক্ষবিজয়াদি নাথগীতিকা ও সহজিয়া সাহিত্যেও অনুরূপ কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদা নিরঞ্জনের স্থান গ্রহণ করে নিজেই ত্রিদেবের পরীক্ষিকা হয়েছেন। দেবীর এই ত্রিদেব-পরীক্ষার কাহিনীটি পাওয়া যায় মহাভাগবত পুরাণে।

শিবগৌরীকে এইভাবে স্থাপিত করে নিরঞ্জন প্রতিবারই বিদায় নিয়েছেন সৃষ্টিমঞ্চ থেকে। ধর্মপূজাবিধানে 'শবযাত্রা' কাহিনী না থাকলেও গঙ্গাকে 'নিরিসন্' দান করে প্রভু পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। সারগীতায় দেবীকে মহেশ্বরের হাতে তুলে দিয়ে অনাদি দেহত্যাগ করলেন ; মহেশ তাঁকে কবর দিলেন, বিষ্ণু জলে ভাসালেন, শেষে

দাহ হল ; তাই থেকে সৃষ্টির পত্তন। মহাদেব দাসের ধর্মগীতায় আদিদেব ধর্ম এইভাবে মহাপ্রয়াণ করেন। বাঙলার অন্যান্য কাব্যেও এই কাহিনীর অভিন্ন রূপ মেলে। বৌদ্ধ সৃষ্টিপত্তনে ও সাহিত্যে যে এক দেবতার দেহ থেকে পরবর্তী দেবতার জন্ম ও পূর্বদেবতার মৃত্যু, তা পুনর্জন্মবাদের দার্শনিক বা তান্ত্রিক রূপ বলে মনে করা যায়। গোসাঞি দেহত্যাগ করলেন, এলেন শিব ; পিতার মৃতদেহ থেকে নতুন সৃষ্টির পত্তন হল পুত্ররূপে। অপিচ এইসব কাব্যে নিরঞ্জন বা অনাদ্যের যে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে, তাতে তিনি শিবের গুণ হরণ করেছেন। ধর্মপূজাবিধানে তিনি গঙ্গাধীশ, শক্তিকে হরশিরে স্থাপনা করে যান। অন্যান্য কাব্যে, গৌরী প্রথমে নিরঞ্জনের, পরে শিবের গৃহিণী। গোপীচাঁদের সন্ন্যাস এবং গোর্খবিজয়ে 'ব্রহ্মাবিষ্ণু মুদ্গর লইয়া হাতে, তাড়িল শিবের মাথে, মাথা কেটে হইল চৌচির।' তাই থেকে জাত হলেন পঞ্চজন শিব ও গোরক্ষনাথ (পৌরাণিক পঞ্চানন-কাহিনীর রূপবদল লক্ষ্য করার মত)। শিব এখানে মৃতকল্প এবং নিরঞ্জন-গোঁসাই পুনর্জাত হন পুত্র শিবের মধ্যে। শিবকল্প নিরঞ্জনের দেহত্যাগ তাই শিবেরই মৃত্যু, আবার তাঁর সশরীরে পুনর্জন্ম ; তাই 'শিব জননীক বিভা করে।'

ঈ। গোরক্ষবিজয়ে গৌরী প্রশ্ন করেছিলেন : 'তুহ্মি কেনে তর গোসাঞি আহ্মি কেনে মরি। হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি।'—এই 'কেন'র উত্তর যে তত্ত্বে, তার পরিচয় এবং উদ্ভবমূল নিহিত আছে আদি কৃষকের কৃত্য ও ব্রতকথার মধ্যে। ভারতীয় শিব-শিবানীকে আশ্রয় করে তার একটি রূপ বিকশিত হয়ে উঠেছে, সে ইতিহাস আমরা আগে পর্যবেক্ষণ করেছি ; পৌরাণিক বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম ও আখ্যানে তার আরও নানা রূপান্তর ঘটেছে। বাঙলার দেব-দেবীর মৃত্যু-পুনর্জন্মের পশ্চাতে এই ঐতিহ্য সক্রিয় ছিল, তাতে শক্তি নিধান করেছে কৃষি-বাঙলার নিজস্ব কৃত্যকথা—যে কথা ও কৃত্যে সেই চিরপুরাতন চিরনূতন মরণ-উজ্জীবনের পুনরাবৃত্তি, ধরণীর প্রতিদিন তৃপ্তিহীন একই লিপি পাঠ : বীজ থেকে শস্য, শস্য থেকে বীজ, তা থেকে আবার শস্য। এ যেন পিতার অপসরণে পুত্রের প্রাধান্য লাভ, মায়ের কোলে কন্যার বারেবারে নতুন করে আসা। মৃত্যু-অমরতার এই আদিম ভাবনা বাঙালীর লোকায়ত জীবনদর্শনে নিগূঢ়ভাবে যুক্ত এবং শাস্ত্রে-কাব্যে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে : সূর্যের পর আসেন রাওল, গৌরীর পর চন্দ্রকলা, হালামালা ; বুদ্ধ থেকে জাত হন বোধিসত্ত্ব, অমিতাভ থেকে অবলোকিতেশ্বর, আদ্য থেকে অনাদ্যকুমার ; নিরঞ্জন পুত্র-শিবের হাতে স্ত্রী গৌরীকে সমর্পণ করে বিদায় নেন, শিব ও গৌরীর একাধিকবার মৃত্যু ও নবজন্ম হয় ; চণ্ডী অপহৃত বা নিরুদ্দেশ মানুষ ও পশুকে ফিরিয়ে আনেন, মনসা মৃতের প্রাণদান করেন, ময়নামতী পুত্র গোপীচন্দ্রকে মেরে আবার বাঁচিয়ে তোলেন ; গোরক্ষনাথ নির্বাসিত মীননাথকে স্বরূপে নিয়ে আসেন, লাউসেন মৃত্যুর মুখ থেকে বারবার ফিরে আসে, চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা ডুবে যায় আবার ভেসে ওঠে, শ্রীমন্ত বন্দী পিতাকে উদ্ধার করে আনে, রাজপুত্র

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যার ঘুম ভাঙায় ; রাধা-কৃষ্ণে নিত্য বিচ্ছেদ নিত্য মিলন ঘটে, শিব বারে বারে পথে নামেন এবং গৌরী প্রতিবারই তাঁকে গৃহমুখী করে তোলেন অথবা শিব নিজেই আবার ফিরে আসেন, যে ঘর ফেলে গিয়েছিলেন সেই ঘরে।

কাহিনীগুলি আজ পরস্পর স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। এদের ভিত্তিমূল যে একই বিন্দুতে, সে তথ্য ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে, সবগুলিরই মৌল গঠনভঙ্গি অভিন্ন—যাওয়া আর আসা, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম, বিরহ এবং মিলন, অভিযান অথবা অভিসার।

খ। কাব্যে দেবীশিবানী

যেমন আর্য ও দক্ষিণভারতের, তেমনি বাঙলাদেশেরও কর্ম ও সাধনলোকে শিব-শিবানী একত্রে আবর্তিত হয়েছেন। কাব্যলোকে দেবতাশিবের পাশেপাশে দেবীশিবানীরও একটি শিল্পরূপ ক্রমবিকশিত হয়েছে। কারণ দুজনের সহযোগেই দুজনে পূর্ণ—শিব স্বামী, শিবানী স্ত্রী। কিন্তু উভয়ের সম্বন্ধসূত্র শুধু এইটুকুই নয়। বিবর্তনের চলতি পথে শিব ও শিবানী দাম্পত্য সম্বন্ধ ছাড়াও অন্তর আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং উভয়ের সেই মিলিত রূপগুলি সচিত্র কাহিনী ও বিচিত্র তত্ত্ব রূপ লাভ করেছে। কৃষক-কল্পিত সূর্যসনাথা পৃথিবী যখন শিবগৌরীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন উভয়ে পতি-পত্নী ; নিরঞ্জন-ধর্মের সহায়ে যে আদ্যাকে দেবতাশিব বিবাহ করলেন, তিনি শিবমাতা ; ব্রহ্মার ললাট থেকে যে অর্ধনারীশ্বর জাত হয়েছিলেন, তাঁরা ভ্রাতা-ভগিনী-কল্প ; তন্ত্রের শ্যামারূপে দেবী শিবের অধীশ্বরী ও বক্ষবিহারিণী।

এই অভিনব সম্বন্ধ-বন্ধন বাংলা কাব্যের মৌলিক সৃষ্টি নয়। এর পেছনে আছে বিভিন্নমুখী ইতিহাস, দর্শনধৃত শিবশক্তিতত্ত্বের ঐতিহ্য, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক কথা-কাহিনী। বিষয়টি ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করিনি ; তাই আমাদের আর একবার পিছিয়ে গিয়ে আলোচনা সুরু করতে হবে।

১। শিব-শিবা

কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতীর সঙ্গে রুদ্র-ব্রহ্মের সম্পর্ক রহস্যময় ও তর্কসাপেক্ষ। তৈত্তিরীয় সংহিতা<১.৮.৬>এবং শুক্লযজুর্বেদে<৩.৫৭.৩১>অম্বিকা রুদ্রভগিনী ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ<১.৬.১০.৪>এবং মৈত্রায়ণী সংহিতায়<১.১০.২০>অম্বিকা যোনি ও ভগিনী (হেরম্বতন্ত্রমতে, যোনি বা ভগযুক্তা যিনি তিনি ভগিনী ও ভগবতী) ; শতপথ ব্রাহ্মণে<২.৬.২.১>দেবী রুদ্রের সঙ্গে একত্রে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। উপনিষদে উমার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া না গেলেও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 'সোম' শব্দের ব্যাখ্যা করা হল 'উময়া সহ বর্তমানঃ' ; বাজসনেয়ী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় সংহিতায়

ব্যাখ্যাকার যথাক্রমে মহীধর ও ভট্টভাস্কর মিশ্রও এর পুনরুক্তি করেছেন [১]। অতঃপর যজুর্বেদ ও কৈবল্য নারায়ণ অথর্বশির নীলরুদ্র প্রভৃতি উপনিষদে শিব-শিবানীর স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে দুর্গা উমা হৈম পার্বতী শব্দগুলি রুদ্রপত্নী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে বৈদিক রুদ্র অগ্নিকে গ্রাস করে 'কালী করালী মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তঃজিহ্বা' তথা সাতটি শক্তিকে পেলেন। রামায়ণে (১ম) এবং মহাভারতে (শান্তিপর্ব) রুদ্রের স্ত্রী হিমালয়কন্যা পার্বতী কিন্তু উদ্যোগপর্বে তিনি রুদ্রাণী।

শিব-শিবানীর সম্বন্ধ-বন্ধনের ইতিহাস জটিল এবং ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। শিবের শক্তি শিবের স্ত্রী বলে সাধারণত গৃহীত হলেও ভিন্নতর সম্পর্ক-স্থাপনও অসম্ভব হয়নি। যেমন শীতলা শিবের শক্তি কিন্তু স্ত্রী নন। তেমনি অম্বিকা রুদ্রের 'যোনি' —এই যোনি মা ও স্ত্রী দুইই হয় [২]। এই বৈচিত্র্য শিব-শিবার অর্ধনারীশ্বর রূপের মধ্যেও বিদ্যমান—এখানে দুজনে ভাইবোনের মত। আবার শিবানী শিবের মাতা, শিব শিশুরূপে তাঁর স্তন্য পান করেন [৩]। তাই শিব বলেন, 'অহং তে হৃদয়ে গৌরী ত্বং চ মে হৃদিসংস্থিতা। অহং ভ্রাতা চ পুত্রশ্চ বন্ধুর্ভর্তা তথৈব চ॥ ত্বং তু মে ভগিনী ভার্য্যা দুহিতা বান্ধবী স্নুষা' [৪]। এই সম্বন্ধ-বৈচিত্র্য তান্ত্রিক দর্শন ও সাধনে ফুটে উঠেছে। মহাযানী বৌদ্ধমতে, Buddha as the principle of active power first proceeds from nivṛitti Ādi Prajnā and then associates with her and from their union proceeds the actual visible world. The principle is symbolized as Prajna being first the mother and then the wife of Buddha [৫]। বুদ্ধের সঙ্গে বুদ্ধমাতা প্রজ্ঞাপারমিতা ও বুদ্ধশক্তি তারার এই বিচিত্র সম্পর্কের মত শিবানীও একাধারে শিবমাতা ও শিবশক্তি [৬]। শাক্ত তন্ত্রে শিব ও শক্তির অনুরূপ সম্বন্ধ—শিব শক্তিজাত, 'ত্বমাদ্যা সর্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ' [৭]; মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বিষ্ণু ঈশান প্রভৃতি দেবতাদের সৃজন ও লয়ের কর্ত্রী। শাক্ত পদাবলীতে এর প্রতিধ্বনি, 'ভব মানসে সম্ভব, ব্রহ্ম জনার্দন ভব'; শিবার সন্তানরূপে 'শিব হয়েছেন শমনজয়ী আমার মায়ের চরণ পেয়ে'; জগজ্জননী নিজেই শিবাদি দেবতারূপে প্রকাশিতা, 'ঐ যে কালী কৃষ্ণ রাম সকল আমার এলোকেশী'; আবার মহাকালীর স্বামীরূপে তিনিই মহাকাল, 'শিবের প্রকৃতি শিবে কর স্থিতি।' তত্ত্ব থেকে সাধনভূমিতে এসে দেখি, কুলকুণ্ডলিনী তথা শক্তির সঙ্গে সাধকের বহচারী সম্বন্ধ: শক্তি-উপাসক মায়ের সন্তান, 'মারে পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে'; মেনকারূপী সাধক মায়ের সেবা করেন তাঁকে আপন কন্যা কল্পনা করে; আর ষট্চক্র পথে ভ্রমণকালে সন্তান মাকে উদ্দেশ করে বলেন, "আবার ভার্যারূপে কভু প্রণয়ের খেলা খেল।" আরও সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যাবে, সাধকের লক্ষ্য মাতৃচরণ, 'শিবের সেব্য চরণ যেন জবা

পাই'; তখন 'শব হবে শিব'-ও 'শিবত্ব হইব প্রাপ্ত'। এই যে জীবের শিবরূপ-আকাঙ্ক্ষা, এ তো বিশ্বমাতাকে স্ত্রীরূপে প্রাপ্তি-বাসনারই আর একদিক। তখন কবি শিবের মতই বুক পেতে দিয়ে বলেন, 'শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি। শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।' তখন শাক্তের বোধিতে I am She, (সাহম্) ৮, শ্যামায়-শিবে মাতা-পুত্রে অভেদ। বৈষ্ণবী পঞ্চরস সাধনায়ও ইষ্ট ও ভক্তের এই সম্বন্ধ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে ব্রহ্মা বিষ্ণু সহজেই ত্রিলোচনে দেবীকে সমর্পণ করেন। কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাবে আলোচিত রূপান্তরটি দেখা দিতে থাকে। আদ্যাদেবী আদিদেবের কন্যা ও স্ত্রী। নিরঞ্জনের অর্ধাঙ্গ থেকে জাত দুর্গা তাঁর 'ঝিআরি', তবু উভয়ের মিলনে ত্রিদেবের জন্ম হল। বাংলা কাব্যে, উড়িষ্যার বৌদ্ধ-বৈষ্ণব সাহিত্যে এই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি, বৈষ্ণব প্রভাবিত সহজিয়া সাহিত্যেও, 'অনাদি ব্রহ্মার ঘামে শক্তির জনম। দিব্যমূর্তি হইয়া তাঁর আকর্ষিল মন॥ এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছা করিল সঙ্গম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হইল জনম।'

কবীরের দোহাধৃত সৃষ্টিপত্তনে পিতা ও পুত্রের একই কন্যাকে বরণ করার যে কথা আছে, জিলি ও বদরুদ্দীন শহীদের ইসলামী সৃষ্টিধারণার সঙ্গে তা অভিন্ন ৯। জরথুস্ত্রের আহুরা-মাজদার শক্তি সদসৎ ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দ্বিধা ১০। আরও সরে গিয়ে অন্য দেশের দেবমণ্ডলীতেও এই ছবি দেখতে পাই—মিশরের ঈসিস-অসিরিস হোরাস-ঈসিস, বাবিলনের তামুজ-ঈশতার তিয়াবৎ-মেরোডাক, মধ্য এশিয়ার সিবিলি-এথিস, গ্রীসের জীউস-হ্নী, নিম্ন-মিশরের চন্থম্‌রা ও হাৎমেহিৎ, আফ্রিকার তামিৎ ও তাঁর সঙ্গী, বাইবেলধৃত জেরুসালেম ও স্বর্গীয় মেষ—এদের সম্বন্ধও স্বামী-স্ত্রী-মাতাপুত্র-ভ্রাতাভগিনীর। হেসিঅদের মতে, আকাশ পৃথিবীর পুত্র ১১; অন্যদিকে আর্যরা দ্যুস্-পৃথ্বীর দাম্পত্য কল্পনা করেছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের কুমারী মেরী ঈশ্বরের পত্নী ও মাতা। এইভাবে শিব-শিবানীর সম্বন্ধের পটভূমিকায় এক জটিলতা ছড়িয়ে আছে, তার নানাবিধ ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। তবু প্রশ্ন জেগেছে বাঙালী কবির মনে। দেবী জিজ্ঞাসা করেছেন, 'বাপে ঝিয়ে ঘর হবে অসম্ভব কথা' (রা. আ.) এবং 'বাপ ছাড়ি পুত্রসঙ্গে রহিবি কিমতে' (ধর্মগীতা); ব্রহ্মাবিষ্ণু ক্ষিপ্ত হয়েছেন এই ভেবে, 'শিব কৈল্য অবিচার, পৃথিবীতে কুলাঙ্গার' (গো. স.); আর স্বয়ং শিব অনুরোধ জানিয়েছেন, 'তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিব গোসাঁই। এমন আজ্ঞা কর যাতে দোষের অন্ত নাই।'

ইয়ুং প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, এই বিচিত্র সম্বন্ধপাতনের মূলে ছিল 'মাতৃগমনেচ্ছা' with a sister who is simply substituted for the mother as a legal uncensored symbol ১২। আরও অগ্রসর হয়ে সৌরসংস্কৃতির সাহায্য নিয়ে তিনি বললেন, বালকসূর্য সমুদ্রজাত, বৃদ্ধ সূর্য সমুদ্রে তথা মাতৃগর্ভে পুনঃপ্রবিষ্ট: Thus it can be said that in the morning the goddess

is the mother, at noon the sister-wife and in the evening again the mother [১৩]। এ যেন তন্ত্রতত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু এই একটিমাত্র বৃত্তির সাহায্যে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ Between erotism and religion there is at most a kinship rather than an identity [১৪]।

সভ্যতার যখন শৈশবাবস্থা, যখন সুবিহিত সমাজধারণার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্বন্ধবন্ধন ও সমাজবন্ধন নির্ণীত হয় নি, রচিত হয় নি প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্রের প্রথম সংস্করণগুলিও, তখন বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল না এবং থাকলেও শিথিলবদ্ধ ছিল। দক্ষিণভারত মিশর আরব ক্যালিফোর্নিয়ার ইণ্ডিয়ান আমেরিকার চিপ্পায় কাদিআক য়াজ্রিদা ক্যারিব প্রাচীন আইরিশ ও পার্শিয়ান পারসিকদের মধ্যে মাতাপুত্রে পিতাকন্যায় ভ্রাতাভগিনীতে সঙ্গমনের প্রমাণ পাওয়া যায় [১৫]। গ্রীসদেশেও একদা এইরকম মিশ্র মিলন হত, ঈদিপাসের কাহিনী তার স্মৃতিবহ। ভারতীয় সমাজজীবনে এর স্বাক্ষর বিদ্যমান। ঋগ্বেদের যম-যমী <১০.১০> সূর্য উষা <১.৭১.৫, ৯১.১>, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রজাপতি-উষা <১১.১.৩৪> এবং পুরাণের শতরূপা-বাক-সন্ধ্যা-সহ ব্রহ্মার বিহারকাহিনী প্রাচীন শিথিল সম্বন্ধবন্ধনের ইঙ্গিতবহ। মহাভারতে <আদি ৬৩,১২২ ; বন ৩০৬ ; অনু. ১০২> শিথিল বিবাহের কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ জাতকে ও যবদ্বীপের উপ-আখ্যানে রামসীতা ভ্রাতাভগিনী ; মহাবংশ কথিত সিংহবাহুর গল্পও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, এই-জাতীয় মিশ্র সম্বন্ধ খ্রী: পূ: ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত চলিত ছিল [১৬]। সুতরাং যে-আদিমকালে সমাজপ্রথা ছিল এইরকম শিথিল, তার কল্পিত দেবদেবীর মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা চলেছে: যেখানে নরের দেহ থেকে নারীর জন্ম কল্পিত, সেখানে উভয়ের পিতা-কন্যার সম্পর্ক ; যেখানে স্বয়ং ঈশ্বর দুজনকে জাত করেন, সেখানে দুজনে ভাই-বোন ; যেখানে ঈশ্বরী সৃষ্টির কর্ত্রী, সেখানে মাতা-পুত্র [১৭]। সাঁওতাল ওরাওঁ প্রভৃতি উপজাতির প্রথম নরনারী তাই ভাইবোন ও পতিপত্নী। সমাজের প্রেক্ষাপটে ধর্মসমন্বয়ের উদার অঙ্গনে বিজাতীয় দেব-দেবীর মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় [১৮]। দক্ষিণ ভারতের মাতৃকাবৃন্দ যখন একে একে শিবের সঙ্গে যুক্ত হলেন, তখন তাঁরা একদিকে তাঁর ভগ্নী বা কন্যা, অন্যদিকে স্ত্রী রূপে পরিকীর্তিতা হলেন। এই পথেই নিরঞ্জন কন্যা গৌরীতে আসক্ত, অনাদি পুত্রী কেতকায় সঙ্গত, কৃষ্ণ মাতৃস্বসা রাধিকায় অনুরক্ত, শিব আত্মজা মনসাকে দেখে বিচলিত (দ্বিজ বংশীতে মনসা ও চণ্ডী 'একই প্রকৃতি') এবং নবজাত মদন দর্শনে 'পুত্রভাবে পতিভাব কাম ও রতির' (রামেশ্বর)।

কৃষকের কাছে পৃথিবী আদিমাতা, অতএব শস্যও তাঁর সন্তান ; আবার উভয়ের মিলনে নবজাত শস্যের উদ্‌গম। আর এক দৃষ্টিতে, শস্যদেব ও পৃথিবী এই সম্বন্ধে আবদ্ধ। পৃথিবী সেই এক আদিম অপরিবর্তনীয়া ; নবজাত শস্য শৈশব থেকে কৈশোর যৌবন, তা থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয় ও মৃত্যুতে পৃথিবীর কোলেই লয় পায়,

আবার উদ্গত হয় নবীন শস্য-শিশু হয়ে। এইভাবে প্রাচীন শস্য নবীনরূপে, পিতা পুত্ররূপে পুনরাবির্ভূত। অসিরিস যেমন হোরাসরূপে পুনর্জাত, আদিনাথও তেমনি পুত্র শিবের মধ্যে বেঁচে রইলেন ; আস্তা-গৌরী-কেতুকা-পার্বতী সেই আদিম অভিন্না পৃথিবী, যাঁর হাতে শিবকে সঁপে দিয়ে দেবতা দেহত্যাগ করেন পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে। এই কোম ভাবনা বিভিন্ন দর্শনে তত্ত্বে তন্ত্রে ধ্যানে সাধনায় কৃত্যে কথায় বিবর্তিত ও বিবর্ধিত রূপ পেয়েছে।

এইজন্যেই শিব শিবানীর ভাই পুত্র ও স্বামী। ইয়ুং-এর ভাষায়, the birth of a hero, as a rule,...is a rebirth from the mother-spouse। তার ওপর গড়ে উঠল অলৌকিক কথার প্রাসাদ আর লোকোত্তর দর্শনের কারুকার্য, কাব্য তাকে প্রকাশ করল মন দেওয়া-নেওয়ার মিলন-বিরহে।

২। অর্ধনারীশ্বর

শিব ও শিবানীর পরবর্তী মিলনচিত্র অর্ধনারীশ্বর রূপের মধ্যে। বিদ্যাপতির হরগৌরী পদে অর্ধনারীশ্বর রূপের বর্ণনা : জয় জয় সঙ্কর জয় ত্রিপুরারি। জয় অধ পুরুষ জয়তি অধ নারি॥ আধ ধবল আধা তনু গোরা। আধ সহজ কুচ আধ কটোরা॥ আধ হাড়মালা আধ গজমোতী। আধ চানন শোহে আধ বিভূতি॥...আধ চান আধ সিঁদুর শোভা। আধ বিরূপ আধ জগলোভা॥ ভণ কবিরতন বিধাতা জানে। দুই কএ বাঁটল এক পরাণে॥ পরবর্তী বাংলা কাব্যে চিত্রকলা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। পাঁচালী ও কবিগানেও তার রেশ বর্তমান ছিল। এগুলির মধ্যে ভারতচন্দ্রের বর্ণনা সর্বোত্তম :

> কি এ নিরুপম, শোভা মনোরম, হরগৌরী এক শরীরে।
> শ্বেত পীত কায়, রাঙ্গা দুটি পায়, নিছনি লইয়া মরিরে॥
> আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে,
> আধ মণিময় কিঙ্কিনী বাজে, আধ ফণিফণা ধরিরে॥
> আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা,
> আধ কণ্ঠে শোভে গরল কালা, আধই সুধামাধুরীরে॥
> দোঁহার আধ আধ আধ শশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
> আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরীরে॥ (ব. সা. প. সং)

ঋগ্বেদ থেকে অর্ধনারীশ্বর রূপের কল্পনা সূচিত, 'উভধানে মো অন্ততঃ পুংমাইতি ক্রবেপাণিঃ সবৈরদেয়ইৎসমঃ' (৫.৬১.৮)। এই সঙ্গে উল্লেখনীয় সায়নের ভাষ্যের 'নেমঃ অর্ধজায়া পত্যোর্মিলিত্বৈক কার্যকর্তৃত্বাদেক এব পদার্থঃ অর্ধনারীশ্বরস্থ,' বৃহদারণ্যক উপনিষদের <১.৪.১৭> 'আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ' বা 'সহৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্' <১.৪.৩>, এবং মনুসংহিতার

<১.৩২>'দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্ধেন নারী তস্যাংশ বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।' পুরাণে অর্ধনারীশ্বর ব্রহ্মার ললাটজাত ও দ্বিধাবিভক্ত ১৯ : সেই কোপে ভ্রূমধ্যেত জন্মিল শঙ্কর। রুদ্ররূপে উপজিল অর্ধনারীশ্বর' (দ্বিজ বংশী)। হস্তীগুহায় অর্ধনারীশ্বর মূর্তি স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে এই অভেদ কল্পনার যাত্রাপথ বাঁক ঘুরল তত্ত্ব থেকে তথ্যে ও শিল্পে। বাঙলা দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধারণা একে নতুন গতি দিল। বৌদ্ধ দেব ও দেবীর অদ্বয়ত্ব অর্ধনারীশ কল্পনার অনুগামী হয়েও অভিনব। শূন্যপুরাণে গৌরী নিরঞ্জনকে বলেন, 'তব অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে জনম লইলাম এখন'; ধর্মপূজাবিধানে প্রভুর স্পর্শে 'অর্দ্ধ অঙ্গ হৈল গঙ্গার ধবল আকার'; সহজিয়ারা প্রকাশ করল, 'রাধাকৃষ্ণ একদেহ জানিহ নিশ্চয়' (আগমসার); এবং রাধাকৃষ্ণের 'অভিন্ন তনুযোগে' চৈতন্যদেবও অর্ধনারীশ্বর। তিনি 'অন্তঃকৃষ্ণং' ও 'বহির্গৌরং', 'ত্বিষাকৃষ্ণং' ও 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতম্', 'মহেশ' ও 'কাত্যায়নী' ভাবাবিষ্ট এবং 'রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতরি' (চৈ. চ. আদি ৪)। এ থেকে বোঝা যায়, বাঙালী কবি অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনায় পুরাণ-ভাবনার সঙ্গে নিজস্ব কল্পনা যোগ করে তাঁদের নবরূপ দিয়েছে। তাঁদের জন্ম তাই ব্রহ্মার ললাট থেকে সর্বদা নয়, উভয়ের প্রেমের গভীরতা বোঝাতেও—'দুই কএ বাঁটল এক পরাণে'।

অর্ধনারীশ রূপকল্পনার পশ্চাতে নানা কারণ বিদ্যমান। এ সম্পর্কে ইয়ুং বলেছেন, আদিম যৌনবৃত্তি ছিল উভলিঙ্গ, পরে দ্বিধাবিভক্ত হয় স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ২০। তিনি অসিরিস-ঈসিস, এবং দায়োনিসসের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি-জাতীয় Hermaphroditeর কথা বলেছেন ২১। প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট এর অন্যতম উপাদান: ঋগ্বেদের 'দ্যুস্ পৃথ্বীর' অভেদ-ধারণা নৈসর্গিক চিত্রদর্শনের ফল; ইয়ুং কথিত আফ্রিকার 'ওবাতালা' ও 'দুদুআ' (আকাশ-পৃথ্বী) একত্রে সংলগ্ন। প্রথম নরনারীর জন্মভাবনার মধ্যেও এই ভেদহীনতার ইঙ্গিত বর্তমান। সূর্য সমুদ্রে তথা পৃথিবীর দেহে প্রবেশ করে বলে দুজনে একতনু। আবার শস্যদেবের স্থিতি-জন্ম-মৃত্যু পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্লেষে—তা থেকে দেবদেবীর একাত্মক রূপায়ণ ২২। মাতৃতন্ত্রের কল্পনায় আদিমাতার পুত্র ও স্বামী অভিন্ন, পিতৃতন্ত্রে এই কল্পনা অর্ধনারীশ্বরে পর্যবসিত। ধর্মসমন্বয়ের একান্ত প্রয়াসও এই রূপকল্পনার অন্যতম উপাদান ২৩। দার্শনিক একে পুরুষ-প্রকৃতি রূপে কল্পনা করেছে, অদ্বয়সাধনা ব্রহ্মস্বারূপ্য দান করেছে, তন্ত্র পরাসম্বিৎ নাম দিয়ে সেই পরম তত্ত্বের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করেছে, যিনি 'নেয়ম্ যোষিৎ ন চ পুমান্', কাব্য তাঁদের রূপান্বিত করেছে নরনারীর চিরন্তন প্রেমের নিবিড়তম ও গার্হস্থ্য প্রতীকে।

৩। শ্যামা

শিবশিবানীর অন্যতম চিত্র—শিবের বক্ষবিহারিণী শ্যামা। শিব তাঁর পদতলে

নিষ্ক্রিয় শবমাত্র। মার্কণ্ডের চণ্ডী ও কালিকাপুরাণে দুর্গার কালীরূপ ধারণের কথা আছে। এই কালীতন্ত্রের দেবী এবংবাঙালীর নিজস্ব। শ্যামা মূর্তির প্রথম কাব্যিক প্রকাশ বোধহয় দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয় কাব্যে। অসুর বধ-নিরতা দেবী কালিকার প্রলয়নৃত্যে যখন পৃথিবী কম্পমান, তখন দেবতাদের সাহায্যার্থে শিব এলেন, 'এত বলি মহাদেব উলঙ্গ হইল। সংগ্রামের রনস্থলে শবরূপে গৈল॥ রনস্থল যুড়ি শিব শবরূপে পড়ে। সমর করেন কালী তাহার উপরে॥ কালিকা হইল শিবশবেত বাহিনী।' তখন সৃষ্টি রক্ষা পেল। উত্তর বাঙলার শবাসনা কালী তন্ত্রের ত্রিপুরভৈরবীর সঙ্গে মিলে হলেন 'শ্যামা'। বাঙালী কবি তখন তাঁর ছবি আঁকল ২৪। শাক্ত পদাবলীতে তার চূড়ান্ত প্রকাশ, 'তুষার ধবলহ্রদে নীলিম নলিনী। হরহৃদিমাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥··এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী। ভ্রমরভ্রমে বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে॥ ··কে ও বিহরে হরহৃদিপরে হর মন ওরে মোহিনী।' পাঁচালী ও কবিগানে এর অনুসরণ দেখি অনুপ্রাসব্যঞ্জিত চরণে।

ইয়ুং শ্যামার আলোচনা না করলেও সমজাতীয় সাধনার বিশ্লেষণ করেছেন। এর অন্যতম কারণ তিনি দিয়েছেন—'মৃত্যুভীতি'। শিব মৃত্যুর দেবতা; গাজনে কালিকাপাতা ও মশাননৃত্যে শবনৃত্য হয়, তন্ত্রসাধনায় শবসাধনা আবশ্যিক অঙ্গ। অর্থাৎ মৃত্যু ও শবদেহ সম্পর্কে আদিম ভীতিতে যেমন শ্মশানচারী দেবতার রূপভাবনা, তেমনি দেবীর চরণতলে শবের কল্পনা করা হয়েছে, যে শব পরে হলেন শিব। ঐ শিব-শবত্ব লাভই হল সাধকের লক্ষ্য, ভয়কে জয় করার সাধনা, মৃত্যু তখন অমৃতের দ্বার। ইয়ুং আর একটি ব্যাখ্যায় বলেছেন, সন্তানের চৈতন্যোদয়ে 'মাতৃকাম' বিসর্জন দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। এর জন্যে ব্যক্তিসত্তাকে বিহিত ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে বিধিবন্ধনের অতীত হতে হয়। মাতৃসকাশে তাই আত্মবলিদান বিধেয়—'মিথ্র' বলি দেন আত্মসদৃশ বৃষকে, যীশু আত্মদান করেন ক্রুশে। আমাদের দেশে কোচ ভক্তরা আত্মোৎসর্গ করত। এই পথে সন্তান-সাধক মাতৃকাম-বিরহী হয়ে নতুন শক্তি লাভ করে এবং প্রলয়ংকরী মার সঙ্গে মিলিত হয় ২৫। এই দৃষ্টিতে দেখলে, শিবও সাধকের মতই যোগী সন্তান; তাঁর শবত্ব হল আত্মবলিদান, জ্ঞান হল মুক্তির উপায়; তাঁর শবদেহের ওপর বিরাজমানা যিনি তিনিই—destroying terrible mother।

আধুনিক মানসিকতা দিয়ে অতীতের মনোবিচারে যতটুকু ত্রুটি থাকা সম্ভব, ইয়ুং-এর ব্যাখ্যায় তা অপ্রতুল নয়। 'ধর্ম ও নীতির বিশ্বকোষে' বলা হয়েছে: **Everywhere is she unwed, but made the mother first of her companion by immaculate conception, and then of the Gods and all life by the embrace of her own son. In memory of these original facts, her cult is marked by various practices and observances symbolic of the negation of true marriage and**

obliteration of sex. A part of her male votaries are castrated। শ্যামা মূর্তিকে তাই বলা হয়েছে 'বিপরীতরতাতুরাম্।' এই 'বিহার' কর্ষণ-প্রজননের দেব-দেবীদের অন্যতম লক্ষণ। এক্ষেত্রে তাকে বিপরীতরূপে দেখা এবং শিবরূপ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অসিরিস ও নীললোহিত লিঙ্গচ্ছেদী। এবং নপুংসকত্ব ও মৃত্যু একই কৃষিভাবনার এপিঠ-ওপিঠ।

কালীর রূপ-পরিকল্পনার মূলে বাঙলার বিচিত্র প্রকৃতি এবং সমকালীন রাষ্ট্রনীতির অবদানের বিস্তৃত উল্লেখ করেছেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে। মহাকাল রুদ্রশিবের ভয়ংকর রূপগুণ নিয়ে 'ডান হাতে তাঁর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।' অন্যান্য মাতৃকা যখন শিবের কর্ত্রী হবার জন্যে ব্যস্ত, কালী তখন শিবমঞ্চোপরে আরোহিতা হলেন। বাঙলার সমকালীন রাজনৈতিক বিপর্যয় ও শক্তিদ্বন্দ্বে নিরাসক্ত শিব ক্ষমতালোলুপ সামন্ত এবং নিপীড়িত জনগণের উপাস্য হতে পারেন না, শক্তিদেবীই তখন তাঁদের আদর্শ। তাই ইয়ুং যখন বলেন, In the work of agriculture hunger and incest intermingle, তখন তিনি আমাদের অভিমতকেই সমর্থন করেন যে, কৃষি ও প্রজনন ভাবনা সহজাত এবং বস্তুজাগতিক পরিপার্শ্ব থেকে মানবমনে ভাবের সঞ্চার ও তার প্রকাশ হয়। কালক্রমে ভিন্ন সমাজের সদৃশ কল্পনার সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে এই ভাবনা বিবর্তিত হতে থাকে এবং জটিল হয়ে ওঠে সামাজিক ধার্মিক প্রাকৃতিক ইত্যাদি বাস্তব কার্যকারণের প্রভাবে। এদিক থেকে শিবশিবানীর সদ্য আলোচিত ত্রিধা সম্বন্ধ-নির্ণয়ের একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা বোধহয় অসম্ভব ও অবান্তর হবে না।

পিতৃতান্ত্রিক আর্য মনন বহুদিন মাতৃতান্ত্রিক অনার্য মনকে প্রশ্রয় দেয় নি; কিন্তু কালক্রমে স্বীকৃতি দান করতে হল। বিপর্যস্ত সংঘাতের দিনে সংস্কৃতির দ্রুত সম্বন্ধবন্ধন অবশ্যকরণীয়। তাই শিবের সঙ্গে শিবানী যুক্ত হলেন নানাভাবে—ভগ্নী-স্ত্রী-মাতারূপে; আর্যেতর ভাবনায় এই বিবর্তন হল মাতা-ভগ্নী-স্ত্রীরূপে। যখন আর্য-অনার্যের মিলন হল নিবিড়তম, তখন দুজনে মিলে একদেহমনপ্রাণ অর্ধনারীশ্বর। ক্রমে অনার্য সংস্কৃতি প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল, রুদ্রের হল শিবত্বপ্রাপ্তি এবং শিবানীর রৌদ্ররসবৃদ্ধি; আর্যেতর ভাবনা আর্য কল্পনার ওপর প্রভাব বিস্তার করল। তখন শিবের বক্ষে বিহার করলেন শ্যামা, অন্নপূর্ণার কৃপার্থী হলেন সর্বত্যাগী শংকর। আর্য মানস শবরূপে তাঁর পদলীন হল, অনার্য মানস হল তার অধীশ্বরী। বাঙালী ধর্মে সাধনায় ও প্রতিমায় সেই পরিণামকে চিরন্তন করে রাখল, তাকে রসরূপ দিলেন কবি শাক্ত পদাবলীর সাংগীতিক আধারে। শিব ও শ্যামা তখন একদিকে দর্শনের তত্ত্ব ও তন্ত্রের সাধ্য, অন্যদিকে সংসারের ও সন্তানের পিতামাতা।

রুদ্রশিবের জীবনে শিবানীর প্রথম আবির্ভাব তাঁর সঙ্গিনীরূপে, তারপর তিনি হলেন শক্তি, শেষে সহধর্মিণী। এরই মাঝে মাঝে তিনি হয়েছেন রুদ্রভগিনী-রুদ্রাণী-

শিবমাতা-স্নেহত্যাগব্রতা সতী-গৌরী-শ্যামা-শিবানী। অতঃপর দুজনে মিলে লীলাবিলাস, ক্রমে পুত্রকন্যাদের আবির্ভাব। তাঁর যাবতীয় প্রতীক তত্ত্ব দর্শন আখ্যান গার্হস্থ্য সংসারের বিভিন্ন উপকরণে রূপান্তরিত হয়ে মাঠ ও মন্দির থেকে ঘরে উঠে এল; গড়ে উঠল কথা ও কাহিনী, তথ্য ও সত্য, জীবনময়তা ও কাব্য-সৌন্দর্য, শিব-শিবানী হলেন সাহিত্যের উপাদান। আধুনিকপূর্ব বাংলা কাব্যের উপকরণ কর্মক্ষেত্র ও ধর্মক্ষেত্র থেকে আহৃত হয়েছে, বাংলা কাব্য উভয়ের মধ্যে সেতুরচনা করেছে এবং উভয়কে অতিক্রম করে এক স্বতন্ত্র সমন্বিত স্বপ্নময় মায়ার জগতের সৃষ্টি করেছে—সে জগৎ লৌকিক পৃথিবীর ও অলৌকিক প্রতিভার, বাস্তবের ও কল্পনার, সত্যের ও শিল্পের। সেখানে শিব দেবতা হয়েও মানুষ, তাঁর গীতি প্রণয় ও পরিণয়গাথা। যে আনুষ্ঠানিক আখ্যায়িকা মাঠে ফসল ফলাত, বনে পশু ও ঘরে সন্তান দিত, সে এখন মনে ফুল ফোটায়, দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, বেদনাকে করে সহনীয়। শিব-কথা এখন আর কৃত্যব্রতকথা নয়—কল্পনার বিকাশ, শিল্পবোধের প্রকাশ, রসাত্মক কাব্য এবং শিব-শিবানী সংসারভারপীড়িত কান্নাহাসির দোল-দোলানো চিরকালীন মানব-মানবী। 'কাব্যে মানবশিব' এই অভিনব জন্মান্তরের জাতকপত্র।

গ। কাব্যে মানবশিব

জীবনের ধর্ম হল সে কেবলই রূপবদল করে, সাহিত্যের ধর্ম হল সে কেবলই জীবনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে। আদিম মানবের কর্মভূমিতে যখন কাব্যের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল, তখন তার কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। সমাজের প্রয়োজন ও সমাজের প্রবোজনায় সমষ্টিগতভাবে সৃষ্ট যে জাদুকৃত্য, কাব্য ছিল তার একটি প্রত্যঙ্গ মাত্র, কর্মের সিদ্ধি এবং সম্পদবৃদ্ধির অন্যতম উপায়-উপকরণ। তথাপি কাব্যসাহিত্য শিল্প; জন্মলগ্নেই তার এই স্বকীয় বিশিষ্টতা আভাসিত হয়ে উঠেছে, কৃষিকথায় স্ফূর্ত হয়েছে মানবতা। পরবর্তীকালে ধর্মের আবির্ভাবে কাব্য হল তার অনুগত দাস 'শাস্ত্র'। আবার এরই পাশে কাব্যের স্বকীয় শিল্পরূপও বিকাশ লাভ করল ধ্রুপদী সাহিত্যরূপে; মধ্যযুগে যখন ধর্ম ও শাস্ত্রের অতি-চাপ, তখনও রচিত হয়েছে ধর্ম-সাহিত্য। অবশ্য ধ্রুপদী সাহিত্যও ধর্মবিচ্ছিন্ন নয়, যেমন শাস্ত্রগুলি নয় কাব্যত্ববিহীন। তথাপি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। শাস্ত্র অধ্যাত্মমুখী, জীবনের কথাকে সে দৈব কথায় রূপান্তরিত করতে চায়; সাহিত্য শিল্পাদর্শের অভিমুখী, সব কথাকেই সে রূপায়িত করে জীবনের সাদৃশ্যে কল্পনার সৌধমূলে। সৃষ্টির এই পালাবদলে সাহিত্যের এবং সেই সঙ্গে দেবতার লীলাবদল ঘটে। কৃত্যব্রতকথা একদিকে শাস্ত্রকথায় পরিণত হয়, অন্যদিকে উপকথা-দেবকথার স্তর পেরিয়ে উন্নীত হয় বিশুদ্ধ কাব্যলোকে। কৌম বিশ্বাসে সূর্য-শস্য ইত্যাদি হয় প্রাণময় জীবন, পৃথিবী-নারী প্রকৃতি অপ্রাণ প্রমথিনী; ধর্মবিশ্বাসে প্রমথ হয় দেব, প্রমথিনী

দেবী ; ধ্রুপদী সাহিত্যে তাঁরা দেব-দেবী হয়েও মানব-মানবী, ধর্মসাহিত্যে তাঁদের দেবত্ব-মানবত্ব তুল্যমূল্য। কাব্যের যতটুকু ধর্মের সীমানায় ততটুকুই তাঁরা দেবতা, তার নিজের এলাকায় তাঁরা মানুষ—ভালোমন্দ আশানিরাশায় ভরা প্রাণবন্ত চরিত্র। পুরাতন কাহিনী থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে, নতুন কাহিনী রচনা ক'রে কবি দেবতার রূপে গুণে চরিত্রে আরোপ করেন পার্থিব দোষগুণ প্রেমপ্রীতি আনন্দবেদনা। দেবত্ব ও মানবত্বের এই সমাহারে প্রাগাধুনিক কাব্য মিশ্র শিল্প, তার আস্বাদনও মিশ্র। কালপ্রবাহে সাহিত্য ধর্মকে অতিক্রম করে, পরিণত হয় স্বতন্ত্র স্বকীয় শিল্পে ; তাতে তখন থাকে শুধু কাব্যত্ব ও মানবত্ব, থাকে বাস্তব কামনাস্বপ্নের পুষ্পিত অভিব্যক্তি আর তার আলম্বন বিভাব নায়ক-নায়িকা। প্রাগাধুনিক সৃজনীশিল্পে যে মানবতার প্রকাশ ইঙ্গিতে, আধুনিক কলার তা-ই একমাত্র সঙ্গীত।

সাহিত্য ও দেবতার এই রূপ-বিবর্তনের পশ্চাতে পরিবর্তনশীল সমাজের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া যেমন বিদ্যমান, তেমনি আছে শিল্প ও শিল্পীর স্বাক্ষরও। আদিম মানবের শিল্পসৃষ্টির কৌশল ছিল অনুকরণ, পরে এল কল্পনা, সুবিহিত রীতি-পদ্ধতি দেখা দিল। সমাজের প্রয়োজনে আত্মসমর্পিত তখনকার মানুষের স্ব-তন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা সচেতন শিল্পবোধ ছিল না ; কিন্তু কৃত্যের বিভিন্ন অঙ্গগুলির উপাদান সংগ্রহ, নির্বাচন, অনুশীলন এবং কর্মক্ষেত্রে সেগুলির বিধিমত প্রয়োগ—এ সবের জন্যেই প্রয়োজন ছিল শিল্পবোধের। সংগ্রহ থেকে প্রয়োগ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটির মূলে ছিল 'রূপান্তর-প্রক্রিয়া'। ত্রিমাত্রিক বাইসনকে পাহাড়ের পটে দ্বিমাত্রিক চিত্রে ফুটিয়ে তোলা, চতুষ্পদী জীবের দেহছন্দকে দ্বিপদী মানবশরীরে নিয়ে আসা, অথবা নির্জীব লাঙ্গলকে সজীব মানুষের মধ্যে রেখায়িত করা—শিল্পের এই রূপান্তরণ কেবলমাত্র সহজাত অনুকরণ দ্বারা সম্ভব নয়, তার জন্যে চাই সক্রিয় শিল্পিমন। আদিম মানবের তা ছিল, তবে একজন-দুজনের নয়, সমগ্র সমাজের, সচেতন নয়, অবচেতন। কালক্রমে অনুকরণ ও শিল্পবোধের বিবর্ধন হয়েছে, শিল্পরীতি সুবিহিত হয়েছে, ব্যক্তির চিত্তে জেগেছে ব্যক্তিত্ব বাস্তবচেতনা এবং কল্পনাবৃত্তি। কাল কলা ও কলাবিদের নিরন্তর সহযোগে সাহিত্য উপনীত হয়েছে আদিম প্রস্তরযুগ থেকে ধ্রুপদী ও মধ্যযুগে, সেখান থেকে আধুনিক যুগে। সে এখন একটি বিশিষ্ট ও মৌল শিল্প, বস্তুভূমি থেকে আহরণ করে প্রাণরস, কল্পনার ফুলে রচনা করে সত্যের সুন্দরের স্তব নিজস্ব রূপে রীতিতে।

সাহিত্যের বিবর্তনের এই ইতিহাসটি ধরিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : 'এককালে যে কাহিনী ছিল কৃষিরক্ষা ও কৃষিপ্রচারের জয়গান, পরবর্তীকালে সেই রামায়ণ কাহিনীই বিশেষভাবে গৃহধর্মনীতির মহিমাকীর্তনরূপেই বিকাশ পেয়েছে' ১। শুধু রামসীতার আখ্যান নয়, প্রাচীন দেবতা এবং দেবকথার মধ্যেই এই পরিবর্তন লক্ষ্যগোচর হয়। সুবর্ণা ও সুবদন কামনার আদিম রূপক মিলিত করতে চেয়ে-

ছিল দূরব্যবধানের সূর্য ও পৃথিবীকে। সেই কামনা শিল্পরূপ পেল প্রমথ-প্রমথিনীর বিবাহ-কথা এবং নর-নারীর মিথুন-অভিনয়ের মাধ্যমে। ধর্ম এই প্রয়োজনের জগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারল না কিন্তু মিথুন-ভাবনাকে পরিণতি দিল দার্শনিক মিথুনতত্ত্বে, দেবদেবীর নিত্যমিলন-নিত্যবিরহ হল সাধকের আরাধ্য বিষয়। সাহিত্য ধর্মের সহগামী হয়েও জীবনের অনুগমন করল; অধ্যাত্ম তত্ত্বকে সে পরিত্যাগ করল না কিন্তু দৈব মিথুনতত্ত্বকে নিয়ে এল মানবিক প্রণয় ও পরিণয় কলায়, অভিযানে অথবা অভিসারে; দৈবলীলা হল প্রেমধর্ম ও গৃহধর্মের লীলায়িত চিত্র। সে ছবির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'রঘুবংশম্' ও 'কুমারসম্ভবম্'—একই কবির দুটি কাব্য, দুটি কাব্যের একই তত্ত্ব: জায়া-জননী-বাদ। যে কামনা ছিল শস্য শিশু ও শাবককে ঘিরে, তা এখন শুধু শিশুকে অবলম্বন করে সংবৃত ও আদর্শায়িত।

বাঙালীর সংস্কৃতিচেতনায়ও এই অগ্রস্থতির লক্ষণ স্ফূর্তিলাভ করেছে, অবশ্য হুবহু আর্যভারতীয় পন্থায় নয়। কৃষিকথা পরিণত হয়েছে ধর্মকথায়, স্বর্গখণ্ডের পাশে এসেছে মর্ত্যখণ্ড, অতীন্দ্রিয় ভাবে ইন্দ্রিয়ভাবনার স্পর্শ। ক্রমে ইন্দ্রিয় হয় ইন্দ্র, মর্ত্যজগৎ স্বর্গরাজ্য অধিকার করে, দেবতা এবং তাঁর আখ্যান রূপ নেয় নন্দনী প্রেমলীলার। প্রাগাধুনিক বাঙলার জনপ্রিয় দেবতা রাধাকৃষ্ণ ও শিব-শিবানী একদিকে ধর্মধৃত, অন্যদিকে কাব্যধৃত: একটি বিবাহবাসরে বৈধী মিলন, অন্যটি লীলাভিসারে রাগাত্মিকা মিলন; একটি নির্বাধ ও সমাজসম্মত, অন্যটি অসামাজিক ও বাধাকণ্টকিত। সাহিত্যরসসমুদ্রে দেখা দিল দুটি বিপরীত রতি—স্বকীয়া ও পরকীয়া, জননী ও প্রিয়া, দুর্গা ও রাধা: 'প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাহিরে' ২। রাধাকৃষ্ণ সর্বজনীন প্রেমের প্রতীক, শিবশিবানী দাম্পত্য আদর্শের সংকেত; একের আশ্রয় রূপকথার অসীম আকাশ, অপরের আশ্রয় গৃহকথার সসীম আঙিনা: 'হরগৌরী বিষয়ে বাঙালীর ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ে বাঙালীর ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে।...হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান ৩।' যাঁরা ছিলেন কর্মপ্রবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তির অবলম্বন, তাঁরা হলেন সৌন্দর্য ও হৃদয়ভাবের আলম্বন।

যে কাব্যের উদ্ভব কর্মক্ষেত্রে, বিকাশ ধর্মক্ষেত্রে, সে ধীরে ধীরে সরে এল মাঠ থেকে মঠে, শেষে মাটির ঘরে। দেব-দেবী জীবনসংগ্রামের রুক্ষ প্রান্তর থেকে উঠে এলেন হৃদয়দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম লীলায়, নীল আকাশের নীচে থেকে চার দেওয়ালের মাঝখানে। কর্মগীতি বা ধর্মগাথা নয়, কাব্যসাহিত্য তখন মানুষের-মানসের জীবনস্বপ্ন ও যৌবনস্বপ্ন, বাদলদিনের বাদলগান সাজ বদলে বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল।

আর্যভারতে রুদ্র-শিব উপনীত হয়েছিলেন দেবতাশিবে, বাঙালী তাঁর দেবত্ব ক্ষুণ্ণ না করে তাঁকে রূপ দিল মানবশিবের। তাঁকে আশ্রয় করে দাম্পত্যলীলা এবং

একটি সুন্দর গৃহচিত্র আকার লাভ করল, সে ঘরোয়া ছবি বাঙালীর। শিব হলেন প্রেমিক ও কামুক, কৃষক ও ভিখারী, মাদকসেবী ও ঔদরিক। ভিক্ষা তাঁর কপালের লেখা, স্ত্রীর গঞ্জনা জলের রেখা, পুত্রকন্যার জনতা মনের বোঝা; শিব-শিবানী জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত বাঙালী-বাঙালিনী, বৃদ্ধ স্বামী এবং তন্বী তরুণী ভার্যা। বাঙালী কবির সর্বাধিক কৃতিত্ব এইখানে, ধার্মিকতার মাঝে থেকেও শিবের এই নবরূপায়ণে। অবশ্য এই রূপান্তরের মূল ছিল শিবের নিজের মধ্যেই, তাঁর রূপ-গুণ-লক্ষণ ও কাহিনী এক্ষেত্রে সহায় হয়েছে; অন্যপক্ষে বাঙলার লৌকিক দেবতাদের মধ্যেও মানবতার বীজ ছিল। উভয়ের যোগে বাঙলার লোকশিব প্রথম থেকেই দেবতা ও মানবরূপে চিত্রিত হয়েছেন; কালপ্রবাহে মানবত্বের দিকটি ক্রম-প্রাধান্য লাভ করেছে; বাস্তব ও কল্পনা তাকে দিয়েছে শিল্পসুন্দরতা, যুগভাবনা দিয়েছে গতি। সেই যুগভাবনা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সত্ত্বেও বস্তুলগ্ন ও ইহমুখী।

বাঙালী মানসে লোকশিবের দ্বিবিধ প্রকাশ: তাঁর একটি রূপবিকাশ 'কাব্যে দেবতাশিব', আর একটি বিকশিত রূপ 'কাব্যে মানবশিব'। আমরা কর্মলোক ও দেবলোক পরিভ্রমণ করে এসেছি, এবার আমাদের যাত্রা মানবলোকে, মাটি ও আকাশের দেবতা থেকে ঘরের ও মনের মানুষে—যেখানে ভারতীয় মনন এবং বঙ্গীয় মানসের সমন্বয়ে এমন এক বস্তুনিষ্ঠ শিল্পপ্রমূর্তি, যা একান্তভাবে বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি ও সম্পদ, যার উত্তরসাধক আধুনিক বাংলা কাব্য।

অ। গৃহচিত্র: বেদ থেকে পুরাণ অবধি, মুজবৎ পর্বত থেকে কৈলাস পর্যন্ত সর্বত্র শিব গৃহবাসীরূপে চিত্রিত। বায়ু প্রভৃতি পুরাণে তাঁর গৃহস্থালীর খণ্ডচিত্র বিদ্যমান, মহাভারতে ও কুমারসম্ভবে দাম্পত্য আদর্শ চিত্রায়িত। অপরদিকে তিনি সংসারবিরাগী, ব্রাত্য, পথিকদেবতা এবং অন্তেবাসী। অধিকাংশ পুরাণে তিনি বিশ্ব-পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এবং ভিখারী। বাংলা কাব্যে শিবের এই শাস্ত্রসম্মত গৃহি-জীবনও যথাযথ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গৃহীর কর্তব্যের চেয়ে বৈরাগ্য ও ভিক্ষাচারের দিকেই যেন তাঁর আনুকূল্য অধিকতর। দেশের আকাশে-বাতাসে স্পন্দমান অনাসক্তি এবং ভিক্ষায় আসক্তির সুর বাঙালী শিবকে সর্বত্যাগী করেছে। তাই বাঙালী শ্রদ্ধার সহিত বলেছে 'নারী লইয়া করে কেলি, তত্ত্বে ত না রহে ভুলি' বা 'একমূর্তি না হএ শিব, জগত জনের জীব, সর্বভোগ করেন আহার।' এই যোগী-ভোগী বহুমূর্তি শিবের একটি বস্তুমুখী গৃহচিত্র ফুটিয়ে তুলেছে বাঙালী, যেখানে ধর্ম ও কর্ম এক হয়ে মিলেছে মর্মের গভীরে। এখানেই বাংলা কাব্যের স্বকীয়তা—শিবের শাস্ত্রীয় রূপকে জীবন ও সাহিত্যের সহায়ে সে লৌকিক করে তুলেছে, করেছে আত্মসমর্পণ।

দরিদ্র পরিবার। গৃহকর্তা হয় কৃষক নয় ভিক্ষুক। বিবাহের বাসনা আছে ষোল আনা অথচ উদর পূরণের ক্ষমতা নেই এক কানাকড়ি। আনুষঙ্গিক গুণেও

আমাটা। ওদিকে, কন্যা বড়ঘরের মেয়ে। তাকে পাত্রস্থ করতে হবে, গৌরী-দানের দুর্লভ পুণ্য অর্জন করতে হবে। নইলে সমাজধর্ম মানে না, মনও না। কৌলীন্যের দাপে সোনার বরণা কন্যাকে তুলে দিতে হয় বহুবল্লভ কুলসকল বৃদ্ধটির হাতে। বার্দ্ধক্যে তিনি স্বভাবতই কর্মে অপটু, শ্রমে বীতরাগ, মাদকে আসক্ত। ফলে পুরুষানুক্রমিক গুরুগিরি অথবা একপুরুষের ভিক্ষাচারে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মিলনের প্রথম মুহূর্তটি পর্যন্ত কন্যার মনে যে রোমাঞ্চশিহরিত সুখাবেশ, তা নিঃশেষে বাষ্প হয়ে উড়ে যায় শ্বশুরালয়ে পা দিতে না দিতেই। প্রাক্-বৈবাহিক প্রতিশ্রুত স্বপ্নের অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘরজামাই হয়ে নিশ্চিন্ত আরামের জীবন অতিবাহনে স্বামীর কোন আপত্তি নেই ; কিন্তু কন্যা ও তাঁর মাতা তাতে অসন্তুষ্টা, রোষাবিষ্টা। অতএব স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে গৃহরচনায় ব্যস্ত ও গৃহিণীতে মত্ত থাকতে হয়। তত্ত্বালোচনায় ও প্রেম-আলাপনে জীবনের প্রথম ভাগ স্বচ্ছন্দেই কাটে। কিন্তু ক্ষীয়মাণ ভাণ্ডারের নিত্য অভাব স্থায়ী সুখের মুখ দেখতে দেয় না। তার ওপর আছে স্বামীজির বহু স্ত্রী—সতীনকাঁটা ও সতীনকন্যা। 'যে জন শংকর পূজে নহে ধনহীন', কিন্তু শংকর নিজে নির্ধন। সতী-স্ত্রী দারিদ্র্যের তাড়নে পুত্র-কন্যার জ্বালায় বিব্রত হয়ে ওঠে। পরম ঔদরিক পতিদেবতার ও তাঁর কর্মহীন আত্মাদের আহার যোগান দিতে অন্নপূর্ণার ঝাঁপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। তার ওপর পর্বতপ্রমাণ সিদ্ধি বেটে বেটে হাতে কড়া পড়ে। তিনি ধনীর কন্যা, উচ্চবিত্ত সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন। ভিক্ষা করে স্বামী যতটুকু ঘরে আনেন তাতে ঔদরিক তৃপ্তিই হয় না, তায় আবার উদ্বৃত্ত থাকবে কোথায়, যা দিয়ে গৃহ ও গৃহিণী প্রসাধিত লাবণ্যে ঝলমল করবে! সুতরাং নিরন্তর কলহ-বিবাদের ছোট ছোট ঢেউ ওঠে জীবন-সরোবরে। স্বামীকে কৃষিতে প্রবৃত্তিদানের সানুনয় প্রয়াস মনের রুদ্ধ কপাটে আঘাত খেয়ে ফিরে ফিরে আসে। পতিদেব অধিকাংশ সময়ে ভাঙ ধুতুরা সেবন করে চক্ষুকর্ণ বুজে পড়ে থাকেন। সতীনারীর দুটি কল্যাণী হাতে একজোড়া চিকন শাঁখা পরার ছোট্ট সাধটুকুও অপূর্ণ থেকে যায়। ঘরে অভাবের ঝুলি ভরে না ; উদরের সঙ্গে মনও শূন্য থাকে। তদুপরি স্বামী আবার কিঞ্চিৎ বহির্মুখী, পরনারী-আসক্ত। অবশেষে গৃহিণীর নিরন্তর মুখরতায় 'বেবুদ্ধি দুখের হাওয়াল' বৃদ্ধ স্বামীকে কৃষিতে নামতে হয়। কিন্তু কোথায় বলদ কোথায় লাঙল কোথায় বীজধান? স্বামীস্ত্রীতে মিলে ধারধোর করে সংগ্রহ করা গেল। মাঘের শেষে কিছু বর্ষণ হল ; মাঠে ঘা পড়ল। সঙ্গীটি অমিতাহারী, ক্ষেতে মশা মাছি জোঁক, কৃষক নিজে আপনভোলা। তার ওপর আশপাশের বাগ্দিনী ডোমনী কোচনীদের প্রসাধিত প্রলোভন। ইত্তি-উত্তি ধান হয় আড়াই হালা, ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ কৃষক। তবু কিছুটা সচ্ছলতা আসে, দুটি নরম হাতে 'আজা উলী' ওঠে ; স্বামী স্ত্রীতে আবার মিলন হয়—'ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।'

তিনি স্বভাবতই 'বাউলমহেশ্বর', সংসারবিরাগী ও পথিকবৈরাগী, তিনি আবার

মেনে নেন অনলস কর্মহীনতাকে। কিন্তু ধনীর দুলালী মহেশ্বরী তা পারেন না। কথার পিঠে কথার ঢেউ ওঠে, মনকষাকষি হয়। বিবাদ ভঞ্জনের আশায় পথই হয় বন্ধু। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ওঠে, বেরিয়ে পড়েন রোদজলঝড়ে। পথে দুরন্ত ছাওয়ালরা বিরক্ত করে; কখনও ভিক্ষা মেলে, ঔষধ দিতে হয় বন্ধ্যা নারীদের, অনেক সময়ে কিছুই মেলে না। ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরতে হয় যে ঘর পেছনে ফেলে এসেছেন সেইদিকেই। এদিকে নিরুদ্দেশের যাত্রী স্বামীর সন্ধানে ব্যাকুলা স্ত্রী পথে পথে প্রশ্ন করেন, 'কেহ দেখল নগনা। ভিখিনা মগইতে বুল অঙ্গনে আঙ্গনা।' একসময়ে দুজনে দেখা হয়ে যায়। একজন প্রশ্ন করেন, 'কওনে ওলা উন্মত্ত হৈ তৈলোকনাথ'! আরজন স্মিতহাস্তে ভিক্ষার ঝুলিটি বাড়িয়ে দেন—অন্নদার চিরভিক্ষু অন্নদ। আলো জলে ওঠে ঘরে ও মনে। কিন্তু 'পাগলাশিবাই' নিজের স্বভাব ছাড়তে পারেন না। তাঁর সব আছে তবু কিছুই নেই; নেই প্রয়াস ও আয়াস, উদ্যম ও অধ্যবসায়। তাই ঘুরে ফিরে গৌরীর প্রশ্ন বেজে ওঠে, 'লক্ষ্মীছাড়া লোকের লক্ষণগুলি কেন!' নিত্য দারিদ্র্য ডেকে নিয়ে আসে নিত্য গঞ্জনাকে। পুত্র-কন্যারাও বিদ্রূপ করে। তার মধ্যে থাকে হাসিকান্না হীরাপান্না, থাকে ব্যঙ্গরস ও আদিরস, কোপোক্তি ও কটূক্তি। বাঙালী বৃদ্ধ যত বয়স বাড়ে তত রসিক, বাঙালী গৃহিণী যত বয়স বাড়ে তত মুখরা। সংসারের দুটি পাল্লা কিছুতেই সমান হয় না। একজন ঘরের কোণে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে, আরজন পথে পথে ডম্বুরা বাজিয়ে দিন কাটিয়ে দেন। ফলে দুয়ে মিলে এক হয় না। ঘরের দেওয়ালে ফাটল বাড়ে, মনে চিড় ধরে। স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ী যান, স্বামী পরদিনই সশরীরে হাজির হয়ে সবিনয় নিবেদনে ফিরিয়ে আনেন। ছেলেমেয়ের হাসিখেলায় গৃহ গৃহস্থ গৃহিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। দুদিন আলো, তৃতীয় দিন থেকে আবার অন্ধকার।

এমনি করে সুখে দুঃখে সময় বয়ে যায়। দিন কাটে, মাস যায়, বছর ঘুরে ঘুরে আসে। ছেলেরা বড় হয়, মানুষ হয়, মেয়েরা যায় পরের ঘরে। তখন চারটি দেওয়ালের মধ্যে শুধু দুটি মন। পরস্পরের খুব কাছে সরে আসে, ক্ষণে ক্ষণে ছুঁয়ে যায়। অল্প বয়সের মাধুর্য, মধ্যবয়সের প্রাখর্য আজ শেষ বয়সের স্থৈর্যের কাছে ম্লানদীপ্তি। নেই সেই বল্গাহীন উচ্ছলতা, কথায় কথায় রাগ-অভিমান, কাছে থেকেও দূরে সরে যাওয়া। আছে কেবল পাশাপাশি বসে নিঃশব্দ প্রতীক্ষা, গভীর সহানুভূতি, একান্ত নির্ভরতা। ঘরের একফালি আকাশে থেকে থেকে বড় মেঘ আর দেখা দেয় না; অতীতের ঝড়ো পাতার দিনগুলি স্মৃতিবহ; মাঝে মাঝে শুধু তার জীর্ণ মলাট খুলে চোখের সামনে মেলে ধরা। এখন কেবল সামনের পারানির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকা, মন দিয়ে মনকে ছুঁয়ে যাওয়া, দুজনের অগোচরে দুজনে মিলে স্বপ্নের জাল বোনা।

জীবনতরী এদিকে চলে এঁকেবেঁকে, সুখদুঃখের চিহ্ন রেখে রেখে—আদি

পর্ব থেকে মধ্য পর্বে, মাঝদরিয়া থেকে অন্তপর্বে, সেখান থেকে দিকসীমানাহীন অন্তবিহীন পারের অভিমুখে। জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না, জীবনদর্শন সত্য হয় না, জীবনসংগ্রাম শান্তিলাভ করে না, মধুময় হয় না এ পৃথিবীর ধূলি। এ চলার 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'; তাই সব বলেও 'কথার ফুরানি নাই।' এই অফুরান কথার চলচ্চিত্র বাঙালীর স্বকীয় সৃষ্টি, তার হৃৎপদ্মসম্ভব, তার জীবনের ও মনের রঙ ও রক্ত দিয়ে আঁকা।

আ। প্রেমিক: পুরাণে শিবের পত্নীপ্রেম নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে[৪]। সতীহারা শিবের ক্ষুব্ধ ছবিটি যুগযুগ ধরে ভারতমনে আনন্দবেদনার সৃষ্টি করেছে। কালিদাসের কুমারসম্ভবে শিবের এই প্রণয়ী রূপটি কাব্যসৌন্দর্যে বিলসিত হয়েছে। তন্ত্রের সামরস্যের ধারণার মূলেও শিব-শিবানীর প্রণয়কল্পার গভীরতা বিদ্যমান। অর্ধনারীশ্বরত্ব একদিকে আধ্যাত্মিক, অন্যদিকে প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যাগম্য। কবি এই যুগ্ম দৃষ্টিতে দেখেই বলেছেন, 'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ' এবং 'পড়ে যথা সতী অঙ্গ পীঠ সেই স্থান। সেই স্থানে ভব গিয়া করে অধিষ্ঠান'[৫]।

বাংলা কাব্যে স্ত্রী-ভীতি কিছুটা স্ত্রৈণ করে তুললেও শিবানী-বল্লভ শিবের প্রেমের গভীরতা প্রথমাবধি চিত্রিত হয়েছে। তাই অনুচরদের কাছে সতীর দেহত্যাগ সংবাদ শুনে 'লোটাইয়া কান্দে শিব মহির উপরে' (ক. চ.)। মনসামঙ্গলে কমল-বনে একাকী শিব চণ্ডীস্মরণে কাতর হন। মনসার কোপে চণ্ডী জ্ঞান হারালে 'বাতুল হইয়া শিব অতিশয় শোকে। উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়া ঘন ঘন ডাকে'[৬]। গোরক্ষনাথ পার্বতীকে প্রস্তরীভূতা করে রাখলে শিব বলেন, 'কথা গেল মোর নারী তুমি কি করিলা' (গো. বি.)। ধর্মমঙ্গলের সীমিত গণ্ডিতে শিবের প্রেমারতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘনরামে, দেবী পূজা নিতে মর্তে যাবেন শুনে শিব বলেন, 'সিদ্ধি গুঁড়া খেয়ে বুড়া পড়ে রবে ঘরে। তোর কি উচিত হয় ছেড়ে যেতে মোরে।' আর মাণিক গাঙ্গুলীর শিব প্রস্তাবটি শুনে 'চাহিয়া রহিল চিত্র-পুত্তলীর পারা।...ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করী কে দিবেক খেতে। ...বাঁচি নাই না দেখিলে বদন তোমার।' তবু যেতে দিতে হয়, 'যাও তবে এসো শীঘ্র গণেশের মা', ফিরে এলে 'এস এস বলি শিব বসান উল্লাসে'। আর ফিরতে দেরী হলে, 'ঐ দ্বারে বাজে ডম্বরু, হর বুঝি নিতে এল। নবমী না পোহাইতে অমান এসে দেখা দিল॥ ... বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে বসে মহাকাল। বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বার বার' (শাক্ত পদ)। শাক্ত পদাবলীতে শিবের প্রেমিক রূপে মিষ্টতা আনা হয়েছে, ব্রতকথার সর্বজনীন আসরে আরোপিত হয়েছে নির্বাধ সারল্য। ব্রতিনীর কাছে পতি হিসাবে শিব সর্বাগ্রগণ্য, দুর্গা যাঁর আদরের স্নেহপুত্তলিকা। ভর্জার আসরেও তিনি 'প্রেমভিখারি'[৭]। হরপার্বতী মঙ্গলে শিবের প্রেমিক রূপটি বড় মধুর: ছল ছল নয়নে জল। চল চল নন্দি তথায় চল॥ টল টল মন হইল শূলী। শোকে ঢল ঢল পড়িছে ঢুলি। তর তর তনু সতীর তাপে। থর থর স্থির মহেশ কাঁপে॥

দর দর দেহ দলিত প্রায়। ধর ধর ধৃতি ধরা কি যায়॥ লটপটজট ভূতলে লোটে। ফিরে ফিরে ফিরে ফুকরি উঠে॥ পড়িয়া রহিল প্রমথপতি। ভাবে ভোর ভুলে ভাবিয়া সতী॥ চর্যাপদে যে প্রেমের বীজ উপ্ত হয়েছিল, তার একটি নেমেছে পথে—বৈষ্ণব পদে, অন্যটি ফুটে উঠেছে ঘরে—শৈবপদে।

ই। কামুকঃ বাংলা কাব্যে শিবের 'কামতাপিত বিগ্রহ' প্রাধান্য লাভ করেছে। পুরাণে[৮] শিব 'কামভস্ম' গায়ে মেখে সকাম হয়েছিলেন। তিনি 'স্ত্রীলম্পট' নামে খ্যাত, দারুক বনে তাঁর ঋষিপত্নীদের পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়ক উদ্ভট কাহিনীও বিদ্যমান। এগুলি ঠিক কামাতুরতার চিত্র নয়। তবে 'কালিকা' প্রভৃতি পুরাণে শিবের বিস্তৃত সতী-বিলাপ তাঁর চারিত্রিক গাম্ভীর্য ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে কিছুটা লঘুতর করেছে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধ দেবদেবী ও সাহিত্যের মধ্যে কামায়নের যে ছবি মেলে, তন্ত্রসাধনা তাকে দেবাচারে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগের বাঙলায় যে কামাচার ছিল আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে, তার অনুরণন সমকালীন দেহ সাধনায়[৯] পরিস্ফুট হয়েছে। সহজিয়া সাহিত্যে হর 'কামবীজের' আশ্রয় নিয়ে দেবীর দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন এবং 'জগতে যতেক নারী তোমারই রূপ। পুরুষ যতেক দেখ আমার স্বরূপ'—শিবের এই তাত্ত্বিক উক্তি তাঁর কামপীড়িত হৃদয়টিকে ঢাকতে পারে না। যুগের প্রভাবই এর কারণ।

মুকুন্দরাম যখন বললেন, 'সেই দেব পশুপতি, তপস্বী পরম যতি, আঁখি মিলি নাহি চাহে নারী' ও 'মদনের শরে ঈশ্বত চঞ্চল শিব হইল অন্তর,' তখন পুরাণের দেবাদিদেব এবং কালিদাসের 'কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য' হরের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু ভারতচন্দ্রে মদনবাণের আঘাতে শিবের 'সিহরিলা অঙ্গ, ধ্যান হৈল ভঙ্গ, নয়ন মেলিলা হর॥ কামশরে ত্রস্ত, নারী লাগি ব্যস্ত, নেহালেন চারিপাশে।' মদনভস্ম হল, কিন্তু মদনারি 'বিবশ হইয়া, নারী তালসিয়া, ফিরেন সকল স্থানে।' কামে মত্ত হর অপ্সরা কিন্নরী দেবীদের পশ্চাৎ ধাবন করেন। অবশেষে নারদের মুখে উমার সমাচার শুনে শিব তখনই ঘটকালি করার জন্যে মুনিকে অনুরোধ করেন। এবং নারদের 'বর হয়ে কবে যাবা' প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আজি চল মোর বাবা।' শিব এখানে কামদহন কিন্তু কামজয়ী নন। তাই কবির কাছে রতিবিলাপের 'এই ফল বিরহীর শাপে।' শিবচরিত্রের এই প্রাকৃত রূপ দ্বিজ কালিদাসের 'কালিকামঙ্গলে' প্রতিচিত্রিত হয়েছে। তপস্বিনী উমার কাছে ছদ্মবেশী শিব যখন শুনলেন তিনি অবিবাহিতা, 'শুনে কহেন ত্রিপুরারি, আহা আহা মরি মরি, কি কথা কহিলে বিনোদিনী', এবং জানালেন, 'আমিও একাকী মোর নাহিক বনিতা।' কবি ছদ্মবেশী শিবকে হিমালয়ের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়েছেন। হিমালয়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে শিব বলেন, 'দেখে তর

গৌরীকন্তে, জামাই হবার জন্তে, তব পুরে হইল আগমন।' শুনে উমার পিতা ভৃত্যকে ডেকে বললেন, যোগীকে 'ধাক্কা মেরে করহ নির্গত' নইলে 'একটা চড় মেরে তোর কাঁথা বাঘছাল কেড়ে লব।' শিব মৃদু হেসে জানান, সব নাও, শুধু অনুমতি দাও 'কেবল হব জামাই'। অবশেষে গিরি তাঁকে কুন্দযন্ত্রে বেঁধে রেখে গঙ্গাস্নানে গেলেন। ধর্মমঙ্গলে শিবের কামুকতা লজ্জাবিরহিত। শিবানী বলেন, 'বুড়া ছেড়ে যুবা হও পেলে যার সঙ্গ। সেইখানে এই কথা উচিত প্রসঙ্গ' (ঘন); শিব নিজে বলেন, 'অঙ্গনার উলঙ্গে উলঙ্গ হয় গা' (মা. গা.)। মনসামঙ্গলে দেবসভায় নাতিনী বেহুলাকে দেখে যখন 'শিব বোলে সসিমুখি, তব রূপজৌবন দেখি, হৃদয়ে ফুটিল কামসর' (না. দে.), তখন সেই উক্তিকে বিশুদ্ধ রসিকতা মনে হয় না।

'শক্তিকাগমসর্বস্বতন্ত্রে' শিবের অন্যতম শক্তি কোচবধূ। স্কন্দপুরাণে (মাহেশ্বর ৩৫) শিবানীকে 'শবরী' বলা হয়েছে ১০। চর্যাপদধৃত কায়সাধনায় শবরী ডোম্বী ইত্যাদি সাধনসঙ্গিনী গ্রহণের কথা আছে। কোচদের সঙ্গে শিবের ঘনিষ্ঠতা তাঁর কোচনীসংস্পর্শের কারণ। বাংলা কাব্যে শিবের কোচনীগমন-প্রসঙ্গ প্রায় সর্বত্র উল্লিখিত হয়েছে। মুকুন্দরামে কোচবধূ শিবকে ভিক্ষা দেন মাত্র; অন্যত্র চিত্রগুলি কামব্যাকুল শিবের চরিত্রায়ণ। কালিকামঙ্গলে, 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভব ভাবিয়া চিন্তিয়া। রসের কুচনীপাড়ায় উত্তরিল গিয়া॥ কৃত্তিবাসে হেরি যত কোচের ঘরণী। বুড়া আইল বলে হেসে তোষে সব ধনী॥ কোন ধনী কহে ওহে রসিকের চূড়া। আমার সভা ভুলে কোথা ছিলে ওহে বুড়া॥ তোমারে না হেরে বুড়া মনোদুঃখে মরি। এত বলে হেসে ঢলে পড়ে সব নারী॥' কোচরমণীরা তাঁকে মালা পরায়, চন্দন দেয়, চরণসেবা করে ১১। বরিশালের 'শিবের গানে' শিব গৌরীকে বলেন, 'কুচনী নগরে আছে তোমার বাপ ভাই।' মনসামঙ্গলে গৌরী ডোমনীরূপে পদ্মবনগামী শিবের পথরোধ করেন; পারানির কড়ি নিয়ে বিতর্কের ঢেউ ওঠে, 'ডোমনী বলিল তুমি কেবল বর্বর। সহজে জেনেছি তুমি প্রধান ভাঙ্গড়॥ ভাঙ্গা নৌকা দেখ মম ভাঙ্গা কেরবাল। এ হাতে না করি পার ভাঙ্গড় মাতাল' (বাইশ-কবি মনসা)। নৌকায় উঠে 'কামবাণে মহাদেবের না ধরে পরাণি॥ সিবে বোলে সুন সুন সরুয়া ডুমনি। থাকি থাকি দেখি যেন স্বরূপ ভবানি। তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর। আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর।' অবশেষে উভয়ের মিলন হয়, কখনও-বা হয় না। রামেশ্বরের শিবায়নে দুর্গা বাগ্দিনী রূপ ধারণ করে স্বামীকে ছলনা করেন। রূপমুগ্ধ শিব বলেন, 'তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে সয়া বুড়া বহুদিন আছিহ তোমার সই ছাড়া॥ হেঁসে হেঁসে ঘেঁসে ঘেঁসে ছুঁতে যান অঙ্গ বাগ্দিনী বলে আইমা এ আর কি রঙ্গ॥......পরের রমণী পিরীতের তরে মরি প্রেম করে তাকে তো পরাণ দিতে পারি॥ অতঃপর আলিঙ্গনে অনুকূলা হও বাগ্দিনী বলে সয়া বিদগধ নও॥ কলেবরে কাদাগুলা ধুয়ে আসি আমি।

ততক্ষণ বাসর নির্মাণ কর তুমি।' কিন্তু অঙ্গুরী আদায় করে বাগ্‌দিনী তথা শিবানী ততক্ষণ হিমালয়ে ১২।

কোচনী ডোমনী বাগ্‌দিনী ইত্যাদি পালায় শিবের এই আসক্তির ছবি তাঁর কামবিজিত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। তাই নাথসাহিত্যের মীননাথের কদলীনারী এবং কৃষ্ণের গোপিনীদের মত শিবের কোচনীর সংখ্যা ষোলশত (এই সংখ্যাটির ব্যবহার বাংলা কাব্যে কৌতূহলজনক ১৩)। বাঙালী কবির লেখনী এই বিষয়ের রচনায় সমধিক স্ফূর্তি লাভ করেছে। তাই দুর্গার মুখ দিয়ে বলান হয়েছে, 'তোমার চরিত্রে প্রাণ পোড়ে কহিতে ফুরানি নাই।' আর শিব বারবার প্রতিবাদ করেন, 'এসব ইঙ্গিতে খোঁটা সকল কথায়।' কিন্তু সে প্রতিবাদ সেদিনকার বাঙালীর মনে গিয়ে পৌঁছয় না। তাই পাঁচালী ও কবিগানে তাঁর মাধুকরীবৃত্তির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

ঈ। মাদীক: বেদে সোমলতা ও রুদ্র দুজনেই মূজবৎপর্বতবাসী। সোম বা চন্দ্র শিবের ললাটে স্থিত। বেদের নীলকণ্ঠ-শিব পুরাণে সমুদ্রবিষ পান করেন। ভাগবতে ও শিবপুরাণে তিনি হাটকরসসেবী। তন্ত্রাচারে মাদকসেবন ধর্মসাধনার অঙ্গ। ওরাওঁ সাঁওতালদের প্রধান দেবতা প্রথম নরনারীকে হাঁড়িয়া উপহার দেন। এই জাতীয় বহুর যোগাযোগে বাঙলার শিব হলেন গঞ্জিকাসেবীদের উপাস্য ত্রিনাথ ১৪, এবং স্বয়ং ভাঙ্গ ধুতুরা সেবী 'সিদ্ধিতে নিপুণ।' অনেকের ধারণা, মিশরের 'রা' সর্পবিষসহ শিবের সঙ্গে মিলিত হন ১৫। ব্যাকাস অসিরিস প্রভৃতির সঙ্গে মদ্যের যোগ আছে। কৌম সৃষ্টিতত্ত্বে কৃষি ও মদ ঘনিষ্ঠ, কৃষির দেবতা মদ্যেরও দেবতা। শিব কৃষিদেব, তাই মদ্যদেব। কালের প্রবাহে ও কাব্যের প্রবাহে মদ্য-দেবতা হলেন মদ্যপ-দেবতা; ধুতুরা তাঁর পূজার উপকরণ, দেহের অলংকার ও সেব্য বস্তু।

বাংলা কাব্যে শিবের 'বিস' বা সিদ্ধিরস সেবন সিদ্ধরস হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত পৈঙ্গলে, 'বাল কুমার ছঅ মুণ্ডধারী। উবাহহীন মুই এক্ক নারী॥ অহংনিসং খাই বিসং ভিখারী। গঈ ভবিত্তী কিস কা হামারী।' বিদ্যাপতির উমা বিলাপ করেন 'বসহ চঢ়ল বুঢ় আবে। ধুথুর গঞ্জাএ ভোজন হনিভাবে॥......পীসলা ভাঁগ রহল এত গতী। কঁথি লই মনাএব উমগাজতী।' রামেশ্বরের 'শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কি। কক্কা উড়ে ভাঙ্গ বিনে ভেকা হয়েছি॥ পার্বতী বলেন প্রভু পারি নাহি যাও। পুড়া ভেঙ্গে গুঁড়া সিদ্ধি ফাঁকি করে খাও॥ গৌরী সে গর্গরী হৈতে গড়াইল জল॥ গাঁজাঝাড়া তাজা ভাঙ্গ ভিজাইয়া তাকে। মহিষমর্দিনী মধ্যে দিল মুণ্ডিটাকে॥ হিণ্ডীর সমীপে চণ্ডী দিল হাণ্ডী ভরি। ছাঁকে আকে বাপে পোয়ে বস্ত্র ধরি।' ধুতুরা মরীচ লবঙ্গ দুগ্ধাদি সহযোগে সিদ্ধি প্রস্তুত হল, 'রাশি রাশি তাল তাল পর্বত প্রমাণ। গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্রলমান।' পান করে সিদ্ধিনাথ 'হুঙ্কার ছাড়িয়া বসে মগন হইয়া।' পুরাণ 'নীলকণ্ঠের' ব্যাখ্যা দিয়েছিল সমুদ্রবিষপায়ী,

তা থেকে হলেন মাদকসেবী। ভক্ত কবি তাকে গেঁথে রাখলেন গীতাকারে : ভাঙ্গবিভোলা ভোলানাথ ভোলা ভূতসাথ নাচিছে। ডিমিকি ডিমিকি রাম রবে মধুর ডমরু বাজিছে॥ ধুতুরা পানে আঁখি ঢুল ঢুল, কর্ণে শোভে ধুতুরারি ফুল, কটিতটে বাঘছাল দুকুল দুলে দুলে খসে পড়িছে॥ বামে বিরাজেন বিশ্বমাতা, সে যে কিরূপ তার কি কব কথা, রজতাচলে হেমলতা জড়ায়ে যেন জ্বলিছে ১৬।

উ। **ঔদরিক :** সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ঔদরিকতা এবং বাঙালীর ভোজনপ্রিয়তার সংমিশ্রণে শিবের ভোজনব্যাপারও বাংলা কাব্যের অন্যতম পালারূপে বিবেচিত হয়েছে। ভিক্ষা করে এনে পরদিন শিব সকালে উঠেই গৌরীকে আহারের এক দীর্ঘ তালিকা দিলেন। কিন্তু দেবী জানালেন, ঘরে চাল বাড়ন্ত। শুনে শিব মহাক্রুদ্ধ, 'আমি ছাড়ি ঘর, জাব দেশান্তর, কি মোর ঘর করণে (ক. চ.)। মাণিক গাঙ্গুলীতে এই একই ছবি ভিন্ন আধারে : একাদশীর উপবাসান্তে কৃষ্ণসেবক-শিব পারণ করবেন, 'ক্ষীণ দেহে ক্ষেমঙ্করি ক্ষুধা নাহি সয়। শাক স্থক্ত যা হও সকাল যেন হয়॥ বুড়াটির বচনে বারেক দিবে মন। ভাল হয় কিছু হলে রসাল ব্যঞ্জন।' ঘরে অন্নাভাব শুনে তাঁর বুদ্ধি লোপ পেল, 'কয়ে কথা কষ্ট দিলে কার্তিকের মা'। ভারতচন্দ্রের শিবের ভোজনবিলাসও শেষ পর্যন্ত এই 'কষ্টে' পরিণত হয়। তাঁর 'সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই' কিন্তু চণ্ডী-গৃহিণীর কৃপায় সে সাধ পূর্ণ হয় না। 'বুড়াটির বোল' শুনে উমার ক্রোধ হল। তিনিও উত্তর দিলেন, এয়োস্ত্রীর প্রয়োজনীয় প্রসাধনটুকুও তাঁর ভাগ্যে জোটে না, 'করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে। তেল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥......বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু। ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপসিদ্ধি লাড়ু।' তার ওপর 'দামাল ছাবাল দুটি, অন্ন চাহে ভূমে লুটি—' গণেশ সিদ্ধিপানে দক্ষ, কার্তিক ওড়ান ময়ূর। অভিযোগ-প্রত্যভিযোগের শেষে 'যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই, কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া' ভেবে শিব বৃষে চেপে গৃহত্যাগেন ভিক্ষায় বেরিয়ে গেলেন। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন রচনায়ও ১৭ শিবের এই ভোজনপালা অনুকৃত হয়েছে। প্রাতঃকালে উঠে কার্তিক গণেশকে দুপাশে নিয়ে স্বস্তিক আসনে বসে 'প্রিহি বলিঞা ডাক দিলেন শঙ্কর।' কৃতাঞ্জলি হয়ে দুর্গা এলে বললেন, 'সকালে ভোজন করি আজি থাকিব বিশ্রামে॥ নিমে সিমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তুত। আজি গণেশের মা রান্ধিব মোর মনমত।' তারপর মুখরোচক রান্নার ফর্দ দিলেন, 'ভোজনশেষ আর হাঁড়ি দশখির।' রামেশ্বর-শিবের ভোজনের বর্ণনাটি সুন্দর : 'তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি। তিনজনে একুনে বদন হইল বার। গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥ তিনজনে বারমুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥ সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে। অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্তি হাঁকে॥ কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা॥ হাসিয়া অভয়া

অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সুপ দিল বেসারির পরে॥ চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর। রণ রণ কিঙ্কিনী কঙ্কন ঝংকার। শেষে আহার সমাপ্ত, গণ্ডূষ করারও ক্ষমতা নেই। তখন 'হুট করে হৈমবতী দিতে আনে ভাত। শার্দ্দূল ঝম্পনে সবে আগুলিল পাত।' শিব উমার প্রশংসা করে ধন্যবাদ দেন, 'আচমন মুখশুদ্ধি সারি সুত সনে। সন্তোষে বসিলা শিব শার্দ্দূল অজিনে।' হিমালয়গৃহে সপুত্র শিবের ভোজনের পর 'কন্যা পুত্র দুদিকে পর্বত মধ্যভাগে। গৌরীকে গৌরব করি দিয়াইল আগে॥ যত্ন করি জনকজননী দুইজন। পূর্ণ করি পার্বতীরে করাইল ভোজন।' তারপর হররমণীর শৃঙ্গারসজ্জা বাসরশয্যা ও চিরকালের জন্যে মিলন, 'যদংশেতে প্রকৃতি পুরুষ ত্রিভুবন। পূর্ণব্রহ্ম বিহার বর্ণিবে কোন জন।'

উ। বিতণ্ডিন: পুরাণে শিবদুর্গার বিবাদ অপ্রতুল নয়। দক্ষগৃহে গমন ব্যাপারে[১৮], পার্বতীর পুত্রকামনায়[১৯], শিব কালীকে কৃষ্ণা বলাতে[২০] এবং দুজনের পাশাখেলাকে কেন্দ্র করে[২১] সাধারণত কলহ বেধে উঠত। সংস্কৃত সাহিত্যে উপাসনা, প্রণয়, বেশভূষা, বাহন ইত্যাদি ছিল বিবাদের মূল। বাংলা কাব্যে এ ছাড়া আরও অন্যান্য ব্যাপারকে আশ্রয় করে দুজনের মধ্যে বিবাদের সূচনা করা হয়েছে। শিবের দারিদ্র্য বার্দ্ধক্য কুরূপ লাম্পট্য উভয়ের দাম্পত্য-সম্বন্ধের পথে বিরাট বাধা ও বিবাদের পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণের প্রসাদসেবনব্যাপারে শিব ও শিবানীর মধ্যে ছদ্ম-কলহের ছবি দেওয়া হয়েছে। শূন্যপুরাণে চাষ করার কথা শুনে শিব বলেন, 'তিন ভাগ বয়েস গেল বৃদ্ধ হল্য কাল। এমন সময়ে দুর্গা না কর জঞ্জাল।' দুর্গা উত্তর দেন, 'নির্বুদ্ধি, গোসাঞি বিবুদ্ধে গেল কাল। দিনে দিনে হয় তুমি দুঃখের ছায়াল।' মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র প্রভৃতিতে সতীর পিতৃগৃহে গমনকালে বিবাদের ফুলকি দেখা দেয়, 'নিমন্ত্রণ বিনে যাবে এই মাথা কাটা। আমার প্রসঙ্গে গৌরী পাবে বড় খোঁটা'। গৌরী তাঁর চরণ ধরলেন কিন্তু শিব আপন সিদ্ধান্তে অটল। তখন গৌরী একাকিনী দক্ষালয়ে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতে সমুদ্রমন্থনে অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে দুর্গা ও শিবের বিবাদ বাধে, 'দেবী বলে দারা পুত্র গৃহী যেই জন। তাহার না হয় যুক্তি এসব কারণ।' দ্বিজ মাধবের কাব্যে পাশা খেলা নিয়ে এই বিবাদ হয়। মাণিক গাঙ্গুলীর দেবী ছল করে লাউসেনকে বলেন, 'বুড়া মোর ভাতার বড়ই দেয় জ্বালা।' আর তাকে জয়থড়্গাটি দিয়ে এলে শিব 'হায় হায় করেন নাহিক শর্ম। পর্বতের বেটী মোর পুড়িলেক জন্ম।' দারিদ্র্য, ভোজনপ্রিয়তা ও মাদকসেবন শিবদুর্গার কোন্দলের অন্যতম কারণ। মনোমত আহার না পেয়ে শিব বলেন, 'গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী', শিবানী উত্তর দেন, চণ্ডের হাতে পড়েই তো তিনি চণ্ডী হয়েছেন, 'অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই। মোর আসিবার পূর্বকালি ধন কই' (ভারত)। তখন শিব সখেদে বলেন, 'দেবের দেবতা বলি বেদে মোরে কয়। ঘরের মেয়ের কাছে কথা নাহি রয়' (ঘন)। অধিকাংশ

ক্ষেত্রে দাম্পত্য কলহের কারণ হয়ে উঠেছে। ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গলে, পাঁচালী ও কবিগানে এই দিকটি মোটা তুলিতে আঁকা হয়েছে। মনসামঙ্গলে মনসাকে এবং পাঁচালীতে গঙ্গাকে কেন্দ্র করেও দুজনে বিবদমান হয়ে উঠেছেন। দুর্গা বিলাপ করেন, 'আমি সিদ্ধেশ্বরী লোকের বাঞ্ছা সিদ্ধি করি, তোমার ঘরে মরি সিদ্ধি বেঁটে। আপনি মাখহ ছাই, আমারে বলহ তাই, চিরস্থাই এক দশা জানি।' আর শিব খেদ করেন, 'আমি তো ভিখারী, রাখি দুই নারী, নাহি কিছু সম্ভাবনা। আমি শূলপাণি, দুজনারে মানি, আমারে কেহ মানে না'। রামেশ্বরের কাব্যে, একদিকে বাগ্‌দিনীপালা অন্যদিকে শঙ্খ পরিধান পালায় দুজনে কলহরত। যশোহর-খুলনার বালাগান এবং পটুয়া ছড়া লোকসংগীতে পরস্পরের রূপ-গুণকে আশ্রয় ও ব্যঙ্গ করে শিব-দুর্গার কোন্দল মুখর হয়ে উঠেছে। কবিগানে এই বিবাদের অনেকগুলি ছবি আছে।

খ। **বিদূষক**: শিবচরিত্রের বিপরীতের সমাহার, বিচিত্র রূপগুণসজ্জা কার্যকলাপ তাঁকে হাস্যরসের উপজীব্য করে তুলেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে চেট বীট বিদূষক এবং পুরাণে ও পৌরাণিক নাটকে নারদের যে স্থান, বাংলা কাব্যে তাইই দেওয়া হয়েছে শিবকে। সামাজিক-সাহিত্যিক প্রয়োজনে একটি হাস্যরসাত্মক চরিত্রের যে অবশ্যম্ভাবী অবতারণা, শিবের মাধ্যমে তাইই স্ফূর্তিলাভ করেছে। যিনি স্বভাবতই দিগম্বর ও ভোলানাথ, উন্মত্ত ও শিশুমনা, বাঙালী তাঁকে যে হাস্যরসের আলম্বন করে তুলবে, এ আর আশ্চর্য কি। পত্নীপ্রেম ও কামুকতা, ভিক্ষায় আসক্তি ও উন্মত্ততা, মাদকসেবন ও ঔদরিকতা, কোন্দল ও সরলতা—বস্তুত শিবের চরিত্রের এই বিশিষ্ট দোষগুণগুলি কেবল বাঙালী চরিত্রের প্রতিদর্পণ নয়, হাস্যরস সৃষ্টির জন্যেও বাঙালী ওগুলির প্রয়োগকুশলতা প্রদর্শন করেছে, তাঁর গুণ-লক্ষণগুলিকে নতুন অর্থে দ্যোতিত করেছে। যেমন—মোহেঞ্জো দড়োর যোগী এবং আর্যেতর শিব কর্ষণ-প্রজননের দেবতা বলে দিগম্বর রূপে কল্পিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে এই দিগম্বরত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে; বাঙালী তা নিয়ে লঘু দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। কামব্যাকুল শিবের ছবিও এই একই ভাবে ও উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। কবিকঙ্কণের দুর্গা যখন বিলাপ করেন, 'উন্মত্ত নঙ্গেট জটাধর চিতাধুলী গায়। দণ্ডীতে মাথার জটা অবনী লোটায়', তখন আমাদের হাস্যের উদ্রেক হয়; যখন ভারতচন্দ্রের শিব অনুরোধ করেন, 'আমি বৃদ্ধ তাই কই, জানি নাই তোমা বই, এক মুঠা অন্ন মেনে দিও', তখন আমাদের হাস্য ফেনায়িত হয়; পাঁচালীর শিব যখন গঙ্গারহস্য প্রকাশের ভয়ে ছল করেন, 'দুর্গা! অকস্মাৎ কি উৎপাত হইল শিরঃপীড়ে' এবং দেবীর ছলোত্তর, 'তোমার জরজ্বালা কোন জ্বালা জন্মে শুনি নাই। আজি শুনে শিরঃপীড়া বড় মনঃপীড়া পাই॥ বৈদ্যনাথের শিরঃপীড়ে বৈদ্য কোথা পাই', তখন হাস্যরসটি জমে; যখন মাণিক গাঙ্গুলীর পার্বতী 'প্রভুকে পথ দেন নাই ছেড়ে। কার্ত্তিক গণেশ নিল সিদ্ধিঝুলি কেড়ে॥ শিঙ্গা থানা নন্দী নিল দূরে গেল দুঃখ। হাসিতে লাগিল হর,' তখন মনে হাসির বুদ্বুদ ফোটে; আর যখন শুনি, 'ভাঙ খাইবে ধুতুরা খাইবে খাইবে

ভাঙের গুড়া। পিরখিমি মজলে শিব না হইবে বুড়া। শ্মশানে মশানে থাকবে মাখবে ভস্মছালি। সগ্‌গলে ডাকবে তবে পাগলা শিব বুলি। ভূতপেরেতের সগে একত্রে করবে বাস। অঘোর সাগরে পইড়া থাকবে বারমাস ॥ বলদের কান্ধে উঠে পিনবে বাঘের ছাল। কুচনীর পাড়াতে যায়্যা কাটাইও কাল' ২২, তখন সেই বুদ্‌বুদ ফেটে পড়ে উচ্চ কলরোলে, তখন বুঝি—কবি এবার স্বয়ং আসরে নেমেছেন শিবের সঙ্গে মুখোমুখি রসিকতা করতে, বাস্তব অসংগতিকে দেবতার মাধ্যমে রূপায়িত ও রসায়িত করতে।

এইভাবে বাঙালী পুরাণশিবের সকল বিশিষ্টতাকে শিরোভূষণ করে তাঁর দেবত্বকে স্বীকৃতি দিয়েও তাঁকে সাধারণ মানুষে রূপান্তরিত করেছে। সাধক শিবকে দেখেছে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তাঁর উপাসনা করেছে যৌগিক-পৌরাণিক-তান্ত্রিক সাধনপথে। কবি তাঁকে দেখেছে গৌণত ধার্মিক ও মুখ্যত শৈল্পিক এই যুগ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে 'বন্দনা' ও 'সৃষ্টিপালায়' যাঁর শাস্ত্রীয় রূপের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছে, মানবখণ্ডে এবং কাহিনীর অন্যান্য অংশে তাঁকেই ভূষিত করেছে পার্থিব মানবত্বে। বাঙলার লোকশিবের দুটি পরিচয়। একদিকে তিনি সংখ্যাহীন জনগণের পূজিত অসীম শক্তিধর দেবাদিদেব, অন্যদিকে সুখে দুঃখে বিচলিত ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক জনৈক চরিত্র। একপক্ষে তাঁর প্রতি অসীম ভক্তি, অপরপক্ষে তাঁর প্রতি সীমাহীন প্রীতি; একবার তিনি বহুদূরের, আরবার তিনি অনেক নিকটের, কবির ও শ্রোতার অতি আপনজন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তকবি ইষ্টদেবকে প্রিয়তম ভেবে তাঁর সাধনা করেছে, তাঁকে নিয়ে খেলা করেছে, দুচোখ ভরে তাঁর লীলাবিলাস উপলব্ধি করেছে। তবু রাধাকৃষ্ণ দূরযানী কল্পজগতের, অধ্যাত্ম-সাধনার এবং তাত্ত্বিক রূপকথার ধূপছায়াঘেরা আবছায়া অঙ্গনের; ইন্দ্রিয়লোক সেখানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে অভিসার করে। শিবকথায়ও বাঙালী একই কাজ করেছে, ভিন্নভাবে। তিনি ভক্ত-কবির মনের মানুষ। তাঁকে নিয়ে সে খেলা করেছে, কাঁদিয়েছে, হাসিয়েছে, কামের অতলান্ত অন্ধকারে নামিয়েছে, আবার প্রেমের সুউচ্চ আলোয় প্রকাশ করেছে। শিবশিবানী নিকটজগতের, আমাদের ঘরেরই ধূপছায়াঘেরা দিবালোকিত আঙিনার। অতীন্দ্রিয়তা এখানে ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে উঠেছে, শিব হয়েছেন আত্মার আত্মীয়। তাতে হয়তো তাঁর দেবত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু মানবত্ব এবং চরিত্রের মহত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণিত প্রসারিত হয়েছে।

একই কেন্দ্রবিন্দু সত্ত্বেও এই পার্থক্যজনিত রূপান্তরটি বিস্ময়কর মনে হতে পারে। শিবের চারিত্রিক রূপগুণের এতটুকু পরিবর্তন না করে বাঙালী কবি সেদিন তাঁর পশ্চাৎপটটি সরিয়ে দিয়েছিল মাত্র। যেখানে ছিল ধর্মের আবরণ, সেখানে এল সাহিত্যের আবরণ, নাটকীয় চমৎকৃতি, কাব্যিক উচ্ছ্বাস আর বস্তুর চিত্র। যা ছিল

দেবতার বিশেষণ তা হল মানুষের ক্রিয়া, যে কাহিনী ছিল অলৌকিক ও সীমিত তাকে লৌকিক ও জীবননিষ্ঠ করে তোলা হল, যে কথা ছিল দেবত্ব ও ধর্মত্বের দ্যোতক তা হয়ে উঠল সংসারের আলোছায়া-উপাদান ; যে দেবতা ছিলেন হিমালয়-গিরিশিখরচূড়ায়, তাঁকে নিয়ে আসা হল সমতলের জগতে অন্তরঙ্গ আত্মীয় করে আত্মকথার প্রতিচ্ছায়ায়। শিবের মাধ্যমে বাঙালী সেদিন নিজেকেই দেখেছে, নিজেকেই আস্বাদন করেছে, নিজের সুখদুঃখ আশাবাসনা ক্রটিবিচ্যুতিকে রূপ দিয়েছে। তারই ফলে শিব তাঁর দেবত্বের সকল গুণগরিমা নিয়ে আকাশচারী দেবলোক থেকে নেমে এসেছেন মৃত্তিকাবিহারী লোকালয়ে, অমৃতময় স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীর ধুলোকাদায়। তখন বৈষ্ণব কবিকেও বলতে হয়েছে, ‘ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ’ (চৈ. ভা.)।

ঘ। শৈব সাহিত্য

অ। বাঙলা দেশে ইতিহাসের প্রথম পাতা থেকেই শিব ধর্মে ও সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন। ক্রমে তাঁর ভৌগোলিক পরিধি বিস্তৃত হয়েছে উত্তর থেকে পশ্চিম, সেখান থেকে নিম্ন ও মধ্যবঙ্গে, শেষে পূর্ববঙ্গে, তারও পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১। তবু তাঁর আবির্ভাব স্বতন্ত্র কোন শৈবকাব্যের মাধ্যমে নয়, অপর দেব-দেবীর ‘আবরণ-দেবতা’ হয়ে স্বর্গখণ্ডে, কখনও-বা মর্ত্যলোকে। নিরঞ্জন-আদ্যাদেবীর প্রতিচ্ছায়ায় তাঁর ‘পুরুষ প্রকৃতি বোলি হইব খিআতি’ ; রাধাকৃষ্ণ বলেন, ‘হরগৌরী মোর আত্মতনু’ ; আর শক্তি ‘নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।’ সদুক্তিকর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, কৌম উপপুরাণ এবং সংখ্যাহীন শিবের গান থাকা সত্ত্বেও বাংলা কাব্যের আদি ও মধ্যপর্ব জুড়ে স্বতন্ত্র শিবমঙ্গলকাব্য একটিও রচিত হয়নি। প্রাচীনতম বিশিষ্ট ও প্রধান দেবরূপে তিনি সকল কাব্যের শিরোভূষণ, কিন্তু তাঁর নিজের কোন কাব্যাধার নেই। সুদীর্ঘ পনেরো শতাব্দীরও বেশী বাঙলায় শিব রইলেন, শৈব ধর্ম রইল, শিবমাহাত্ম্য গীত হল—নেই ‘শিবমঙ্গল’। এই সত্য বিস্ময়কর কিন্তু অকারণ নয়।

তখনও বাঙলার অখণ্ড একদেশত্ব দৃঢ়পিনদ্ধ হয়ে উঠেনি। ভৌগোলিক ও সেই সঙ্গে সামাজিক পরিবেশ ছিল বিভিন্ন। শিবও ছিলেন না কোন বিশেষ কালে স্থানে ও গোষ্ঠীতে আবদ্ধ। তাঁর ছড়িয়ে-থাকা কথাগুলিকে একত্রিত সংকলন করার অবকাশ ছিল সামান্য। পুরাণের সহায়ে এই কাজটি করা হয়তো সম্ভব হত। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের মূলে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও শাক্ত সাহিত্যের মূলে গৌড়ীয় শাক্ত (তন্ত্র) ধর্ম, শৈব সাহিত্য রচনার ভিত্তি হিসাবে তেমন কোন ‘গৌড়ীয় শৈবধর্ম’ দানা বেঁধে ওঠেনি। চৈতন্যদেব ও রামপ্রসাদের মত কোন বিশিষ্ট শৈবসাধক অথবা সম্প্রদায় তাঁকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন নি ২। বাংলা কাব্যে ধর্মকলহ মূলত শাক্ত ও বৈষ্ণবে, শক্তিতে শক্তিতে, শিব উপলক্ষ ও সহায়মাত্র। ওপরতলা থেকে

অপস্রিয়মাণ বৌদ্ধধর্ম ও নীচের তলায় কৌম দেবতা শিবকে আশ্রয় করেছিল বলে হয়তো লোকশিব উচ্চবিত্ত সমাজের অনুমোদন ও সহায়তা লাভ করেন নি ; হয়তো বহিরাগত আর্যদেবতা বলে শিব মাতৃকা ও ধর্ম-অনুগামীদের কাছে কাব্যের নায়করূপে প্রতিভাত হন নি। অথবা শুধুই উন্নাসিকতা নয়, শৈব সম্প্রদায়ে এমন কোন শক্তিমান কবি আবির্ভূত হননি যিনি ছোট ছোট কথাগুলিকে একটা বড় কাব্যের আধারে দাঁড় করিয়ে দেবেন। উপাস্য-শিব ও কাব্যিক-শিবে এইদিক থেকে বহুদূরের ব্যবধান।

শাক্তপ্রধান বাঙলাদেশে মাতৃকাদেবতাদের প্রবল প্রতাপের মধ্যে শিবের আত্ম-বিকাশ। নেতা হওয়ার মত গুণের অভাব তাঁর ছিল না। কিন্তু যে সময়ে অন্যান্য দেবদেবী নিজ মহিমা প্রচারে ব্যস্ত তখন শিব বলেন, 'আমা হৈতে হয় যদি লোক পরিত্রাণে॥ তবে আমি আপনে করিব বিষপান। জীবন তেজিয়া করি লোক-পরিত্রাণ' ৩। আত্মপ্রচারণায় তিনি বীতরাগ। কারণ, 'যে সময় বাদশাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং ন্যায় অন্যায় সম্ভব অসম্ভবের ভেদচিহ্নকে ক্ষীণ করিয়া আনিয়াছিল, হর্ষশোকবিপৎসম্পদের অতীত শান্তসমাহিত বৈদান্তিক শিব সে সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্বেষ প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ' ৪। তাই তখনকার কাল নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় উপায় ও প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করে সকাম সক্রিয় বোধিসত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল—কৃপাময় দেবতারূপে। স্থাণু যোগীশ্বর বৈদান্তিক জ্ঞানের ও ধ্যানের আশ্রয়, সাধারণ মানুষ জ্ঞানের দেবতায় তৃপ্ত হয় না ; লোকশিব আনন্দময় জীবনময় কিন্তু উত্তেজক উন্মাদনা তিনি নন। শিবরূপের ও শিবচরিত্রের এই অনাসক্ত ঔদাসীন্য, আত্মমহিমা প্রচারে বীতরাগ এবং আঞ্চলিক বিক্ষিপ্তি তাঁকে আখ্যানের নায়ক হতে দেয়নি। কিন্তু যেহেতু উপাসনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বজনবন্দিত, সাম্প্রদায়িক সীমিতগণ্ডীর অতীত, সহজ ও সুন্দর, নমনীয় ও কমনীয়, তাই তাঁকে চিরকাল উপনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয় নি, সপ্তদশ শতাব্দীর সীমানায় এসে তাঁকে অবলম্বন করে শিবকথা রচনার সম্ভাবনা দেখা দিল। ক্রমে মোগল পরিবেশের বিকৃত রুচির প্রতিফলন এতে পড়ল ৫। কিন্তু কৃষিকথা থাকলেও 'কৃষকদের প্রয়োজনানু-রোধে' এইসব শৈবকাব্য কখনও লিখিত নয়। সংস্কৃত সংযম রামেশ্বরী কাব্যকে 'ভব্যকাব্য' করে তুলেছে ; তিনি কাব্যরচনা করেছেন রাজকীয় পরিবেশে, কৃষকের আঙিনায় বসে নয়। অপিচ এখানেও সেই বিষ্ণু এবং শক্তির মহিমাকীর্তন এবং চট্টগ্রামের শৈবকাব্যে পুরাণ ও প্রবাদ-কথার জনতা। এমন-কি অনেক লৌকিক শিবের গানেও তাঁকে শোনান হয়েছে অন্য দেবতার মহিমাকীর্তন। বিশুদ্ধ শৈবকাব্য এদেরও বলা চলে কিনা, সে প্রশ্ন অবান্তর নয়। তার ওপর, বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যের প্রবলতায় এই ধারারও পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী হল না।

শিব লম্পট কিন্তু কপট নন, ললনা-অনুরাগী কিন্তু ছলনা-অনুরক্ত নন। বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সেই ঝড়বাদলের দিনে যখন অসহায় মানুষ ধর্মের ছত্রছায়ার তলে ছুটোছুটি করছে, তখনও 'জগৎ পরিব্রাজক' সন্ন্যাসী শিব ঝোলাটি কাঁধে ফেলে বৃষকে সঙ্গে নিয়ে নির্বিকারভাবে পথে প্রান্তরে বেরিয়ে পড়েছেন। তবু যাও-বা কয়েকটি শৈবকাব্যের আভাস চমকিত হয়ে উঠল, অষ্টাদশ শতাব্দীর অব্যবহিত পরে কালের কাঁকন-কিঙ্কিণীতে ঠেকে মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানকাব্য হাজারকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পাঁচালী ও কবিগানে, আখড়াই ও হাফ্-আখড়াইয়ে; শিবচরিত্রও সেই অভাব্য দুর্ঘটনায় শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কণায় কণায়। তারপরে এল নবযুগ, নতুন সমাজ, নবীন মনন, নব্য সাহিত্য এবং অভিনব শিব ও শৈব দর্শন।

আ। প্রাগাধুনিক বাঙলায় শিবের বিবর্তনের সামগ্রিক পরিচিতিলাভের চেষ্টা আমরা করেছি। অন্তপবিক শৈব সাহিত্যগুলি থেকেও প্রয়োজনীয় উপাদান আহরণ করেছি। কিন্তু সেগুলির স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ ভিন্ন শৈব চিত্র সম্পূর্ণ হতে পারে না। শিবায়ন তথা শৈব সাহিত্য মঙ্গলকাব্য নয়, বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলীও নয়, ভঙ্গিতে না হলেও সংগীতে সে স্বতন্ত্র। শিবও মঙ্গলকাব্যিক দেবতার সগোত্র নন। যে চেতনা নিয়ে মঙ্গলকাব্যাদির আবির্ভাব, শিবকে ঘিরে সে চেতনা দানা বাঁধে নি। যিনি ধর্মকলহে নির্বিরোধ, ভক্তের বিপদে নির্বিকার, আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিরাসক্ত, দ্বন্দ্বে পরাঙ্মুখ, ধর্মসাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে তাঁর স্থান সামনের সারিতে হতে পারে না। ভক্তশক্তির প্রকাশ মঙ্গলকাব্যে শাক্তপদে, প্রেমভক্তির বিকাশ বৈষ্ণব সাহিত্যে, অনুবাদসাহিত্যে শক্তি আছে ভক্তিও আছে। চণ্ডী মনসা পূজা প্রচারের জন্যে অভিযান করেন, ধর্মঠাকুর যবনিকার অন্তরালে থেকে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেন, রাধা করেন অভিসার। কিন্তু শিব শৈবভক্তি শৈব সাহিত্য স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। ধর্মজগতে তিনি জনবন্দিত কিন্তু কাব্যলোকে লক্ষ্য নন, উপলক্ষ, সাধ্য নন, সহায়; এমন-কি নিজের সাহিত্য-আসরেও দেবতা-শিবের ব্যক্তিত্ব তেমন উগ্রভাবে আত্ম-ঘোষণা করে নি। তথাপি শিল্পজগতে তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর অন্তর ও অন্তঃপুর ভাবারূপ পেয়েছে তাঁর মাধ্যমে। মানবশিব সমকালীন বঙ্গ-সমাজের ও সংসারের জীবনসহচর ও অন্তরদেবতা। তাই তিনি সর্বত্রগামী, শত্রুশিবিরেও তাঁর ও তাঁর কাহিনীর অবাধ গতি, কথাশরীরে লাঞ্ছিত হয়েও কাব্যশিরে অর্থাৎ বন্দনায় তিনি পরম শ্রদ্ধায় স্তুত। শৈব কাব্যগুলি সংখ্যায় অল্প হলেও আন্তরিকতায় পূর্ণ সশ্রদ্ধ স্তব।

ই। শিবমঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম কবি বলে গণ্য রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র বিরচিত শিবায়ন ৬ ১৬২৫ খ্রী:র কাছাকাছি সময়ে লেখা। তাঁর শিবগীতি আদিরসপুষ্ট ও রঞ্জিত অর্ঘ্যনিবেদিত। কবি সম্ভবত বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, তবু তাঁর শিবায়ন নির্ব্যূঢ়ভাবে শিবমাহাত্ম্য-প্রচারিকা, যার ধ্রুবমন্ত্র—'অর্ধনারীশ্বর এই বিশ্বের আকার'। রামকৃষ্ণের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল গভীর ও ব্যাপক। শিবকথার পালাগুলি আবদ্ধ হয়েছে

মহাভারত ভাগবত হরিবংশ এবং শিব কালিকা স্কন্দ পদ্ম প্রভৃতি পুরাণ থেকে। এর প্রতিটি কাহিনীই শিবমহিমান্বিত। স্বাভাবিকভাবেই কাব্যটিতে শিব-বন্দনা বিস্তৃততর। সৃষ্টিতত্ত্বে শিবপুরাণ প্রভৃতির অনুসরণে শিব নির্গুণ ব্রহ্ম ও আদি স্রষ্টা রূপে বর্ণিত হয়েছেন—'এক ব্রহ্ম রুদ্র আর যত প্রতিবিম্ব।' এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্লিঙ্গ সুদর্শনচক্র প্রলয় ইত্যাদি কথা সংযোজিত হয়েছে। শিব-শিবানী কথায় দক্ষযজ্ঞ সতীর দেহত্যাগ উমার তপস্যা ও শিবলাভ পুরাণ-অনুগামী। অতঃপর শিবের পঞ্চানন ত্রিনয়ন পিনাক সর্প জটা ও লিঙ্গাদির মাহাত্ম্য এবং শিব-নৈকট্য লাভের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মনসার জন্ম বিবাহ ও আস্তীকের জন্ম বিবৃত হয়েছে। শেষে বলি বিন্ধ্য গঙ্গা ত্রিপুর অন্ধক পরশুরাম রাবণ ও বাণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থশেষে শিবকৃষ্ণে মিলন ও 'পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চাশী'। কাব্যের কথাশরীর বিশ্লেষণ করে কবির শাস্ত্রজ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় মেলে, তা বিস্ময়কর। কবি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তিল তিল শৈবকথা আহরণ করে নিজ কাব্যে সন্নিবেশিত করেছেন, শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। পরিকল্পনাটি অভিনব এবং আগামী কালের শৈবকাব্যে অনুসৃত। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে জনশ্রুতিও মিশ্রিত হয়েছে, কল্পনাশক্তি তাকে সৌন্দর্য দান করেছে। সশ্রদ্ধ হৃদয়ের ভক্তিভাবে আমন্থর রামকৃষ্ণ শিবায়ন। কিন্তু পুরাণ-অনুগমনের ফলে কাব্যটিতে উল্লেখযোগ্য দোষও দেখা যায়। আহৃত শৈব কথাগুলি শিবের মহিমাদ্যোতক হলেও কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ফুলের সমষ্টিমাত্র, দৃঢ়পিনদ্ধ মালা নয়। দ্বিতীয়ত, কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণে কবির মৌলিকতা স্ফূর্ত হবার সুযোগ কোথাও মেলেনি। মর্ত্যখণ্ড অলিখিত। মনসার কারণে ও দারিদ্র্যের তাড়নে শিবদুর্গার কলহ, পুষ্পোদ্যানে উভয়ের ছল-কথোপকথন এবং বিবাহ ও ফুলশয্যার বিস্তৃত চিত্ররূপায়ণ ছাড়া অন্যত্র শিব-শিবানীর গার্হস্থ্য জীবন বা মানবিক রূপের প্রকাশ ঘটেনি। তথাপি পাণ্ডিত্য ও সংযম, ভক্তি ও সমন্বয়দৃষ্টি, ভাষা ও ছন্দের সৌকর্য রামকৃষ্ণের শিবায়নকে যে একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা দান করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

কাহিনীর সীমাবদ্ধতায়, আয়তনের ক্ষুদ্রতায় ও কল্পনার সংকোচনে চট্টগ্রামের শৈব কাব্যগুলি সর্বজনীনতা লাভ করতে পারেনি। দেশের হৃদয় থেকে বহুদূরে থাকার জন্যেই বোধহয় এগুলির আঙ্গিক মঙ্গলকাব্যের ষড়ঙ্গকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেনি। আখ্যানভাগের সরলতায় ও রূপকের প্রয়োগে রচনাগুলি স্বতন্ত্রজাতীয়। 'ভাগবত'-ধৃত মুচুকুন্দ রাজার কাহিনী ও তার অন্তর্গত মৃগ-ব্যাধকাহিনী কাব্যগুলির মূল-বক্তব্য। তার সঙ্গে 'ভবিষ্যপুরাণের' ব্যাধকাহিনী মিশ্রিত করে নতুন কথার সৃষ্টি হয়েছে। রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' এই ধারার প্রথম কাব্য। কবির ও কাব্যের ইষ্ট দেবতা শিব। বন্দনায়ও তিনি স্তুত। কিন্তু তাঁর রূপগুণচরিত্রের বর্ণনা অপেক্ষা শিবপূজার মহিমা, সরল ভক্তির মাহাত্ম্য এবং সাধারণ মানবিক নীতিওঁজনের প্রচারই কাব্যের মূল বক্তব্য। মুচুকুন্দ রাজাকে রাণী রুক্মিণী দেবী ব্যাধের শিবরাত্রির

কাহিনী শোনালেন। এক ব্যাধ- যমরাজের কাছে বর পায়, প্রাণীদের ভাষা তার বোধগম্য হবে। পরে একদিন মৃগমৃগী তার জালে ধরা পড়ে এবং সুভাষিতাবলীর মাধ্যমে একে অপরের জন্তে জীবনদানে ব্যাকুল হয়। অবশেষে শিবলোকে তাদের স্থান হয়। তাদের নির্দেশে শিবপূজা করে ব্যাধও শিবলোক পায়। শেষে মুচুকুন্দ রাজার শিবপূজা ও কৈলাসে গমন বর্ণিত হয়েছে। দেবখণ্ড ও মানবখণ্ডের সহযোগে জীবনের স্পন্দন অপেক্ষা একটি ছোট কাহিনীকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক আলোচনাই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। ভক্তিই এর স্থায়ী রস। দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' (১৬৭৪)-র কাহিনী ও দৃষ্টিকোণ একই জাতীয়। তবে কবি একে বিস্তৃততর করেছেন নতুনের সংযোজনায়। এখানে শিবের পরিচিতি একটু বেশী : সৃষ্টিবর্ণনা শিবশিবানীতত্ত্ব লিঙ্গমাহাত্ম্য, দক্ষযজ্ঞবর্ণনা শিবরাত্রিব্রতমাহাত্ম্য, এমন-কি শিবের প্রেমিক ও কামুক রূপের ইঙ্গিতও বিদ্যমান। মনে হয়, মঙ্গলকাব্যের কিছু প্রভাব এতে পড়েছিল। তবে পুরাণের প্রভাবই বেশী। সেই সঙ্গে মূল কাহিনীর ক্ষেত্রে প্রসার এনে ঘটনার বিস্তৃতি ও তত্ত্বের গভীরতা প্রকাশে কবি সমর্থ হয়েছেন। পূর্বকাব্যের সংক্ষিপ্তি-জনিত অস্পষ্টতা তাঁর লেখনীতে প্রসারিত স্বচ্ছতা পেয়েছে। দ্বিজ রতিদেবের প্রকাশভঙ্গিও উন্নততর। তাঁর কাব্যপাঠে মনে হয়, নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ গেলে চট্টগ্রামের শিবকথাও একদা দেশের অভ্যন্তরভাগের মঙ্গলকাব্যের অনুসারী ও সদৃশ হয়ে উঠতে পারত।

জীবন মৈত্রেয় (১৭৪৪ খ্রীঃ) লিখিত শিবায়ন কাব্য পুরাণঘেঁষা। একমাত্র শিবশিবানীর বিবাদ বিষয়েই কবির মৌলিকতা প্রকাশিত : শিব বলে কৈতি পারি পাষাণের ঝি। কার কারণে কোন দোষে ভিক্ষা করিয়াছি॥ তোমাকে বিভা করি আমার কোনদিন নাই সুখ। আদিকথা কহিলে পাইবা বড় দুঃখ॥ যেদিন সম্বন্ধ হৈল তত্ত্ব পাইনু মুই। সেদিন হারাইল আমার ঝুলি সিয়া সুঁই॥ নিরীক্ষণপত্র হইল যেহি দিন। আচম্বিত হারাইল পরণের কৌপীন॥ যেদিন তোকে বিভা করিয়া লইয়া আইনু ঘরে। চৌদ্দ আঁটি ভাঙ্গ সেহি দিন নিল চোরে॥

শিবসাহিত্যের প্রস্তুতি পূর্ণরূপ পেল রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে (১৭৫০ খ্রীঃ)। কবির ভণিতা, 'চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর। ভব্যভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর।' গ্রন্থটি মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক-রীতিতে লেখা। তবে কাহিনীর দুটি ভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম ভাগে স্বর্গখণ্ড ও দৈব মাহাত্ম্যকীর্তন; দ্বিতীয় ভাগে, মর্ত্যখণ্ড ও মানবিকতা। প্রথম ভাগে, শিব বিষ্ণু ও শক্তির পৌরাণিক ব্রত ও মহিমা বিবৃত হয়েছে। শিবের মুখে বিষ্ণু ও শক্তির মহিমা কীর্তন লক্ষণীয়। কবির মত তাঁর কাব্যনায়কও কৃষ্ণ ও শিবানীর অনুগত। শিবায়ন নামকরণের দ্বারা কবি রামচন্দ্রের চরিত্রগৌরব ও গাম্ভীর্য শিবে আরোপিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রথমাংশ বিচারে কাব্যটিকে ত্রি-দেবতার ইতিকথা বলাই বোধ হয় সংগত; দ্বিতীয়াংশে একান্ত শিব-কাহিনী থাকলেও গৌরব মহত্ত্ব বা প্রসাদগুণ কোনটাই

শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি। শিবের কৃষিকাজ বাগ্‌দিনী পালা শঙ্খ পরিধান বিষয় নিয়ে এই দ্বিতীয় অংশ রচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বঙ্গবাসী সংস্করণ শিবায়নের সম্পাদক লিখেছিলেন, 'এই উপাখ্যানের তাৎপর্য কি, তাহা আমরা জানি না'; এবং রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছিলেন, 'বোধহয় উহা কবির স্বকপোলকল্পিত হইবে'; আর একজন ঐতিহাসিকের মত, 'রামেশ্বর উচ্চশ্রেণীর কবি নহেন। এই সকল ঘটনায় দেবতার মহত্ত্ব নাই, মানুষের লঘু চরিত্রের পরিচয় আছে' ৭। চাষপালাদি উপাখ্যানের তাৎপর্য আমরা ইতিপূর্বে নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি। শেষ মন্তব্য সম্পর্কে কিছু কথা বলা আবশ্যক। আধুনিকপূর্ব বাংলা কাব্য ছিল মূলত দৈবনির্ভর। কিন্তু যেহেতু সাহিত্য জীবন-বিরহে বাঁচতে পারে না, সেইজন্যে দেবতার মহিমার পাশাপাশি মানুষের জীবন ও চরিত্র তার বাস্তবতা এবং মহত্ত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে। চাঁদ সদাগর, বেহুলা, কালকেতু, লাউসেন, গোরক্ষনাথ, ময়নামতী প্রভৃতি চরিত্র মানবতাবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কালচক্রে তার সঙ্গে মিলিত হল আদিরস ও নাস্তিকতা। দেবদেবীর স্বর্গীয় জীবন হল কাব্যের গৌণ অংশ; তাঁদের মানবী রূপ সুখদুঃখ প্রেমকাম লাভক্ষতি সফলতা ব্যর্থতা শ্রোতৃবৃন্দের কাছে অধিকতর মনোহারী হয়ে উঠল। এবং একসময়ে বাঙালী দৈবকথাকে পেছনে ফেলে বিদ্যা-সুন্দরের মত কাহিনীকে সাদরে বরণ করে নিল। কথাশরীরের কোথাও আদিরসের আধিক্য, কোথাও-বা মানবরসের আতিশয্য দেখা দিল। রামেশ্বর ধার্মিকতাকে অস্বীকার করলেন না, তার পাশে সমান স্থান দিলেন মানবিকতাকে। তাঁর বাগ্‌দিনীপালায় আদিরসে আদিমতার স্পর্শ থাকলেও মর্ত্যখণ্ডের সমগ্র ছবিটি গার্হস্থ্য ও দাম্পত্যজীবনের সরলতায় শান্তরসাস্পদ। ছন্দে অলংকারে শব্দচয়নে ভাববয়নে, সংযত ও কাব্যিক রচনাভঙ্গিতে রামেশ্বর বাঙালী শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। কাব্যটিতে করুণরসাত্মক চিত্র থাকলে আরও ভালো হত। তবে গতানুগতিক সনাতনী-পন্থা ত্যাগ করে তিনি যে লোকগাথা থেকে তাঁর কাহিনী আহরণ করে নিজের ভদ্রকাব্যে সংযোজিত করেছেন, এতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ পেয়েছে; সাধারণ কথা আভিজাত্যের টিকা পেয়েছে, শ্রোতৃবৃন্দ নতুন কাহিনী শুনে বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়েছে। ভারতচন্দ্র বিদগ্ধ কবি; রামেশ্বর বিদগ্ধ হয়েও সংযত কবি। তিনি ও তাঁর শিব উভয়েই ভারতচন্দ্রীয় হয়েও ভারতীয়, অভিজাত হয়েও লোকায়ত।

শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত (১৮৫২ খ্রীঃ) দ্বিজ রামচন্দ্রের 'হরপার্বতীমঙ্গল' অর্বাচীন রচনা হলেও একটি উল্লেখ্য শৈবকাব্য। এর কাহিনী মূলত কালিকাপুরাণ থেকে গৃহীত। শিব সম্বন্ধীয় পৌরাণিক কাহিনী অন্যান্য কাব্যের অনুগামী। শুধু বরাহ-রূপী বিষ্ণু ও শরভরূপী শিবের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ৮ বাংলা কাব্যে নতুন সংযোজনা। শিবের বন্দনায় কবি চতুর্ভুজ ত্রিপুরারির ধ্যান করেছেন। গৃহজীবনের বর্ণনায় তাঁর কামব্যাকুলতা, দারিদ্র্য ও সতীর আক্ষেপোক্তির মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই। দেবলীলার শেষাংশে শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর অভেদ-বর্ণনায় দ্বিজ রামচন্দ্র ভারতচন্দ্র-

রামেশ্বরের অনুগামী। কবির মৌলিকতা মানবখণ্ডে, মানবিকতায় নয়। এই অংশে যে কাহিনীগুলি বিবৃত হয়েছে, সেগুলি নবাগত, অবশ্য পুরাণ থেকে আহৃত, সমকালীন জীবন থেকে নয়। সৌদাস ধর্মকেতু সুমেধস ধর্মায়ু সুধর্মা এই পাঁচটি আখ্যান হরপার্বতীমঙ্গলের শেষাংশ। কবি গ্রন্থশেষে শৈব যোগাচারের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। কাহিনীগুলি এই তত্ত্বের পরিপূরক। কাব্যটি এক্ষেত্রেও পুরাণের অনুগামী। একবিষয়ে কবির মৌলিকতা উল্লেখযোগ্য। অন্য দেবতার প্রভাব-বিরহিত শুদ্ধ শৈবমাহাত্ম্য কীর্তন রামকৃষ্ণ-শিবায়ন এবং চট্টগ্রামের কাব্যে আছে; শৈবযোগের বিবৃতি আছে আলাওলের পদ্মাবতীতে। কিন্তু দুটিই একত্রে কোন শৈবকাব্যে পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে আলোচ্য কাব্যে নতুন ধারাপাত হয়েছে। প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে কবি কোন কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি শৈব কাব্য রচিত হয়েছিল। পাদ্রী লঙ্ সাহেব কয়েকটির নাম করেছেন। বাঙলার শৈব তীর্থগুলিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কাব্যকাহিনী প্রস্তুত হয়েছে। চাষের মাঠে, কৃত্যের উৎসবে, বিভিন্ন লক্ষ্যে-উপলক্ষে যে অসংখ্য শিবগীতি লোকসমাজে আজও প্রচলিত, সেগুলিও শৈব সাহিত্যের অঙ্গীভূত।

৬। বাঙালী মানস ও শিব

বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। পলিমাটির মত নরম মন নিয়ে সে বেগবান: কঠিনকে করেছে আবেগকোমল, বজ্রাদপি কঠোরাণিকে করেছে মৃদূনি কুসুমাদপি, বরণীয়কে নমনীয়। শৈব মহত্ত্বকে সে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বন্দনায় প্রার্থনায় স্তুতিপালায় কিন্তু ভালবেসেছে যে-দেবতাকে, তিনি ছড়িয়ে আছেন কাব্যের কথাশরীরে শরীরী মানবরূপে। বাংলা কাব্যে শিব তাঁর সকল অতীত ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য নিয়ে স্বমহিমায় বর্তমান; বাঙালী তাকে অস্বীকার করে নি, নতুনতর অর্থে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে, দেবতাকে করেছে মানব, স্বর্গীয় কথাকে ঘরোয়া কথা। বাঙালীর জীবন ও মানস প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মধ্যে দিয়ে; যা ছিল মহৎ ভাব, তা হয়েছে লৌকিক রস।

শৈব ভাবে মহাকাব্য রচিত হতে পারত, তার উপাদান আছে তাঁর মধ্যে। শিবরূপের পরিধি গভীরতা ও বৈচিত্র্য অসীম, সমুদ্র হিমাচল অথবা আকাশই তাঁর উপমা; ভারতসংস্কৃতির অণুপরমাণুতে তিনি ছড়িয়ে আছেন বহুধা হয়ে, তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে ভারতবাসীর বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্রের ঐক্যবোধ; শৈব ভাবনায় সৌন্দর্য মাধুর্য কল্যাণের সঙ্গে আছে সংযম সন্ন্যাস সংগ্রাম; তাঁর প্রেমে শক্তি, সাধনায় বল, স্বভাবে সারল্য—যা চিত্তকে শোধিত ও প্রসাধিত করে। তিনি বিরাজমান দেবলোকে, মানবলোকে, আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে আর মনের মানুষে হৃদয়ের অন্তরতম আনন্দে; তাঁর রূপ-গুণ-ক্রিয়া ছড়িয়ে আছে শাস্ত্রে সাহিত্যে উপাসনায় শিল্পে জ্ঞানে, সারা ভারতের পটে আঁকা বহুবিচিত্র ছবিতে। সেইসব

বৈচিত্র্যের ঐক্য সাধন করে গড়ে তোলা যেত এক মহৎ কাব্য—'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিত পান সুধা নিরবধি।'

কিন্তু তা হল না। বাঙালীর বিশিষ্ট মানসপ্রবণতা এবং গোষ্ঠীরীতি ভিন্পথের পথিক। তার শিল্পচেতনায় প্রজ্ঞা অপেক্ষা প্রজ্ঞান, বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়ের অধিকতর প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাঙলার হরগৌরীকথায় 'বীরত্ব, মহত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ উন্নত এবং বিশুদ্ধ, তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল' (গ্রাম্যসাহিত্য)। এই 'কঠোর-গম্ভীর' বাঙালীর ধাতুসহ নয়, 'স্নিগ্ধ-কোমল' তার মাটিতে ও মনে; বাঙলার জলবায়ুতে দেবতা অচিরে বাঙালী হয়ে উঠেছেন। তার রাধাকৃষ্ণ কাহিনীতে প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক বেদনা, প্রেমের মর্মপীড়া, কল্পনার মধুরসতা; তার শিবশিবানী আখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে সাংসারিক যন্ত্রণা, দারিদ্র্যের মর্মজ্বালা, বাস্তবের তিক্ত রস। না-পাওয়ার জলছবি কৃষ্ণকথায়, পেয়ে-হারানোর জ্বলন্ত ছবি শৈবকথায়। পথের প্রেম বাঙালীর অলস সাধ, ঘরবাঁধা তার অবশ্যসাধ্য; একটি তার মনোহরণ করেছে, অপরটি দুঃখদহন-দুঃখহরণের পালা। ফলে যে শিবকথা হতে পারত ওজস্বী মহাকাব্য, তা রূপ নিয়েছে খণ্ডকাব্যের, গৃহচিত্রের, মানবতার। পর-কাল কোন জাতীয়-কাব্য পেল না বটে কিন্তু যা পেল তা আরও বড়—জীবনচেতনা ও মানবমমতা শিবের ইতিহাস বাঙালীরই ইতিকথা।

বাঙালী জীবন ও মনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে শিবের কথা ও চরিত্রের যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ, সেকথা একাধিকবার উল্লিখিত ও সবিস্তারে উদাহৃত হয়েছে। এই ঘনিষ্ঠ যোগ যে কত নিবিড় ও নিগূঢ়, বাঙালী মানসের আরও গভীরে গেলে তা বুঝতে পারা যায়।

আধ্যাত্মিক আকাশচারণা সত্ত্বেও বাঙালী চিরকাল গৃহমুখী ও ইহমুখী। ধার্মিকতা ও বাস্তবতা, অতীন্দ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়পরতা, তার মনের একই পাত্রে অবিনাভাবে বিদ্যমান। দ্বৈতবাদী জাতি-মানসের এও যেন এক দ্বৈত সাধনা। তার এই মিশ্র-চেতনার মূলে সুচিরাগত আর্যধর্মের অবদান যতটা, তার চেয়েও বেশি সক্রিয় ছিল তার নিজস্ব ঐতিহ্য, তার জীবনপালা ও জীবনলীলা, লোকায়ত মেজাজ এবং ইশলাম-বাহিত পৃথ্বীলগ্ন জীবনদর্শন। বাঙালী কবির আঁকা শিবের চরিত্র-চিত্রে এই স্ববিরোধী দ্বিত্ব, এই মিশ্র-চেতনার বিচিত্র প্রকাশ স্বতঃ। তিনি একদিকে পার্থিবতায় অনীহ দেবতা এবং দৈবরসে অভিষিক্ত, অন্যদিকে তিনি ইহলোকের সাধারণ মানুষ এবং জীবনরসে সিঞ্চিত।

এই দ্বৈত-চেতনার ফল: একপক্ষে চরম আসক্তি, অন্যপক্ষে পরম অনাসক্তি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে-আলোড়নে বাঙালী যেমন সহজে উদ্বেল উত্তেজনায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তেমনি সহজেই নিরুত্তাপ নিরুদ্বেগে তা থেকে সরে দাঁড়াতেও

পারে। মহাভাব-স্বরূপ অলৌকিক প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় নরনারীর লৌকিক ও স্বাভাবিক মিলনকে 'কাম' আখ্যা দিয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে, পরক্ষণেই সহজসাধনার নামে প্রেমকে নামিয়ে আনতে পারে কামায়নের বিকৃতজটিল সাধনাচারে। শিব-চরিত্রেও এই অনুরাগ-ঔদাসীন্যের দ্বন্দ্বজটিল অর্ধনারীশ্বরত্ব। মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতির অববাহিকায় যখন শক্তি-সংঘর্ষের আবর্ত, শিব তা থেকে দূরে সরে থাকেন নি, আবার তার মধ্যে হারিয়েও যান নি: সংঘাতে যেমন আবর্তিত হয়েছেন, তেমনি তাকে অতিক্রম করে নির্বিকার মনে স্বপথে বিবর্তিত হয়েছেন। ভোগকে তিনি অস্বীকার করেন নি, বাসনার আদিরসে অবগাহন করেছেন; পরমুহূর্তে ত্যাগমাধ্যমে যতি অবলম্বন করেছেন নিস্পৃহ মোহমুক্ত চিত্তে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিরন্তর বিচলিত হয়েছেন, সেই বিচলনকে হাসির উচ্ছল আঘাতে বিগলিত করে দিয়েছেন। শিবের এই লীলা বাঙালীর জীবনপালারই সচেতন শিল্পরূপ। তিনি তাই শাক্ত ও বৈষ্ণবেরও মিলনবিন্দু। মধ্যযুগীয় ধর্মকলহে ও স্বার্থ-সংঘর্ষে বাঙালী একবার নত হয়েছে প্রতাপান্বিত শক্তির পদতলে, আরবার আশ্রয় চেয়েছে উত্তপ্ত প্রেমের কুঞ্জতলে, আবার এই দুই চঞ্চল স্রোতের মাঝখানে থেকে নিরাসক্ত সমুদ্র-দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে জীবনকে, তাকে পেরিয়ে গেছে। প্রথমটির ফল শাক্ত সাহিত্য ও পদাবলী, দ্বিতীয়টির ফল বৈষ্ণব জীবনী ও পদাবলী এবং উভয়ের মাঝে নিরুদ্বেগ সাগরের মত শৈব কথা ও শৈব সাহিত্য। শিব বাঙালী ভক্ত ও কবি, কথক ও শ্রোতার জীবন-দেবতা, তার বাস্তব ও কল্পনার অকপট দর্পণ। তাঁর মাধ্যমে ও সহায়ে বাঙালী ধর্মের অচলায়তনের মধ্যে থেকেও চিনেছে চলমান জীবন ও সমাজকে, মানুষ ও মানসকে। পরবর্তীকালের কাছে এই তার সবচেয়ে বড় দানপত্র এবং এই পাওয়া তো পরম পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের ক্রান্তিদর্শন প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্য সম্পর্কে। বীর্যবান ভক্তি, শক্তিমান প্রেম এবং সংগ্রামী জীবনবোধ তথা কোমল-কঠোর স্নিগ্ধ-গম্ভীর শৈবাদর্শের সাধনাকে বাঙালী গ্রহণ ও প্রকাশ করেছে আধুনিক যুগে, প্রধানতম প্রবক্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। চলার পথে আমরা উপনীত হয়েছি নবযুগের সেই নতুন তোরণের সামনে যেখানে মধ্যযুগীয় বঙ্গসংস্কৃতি নিজেকে নিঃশেষে দান করে নব ঐশ্বর্যের মুখোমুখি, যেখানে আধুনিক বাঙালী প্রবীণের উত্তরসাধক হয়েও নবীন তপস্বী, যেখানে চিরপুরাতন হয়েও নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ॥

আধুনিক যুগ

ক। উনবিংশ শতাব্দী

কালান্তর : নতুন পটভূমিকা ॥

পলাশী যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের পর্যালোচনায় মার্ক্‌স্ বলেছিলেন : England has broken down the entire framework of Indian society without any symptoms of reconstruction yet appearing. This loss of his old world, with no gain of a new one, imparts a particular kind of melancholy to the present misery of the Hindoo and separates Hindostan, ruled by Britain, from all its ancient traditions and from the whole of its past history [১]। ব্রিটিশ অধিকারে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে ভারতীয়দের প্রাচীন ইতিহাস এবং ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল—মার্ক্‌স্-এর এই উক্তি সর্বাংশে সত্য নয়। নতুন অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার বিদ্যুৎচমকিত আবির্ভাবে অস্থির সমাজের এক অংশে পচনশীল পুরাতনের প্রতি অনীহা ও বিদ্রোহের চেতনা জেগেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু পুরাতন সংস্কৃতির প্রবাহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি এবং দেশের বৃহত্তর অংশই ছিল প্রাচীন অনুশাসনের অনুগত, ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ, অতীতমুখী। কালক্রমে পুরাগত এবং নবাগত এই দুই ভাবনা মিলে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানসে একটি আবর্তিত দ্বন্দ্বের সূচনা করেছিল [২], পর-শতাব্দীর ভাবনা-রচনায়ও এই দ্বিধারার যুগ্ম স্বাক্ষর প্রকাশমান। আজও আমাদের কর্মে-চিন্তায় প্রাচীন-অর্বাচীনের এই যুগল-প্রভাব গভীর ও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। বস্তুত সাগরপারের পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও আমাদের আধুনিক সংস্কৃতি পুরাতন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রবাহ নয়—বরং তার উত্তরসাধক।

তবে একটা পরম নিরাশাবোধ যে দেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে ছিল, তা অনস্বীকার্য। বিবর্তনের নিজস্ব নিয়মে মধ্যযুগীয় সমাজ ও সংস্কৃতি তখন উপসংহারে উপনীত, জীবন ও মানস কালান্তরের মুখোমুখি; সেই পুরাতনের ভস্মশেষে নতুন কালের বীজও দেখা দিয়েছে, পুরনো পথের ওপর নতুনের পদধ্বনি বেজে উঠেছে। কিন্তু দেশবাসী সেই ধ্বনির যথার্থ অর্থ তখনও বুঝে উঠতে পারে নি। সেই দিকহারা মুহূর্তে আলোর রেখার মত আগন্তুক সংস্কৃতি তার মনকে নতুন পথের নিশানা দিয়েছে। প্রথমদিকে এই আলোও ছিল মুষ্টিমেয়ে সীমাবদ্ধ। কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে। সেই ফুলের গন্ধে শিল্পজগতে নতুন ভাবনা ও ভঙ্গিচেতনা এসেছে, দেশপ্রেম ও সমাজচিন্তা উদ্বোধিত হয়েছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং ইহবাদী কল্পচেতনা দিয়েছে এগিয়ে চলার প্রেরণা। বিদেশী ও দেশী সংস্কৃতির

যোগাযোগে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে জীবননদীর আধুনিক ধারা। ইউরোপে যে রেনেসাঁসের আবির্ভাব চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে, এদেশে তার অনুভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী দিনগুলি বিশৃঙ্খলা অনাচার অসাধুতা এবং শোষণে মসীলিপ্ত। ইংরেজ বণিকের লোভ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—বাঙালী জীবনের ঊষর মরুতে ধূসর পাণ্ডুলিপির আয়োজন। গ্রামে প্রাচীন সংস্কার ও সংস্কৃতির রোমন্থন, আর নগরে নতুন ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা। কিন্তু তার প্রথম পাতার সবটাই নির্ভেজাল নতুন বা নিবিড় সবুজ নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পোষকতা, আর্থিক সমৃদ্ধির ইশারা এবং নিরাপত্তাবোধের নিশ্চয়তায় কলকাতার বুকে নব্য জীবনের সূত্রপাত হল। তখনকার নতুন জমিদার-মুৎসুদ্দিদের না ছিল উন্নত রুচি, না ছিল প্রগত আদর্শ। এইসব হঠাৎ-রাজাদের দরবারী সাহিত্য কবিওয়ালাদের গান। যেমন নববাবুবিলাস, তেমনি নববাবুকালচার। কবিগানের উদ্ভব মধ্যযুগে, বিষয় অনবীন, গায়নরীতি লোকগীতির অনুগামী। এই পুরাতনই এখন চটুল ভঙ্গির আশ্রয়ে জ্বলে উঠল, গানের ফুল নয়, ফুলঝুরি হয়ে। তবে এই চটুলতার সবটাই বৃথা নয়, বাঁকফেরার ইঙ্গিত এখানেও ইতি-উতি আভাসিত হয়ে উঠেছে। ফলত, পলাশী-উত্তর সময়সীমাটি বাঙালীর পক্ষে প্রস্তুতির পর্ব। পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শ ও সভ্যতার অভিভবে দেশের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল, তাকে বরণের জন্তে বুদ্ধিজীবী বাঙালী এগিয়ে এল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ঊষর মরুভূর বুকে দেখা দিল নতুন তরুভূমি—ব্যক্তিস্ববোধ যুক্তি-বিচার জীবনচেতনা রোমাণ্টিকতা স্বাজাত্যপ্রীতি। সূচিত হল 'নবজন্মের'। ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে, অনেক পথ পেরিয়ে, স্বকীয় প্রয়াসে ও পরকীয় সহায়ে আধুনিক সংস্কৃতি এগিয়ে চলল সমুখপানে। প্রবীণ-নবীন ধ্যানধারণার সমবায়ে বাংলা কাব্য পর্যবসিত হল যৌথ সৃষ্টি থেকে একক সৃষ্টিতে, গ্রাম্য কুটিরশিল্প থেকে শহরের ভারী শিল্পে।

বিবর্তনের পথে বারেবারে রূপবদল হয়েছে পৃথিবীর, পৃথিবীর মানুষের, আর মানুষের কবিতার। প্রথমে কর্ম, পরে ধর্মের অনুগমন করেছে কাব্য, অবশেষে সে উত্তীর্ণ হয়েছে সেই লোকে, যেখানে সে ব্যক্তিগত ও অনন্যপরতন্ত্র। এই উত্তরণের পশ্চাতে বাস্তব ও মানসিক নানা কার্যকারণ ক্রিয়া করেছে। কাব্য আজও মানুষকে কর্মে প্রেরণ করে, সত্যধর্মে প্রেরণা দেয়, আবেগকে বেগবান করে। তবু সে আর আগের মত কর্মসম্পাদনের হাতিয়ার বা ধর্মসাধনার উপায় নয়; সে অবসরের সঙ্গী, হৃদয়ভাবের প্রকাশ-আকাশ, সমাজের রসায়িত শিল্পচিত্র। তার ফলশ্রুতি ধর্ম-অর্থকামমোক্ষপ্রদ নয়, 'আর্টের কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া, যেখানে রূপের পূর্ণতা' (রবীন্দ্রনাথ)…'জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়া, আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলা রূপসৃষ্টি

ও রসসৃষ্টি বিষয়ে এই হল শিল্পের কাজ' (অবনীন্দ্রনাথ)৩। প্রাগাধুনিক সাহিত্যে এই রূপরসের এই মানবতার স্ফুরণ দুর্লভ ছিল না; কিন্তু আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গিই স্বতন্ত্র। ধর্ম-শাস্ত্রের অনুশাসন নয়, মানুষকে সে দেখে ইহবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। তার সৃষ্টি বাসাবদল করেছে দেবলোক থেকে বস্তুলোকে, যৌথ চেতনা থেকে একক চৈতন্যে; দেবতা নয়, মানুষই তার সাধ্য, মানবতাই তার ধর্ম। তা বলে আধুনিক মানস পুরাতনকে পরিত্যাগ করে নি, দেবতাকে ভুলতে পারে নি। যিনি আদিতে ছিলেন প্রমথ ও দেবতা, মধ্যভাগে দেবতা ও মানব, তাঁকে বারবার স্মরণ করেছে, করে তুলেছে মানব ও জীবনদর্শন।

কারণ প্রাচীন ঐতিহ্য দুর্মর। তাই রোমান্টিক শিল্পে-সাহিত্যে ক্লাসিক-প্রীতি নিবিড়। অতীতকে আমরা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি, জাদুবিদ্যা-অলৌকিকতা-দৈবনির্ভরতা ত্যাগ করে বাস্তবে-বিজ্ঞানে ভর করতে শিখেছি, সমষ্টি-আবেগ থেকে ব্যষ্টি-আবেগে উত্তীর্ণ হয়েছি। সে জীবন নেই, সে মানসও নেই। তবু আজকের ব্যষ্টিমনে সেদিনের ভাবনা ফুল হয়ে ফুটে আছে নানা রূপে-রসে। শহুরে কাব্যকে আজ আর মাঠে-মন্দিরে যেতে হয় না, ফসল অথবা দেবতার লীলাকীর্তন করতে হয় না। কবির মনের আকাশে আজ যে তারা জ্বলে তার আলো তাঁর নিজের, যে বলাকা পাখা মেলে, তাঁর চিত্তগুহাই তাদের নীড়। তবু হৃদয় ঐতিহ্যলগ্ন। তাই রোমান্টিক মানস ধ্রুপদী ভাবজগৎ থেকে রস আহরণ করে, তাকে পেরিয়ে আদিম উৎসেও অভিসার করে। আজকের ব্যক্তিগত বাসনালোকে ক্ষণে ক্ষণে বেজে ওঠে 'কালেক্‌টিভ্‌ ইমোশন্‌'-এর তির্যক প্রতিধ্বনি।

তাই দেখি, রবীন্দ্রনাথের অভিজাত মননেও সুপ্রাচীন কৌম ভাবনা রসরূপে স্মৃতিবহ। লিপিকার 'মেঘদূতে' তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন আকাশ-পৃথিবীর চির-পুরাতন বিবাহ-মিলন বার্তা এবং সেই অতীতকে নিয়ে এসেছেন বর্তমানের ভূমিতে: 'সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে'। সূর্য ও পৃথিবীর মিলনের ফল শস্য; সূর্যের আলো সেই মিলনের লিপি, পৃথিবীর শস্য তার উত্তর—ফলে ওঠা আর ঝরে যাওয়া, লিখে লিখে মুছে ফেলা:

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান;
উর্ধ্ব হতে তাই নামে গান।
চিরবিরহের নীল পত্রখানি 'পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।...
বিরহিণী, সে লিপির যে উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।
যুগে যুগে বারবার লিখে লিখে
বারবার মুছে ফেল; (লিপি: পূরবী)

কর্ষণ-প্রজননের অভিরতায় ধারণা টি. এস. এলিঅটের অতি-আধুনিক প্রাগ্রসর

মননশীলতায়ও উদ্ভাসিত। তাঁর ওএস্ট্ ল্যাণ্ড্ কাব্যটির মূল ধুয়া এই তত্ত্ব। এবং অন্যত্রও :

The time of milking and the time of harvest
The time of the coupling of man and woman
And that of beasts (East Cocker : Four Quarters)

শস্যক্ষেত্রে সমবেত কৃষি-উৎসবের ছবি জীবনানন্দ দাশের ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে :

ভুলে গিয়ে কাব্য-জয়-সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে লব তার শীতলতা।
ডেকে লব আইবুড় পাড়াগাঁর মেয়েদের সব,—
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে,—
সুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব। (অবসরের গান)

নবান্নের প্রশস্তি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্রাট-এ :

মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা, পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়। (শস্য-প্রশস্তি)

মৃত্যুমাধ্যম নবজন্মের অভিব্যক্তি বুদ্ধদেব বসুর শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-এ :

যে-মৃত্যুকে ভেদ করে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভুল,
রাশি-রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়,
যে-মৃত্যুকে দীর্ণ ক'রে বরফের কবর কেটে ফুল
জ্বলে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়—
সেই মৃত্যুর—নবজন্মের প্রতীক্ষা করো। (শীতরাত্রির প্রার্থনা)

এককালের অভ্যাস অন্যকালে হয় সংস্কার, নিরন্তর অনুশীলনে সংস্কার হয় ঐতিহ্য, ঐতিহ্য দীপ্ত করে তোলে সংস্কৃতিকে। তখন কাব্যের সংজ্ঞা, হাউপ্ট্ম্যানের ভাষায়, poetic rendering is that which allows the echo of the primitive word to resound through the form—আজকের মনে আদিমের প্রতিধ্বনি, পুরাতনের পটে নতুনের ভূমিকা, এইকালের মৌচাকে ওইকালের সঞ্চিত মধু। এই মধুরসের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'তপোভঙ্গ' কবিতাটি, যার অধিদেবতা নটরাজ শিব।

জন্ম-মরণ-পুনরুজ্জীবন অথবা মিলন-বিচ্ছেদ-পুনর্মিলন : আদি কৃষকের এই চক্রায়ত জীবনতত্ত্ব তপোভঙ্গে নতুন রূপ নিয়েছে। বিচ্ছেদ ও তপস্যা শেষ হল, পুষ্পলাবী দক্ষিণী বায়ু নিয়ে এল মিলনের মন্ত্র :

সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন পত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা শ্যাম বহ্নিশিখা।

তারপর বিচ্ছেদের পালা। রুদ্রের তাণ্ডবনৃত্যে, কালবৈশাখীর নিঃস্ব নিঃশ্বাসে শূন্যতার হাহাকার, আলেয়ার প্রেতনৃত্য :

বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড়নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শান্ত হয়ে আসে।

আবার মিলনের বেলা, বারেবারে অগ্নিতেজে দগ্ধ করে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলা, বসন্তের মধুলগ্নে হারিয়ে-যাওয়াকে ফিরে-পাওয়া। তখন—

উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাক বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে কবি সঙ্গে চলে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব-কাল থেকেই শিবের সঙ্গে কবি এবং কবির সঙ্গে শিব চলেছেন সমতালে, সমচালে।

অ। ইতিহাসের বিচারে কলকাতা কালচারের প্রথম সারিতে কবিগান পাঁচালী প্রভৃতির আসন। কিন্তু জন্মসময় বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এগুলি প্রধানত মধ্যযুগীয়। কবিগানের উদ্ভব সপ্তদশ শতাব্দীতে, বিকাশ ১৭৬০ খ্রীঃ থেকে ৪। তাই প্রাগাধুনিক পর্বে এগুলির উল্লেখ করেছি। রামরাম বসুর লিপিমালায় (১৮০২) শিব এসেছেন গদ্য-ভূমিতে কিন্তু নতুন কোন ভূমিকায় নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২) কবিতায় ৫ অতীতপ্রীতি ও যুগজিজ্ঞাসা উভয় ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সারদামঙ্গল-ধৃত শিবদুর্গার ছবিটি গতানুগতিক এবং শৈব গীতিতে অধ্যাত্মভাবের প্রাধান্য। তাঁর আদর্শ—'আছ জীব শিব হও' এবং শিব—'লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী, সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান।' অন্যদিকে বিলাতগামী মার্শম্যানের উদ্দেশে রচিত ব্যঙ্গকবিতা 'বুড়াশিবের স্তুতি' সমসাময়িক চিন্তার প্রতিফলনে অভিনব। শ্রীরামপুরকে কৈলাস-রূপে বর্ণনা করে তিনি বললেন : 'কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত তুমি বুড়া শিব। তথায় বিরাজ করি তরাতেছ জীব ॥ শুভ্রদেহ ভূতনাথ ভোলা মহেশ্বর। গঙ্গার তরঙ্গ তব মাথার উপর ॥ কখনো প্রখর বেগ কভু থ ম্থম্। বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ॥ …যোড় করে পশুপতি করি নিবেদন। সেখানে করো না গিয়ে প্রজার পীড়ন ॥ ভূতপ্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও। এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও? বাজাই বিদায়ী বাদ্য টম্ টম্ টম্। বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ॥ কিসে তুমি কম?' যেখানে উভয় ভাব সম্মিলিত হয়েছে সেখানে দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সমাজসচেতন জাতীয়তাবোধে : 'শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম, শিবধাম স্বদেশ তোমার।'

আ। 'এ বাসায় তখন পুরোনো কাল সন্ত বিদায় নিয়েছে। নতুন কাল সবে এসে নামল'—শুধু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে নয়, ঊনবিংশ শতক-মধ্যভাগের

কলকাতা কালচারের প্রাণকেন্দ্রে। নতুন কালের আসবাবপত্র অনেকগুলি এসে গেছে, পুরোনো আসবাবের অনেক স্মৃতি তখনও অমলিন। শুধু সমাজ নয়, শাসনক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব—এক পক্ষে কূটনীতি-শোষণ-বিদ্রোহদমন, অন্যপক্ষে শিক্ষার প্রসার ও নিয়মতন্ত্র। সমাজের রূপান্তরও সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ নয়। সংস্কৃতির নানা দিকে তখন দ্বৈত অভিব্যক্তি, বিপরীতের সমাবেশ। ফলে বাঙালীর উত্তরণের পথে-পথে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জীবনে ও মানসে স্ব-বিরোধ। সমসাময়িকতা ও অতীতমুখীনতা, রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতা, ইংরেজপ্রীতি ও স্বাজাত্যচেতনা, কল্যাণী পরিবারভাবনা ও সন্ন্যাসের আদর্শ—একই কালে একই চিত্তকে আন্দোলিত করেছে। সেই আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ও বাণীমূর্তি রুদ্র-শিব। রেনেশাঁস যুগের কবির লেখনীতে নতুন রক্তেরেখায়রসে তাঁর শিল্পায়ন নবরূপ লাভ করেছে। এবং তাঁর সহায়ে ও সাহচর্যে সুরু হয়েছে বাঙালীর জীবনসাধনা, অগ্রসৃত হয়েছে প্রাণধর্ম পুনরুজ্জীবনের দুশ্চর তপস্যা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম থেকেই বিদ্রোহ ও সংগ্রামের দোলাচল অস্থিরতা, বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম পর্যায়ে একে প্রেরণা দিয়েছে পুরাতন থেকে মুক্তিলাভ এবং নতুনকে বরণের আগ্রহ; পরবর্তীকালে একে অনির্বাণ রেখেছে পরাধীনতার গ্লানিবোধ ও স্বাধীনতার সোনা-স্বপ্ন, ব্যষ্টির আত্মমুক্তি ও সমষ্টির প্রগতি-কামনা। ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত চিন্তাচেতনার সকল ক্ষেত্রে বাংলা কাব্যের যাত্রা সুরু রৌদ্ররসে অবগাহন করে। এবং এই রৌদ্ররসের প্রতীক-প্রতিমা রুদ্রশিব। ভারতশিবে দার্শনিকতা ও ভক্তির তত্ত্বরূপ, মধ্যযুগীয় বঙ্গশিবে দেবত্ব ও গৃহভাবনার সমাহার, আধুনিক বাঙালীর শিব জীবন ও দর্শনের সমন্বয়। কি প্রেমের জগতে, কি সংগ্রামের ক্ষেত্রে, কি জাতীয়তাবোধে, কি বিশ্বভাবনায়, শিবকে দেখি বারবার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর এই মধ্যভাগ পর্যন্ত। যেখানে অসহায় নিরাশা কবিচিত্তকে ব্যথায় আকাশনীল করে তুলেছে, সেখানে তিনি; যেখানে পরম আশার রাঙা আলোয় আকাশের নীল হয়েছে সোনা, সেখানেও তিনি। আধুনিক বাঙালী কবি পুরাতন শিবকে আহ্বান করেন নি, তাঁর সনাতনী রূপগুণকে পরিত্যাগও করেননি, নতুন জীবন ও দৃষ্টির আলোকে সেগুলিকে পরিবর্ধিত ও নব অর্থে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। আধুনিক কবির আরাধ্য দেবতাশিব নয়, গৃহিশিব নয়; তাঁর কৃতিত্ব—নতুন কালের নটরাজের আবাহনে, শিবানী-বল্লভের নবীন প্রেমলীলায়, ধ্যানী শিবের নবতর ধ্বনিব্যঞ্জনায়।

আধুনিককালের শিব প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিব থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ অভিনব একটি রূপচিত্রও নন। তাঁর পশ্চাৎপটে যুগযুগান্তব্যাপী ঐতিহ্যের আলোকসম্পাত; সেই আলোকে কবি এঁকেছেন একালের বাস্তব ও কল্পনাকে। ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পে দেবপ্রতিমা ত্রিবিধ: যখন তাঁর নয়নে দৃষ্টি তখন তাঁর মধ্যে পার্থিবতার প্রকাশ; যখন

তিনি নিমীলিতনয়ন তখন তাঁর সমাধির আবেশ; যখন তাঁর ললাটে তৃতীয় নয়নের জ্যোতি তখন তাঁর ভাগবত বোধির উদ্বোধন। ভারতশিব নিমীলিতনয়ন সমাধিমগ্ন যোগী, বঙ্গশিব উন্মীলিতনয়ন গৃহস্থ মানব, আধুনিক শিবের তৃতীয় নয়নে দিব্য বিভা—সে আভা বাস্তবনিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বনিষ্ঠ, জীবন-দর্শনের এবং জীবনদর্শনের। তিনের শিবানী-মিলনেই রুদ্র-শিবের পূর্ণতা ও সমগ্রতা।

ই। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাঙলার মানস-আকাশে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়, তা একটি সুবিহিত শিল্পরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল এক শতাব্দী পরে মধুসূদন-বিহারীলাল-হেমচন্দ্রের সাহিত্যরচনার মধ্যে। তাঁদের শিব প্রবীণ-নবীনের মিশ্রণে অর্ধনারীশ্বর। কবি ব্যবহারিক বোধ ও বিচার প্রণোদিত হয়ে শিবকে নতুনভাবে চিত্রিত করেছেন, শ্রদ্ধাহীন চিত্তে নয় ৬। এখানে শিব মূলত পুরাণভিত্তিক ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী; মধুসূদনে পাশ্চাত্ত্য ছায়াপাত এবং হেমচন্দ্রে পুরাণ-প্রবণতা তাঁর চরিত্রে নতুন রঙ দিয়েছে।

মধুসূদন দত্তের (১৮২৪) মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে কৈলাস গিরি-শিখরে কুমারসম্ভবের নব্য সংস্করণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি আঁকতে গিয়ে কবি কালিদাসকে স্মরণ করেছেন, মদন সেই পূর্বকথা বিবৃতও করেছে। তথাপি দুটি ছবির মধ্যে অনেক পার্থক্য। একটিতে মদনবাণের আঘাতে 'হরস্তু কিঞ্চিৎ-পরিলুপ্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ। উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি'; অন্যটিতে সম্মোহন শরবিদ্ধ

> শিহরিলা শূলপাণি। নড়িল মস্তকে
> জটাজুট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
> ঘোর মড়মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
> অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
> চিত্রভানু, ধক্‌ধকি উজ্জ্বল জ্বলনে। —এপর্যন্ত গাম্ভীর্য অব্যাহত।

কিন্তু তারপরেই মোহিত মোহিনীরূপে

> প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
> লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিলা চাঁদেরে,
> হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবসু!—শিবচরিত্রে তারল্য এনে

দিয়েছে, কালিদাসের হিমালয় পর্বতের ওপর হোমরের আইডা পাহাড় স্থাপিত হয়েছে, শিব-শিবানী জীউস-হেরার ভারতীয় সংস্করণ হয়ে উঠেছেন। হেরা যেমন মোহিনীবেশ ধারণ করে জীউসকে মুগ্ধ করেছিলেন, মধুসূদনের শিবানীও সেইভাবে পশুপতিকে উন্মাদিত করে তোলেন। শিবের এই উন্মদরূপের পশ্চাতে একদিকে যেমন গ্রীক প্রভাব অন্যদিকে তেমনি নিকট-অতীতের ভারতচন্দ্রাদির প্রচ্ছায়াও বিদ্যমান। তবু মধ্যযুগের বাঙালী কবির লেখনীতে শিবের যে কামুকতা ব্যাকুল-বাসনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, আধুনিক কবি তার কাছাকাছিও যান নি। বরং তাঁর

মানবিক রূপই এখানে স্ফূর্তিলাভ করেছে। এরই পাশে দেখি ধ্যানী যোগী শিবের ভাবগম্ভীর মূর্তি। মন্মথসহ কৈলাসে এসে

দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দী তপস্বী
বিভূতিভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন বাহ্যজ্ঞানহত।—মনে পড়ে কালিদাসের 'অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে। এই শ্রদ্ধিত অন্তর নিয়ে কবি দেখেছেন প্রহরণধারী মহাকাল শিবকে এবং বিষাদের প্রতিমূর্তি রাবণের মধ্যে পরম শৈব অনাসক্তি, 'বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে।'

মধুসূদনের শৈব ভক্তির গাঢ়তর প্রকাশ চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে। একাধিক ক্ষেত্রে কাব্যিক অলংকাররূপে শিবের প্রয়োগ ছাড়াও শিব সম্পর্কে স্বতন্ত্র সনেটও তিনি রচনা করেন, যেখানে ধ্রুপদভঙ্গিম কবিকল্পনায় পৌরাণিক শিবের মহিমা স্ফূর্ত হয়েছে। 'নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির' এবং 'নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির' সনেট দুটিতে শিবমন্দির উপলক্ষ ; প্রথমটির লক্ষ্য প্রকৃতির রূপচিত্র, দ্বিতীয়টির বক্তব্য কালের অবশ্যম্ভাবী নশ্বরতা। প্রথমটিতে ভাবুকতার ঐশ্বর্য, দ্বিতীয়টিতে বৈরাগ্যভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং উভয় কবিতায় কবি শিবের প্রতি সশ্রদ্ধ। 'কিরাত-অর্জুনীয়ম্' সনেটটি মহাভারত (বা ভারবির) স্মরণ ও অনুসরণমাত্র নয়। কবিদৃষ্টিতে শিব বীরত্বের প্রতীক, বীরবীর্যে আশুতোষের সন্তোষ :

বীরতা ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্লভ এ বর !—
কি লাজ, অর্জুন, কহ, হারিলে এ রণে ?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর !

এই দর্শন আরও উন্নত ও অতিসম্পন্ন হয়েছে 'বীররস' সনেটটিতে। কবি 'উৎসাহ'কে প্রকাশ করেছেন ব্যোমকেশ ভৈরবরূপে :

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন ! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ, হুঙ্কারি ভীষণে !

ভয়ানক-সুন্দর এই চিত্রটিতে শিবরূপের এক সমুন্নত মহিমা ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের রসকল্পনার অনুসরণ যেমন, তেমনি বীররসে আসক্ত কবির নিজস্ব মনন ও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যও এখানে বর্তমান। কবি যখন শোনান, 'বীর-রস, এ বীরেন্দ্র, রসকুলপতি', তখন দেবকুলপতি দেবাদিদেবের মাহাত্ম্য-উদ্গীতির সঙ্গে সঙ্গে কবির অন্তরলোকে উদ্ভাসিত

শৈব ধারণার মহিম-সুন্দর ছবিটিও উদ্‌ঘাটিত হয়। মেঘনাদবধ কাব্যের শিব আখ্যানের প্রয়োজনে পরিকল্পিত, চতুর্দশপদী কবিতায় শিব কবিচিত্তের ভাবাবেগে আন্তররসান্বিত।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫) যোগী শিবকে স্মরণে রেখে কাব্য রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন ধ্যানী কবি, তাঁর কল্পচিত্রগুলিতে ধ্যানী শিবের প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠেছে। সারদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থে বাল্মীকি তাই যোগীরূপে চিত্রিত, সরস্বতী 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে' এবং কবিমাত্রেই যোগিশিবের প্রতিভাস। বিহারীলালকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল :

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে, ঢুলুঢুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও!

তখন কবি উত্তর দিয়েছিলেন সাধের আসন-এ :

ধেয়াই কাহারে দেবি! নিজে আমি জানিনে!
কবিগুরু বাল্মীকির ধ্যান-ধনে চিনিনে।

এই ধ্যানী শিবকে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮) দেখেছেন, কবি নয়, কর্মীরূপে। বৃত্রসংহার কাব্যে শিব অন্তরীক্ষের দেবতা :

ঐশ্বর্যভূষিত অঙ্গ, সংযত মূরতি,
প্রকাশিতবহ্নি ভালে প্রগাঢ় ভাবনা,
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি।

—তিনি তত্ত্বদর্শী, এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সঙ্গে অভেদ হয়ে 'অতনু হইলা মহাদেব', ত্রিদেবের মিলনে পরব্রহ্মের আবির্ভাব হল। আর একদিকে দৈত্য কর্তৃক শচীহরণের সংবাদ শুনে

ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব যত শূন্যে মিলাইল,
পরশিল জটাজুট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।

—রুদ্র ব্যোমকেশের সংহারমূর্তি ইন্দ্রকে সন্ত্রস্ত করে, বীরভদ্রকে 'সন্ত্রাসিত' করে শিবানীকে কাতর আবেদন জানাতে হয়, 'সম্বর সম্বর দেব সংহার ত্রিশূল'। নবীনতার প্রলেপ সত্ত্বেও কবির শিব অধিকতর পুরাণসম্মত। দশমহাবিদ্যায় সতীহারা শিবের বিরহ-বিলাপ গাম্ভীর্যে পরিমণ্ডিত। তাঁর বেদনাবিমথিত আর্তি নির্বাক স্পন্দন-হীনতায়, ক্রন্দসী কারুণ্যে মহিমময় :

রে সতি, রে সতি, কাঁদিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগমগন হর, তাপস যতদিন,
ততদিন নাহি ছিল ক্লেশ।

হেমচন্দ্রের শিব একদিকে দেবাদিদেব শ্রেষ্ঠ দেবতা, অন্যদিকে জাগতিক দুঃখে যন্ত্রণায় ব্যথিতহৃদয় মানবশ্রেষ্ঠ। মহাকালীর দশমহাবিদ্যার স্বরূপ ও লক্ষণ একমাত্র তাঁরই পরিজ্ঞাত, জগৎ-সমস্যার সমাধান তাঁর হাতে, 'সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন, চরাচর শঙ্করের সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল। ইহা অবিদ্যার মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাশক্তির কি মৃত্যু আছে?' ৭ কবির দৃষ্টিতে শক্তি হলেন বিদ্যা জ্ঞান ভক্তির প্রতীক এবং শিব অবিদ্যামোহের রূপক এবং সেইরূপেই তিনি জীবকুলের প্রতিনিধি।

ঈ। রেনেশাঁস-পর্বের পুরাণপ্রবণতা রেনেশাঁস-উত্তরকালে অনেক ক্ষেত্রে পৌরাণিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু কবির আন্তরিকতা, মানবতা ও জীবনভাবনার অভাব কোথাও হয় নি, সর্বত্রই শিব হৃদয়রসে অভিষিক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত শৈব কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ভারত সরকারের মদনভস্ম, দ্বিজ কালিদাসের কালীবিলাস, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের দক্ষবধ কাব্য, অক্ষয় সরকারের তারকসংহার, হরিবালা দেবীর সতীসংবাদ, শশধর রায়ের ত্রিদিব বিজয়, শরৎ চৌধুরীর দেবীযুদ্ধ, রামগতি চট্টোপাধ্যায়ের সুরারিবধ কাব্য প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য পুরাণাশ্রিত কাব্যগুলিতেও শিব চিত্রিত হয়েছেন। যদিও এগুলি মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকরণ, তথাপি এইসব পুরাণাশ্রয়ী আখ্যায়িকা-কাব্যের কয়েকটিতে দেশপ্রেম ও শৌর্যের আধুনিক মনোভাবও স্ফূর্তি লাভ করেছে। শুধু সাহিত্যজগতে নয়, শিবকে পাই আদর্শবোধ স্বদেশপ্রীতি এবং জাতীয়তাবোধের বলিষ্ঠ কর্মক্ষেত্রেও। Perhaps, Swamiji, Kali is the vision of Shiva—ভগিনী নিবেদিতার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২) বলেছিলেন: The totality of all souls, not the human alone, is the Personal God. The will of the Totality nothing can resist. It is what we know as Law. And this is what we mean by Shiva and Kali and so on ৮। এই অধ্যাত্ম বিশ্বাসবলে পরাধীন ভারতকে ত্যাগে সন্ন্যাসে সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন তিনি, 'হে ভারত! ভুলিও না, তোমার উপাস্য সর্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর' ৯। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে স্বাধীনতাচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে বিপিনচন্দ্র পাল লিখলেন: 'দেবতার ধ্যান মাত্রেই প্রাকৃতাপ্রাকৃত মিশ্রিত। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং ইত্যাদিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুই মিলিয়া আছে।' ১০ সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'আদর্শ পুরুষ চরিত্র শিব' ১১ এবং 'মহাদেব আমাদের পরুষ সৌন্দর্যের চরম আদর্শ। এই যোগিগৃহস্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।...এখন বৈষ্ণব স্বাধীনতায় শৈব সংযম, বৈষ্ণব প্রেমে শৈব বল, বৈষ্ণব মাধুরীতে শৈব গাম্ভীর্য মিশিতে পারিলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়' ১২।

এই সর্বাঙ্গসুন্দরের সামগ্রিক প্রকাশ রবীন্দ্রনাথে ও রাবীন্দ্রিক শিবে।

খ। ঊনবিংশ—বিংশ শতাব্দী

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা। (কবির দীক্ষা : কালের যাত্রা)

কবি-ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১) এই অভিব্যক্তি তাঁর নিজেরই আত্মপরিচয়। কবির ভাবজীবনে বৈষ্ণবীয় দ্বৈত সাধনার বড় স্থান থাকলেও শিব তাঁর প্রাণদেবতা ১৩। হিমালয়দেহে তিনি দেখেছেন মহান দরিদ্র রিক্ত নিরাভরণ স্তব্ধতা এবং তাকে ঘিরে পল্লবে কুসুমে ছায়ায় রৌদ্রে মেঘের খেলায় সফেন চঞ্চল নিত্য মাধুরীচ্ছবি : 'অভেদাঙ্গ হরগৌরী'। এই হরগৌরীর অপরূপ লীলা তাঁর সাহিত্যে দর্শনে ধর্মবোধে, 'তাঁহার রসসাধনা এবং শিবসাধনা তাঁহার কাব্যসৃষ্টির ভিতরে তাই গভীর সঙ্গতি লাভ করিয়াছে।' ১৪ উদ্ধৃত শ্লোকটি এই 'সঙ্গতির' শিল্পরূপ এবং ভাষ্যরূপ তাঁর একটি চিঠিতে : 'আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য। বিশ্ব এই দুয়ের মিলনেই সত্য।...শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে এই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আহ্বান করব যারা বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ, যাদের মধ্যে অভাব আর অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা' (পথে ও পথের প্রান্তে)।

কালিদাসের ভারতদৃষ্টি কবির মন ও মননকে বারেবারে দোলা দিয়েছে এবং সেই দোলন রস ও তত্ত্বরূপে নানা ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানবপূজারী রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল সত্য-সুন্দর-শিবের সমন্বয়, সংযমের তপস্যায় উপভোগের পূর্ণতা ১৫। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কালিদাসের তথা ভারতবর্ষের প্রেমে কবি দেখেছেন ভোগারতির মধ্যে সৌন্দর্যভোগ, দেহসাধনার পরপারে ত্যাগ ১৬, প্রেয়ের পথে শ্রেয়ের সাধনা : 'আমাদের জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণমুখ তাই আমরা দেখব, ভীষণকে সুন্দর বলে জানব, মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি তাঁকে, ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব।...যিনি ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং, তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দলীলার নিত্য সহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাকব—নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। সুন্দরকে জানার জন্য কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার; প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো মরীচিকা' ১৭ এবং 'ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সাধনার সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল। প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।...ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই' ১৮।

এই সাধনা ও সুন্দর, রুদ্রম্ ও শিবম্, ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্যকে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন নিজের মধ্যে ও চারপাশে, প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রেমের কল্পনায়, ঋতুর রূপায়ণে, জীবনের বীর্যবান সংগ্রামে, মরণ-উজ্জীবন তত্ত্বে, অধ্যাত্ম সাধনায়। শিব তাঁর রূপক ও রূপকথা, রূপ ও প্রতীক, জীবন ও দর্শন—বৈষ্ণবের যেমন কৃষ্ণ, শাক্তের যেমন শক্তি, প্লেতোর আক্রোদিতে, বার্নার্ড শ-র সুপারম্যান, বের্গসর মোশন্, হুইটম্যানের বিশ্বমানব, রোমান্টিক কবির পোএট্‌স্ ডারলিং, এবং আত্মারামশ্চ মুনয়োঃ।

অ। আকাশে তারাদের অদলবদলে আলোর রঙবদল—এই উক্তি 'রেনেশাঁস' সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু আলোর এই রঙফেরা স্বাধীন দেশে এবং পরাধীন দেশে একইভাবে হয় না। কারণ দুটো আকাশ এক নয়। একদেশে যে মানস-ফসল বাস্তবক্ষেত্রে জাত, অন্যদেশে তা মুখ্যত মানসিক। অবশ্য নবজন্মের বীজ পরাধীন দেশের নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যেই থাকে, তবু তার অনেকখানি আসে বাইরে থেকে। স্বকীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরকীয় ঐশ্বর্যের মিলন সহজে হয় না; তাছাড়া শিল্পায়ন ও সমাজ-বিবর্তনের অসম্পূর্ণতাও আছে। ফলে তার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা যতটা, দ্বন্দ্ব তার চেয়ে কম নয়। ইউরোপের রেনেশাঁসের সঙ্গে ভারতের রেনেশাঁসের পার্থক্য পরিবেশগত ও কালগত, তাই গুণগতও। বৈপরীত্যের তীব্রতা তার জীবনে, তার মননে। একদিকে শাসনসংস্কার নিরাপত্তা শিক্ষা শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি যেমন অগ্রগতির সূচনা করেছিল, অন্যদিকে তেমনি বিদেশী শাসকের শোষণ পীড়ন সমৃদ্ধি এবং স্বদেশের দারিদ্র্য লাঞ্ছনা দুর্বলতা অনগ্রসরতা দেশবাসীর চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল। মানসজগতেও এই দ্বন্দ্ব: একপক্ষে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ইতিহাস শিল্প দর্শন বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ অনুশীলন, অন্যপক্ষে ঐতিহ্যপ্রীতি স্বাজাত্যবোধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। রেনেশাঁস এবং রেনেশাঁস-উত্তর ভারতের জীবনে ও মানসে সংঘাত-সমন্বয়ের এই বিচিত্র লীলা। কালপ্রবাহে দুই ধারাই গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে; ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লব-আন্দোলন যেমন ক্রমশঃ তীব্রতর হয়েছে, তেমনি শিল্প সাহিত্য চিন্তার সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিশ্রণ দ্রুততর হয়ে উঠেছে। বাঙলায় এই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি কলকাতা, কেন্দ্র থেকে আবর্তিত ঢেউ ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলে, এমন কি প্রতিবেশী রাজ্যেও। সে-ঢেউ নতুন করে ঘর বাঁধার সংকেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ অভিঘাতে বাঙালী মানস বিবর্তিত হল নতুনতর সমীক্ষা ও সন্ধিৎসার পথে। ইউরোপে অগ্রসৃত জ্ঞানের অনুশীলন এবং বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার তাতে ইন্ধন জোগাল; মধ্যবিত্ত সমাজে ভাঙন, শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট তাকে প্রদীপ্ত করে তুলল। গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বাধীনতা-আন্দোলন গণসংগ্রামের রূপ নিল; জাতীয়তাবোধে যুক্ত হল আন্তর্জাতিকতা, সেই সঙ্গে সাম্যের চেতনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি পৃথিবীর ইতিহাস এই

বাঁকফেরাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শিল্পের সম্প্রসারণ সাম্যবোধের অনুশীলন চিত্তকে অগ্রস্থতি দিল, বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠল। বিয়াল্লিশের আন্দোলন এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঘাত-প্রতিঘাত চূড়ান্ত রূপ নিল। জীবন সম্পর্কে পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে চুরে নতুন মূল্যায়ন দানা বাঁধতে লাগল, পৃথিবীর অত্যাচারিত জাতির পাশে এসে দাঁড়াল ভারতের মুক্তিসাধনা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-অর্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক, বিশ-ত্রিশের দশক, এবং উত্তরতিরিশ—এই তিনটি বড় পর্বে বাঙালীর জীবন ও মানস বিরোধ-সমন্বয়ের অসমতল পথে অগ্রসর হয়েছে, তার প্রতি পদক্ষেপে ছোটছোট আবর্তের ঘূর্ণি। বাস্তবের এই পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যেরও তিনটি পর্যায় অভিব্যক্ত হয়েছে: প্রথম পর্বে রোমান্টিকতার প্রাধান্য, দ্বিতীয় পর্বে মননশীলতার, তৃতীয় পর্বে রোমান্টিক মননে যুক্ত হয়েছে সহজ বাস্তবতা (বলা বাহুল্য, এই বিভাগের দ্বারা একের এলাকায় অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় নি)। স্বদেশ ও বিশ্ব-ইতিহাসের পটভূমিকায় বাঙালী সংস্কৃতির এই ঋতুবদলে রীতিবদল হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যসৃষ্টির। ব্যাপকতর অর্থে, বস্তুলোকের সমতালে তাঁর সৃজনশিল্পেরও তিন পর্যায়: রোমান্টিক-দার্শনিক-রিয়েলিস্ট (এখানেও একের মধ্যে অন্য দুটি অনুস্যূত, বিভাজন প্রাধান্যের দিক থেকে)। ত্রিধারার মিলনে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, প্রতিপদে যার আপনারে জয় করে চলা, প্রতি কাব্যে যার নিরন্তর পরিবর্তন এবং রূপান্তরিত ঢেউগুলির পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রস্থতি।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি—এই উক্তি মোহগ্রস্ত উচ্ছ্বাস অথবা অন্ধ আবেগের ফল নয়। প্রকরণে-প্রত্যয়ে অভিনব তাঁর অনন্ত প্রতিভায় বহুর সম্মেলন এবং বিচিত্রের ঐক্য সম্পাদিত হয়েছে, দেশবিদেশের সঙ্গে স্বদেশের গভীর যোগ স্থাপিত হয়েছে। গতকালীন স্বপ্নলোক ও সমকালীন বস্তুলোক, বিগত ঐতিহ্য ও বর্তমানের ঐশ্বর্য, মাতৃভূমি ও বিশ্বভূমি তাঁর রচনায় একইকালে ছায়াবিস্তার করেছে। তাঁর সাধনায় নিবিড় মিলন হয়েছে অভিজাত চিন্তার সঙ্গে লোকায়ত চেতনার, কল্পনার সঙ্গে প্রজ্ঞার, শিল্পায়নের সঙ্গে মানবমমতার। বাঙলাদেশ তাঁর জননী জন্মভূমি, তার প্রতিটি স্পন্দন তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন; শাস্ত্র সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরাত্মা এবং প্রাণপ্রবাহকে তিনি সমগ্রভাবে উপলব্ধি করেছেন; সংস্কৃতিসংযোগের মাধ্যমে প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাণকেন্দ্রকে স্পর্শ করেছেন; পাশ্চাত্ত্য জীবননিষ্ঠ মনন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনকে পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতসংস্কৃতির ভাষ্যকার এবং নব-ভারতের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে যেমন ভোলেন নি, তেমনি রূপ দিয়েছেন প্রাণ দিয়েছেন বিশ্বমানবতাকে। এই ভূমৈব প্রতিভার বিরাট আকাশে রুদ্রশিবের যে রূপময় প্রকাশ, তা এক মহৎ ও বিরাট অভিব্যক্তি। ভারতবর্ষের

ইতিহাসে ও ভূগোলে, সংস্কৃতির অন্তরে-বাহিরে রুদ্রশিবের যে যুগযুগান্তরব্যাপী লীলা, তার মর্মমূলে কবি প্রবেশ করেছেন, তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ এবং ব্যক্তিগত দর্শনকে। ঐতিহ্যের রাজপথে শিবের যে সমস্ত রূপ-গুণ-লক্ষণ শিল্পরসতা লাভ করেছে, কবি সেগুলিকে যথাযথ রেখেই নবীন ভাবেরসে নবতর অর্থে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন, বৃহত্তর ও পূর্ণতর পটভূমিকায় শিবসংস্কৃতিতে সুষম সৌন্দর্য এনেছেন। যোগ হয়ে গেছে সেকালে আর একালে।

হিমালয়ের নির্জন শিখরে যার রূপ এক, সমুদ্রের বিজন তরঙ্গচূড়ায় তার রূপ আর। ভারতশিব প্রমথ ও দেবতা, বঙ্গশিব দেবতা ও মানব, রবীন্দ্র-শিব লীলা ও তত্ত্ব; সে লীলা কবির, সে তত্ত্ব জীবনপন্থ। তার যোগ অতীতে, যোগফল বর্তমানে। উত্তর ভারতে দেবতা যখন এক তখন তিনি আশুতোষ ধ্যানী, যখন দুই তখন শিব-পার্বতী; দক্ষিণ ভারতে দেবতা যখন এক তখন তিনি প্রলয়ী নটরাজ, যখন দুই তখন মহাকাল-মহাকালী। প্রাগাধুনিক বাঙলায় উত্তরীয় প্রভাব ছিল সমধিক। রবীন্দ্রনাথ উভয় প্রান্তের উচ্চকোটি ও নিম্নকোটি শিবকে গ্রহণ ও সমন্বিত করেছেন—যিনি এককরূপে ধ্যানী ও নটরাজ, দ্বৈতরূপে উমা-মহেশ্বর ও মহাকাল-মহাকালী। আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখি, প্রাচ্যের ইষ্টদেবতা শান্ত যোগিরাজ এবং পাশ্চাত্ত্যের উপাস্য দেবতা অশান্ত নটরাজ। কবির শৈবদৃষ্টিতে এই সত্য প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি অনুভব করেছেন, উভয়ের যোগেই পূর্ণতা ও সৌষম্য। তাই তিনি ধ্বংসকে আমন্ত্রণ করেছেন সৃষ্টির অগ্রদূতরূপে, বিচ্ছেদকে জেনেছেন মিলন ও মুক্তির সেতুরূপে, অমৃত চেয়েছেন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এবং সত্য-সুন্দর-শিবকে সংযম-সন্ন্যাস-সংগ্রাম মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ শিব-প্রতিমার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার।

আর্য ঋষির মননে পরম-এক বহুরূপে প্রকাশমান। বহুর মধ্যে সেই একের উপলব্ধি বিশ্বজ্ঞান, একের মধ্যে বহুর অনুভব ব্রহ্মজ্ঞান। রবীন্দ্রমানস শিব ব্রহ্ম ও বিশ্ব: 'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে-বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনবিমুক্ত হয়' (নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা)। কবিচিত্তের রূপলোকে বহুর সাধনা, তা বহুচারী, তা জীবন ও শিল্পসাধনা। সেখানে তিনি শিবকে এঁকেছেন কোথাও শিবানীসহ দ্বিবচনে, কোথাও একবচনে—প্রলয়ী নটরাজ এবং স্রষ্টা ধ্যানী রূপে। তাঁকে দেখেছেন বাস্তবভূমিতে ও কল্পনার আকাশে, ব্যষ্টিগত ভাবনা ও সমষ্টিগত আদর্শে, রাষ্ট্রিক-সামাজিক ভাঙাগড়ায়, মনুষ্যত্বধর্ম উদ্বোধনে, প্রকৃতিতে-ঋতুতে, রতি-আরতিতে, সংগ্রাম ও তার বিরতিতে। কবিচিত্তের রসলোকে একের সাধনা, তা একচারী, তা ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনা। সেখানে শিব কবির ইষ্ট, আত্মীয় দর্শন,

বোধিদৃষ্টির কেন্দ্রীয় শক্তি, দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে যাত্রাপথের আলোক ও পথশেষের অ-লোক পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের শিব ভারতীয় হয়েও রাবীন্দ্রিক—কবির জীবনদেবতা-কাব্যদেবতা-বিশ্বদেবতা।

আ। দুটি কিশোর কবিতা রবীন্দ্রনাথের শৈব ভাবনার সূক্ষ্মরেখা। ক্রমে রেখা আকার নিয়েছে, প্রাণ পেয়েছে, এগিয়ে গেছে ক্রম-অভিব্যক্ত হতে হতে। কবিতা দুটি ১৯—শৈশব সংগীতের 'হরহৃদে কালিকা' এবং প্রভাতসংগীতের 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়'।

হরহৃদে কালিকা : কে তুই লো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারীর সর্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?
নাই হোথা সুখ-আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের—পৃথিবীর ভাবনা!

শিবের বুকে শ্যামা, পাষাণহৃদয়ে আলোকময়ীর চপল নৃত্য। ভিখারী হরের সংসারভাবনা নেই, কবির চিত্তেও একটিমাত্র স্বপ্ন, 'জগতে থাকিয়া আমি থাকি তার বাহিরে।' হৃদয়ে দেবীর রূপ ভরে নিয়ে তিনি সর্বত্যাগী হবেন। তারপর একদিন প্রলয়শিঙা বেজে উঠবে, আলোড়ন উঠবে, বন্ধন টুটবে, দেবীর নৃত্যের তালেতালে কবির মনও নেচে উঠবে :

দেখিব হৃদয় মাঝে, কেমনে ও বামা নাচে
উন্মাদিনী প্রলয়ের ঘোর গীতি গাহিয়া।

একসময়ে প্রলয়ের অন্ত হবে, নেমে আসবে নিবিড় স্তব্ধতা, অনন্ত অন্ধকার, আর কবি ভাসতে থাকবেন সেই না-তীর না-তরঙ্গ আঁধারসাগরে :

তখনো রবি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনাবাসনাহীন এই বুক মাড়ায়ে?

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় : মহাশূন্যে ধ্যানরত ব্রহ্মার চতুর্মুখ থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল বেদগান। জন্ম নিল আনন্দ ও প্রেম। বিষ্ণুর শঙ্খনাদে ধরা দিল প্রাণের উল্লাস, ছন্দিত হল সৌন্দর্য। এইভাবে কেটে গেল যুগযুগান্তর। তারপর একদিন এল শ্রান্তি অশান্তি বিক্ষোভ বিলাপ—আর নিয়মের পাঠ নয়, 'সাধ গেছে খেলা করিবারে'। কামনা হল প্রার্থনা, 'গাও দেব মরণ সঙ্গীত, পাব মোরা নূতন জীবন।' জগতের আর্তক্রন্দনে মহেশ্বর জেগে উঠলেন :

প্রলয় পিনাক তুলি ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগৎ চাপিয়া—
জগতের আদি অন্ত থর থর থর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সমস্ত বন্ধন, গ্রহতারকারা মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে, ছন্দ-বেতুল জগৎ মেতে উঠল ধ্বংসের উন্মদ আনন্দে ; সৃষ্টির আদিতে ছিল 'অনন্ত অন্ধকার', অন্তিমে রইল 'অসীম হুতাশন' :

অনন্ত আকাশ গ্রাসি অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

প্রলয়ের পটভূমিকায় রচিত কবিতা দুটিতে আধুনিক গীতিকবি তত্ত্বকথাকে পরিণত করেছেন আত্মকথায়। প্রথমটিতে শিব ও শ্যামা সাংখ্যের তত্ত্ব, তন্ত্রের দেবতা। শবরূপী মহাকাল নিস্পন্দ যোগী, নৃত্যপরা মহাকালী স্পন্দিত চৈতন্য, স্থির সমুদ্রে অস্থির তরঙ্গ। কবির কাছে এই প্রতিমা প্রেমের পরিপ্রকাশ; দুজনে মিলে দর্শনের সমগ্রতা, সৃষ্টি-লয়ের নিত্য-অনিত্যের যুগল রূপ। আবার কবি যখন শিবের সঙ্গে অভেদ, তখন তিনি প্রেমিক-ধ্যানী, দেবী তাঁর হৃদয়লগ্না। দ্বিতীয় কবিতায় শিব একক, ত্রিদেবের অন্যতম, লয়ের বিধাতা, কালের অধীশ্বর। তিনি যতিপাতনের অবকাশে ছন্দকে দুলিয়ে দেন, নিয়মের বন্ধন ছিন্ন করেন ধ্বংস-মাধ্যমে, মৃত্যুর আঘাতে জীবনকে দেন গতি শক্তি পূর্ণতা ও সুন্দরতা। তিনি ধ্যান করেন প্রলয়ের প্রস্তুতিতে, লয় করেন নটরাজ মূর্তিতে, প্রলয়ান্তে আবার ধ্যানে বসেন নবসৃষ্টির উল্লাসে। মৃত্যুমাধ্যমে উচ্ছলিত হয় অমৃত।

কিশোর-কবির একটুখানি মনে এই যে অনেকখানির বীজ, তা নবনব ভাবে-ভঙ্গিতে ক্রমবিকশিত বৈচিত্র্য ও পূর্ণত্ব লাভ করেছে। ধ্যানী ও নটরাজ শিব, শিবানীবল্লভ শিব ছড়িয়ে পড়েছেন কবির শিল্পচেতনায় ও দর্শনচিন্তায় রসমূর্তি ও রূপপ্রতিমা হয়ে। সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে তিল-তিল করে গড়ে-ওঠা 'রবীন্দ্রশিব' বহুরূপান্বিত, আবার সব মিলিয়ে এক ও সমগ্র।

ই। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের প্রথম পর্বে শিব-শিবানীর কাব্যচিত্রগুলি ঐতিহ্যের অনুগামী, রঙ ও রেখা কবির নিজস্ব। তিনি দেবদম্পতির আনন্দিত সহচর, প্রকৃতির বুকে দেখেন যোগী ও নটরাজকে, যাঁর আবির্ভাবে সীমা বিলীন হয় মহাজীবনের অসীমতায়। নৈবেদ্যের রুদ্র উপনিষদের ব্রহ্ম, শৈবদের আরাধ্য, কবির দীক্ষাগুরু। নৈবেদ্য কল্পনা উৎসর্গে পাই কালিদাসের ভাবানুসারী শিবানী-শিবকে। খেয়ার অধ্যাত্ম ভাবনায় দেবতার আবির্ভাব দুঃখরাতের রাজা হয়ে। এপর্বে কবির শিব মধুরতা সত্ত্বেও ঐশ্বর্যভাবান্বিত। দ্বিতীয় পর্বের 'বলাকা' থেকে রবীন্দ্রমানসে যে স্বকীয় দার্শনিক তত্ত্বের স্ফুরণ, তার আশ্রয় ও প্রাণকেন্দ্র শিব। পূর্বে উৎসর্গের 'মরণ' কবিতায় কবি শিবকে দেখেছিলেন এক নতুন রূপে, বলাকা-পূরবীর সংগ্রাম ও গতিমুখর তত্ত্বে সেই দেখা হয়েছে দর্শন। তাঁর এই সময়ের অধ্যাত্ম ও জীবন-ভাবনার সকল ক্ষেত্রে রুদ্র-শিবের অভিপ্রকাশ। প্রকৃতির পালাবদলে, প্রেমের মন্ত্রণায় অনুভব করেছেন তাঁর রঙ্গলীলা ও লীলারূপ, মহুয়া বনবাণী এ অনুভূতির আধার। কবির মননরসে সঞ্জীবিত রুদ্র-শিব প্রেমিক কিন্তু পথিক, অনুরাগী হয়েও বৈরাগী, বিলাসী সত্ত্বেও বিবাগী, সংযমী ও সংগ্রামী। উপলব্ধির গভীরতায় কবি ও শিব ক্ষণে ক্ষণে অভিন্ন হয়ে গেছেন; সেই আনন্দিত মুহূর্তে কবির ইষ্টদেবতা

ঐশ্বর্য সত্ত্বেও মধুরভাবাশ্রিত। এই দুই পর্বের যোগে এবং অতিরিক্ত স্বকীয়তায় তৃতীয় পর্ব আরও সহজ সুন্দর গভীর। একদিকে তাঁর আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিচিন্তা যেমন নিবিড়, অন্যদিকে তেমনি তাঁর জীবনচেতনা, মানবমমতা ও সমাজভাবনা ব্যাপক। এখানেও কবির অন্তর্জীবন ও বাহিরজীবন, আত্মবোধি ও বিশ্ববোধের নিয়ন্তা শিব, যিনি ধ্যানী ও নটরাজ। পুনশ্চ পত্রপুট শেষ সপ্তকের আধ্যাত্মিকতায় তাঁর সহযোগিতায় মৃত্যু আনে পূর্ণতা, আত্মা উপনীত হয় জীবনমৃত্যুর মহাসংগমসমুদ্রে; শেষ পর্বের আত্মচিন্তায় ব্যক্তিচিত্তের যে বন্ধনক্ষয়ের কামনা ব্যক্ত হয়েছে, সেখানেও আছেন এই দেবতা। সমষ্টির ক্ষেত্রে কবি শিবকে দেখেছেন মহাকাল-ভৈরবরূপে, মানবত্রাতা এবং সমসমাজের উদ্‌গাতা রূপে—পূর্বগামী অচলায়তন মুক্তধারা রক্তকরবী কালের যাত্রা নাট্যপালায়। রিয়েলিস্ট কবির এই পৃথ্বীপ্রীতি ও মানবতার দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর প্রকাশ ঘটেছে পুনশ্চ পত্রপুট প্রান্তিক নবজাতক সেঁজুতি আরোগ্য জন্মদিনে প্রভৃতি গ্রন্থের কালসচেতন কবিতাগুলিতে। পুরাতন পচনশীল ব্যাধিগ্রস্ত পৃথিবীকে মুছে ফেলে নতুন পৃথিবী নতুন প্রাণ রচনা করবেন যে রুদ্রশিব, জড়ে-চেতনে রূপলোকে-রসলোকে যাঁর নিত্য প্রকাশ, তিনি ঐশ্বর্য-মধুর: একই সঙ্গে প্রলয়ী ও প্রণয়ী, তত্ত্ব ও লীলা।

রবীন্দ্রশিবের সৌষম্য ও সংহতি নৃত্যনাট্যে, বিশেষত ঋতুনাট্যে ২০। জীবন-পালা এবং জীবনলীলা তথা জীবনদর্শনের এক অভিনব সমন্বয় ঘটেছে এখানে। কবির সামগ্রিক দৃষ্টিতে একের মধ্যে সব, সবের মধ্যে এক, সেই এক শিব। বিশ্বের আবর্তন ও চিত্তের বিবর্তন নটরাজেরই ঋতুরঙ্গ—নটরাজ শিব এর নাট্যকার ও প্রযোজক। রবীন্দ্রশিবের এই বিবর্তরূপের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে তাঁর সংখ্যাহীন গদ্যরচনা, যেখানে কবির শৈব ভাবনা অভিব্যক্ত হয়েছে চোখে-দেখা জগৎ এবং মনে-ভাবা তত্ত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। এই ভাবনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিফলন হয়েছে তাঁর উপন্যাসে গল্পে নাটকে চরিত্রে চিত্রে এবং গানে-গানে। রবীন্দ্রসংগীতে রবীন্দ্রশিবের যে আলোকময় প্রকাশ, তা তাঁর ভাবনা-কল্পনার অন্তরঙ্গ রসরূপ—আরও নিবিড় ও গভীর, আরও বিধুর ও মধুর।

রবীন্দ্রমানসের বিভিন্ন দিকে রবীন্দ্রশিবের যে বিচিত্র অভিব্যক্তি, এখন আমরা সেগুলিকে দেখব বিষয় অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত করে—প্রেম, প্রকৃতি, জীবনসংগ্রাম গীতিময়তা এবং অধ্যাত্মচিন্তায়।

ক। কড়ি ও কোমলে প্রেমের দেহসীমার যন্ত্রণা মানসীতে মুক্তির মন্ত্র-পিয়াসী। ক্রমে সীমাহীন ও বৈদেহী ভালবাসার অভিমুখে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় অভিসারী হয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি দেখলেন, মহাযোগী শিব কামকে ভস্ম করে প্রেমকে দিয়েছেন দেহহীন বিশ্বজনীনতা।

তাই ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

এবং পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণ মন উল্লসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে। (মদনভস্মের পর : কল্পনা)

প্রেমের দেবতার বিদেহী সত্তার অনিবার্য প্রভাব ধ্যানরত শিবকেও চঞ্চল করে তোলে। সেই চঞ্চলতার ফলই যেন নৈবেদ্য-উৎসর্গের 'ভবভবানীর প্রেমগাথা'। কবি আঁকেন শিব-পার্বতীর মধুর দাম্পত্য চিত্র। কিন্তু যিনি মদনদহন, তিনিই আবার মদনজিত হলেন কেন? কবির মনে তাই প্রশ্ন জাগে :

নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে! কিছু নাহি চাহি যাঁর
তিনি কেন চাহিলেন, ভালবাসিলেন নির্বিকার,
পরিলেন পরিণয়পাশ!

—এর উত্তর তিনি পেলেন পূরবীতে এসে, ধরে রাখলেন তাকে 'তপোভঙ্গ' কবিতার সাংগীতিক চিত্রল আলিম্পনে। যৌবনবেদনরসে উচ্ছল প্রেমসুন্দর দিনগুলি এখন অতীতের স্মৃতি; তবু তারা কালের অধীশ্বর ভোলা সন্ন্যাসীর তাণ্ডব নৃত্যে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তারা আছে তাঁর ধ্যানের নিগূঢ় নৈঃশব্দ্যে। ত্যাগব্রত সংযম ও সৌন্দর্য-উপভোগ, বিচ্ছেদ ও মিলন, উভয়ের যোগেই সার্থকতা পূর্ণতা; এই পূর্ণতার সাধনাই শিবসাধনা; তাঁর প্রণয় প্রেমের অভিনয় নয়, শক্তির তপস্যা। কবি উপলব্ধি করলেন, শিবের সেদিনের পরিণয় ত্যাগের দ্বারা পবিত্র, সন্ন্যাসের দ্বারা শুদ্ধ; এবং আজকের এই তপস্যা সুন্দরেরই ধ্যান, আনন্দের সন্ধানে বৈরাগ্যের ছদ্মরণ। যেদিন এই ত্যাগধর্ম পূর্ণ হয়ে উঠবে, সেদিন বন্দী যৌবন আবার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে 'বাহিরিবে ব্যগ্রবেগে উচ্চ কল্লোচ্ছ্বাসে' :

তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্ত দুঃখদাহে।
ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি,
দেখি আমি যুগে যুগে

মধুমাসে আসে সেই মিলনের লগ্ন, উমার কপোলে জাগে স্মিতহাস্য বিকশিত লাজ, বিবাহের যাত্রাপথতলে কবির ডাক আসে; প্রেমিক সন্ন্যাসীর অস্থিমালার স্থানে মাধবীবল্লরী, চিতাভস্মের স্থানে পুষ্পরেণু আর প্রিয়ার অধরে কৌতুকের হাসি : সে হাস্তে মন্ত্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে কবির পরাণে। যিনি চিরত্যাগী স্বেচ্ছা-নির্বন্ধ, তিনি উমার কোমল হাতে ধরা দিলেন কবির ষড়যন্ত্রে। এ পরাভব সুন্দরের কাছে সন্ন্যাসের, এই সংযম সৌন্দর্যে উপনীতির সাধনা।

একদিকে রসের সাধনা, অন্যদিকে শক্তির সাধনা—রবীন্দ্রকাব্যে শিবের এই দ্বিবিধ রূপ। এই বীর সন্ন্যাসীর কল্যাণসুন্দর প্রেমারতির সূচনা উদ্ধৃত

কবিতাগুলিতে, পরিণত প্রকাশ মহুয়া কাব্যে। প্রথম কবিতা 'উজ্জীবনে' মূল সুরটি নিহিত :

ভস্ম অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু—
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক ; হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

এই শক্তিনির্ভর প্রেমের সাধনা মহুয়ার প্রণয়ের প্রসাধনকলা ও সাধনবেগকে ধারণ করে আছে। তাই প্রেম আসে দুঃখরাতের রাজার মত অকস্মাৎ 'বিপুল বিদ্রোহে', তার 'অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন'। প্রেম যেমন সন্ন্যাসী, প্রেমিকাও তেমনি তপস্বিনী ; মানুষের মধ্যে যে দেবতা, তারই গলে বরমাল্য দেবে সে, যে 'ফেলেনি ছায়া ছায়ার মাঝারে', যে পথপ্রান্তে একাকী, মুক্ত ও পূর্ণ। সেখানে

যে রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহরস, তাই দিয়ে ভরিয়া আধার
কোন্ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার। (একাকী)

আর রিক্তবিত্ত উদাসী সন্ন্যাসী-মেঘ যখন উড়ে যাবে গৌরীশংকরের তীর্থপথে, তখন পূর্ণতার গম্ভীরতায়, মুক্তির শান্তির মাঝখানে 'তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে চক্ষু নাহি জানে।' মহুয়ার প্রেম তাই ছুটে চলে দুর্গম পথে দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে। তার ঘোষণাপত্রে লেখা হয় :

আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব, চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—তুমি আছ, আমি আছি। (নির্ভয়)

দুজনের একজন বলে : যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন (সবলা)

আর অন্যজন জানায় : সেবাকক্ষে করি না আহ্বান—
শুনাও তাহারি জয়গান

যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত। (লাঞ্ছিত)

কাব্যজীবনের প্রথম পর্বে কবির প্রেমসাধনা মুখ্যত রোমান্টিক, মিলন-বিরহের স্বপ্নসম্ভব সেতুরচনা। ক্রমে তাঁর মননে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, দাম্পত্য সম্বন্ধ এবং প্রেমাদর্শ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার আলোড়ন হতে থাকে। একদা কালিদাসের অনুসরণে তিনি নারীকে জেনেছিলেন উর্বশী ও লক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদের পথ দিয়ে চেয়েছিলেন মিলন ও কল্যাণী প্রেমের প্রতিষ্ঠা। সে ধারণা পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত হয়ে কবির নিজস্ব ভাবনা আকার নিল। প্রাচীন সাহিত্য থেকে লিপিকা এবং তারও পরে ছড়িয়ে আছে এই বিবর্তমান চিন্তার স্বাক্ষরগুলি। এই প্রসঙ্গে সমাজ গ্রন্থের 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রভৃতি নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য। কাব্যের ক্ষেত্রে পূরবী-মহুয়া থেকে দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। পূরবীতে কবির আশা ছিল, 'ধন মান নয় কিছু ভালবাসা'। এখানে বিরহশেষে মিলনের কথাই বলা হয়েছে :

স্বর্গ হতে মিলনের সুধা
মর্ত্যের বিচ্ছেদপাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বসুধা ; (লিপি)

আবার এখানেই কতকগুলি কবিতায় আছে মিলনাস্তিক বিরহের পালা, ছেদহীন বিচ্ছেদের পূরবী রাগিণী। 'অপরিচিতা-আনমনা-শেষ বসন্ত-মধু-পথ' ইত্যাদি কবিতার সরণিতে বেজে উঠেছে অজানার পদধ্বনি। এই ধ্বনি রস হল মহুয়ায়, যেখানে কবির প্রেমভাবনা একটি তত্ত্বরূপ নিয়েছে। এ-প্রেম বিরাগী : মিলনের আগে তার প্রস্তুতি-প্রসাধনকলা, মিলনমুহূর্তে রসোল্লাস-সাধনবেগ, মিলনশেষে হাসিমুখে চলে যাওয়া ; সেই চলার পথে পথে চিত্তের শোধন, আত্মার বিস্ফার। এই প্রেম পথিক—বলিষ্ঠ সংযম, দৃঢ় প্রত্যয় এবং শৈব অনাসক্তিতে ত্যাগাঙ্গ ভোগের সাধনা। শুধু মানবচিত্তে নয়, প্রকৃতির রঙ্গপটেও তার আসা-যাওয়ার নিত্য লীলা। গ্রীষ্ম-বর্ষার পর আসে শরৎ, ধরণী হয় ফলবতী ফুলবতী ; তারপর বিজয়া ; হেমন্ত-শীত পথ করে দেয়, বসন্ত আসে ; পৃথিবী হয় বসুন্ধরা, অন্নে-বর্ণে বাসন্তিকা ; তাকেও চলে যেতে হয়। এমনিভাবে মনের আকাশেও ঋতুবদল হয় ; যে যায় সে আর আসে না, মনে তার নিত্য যাওয়া-আসা ; ক্ষণিকের মিলন হৃদয়কে রাঙিয়ে দিয়ে যায়, কর্মে প্রবৃত্তি দেয়, চিত্তকে বিশ্ব-অনুগ করে। তাই এ মিলনে উচ্ছ্বাস নেই, এ বিরহে বেদনা নেই :

নাই পিছে ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি। (নৈবেদ্য)

সাহিত্য গ্রন্থে কবি বলেছিলেন, 'শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই।' তাই উত্তরকালে কবি আহ্বান করেছেন শৈবভাবান্বিত প্রেমকে, যা মনকে নিয়ে

যাবে ত্যাগ-বীর্য-কর্মের পথে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমাদর্শ চতুরঙ্গ-তপতী-বাঁশরীতে অবশ্য তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছে; কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে তা যৌন-মনস্তত্ত্বের ভিত্তিচ্যুত নয়। প্রেমবৃত্তিকে তিনি অস্বীকার বা অবদমন করতে চান নি, রৌদ্র সাধনায় উজ্জীবিত করে তুলেছেন, অগ্নিস্নাত অতনুকে দিয়েছেন বীরতনু, দগ্ধকাম বীর্যবান প্রেমকে স্থাপন করেছেন জীবনসংগ্রামের কঠিন অসমতল ভূমিতে। কবির শেষজীবনের কবিতায় গল্পে নৃত্যনাট্যে এই সংযত কর্মিষ্ঠ ভালোবাসা নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর এই আদর্শ অসামাজিক অবাস্তব নয় বলেই শান্তিনিকেতনের আশ্রমবালিকাদের বিবাহগীতিতে একই সুরে আশীর্বাদ করেছেন:

প্রেম নাহি কৃপণতা জানে,
আত্মরক্ষা করে আত্মদানে,
ত্যাগবীর্যে লভে মুক্তিধন। (ভীরু: বিচিত্রিতা)

বৈরাগ্যের এই শুদ্ধ ব্যাকুলতা বীথিকার 'সন্ন্যাসী' কবিতায়। মহেশ্বর সন্ন্যাসী এবং

মন্দাকিনীর নির্ঝরিণীধারা
কলহাস্যে মুখরিয়া
উদ্ধত নন্দীর রুষ্ট তর্জনীরে করে পরিহাস,
ক্ষণে ক্ষণে করে তব তপোনাশ;

শিবের মত এরাও নিয়মবন্ধহারা। সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে অরণ্যের দোলায় যৌবনের উদ্বেল কল্লোলে তাদের প্রাণশক্তি দুর্দম; তারা তাঁর বাহু ধরে নাচের ছন্দ নিয়ে আসে। তাই তারা

আনে চাঞ্চল্যের অর্ঘ নিরন্তর তব শান্তি নাশি,
এই তো তোমার পূজা, জান তাহা হে বীর সন্ন্যাসী।

কবির দৃষ্টিতে সবুজের জয়-অভিযান আর মহাদেবের তপোভঙ্গ এক হয়ে গেছে। কারণ বন্ধনই মৃত্যু, মৃত্যুই মুক্তি। বাঁধনহারা পাগলামির মধ্যেই আছে অগ্রগতি, আছে সৃষ্টির আলোকিত পথ, সেপথে 'রুদ্রের প্রসাদ' একমাত্র সঙ্গী। নবজাতকের 'ক্যাণ্ডীয় নাচে' মহাদেবের তপোভঙ্গে

উঠল জ্বলে দুর্দাম তাঁর প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
নাচের বহ্নিশিখা
নিদয়া নির্ভীকা।

এ নাচ মৃদু লতার দোলন নয়, পাতার থরথর কাঁপন নয়:

নটরাজ যে পুরুষ তিনি, তাণ্ডবে তাঁর সাধন,
আপন শক্তি মুক্ত করে ছেঁড়েন আপন বাঁধন;
দুঃখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয়,
জয়ের নৃত্যে আপনাকে তাঁর জয়।

এই বীর্যবান প্রেমের সাধনা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ও নাটকে রূপায়িত,

যেখানে প্রধান চরিত্রগুলি শৈবভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। ত্যাগ ও আঘাতের আলোয় সন্ন্যাসী গোরার মোহমুক্তি হল, সে পেল সুচরিতাকে কল্যাণী প্রেমের দীপ্তিতে। অভিঘাতে জেগে উঠল বিমলার মন নিখিলেশের প্রতি মাঙ্গলিক প্রেমে। অমিত-লাবণ্যের বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে এল, বিরহ নয়, তুটি মনের সমৃদ্ধি ও চিত্তের বিস্ফার। বাঁশরী ভালোবাসল সোমশংকরকে, সুষমা পুরন্দরকে, কিন্তু পেল না ; এই বিরহের সমুদ্রপানেই তাদের প্রেমের পূর্ণতা। রাজা ও রানী নাটকে সুমিত্রা চেয়েছিল রানীরও অধিকার ; তপতীর স্থায়ী ভাব এই বীরতনু প্রেম, 'উজ্জীবন' তার ধ্রুবপদ ; রানীর আত্মদানে বিক্রমের কামের অবসান হল। রক্তকরবীর নন্দিনীর প্রেমেও এই ত্যাগ-সংগ্রাম-আত্মদান। এই প্রেমের বিকাশ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেও ভাবরূপ লাভ করেছে। শ্যামার দেহলালসা বজ্রসেনের জন্যে প্রেমিক উত্তীয়ের হত্যা ও বজ্রসেনের প্রত্যাখ্যানে বিশুদ্ধ হয়ে এল, অকল্যাণী পাপ তুজনকে বিচ্ছিন্ন করল। চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের রূপজ কামে একদিন এল ক্লান্তি, মোহময়ীর বীর্যময়ী নারীরূপে আত্মপ্রকাশে হল সার্থক মিলন। চণ্ডালিকায় প্রকৃতির দেহভোগ পরিণত হল আত্মলোপী প্রেমে, যার মূলে আনন্দের আদর্শলব্ধ 'শিবের ক্রোধানলদীপ্তি'। শাপমোচনের কমলিকা এবং রাজার সুদর্শনা ভুল করেছিল রূপের বিচারণায় ; বিরহের বেদনামথনে সুদর্শনা বুঝেছিল, 'তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম', কমলিকা জানল, রূপের অভাব সত্ত্বেও 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কি সুন্দর রূপ তোমার।' প্রেম দেহ-জাত হয়েও বিদেহী ভাবান্বিত হল এবং অসুন্দরকে মৃত্যুকে জয় করল। অনেকদিন আগে কবি বিবাহার্থী বিলোচনকে দেখেছিলেন একই সঙ্গে মরণরূপে ও প্রেমিকরূপে :

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন ওগো মরণ, হে মোর মরণ ;
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল যত ভুজঙ্গদল তরজে।...
শুনি শ্মশানবাসীর কলকল ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর তাঁর হিয়া তুরুতুরু তুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।

শুধু কি উমা? কবি নিজেও মৃত্যু-মহাকালের জন্যে প্রণয়-প্রতীক্ষারত :

যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ থাকি আধজাগরূক নয়নে
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

শক্তিনির্ভর মরণবরণ-রসের সাধনায় কবি উমার মত নিজেকে নটরাজের কাছে নিবেদন করতে প্রস্তুত—এ যেন মরণের কাছে জীবনের প্রেম নিবেদন।

আবার 'তপোভঙ্গে'র সন্ন্যাসী-শিবও তিনি; ত্যাগ ও সংযমের তপস্যায় উত্তীর্ণ হয়ে বিরাগী বিলোচনের মত নিজেকে উমা তথা সৌন্দর্যময়ী পৃথিবীর কাছে সমর্পণ করতে আগ্রহী—এ যেন জীবনের কাছে মরণের আত্মসমর্পণ।

শিবতত্ত্বের যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা হয়েছে সুন্দর শক্তির তপস্যা। এখানে মিলন সত্য, বিচ্ছেদও সত্য; মিলনের আয়োজন বিচ্ছেদের জন্যে, বিচ্ছেদের প্রয়োজন কল্যাণের জন্যে। ছেদ আনে ছন্দ। এই ছন্দ বৈষ্ণবের প্রেম ও প্রেমবৈচিত্ত্য নয়, প্লেটোনিক ভালোবাসা নয়; এই ছেদ চিত্তকে মুক্তি-শুদ্ধি দেয়, নিয়ে যায় কর্মপথে, দুজনের জগৎ থেকে বহুজনতার ভীড়ে। রবীন্দ্রনাথের ত্যাগাঙ্গ প্রেম আদিতে কুমারসম্ভব, মধ্যে কু-মারসম্ভব, অন্তে কর্মসম্ভব। ধ্রুপদী শৈব মন্ত্রে, বৈষ্ণব-শাক্ত ভাবের মাল্যবন্ধনে, কবিচিত্তের পৌরোহিত্যে দেহজ রতি দেহাতীত আরতিতে, সন্ন্যাসের সাধনা সুন্দরের আরাধনায়, জীবনজিজ্ঞাসা অমৃতের অভীপ্সায় পরিণত। এই উপলব্ধিতে কবিকণ্ঠে সঞ্চারিত হয় গান :

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শংকর, হে ভয়ংকর
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
জীবনমরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে।

এই সুন্দর সন্ন্যাসীর সংযমিত প্রেমসাধনার মূল কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ে নিহিত, মধ্যপর্বের কবিপ্রজ্ঞায় সে হল ফুল, সেই ফুল ফুটেছে উত্তরতিরিশের রবীন্দ্র-প্রেমকাব্যে—যেখানে শ্যামলী আকাশপ্রদীপ সানাই ইত্যাদি কাব্যের ভালবাসার ছবিগুলি সহজরসান্বিত।

উ। জাভাযাত্রীর পত্রে কবি বলেছেন, 'আমাদের দেশে একসময়ে শিবকে দুইভাগ করে দেখেছিল। একদিকে তিনি অন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত; আর একদিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তন-পরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে' ২১। এই দৃষ্টিতে পৃথিবীকে মনে হয়েছে, 'বিপরীত তুমি ললিতেকঠোরে, মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে-নারীতে।' রবীন্দ্রনাথ শিবকে ও শিবতত্ত্বকেও দেখেছেন এই দুইভাবে—ধ্যানী শিব ও নটরাজ রুদ্র : একজন করেন ধ্বংস, অপরজন করেন সৃষ্টি—বাহির-জীবনে ও অন্তরের অন্তঃপুরে, রূপের বৈচিত্র্যে ও রসের ঐক্যে। বিশ্বলীলারঙ্গ তথা মানুষ ও প্রকৃতির রঙ্গলীলা তাঁর খেয়ালখুশীর প্রকাশশিল্প।

সৃজন-প্রলয়ের ভোগ-ত্যাগের এই দেবতার রূপচ্ছায়া প্রকৃতির পটে আকাশে-বাতাসে ঋতুতে-ঋতুতে। কল্পনার 'বৈশাখ' দগ্ধতাম্র বৈশাখের আবাহন :

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,

তপঃক্লিষ্ট তপ্তভস্ম, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—

এবং প্রার্থনা : নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার—
চিতা জলে সম্মুখে তোমার।
হে বৈরাগি, করো শান্তিপাঠ।—

—উড়ে যাক সুখদুঃখ আশানিরাশা, ঘুচে যাক তন্দ্রা, লক্ষকোটি নরনারীর মনে নেমে আসুক বৈরাগ্য। 'বর্ষশেষে' যে ঝড়কে কবি স্বাগত জানিয়েছিলেন, তার তাণ্ডব নৃত্যের প্রতিঘাতে দুলে ওঠে অরণ্যানী, দুলে ওঠে হিমালয়বক্ষ ২২। তার সমতালে আর একদিন রুগ্‌ণ কবিকণ্ঠ গেয়ে ওঠে :

নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর
যত লোভ যত শঙ্কা
দাসত্বের জয়ডঙ্কা দূর দূর দূর। (ঝড় : পূরবী)

শারদোৎসব এবং ফাল্গুনীতেও এই বৈরাগ্যের নৃত্যভংগী ; শিব 'কবি-বাউল', প্রকৃতি মানুষ কবি সবাই তাঁর চেলা। মহুয়ার ঋতুপর্যায়ের কবিতাগুলি এই শৈব দৃষ্টিতে অনুরঞ্জিত। বৈশাখের দিনে নিষ্ফলা পৃথিবীর বুকের ওপর বনস্পতি 'নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে, দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে' ; হঠাৎ একদিন আকস্মিকের মত এসে পড়ে 'উদাত্ত অকৃপণ, আষাঢ় মাসে সজল শুভধন' (অপরাজিত), শরৎ আসে আলোর অঞ্জলি ছড়িয়ে। 'নির্মম শীত' এসে উত্তরবায়ুর একতারার ঝঙ্কারে সমস্ত জীর্ণতাকে ঝরিয়ে দেয়, ভাঙ্গনের পথে আসে নব যৌবন বসন্ত (বোধন) ; সে জড়দৈত্যের সঙ্গে নিত্য সংগ্রামরত, জীবন-রসে নব অভিযানে সদা উন্মুখ, কারণ 'হে অজেয়, তব রণভূমি 'পরে, সুন্দর তার উৎসব করে' (বসন্ত)। কিন্তু তাকেও যেতে হয় নবীনতরের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে ; 'বসন্তবায় সন্ন্যাসী' চৈৎফসলের শূন্য ক্ষেতে জানিয়ে দিয়ে যায় 'প্রলয়দাহের রৌদ্রতাপে' ফোটা বৈশাখের আগমনী (শেষ মধু)। 'মুরতি' কবিতায় স্বল্পভাষণে ষড়ঋতুর এই আসা-যাওয়ায় যে চলন্তিকা চিত্র কবি অনুভব করেছেন, তা প্রসারিত হয়ে উঠেছে ঋতুগীতি ও ঋতুনাট্যে, তা মৃত্যু মাধ্যমে অমৃতেরই সাধনা।

কবির পরিণত চিন্তা ও রসবোধ শিবকে একটি গভীর ও গম্ভীর পরিণতি দান করেছে। ঋতুচক্রের আবর্তনে নটরাজের লীলারূপ দর্শনে তাঁর এই পরিণত মনটি মধুরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ঋতুনাট্যগুলি এই প্রকাশের বিচিত্র-বর্ণের ফুল। বর্ষা কবির চিত্তে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কেতকীর অধিকাংশ গানে শিবের নটরূপ ফুটে উঠেছে। আষাঢ়ের ভৈরব

তান এবং খেপা শ্রাবণের পাগলা হাওয়ায় কবির মনে গুনগুনিয়ে ওঠে, 'ঝড় এসেছে, ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথি'। শ্রাবণগাথার প্রযোজক নটরাজ। ধরণীর তপস্যাকে সার্থক করে রুদ্রের তৃতীয় নেত্রে আগুন জ্বলে ওঠে; নেমে আসে করুণাঘন; গুরু গুরু ডমরুতে মন্ত্রিত হৃদয় গেয়ে ওঠে, 'ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে'; পুরাতনকে জীর্ণ করে প্রাণকে রিক্ত করে নাচিয়ে দেবে যে, সেই 'সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিনটিনী।' তাই :

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

তারই সঙ্গে নাচে জন্ম ও মৃত্যু, বন্ধন ও মুক্তি; অকারণ চাঞ্চল্যে উধাও মন নিরুদ্দেশের সঙ্গ নেয়, ঘরের কোণের শাসনসীমার সকল বাধা ছিন্ন করে অজানার অবগাহন করে; বজ্রের গানে জেগে ওঠে 'মৃত্যুর মাঝে যে অনন্ত প্রাণ', আরামবিহীন সেই গভীরে নামতে চায় 'অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।' শেষ বর্ষণের ব্যাখ্যাতাও নটরাজ। এখানে শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী সন্ন্যাসী, বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা তার মালা, শ্রাবণী পূর্ণিমা হাসিকান্নায় দোলদোলানো। বর্ষা বিরহ ও মিলনের অগ্রদূত, 'খুব বড়ো মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের' এবং 'মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন।'

কিন্তু সে মিলন চিরস্থায়ী হয় না : 'এই তো সৃষ্টির লীলা, এ তো কৃপণের পুঁজি নয়, এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি।' ত্যাগেই ঐশ্বর্যের আবির্ভাব। তাই শারদোৎসবে শরৎ আসে সন্ন্যাসীর বেশে। এপালায় কাজের কথা নেই, আছে 'ছুটির খুশি', যেখানে 'সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর'। এই ত্যাগাঙ্গ পথে আসে উদাসীন নিষ্করুণ শীত, অপচয় ঝরিয়ে দিয়ে স্থান করে দেয় বসন্তের। কিন্তু ফাল্গুনী বসন্তের চোখেও জল, যৌবনমন্ত্রে বৈরাগীর সুর, কান্নায় সে সবুজ, নিরাসক্তিতে প্রৌঢ়। রিক্ত হওয়ার মধ্যেই পূর্ণতা—'বসন্ত' আসে এই বাণী নিয়ে, 'তার এক পিঠে নূতন, আর একপিঠে পুরাতন'; সে 'বাস্তুছাড়ার দলপতি;' তাঁর খেলাভাঙ্গার খেলায় নেচে ওঠে মরণবাঁচন, হাসিকান্না উধাও হয়ে যায়। অবশেষে ঋতুরাজ রাজবেশ খসিয়ে বৈরাগী হয়ে পথে নামে, বোঝা হাল্কা করে মন নেচে ওঠে নাচের তালে তালে, তপস্যার আহ্বানে। তখন 'মুক্তি-পাগল বৈরাগীরের চিত্ততলে। প্রেমসাধনার হোম হুতাশন জ্বলবে তবে।' তাই নবীনে বাসন্তী মন মেতে ওঠে বেড়াভাঙ্গার মাতনে, পাওয়া-না-পাওয়ার দেওয়া-নেওয়ার আবর্তনে, পরিপূর্ণ-অপরিপূর্ণের বিরহ-মিলনের দোলনে। তখন ফাগুনের হাওয়ায় হাওয়ায় প্রাণ আপনহারা ও বাঁধনছেঁড়া; সর্বনাশের ব্রত গৃহীত হয়। ক্রমে বিদায় নেওয়ার সময় আসে, বাসন্তী রঙ ম্লান হয়ে মাবে গেরুয়া রঙ, প্রকৃতির ঝরাপাতা নবীনকে

পরিয়ে দেয় সন্ন্যাসীর সাজ ; তার উদয়ও সুন্দর, অস্তও সুন্দর, তার স্পর্শে 'চিত্ত উদাসীরে নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে।'

প্রকৃতির পটে শৈব দর্শনের সঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছে মনের লীলা এবং মৃত্যু-পুনরুজ্জীবনের আদি তত্ত্বভাবনা। রক্তকরবীর 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটিতে তার ব্যঞ্জনা, বনবাণীতে তার রসরূপ ফুটে উঠেছে। আপনভোলা নটরাজের প্রলয় নাচনের রুদ্র আলোকে কবির এই যে ঋতুরঙ্গ ও প্রকৃতি-পরিদর্শন, তা পূর্ণতা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়। তার ধুয়া হল :

আমি নটরাজের চেলা, চিত্তাকাশে দেখছি খেলা
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন মহাকালের বিপুল নাচে।

নটরাজের কবিশিষ্য তাঁর নাট্যের অঙ্গনে মুক্তিমন্ত্র নিতে এসে দেখলেন বৈশাখকে—তপস্বী রিক্ত নিঃস্ব অন্তররসিক ; মাধুরীর সাধনায় সুন্দরের জন্যে তিনি ধ্যানমগ্ন। একদিকে 'তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষেরে দাও উড়ায়ে সকলকলুষ নাশ হয়ে যাক', অন্যদিকে 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।' গ্রীষ্মান্তে এল বরষা ; সেও সাধক—মাথায় জটা, দেহে শ্যামল উত্তরীয়, মনে অতল বিরহ। বিরহিণী তাপসিনী ধরণী-উমা আষাঢ়-শিবের কাছে পাঠায় প্রেমপত্র, 'লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া, চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।' দুলে উঠল বর্ষার রূপ জটার গভীরে, সুরু হল বর্ষণ, 'ওগো সন্ন্যাসি, কি গান ঘনালো মনে। গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু বাজিলো ক্ষণে ক্ষণে।' দুজনের মিলন হল, জাত হল বিজয়ী তরুণ বীর শরৎ, দেবসেনাপতির মতই আলোক-সেনাপতি হয়ে। তারপর এল হেমন্ত অমরার লক্ষ্মীরূপে। দুজনেই 'আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।' সব অবসাদ বিষাদ কালো নাশ করে দীপালিকার আলো জলে উঠল। কিন্তু অচিরেই হেমন্তলক্ষ্মীর নয়ন ঢাকা পড়ল হিমের ঘনঘোমটায়। দিন ফুরাল, এল আঁধার, এল শীত সন্ন্যাসীবেশে ; বিকীর্ণ শীর্ণ পাতাঝরা মৃত্যু বিপ্লবের মাধ্যমে প্রচার করছে, 'জীর্ণতার মোহবন্ধ ছিন্ন করো' ; অন্যদিকে শিব বসন্তের কবি, মৃত্যুর অঞ্জলিতে তাঁর অমৃতের ধারা ; তিনি যেন নিরাভরণা তাপসী উমার ছদ্মবেশী বর, তাই তাঁর বিরহী অন্তরে মিলন-ব্যাকুলতা। কবি তখন বলেন :

ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথী, প্রলয়বেদনা নিল বুক পাতি,
রুদ্র এবার বরবেশে তারে করগো ধন্য হও প্রসন্ন।

শূন্যতার শুভ্রপাতার বুকে পূর্ণতার ছবি লেখা সুরু হল ; শীতের ছদ্ম তপোবেশ খুলে বেরিয়ে এল বসন্ত নব বরবেশে ; ন যযৌ ন তস্থৌ শৈলাধিরাজতনয়া পৃথিবী-উমার সঙ্গে হল সেই মিলন, যার জন্যে এত তপস্যা এত কান্না এত বিরহের দুঃখদহন। কিন্তু সে মিলনও ক্ষণিকের ; আবার আসবে ঋতুচক্রের আবর্তনে বিচ্ছেদের অনিবার্যতা, সাধনার কঠোরতা ; তারও পরে আবারও নতুন করে যতিপতন মিলনের নবীন ছন্দ। এই তত্ত্ব বনবাণীতে বিজ্ঞানসম্মত ও সংবৃত্ত হয়েছে। কবি

দেখেছেন, মৃত্যু ও ক্ষয়ের মাঝে প্রাণের 'নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে' এগিয়ে চলা (দেবদারু)। তাই 'বৃক্ষবন্দনা' করলেন :

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর,

বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির ;—মানুষ এই 'মৌন মহাবাণী'কে চিরস্থায়ী করতে চায় বাসন্তী দোলের মাধ্যমে, যখন স্বর্গমর্ত্য দোলে ছন্দভরে। কবির কাব্যসংগীতও নাচবে নটরাজের এই দোলনৃত্যের তালে তালে, বিশ্বনৃত্যে যোগ দিয়ে কবি উপলব্ধি করবেন অখণ্ড লীলারস :

এসো গো এসো দোলবিলাসী বাণীতে মোর দোলো।
ছন্দে মোর চকিতে আসি মাতিয়ে তারে তোলো॥
অনেকদিন বুকের কাছে রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজ তোমার নাচে সময় তারি হোলো॥

উ। সুন্দরকে পেতে হলে যেমন চাই সন্ন্যাস, শিবম্‌কে পেতে হলে তেমনি চাই সংগ্রাম। মৃত্যুর মধ্যেই অমরতা, গতির মাধ্যমে স্থিতি। সেই গতি নিরঙ্কুশ নয়, সেই স্থিতি নিরবধি নয়। কবি রুদ্র শিবকে দেখেছেন এই আন্দোলিত বিশ্বতত্ত্বের প্রতীকরূপে, বিশ্বনৃত্যকে মনে হয়েছে তাঁরই প্রলয়নাচ। কাহিনীর 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় এই ভাবটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বলগ্নে গান্ধারী শুনতে পান রুদ্রলোক থেকে ভেসে আসা রথচক্রধ্বনি, প্রণাম জানান কালের অধীশ্বর রুদ্রভৈরবকে। জীবন ও হৃদয়ের ওপর দিয়ে চলে যাবে মহাকালের রথ, ক্রন্দন হাহাকার-আর্তির মধ্যে দিয়ে অবসান হবে পাপের অন্যায়ের —

তারপরে নমো নমঃ
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি, নমো নমঃ
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের পরমা নির্বৃত্তি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

বেদনার মধ্যে হবে অশুভের বিনাশ, দুঃখের মন্থনে সত্যের প্রকাশ। তাই কবি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আহ্বান করেন সংগ্রামী রুদ্রকে নৈবেদ্যে :

অস্ত্রে দীক্ষা দেহ,
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

অথবা

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিকায় যে মহাকালের স্তবপাঠ করেছিলেন কবি, সেই চিরযোদ্ধা রুদ্র নটরাজকে আবার স্মরণ করলেন তিনি বলাকায় বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে, যখন 'পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল।' সেই সার্বজাতিক যজ্ঞে তিনি অনুভব করলেন 'সর্বনেশের' আবির্ভাব, জীবনের 'মরণবিহার', রুদ্রের তূর্যনিনাদী সংকেত। একদিকে দেখলেন 'মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে ঐ যে আমার নেয়ে', অন্যদিকে ডাক দিলেন চিরযুবা চিরজীবী সবুজদের অচলের শেকল ভেঙে বেরিয়ে আসতে :

ঝড়ের মাতন বিজয়কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন রে বাছা বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা। (১নং কবিতা)

রুদ্রের প্রলয়নৃত্যের তালে তালে যখন ঈশান জেগে উঠবে, বিষাণ মুখর হবে, সকল বন্ধ সমস্ত দ্বিধা ঘুচে যাবে, তখন

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না।
চরণে তোর রুদ্রতালে
নূপুর বেজে উঠবে না ? (২নং কবিতা)

কবি সংগ্রামের দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন রণসজ্জা দুঃস্বপন আঘাত ব্যাঘাত, যৌবনের দীপকতান এবং সংগ্রামের সংকেতধ্বনি। সেই সংগ্রামের পথে মৃত্যু-সাগর মথন করে অমৃতরস আহৃত হবে। কবি ইউরোপে দেখে এসেছিলেন, 'ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সর্বজাতির লোকের।' ঘরছাড়া এই দেবতার শঙ্খধ্বনি শোনালেন তিনি স্বদেশবাসীকেও, যেখানে 'ঝড়ের গর্জনমাঝে বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে, ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল' :

'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ। (৩৭ সংখ্যক)

সেই সঙ্গে তিনি পড়লেন রাত্রি-অবসানের মন্ত্র, 'রুদ্রের ভৈরব গান'—অমৃতের কামনা সুখ-শান্তি দেয় না, বিশ্রাম-আরাম দেয় না ; তার বদলে

মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ। (৪৫ সংখ্যক)

রুদ্রসাধনা আলোর সাধনা, সে আলোয় পৌঁছতে হয় আঁধারসাগর পেরিয়ে ;

সেই অন্ধকার পার হয়ে রুদ্র আসেন, হাতে 'একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার' —শান্তি ও পূর্ণতার প্রতীক। তাঁর ইশারায় অলক্ষ্মীর হাত ধরেই পাওয়া যায় লক্ষ্মীকে, মৃত্যুর মাঝে ডুব দিয়ে অমৃতকে। সেই মহৎ জীবনসাধনাতেই পৃথিবীর 'চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে।'

কবি নিজেও ঘরছাড়া-পথিক, নটরাজের আহ্বানে। বলাকার তত্ত্ব পূরবীতে এসে হল দর্শন। হারুণা-মারু জাহাজে বসে রুদ্রকে লিখলেন :

আমার কাছে কী চাও তুমি ওগো খেলার গুরু।
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু
তেমনি হবে সারা। (খেলা)

—সাড়া দিলেন তিনি 'খেলার গুরু'র রৌদ্র লীলায়। রুদ্রবীণার সঙ্গে মিলল কবির বাঁশি, সুরের সঙ্গে আলো। কামনা করলেন—তাঁর হাসিকান্না আনন্দ বেদনা যেন বৈশাখী তাণ্ডবলীলার সঙ্গী হয় (সাবিত্রী), আনন্দের পদ্মে পা রাখেন 'বেদনার রুদ্র দেবতা' (উৎসবের দিন), দুজনের মিলন হয় একই 'গীতরঙ্গে তালেতালে' (মুক্তি), ভাবনারা হয় 'ঘরছাড়া বাউল' (দোসর) এবং সীমার অহংকার ভেঙে হয় অসীমের অলংকার :

অপূর্ণের যত দুঃখ যত অসম্মান
উচ্ছ্বসিত রুদ্র হাস্যে করি দিবে শেষ দীপ্যমান। (শেষ)

রবীন্দ্রনাথের এই সংগ্রামী গতি-দর্শন যেমন তাঁর ব্যক্তিভাবনায় তেমনি বিশ্বভাবনায় অনুস্যূত হয়ে আছে। একদিকে বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ, অন্যদিকে উপনিষদের চলনমন্ত্র, মাঝখানে আদিম কর্ষণচিন্তাজাত মৃত্যু-পুনর্জন্ম তত্ত্ব—এই ত্রয়ীর সম্মিলনে এবং সমকালের সাহচর্যে গড়ে উঠেছে কবির শৈব জীবনাদর্শ। যে দৃষ্টিতে তিনি নিজের মধ্যে ঘরছাড়া রুদ্র নটরাজের আহ্বান অনুভব করেছেন, সেই দৃষ্টিতেই তিনি উপলব্ধি করেছেন মরণকূলের উৎসবে চিরযাত্রী জনধারাকে : সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাস এবং বাউল উত্তুরে হাওয়ায় বৈরাগ্যের মন্ত্রলিপি, পায়ের তলে উৎকণ্ঠিত সুখ এবং আনন্দিত সর্বনাশ, সামনে তন্দ্রাতুরা রাত্রি, হাতে রুদ্রজ্বালা মশাল ; মাটি মাড়িয়ে ছুটে চলেছে মানুষের দল, যেখানে 'শূন্যে নবীন সূর্য জাগে', যেখানে শংকরের টলমল চরণপাতনে

জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডবমাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল (যাত্রা)

এই দৃষ্টি-আলোকে হিজলী কারানিবাসে নির্যাতিত দেশসাধকদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য পাঠালেন : মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে। (চিঠি)

সংগ্রাম-মৃত্যু-অমৃতত্ত্বের এই জীবনদর্শনকে কবি রূপ দিয়েছেন তাঁর শিবায়নের মাধ্যমে,

তাঁর ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজচিন্তা অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। আণ্ডিস জাহাজের অন্ধ কেবিনে একদিন ঝড় উঠল; ঝড় তো নয়, মহাদেবের তপের জটানিঃসৃত মুক্তিমন্দাকিনী, রোগশয্যা হল কৈলাসের শৈলশিখর এবং ঝঞ্ঝাসংগীত

বললে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে,
ভস্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে। (ঝড়)

বলাকা-পূরবীর গতিমুখর বিশ্বতত্ত্ব পলাতকা-লিপিকা-মহুয়া-বনবাণীতে প্রসারিত হয়েছে যথাক্রমে সংসার-জগৎ-প্রেম এবং উদ্ভিদজগতের তট ছুঁয়ে ছুঁয়ে। পলাতকার 'শেষ গানে' যে মূল সুর, 'শেষ প্রতিষ্ঠায়' তা হয়েছে কথা :

আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

লিপিকার পথ-যাত্রা এবং নিয়মবন্ধ-বিরোধিতা এই শৈব ভাবনার স্ফুলিঙ্গ। মহুয়ার প্রেমের গানে চলার যে রাগিণী, বনবাণীতে তা হয়েছে প্রাণ-পৈতি— 'প্রাণতীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন' (নারিকেল)। এই দৃষ্টিতে কবি আত্ম তথা জীবন-সমীক্ষা করেছেন :

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর কঠিন তপস্যা তব গলি
ধরিত্রীরে করে দান যে অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত্র, গতিপথে নিঃশেষ পাথেয়,
নিঃসীম সাহসবেগ, উল্লসিত, অশ্রান্ত অজেয়। (হাসির পাথেয়)

কৈশোর রচনা 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ে' যে ভাবনার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল, তা একদা একটি ছোট গল্পের আকার নিয়ে প্রকাশ পেল, তা থেকে তাসের দেশ নৃত্যনাট্যে। নিয়ম-বন্ধন মোচনের এই মুক্তিমন্ত্র শৈবাদর্শের অনুগামী, তার ধ্রুবগীতি 'খর বায়ু বয় বেগে' এবং সমাপ্তি-সংগীত 'ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও'। অবশেষে শৈব অভীঃমন্ত্রে উজ্জীবিত কবি বিশ্ব-ইতিহাস দর্শন করলেন কালের যাত্রার 'রথের রশিতে'—যেখানে বললেন : সব অসমতল ভেঙে ভেঙে জীবন তার চলার পথকে কেবলই সমতল করে নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি পৃথিবীর অসহনীয় বেদনাকে কবি অনুভব করেছেন, ধিক্কার জানিয়েছেন লোভী সবলের শোষণলালসাকে, আত্মীয়তা পাতিয়েছেন লাঞ্ছিত নিপীড়িত অসহায় জনগণের সঙ্গে। প্রমত্ত শক্তির নগ্ন প্রকাশ, তার প্রতিরোধ এবং নতুন বিশ্ব গঠনে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা—সকল ক্ষেত্রেই কবি স্মরণ করেছেন রুদ্রশিবকে : 'সত্যকে তিনি দেখেছেন জীবনে, সুন্দরকে এই জগতে, আর অশুভ-বিনাশের জাগতিক সাধনাতেই দেখেছেন শিবের বিস্ফুরণ ২৩।' সমসাময়িক বক্তৃতা-প্রবন্ধে এই আদর্শ প্রমূর্ত হয়েছে ২৪। পূর্বগামী জীবনদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে এসে প্রবাহিত হয়েছে জীবনের ওপর দিয়ে, সাংসারিক সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে, সমাজের-রাষ্ট্রের ছোটবড় অন্যায়-অবিচারের

বিরোধিতায়। রিয়েলিস্ট কবি, জনগণের কবিমানসে এখন 'অনেক বাণীর বদল হল অনেক বাণী চুপ ; নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ' ২৫।

এই নতুন রূপের একটি হল শিশু ভোলানাথ। যিনি সর্বত্যাগী উদাসীন ভয়হীন, তিনি তো শিশু। পূরবীর কয়েকটি কবিতায় নটরাজকে পাই নৃত্যপর শিশুরূপে, তাঁর নাচের দোলা তত্ত্ব হয়েছে শিশু ভোলানাথ কাব্যগ্রন্থে :

ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।

লজ্জা বিত্ত দারিদ্র্য আসক্তি কিছুই নেই, তাঁর অন্তরে ঐশ্বর্য অন্তরে অমৃত। তাঁর ডমরু-ধ্বনিতে লোভশোকভয় দূর হয়ে যায় ২৬, দুর্বলতা অপনোদিত হয় ২৭, তন্দ্রা ভেঙে জীবন প্রাণ পায় ২৮। তাঁর তাণ্ডবের সুরে বাঁধা তালে-লয়ে বিশ্ব গতিময় ; তার সঙ্গে পা না মেলাতে পারলে আসে প্রলয়, 'বেজে ওঠে ডঙ্কা শঙ্কা শিহরায় নিশীথগগনে ২৯।' নটলীলার এই তত্ত্ব উত্তরতিরিশের কোঠায় এসে হয়েছে জীবন-দর্শন, কবিতায় তখন কাহিনীর প্রলেপ। পুনশ্চে ঘরের কথা যেখানেও সেখানে 'বালক-ছেলেটা-অপরাধী-সহযাত্রী' ইত্যাদি কাব্যকথায় ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়েছেন বাধাবন্ধনহারা শিশু ভোলানাথ ; আর পথের কথা যেখানে, সেখানেও বিশ্বমানবের অভিযাত্রায় চিরযাত্রী শিবেরই শোভা। 'মানবপুত্র' এবং 'শিশুতীর্থ' কবিতা দুটির পশ্চাৎপট খ্রীষ্টজীবনী হলেও মূলত 'কুমারসম্ভব' তথা শৈবভাবের দ্যোতক। শিশু ভোলানাথই শিশুতীর্থের নবজাতকরূপে পুনরাবির্ভূত, 'সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ' (অথর্ববেদ), যাঁর উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয়েছে কবির জীবনমন্ত্র : 'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।'

আর এক রূপে শিব ব্রাত্য-ভিখারী, যিনি কবিকে নিয়ে এসেছেন 'ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে', ব্রাত্য পল্লীর অন্দরে ও অন্তরে। কবি সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ বেদনাযন্ত্রণা অনুভব করেছেন, তাদের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি ও উদ্‌ঘাটন করেছেন। পুনশ্চের ধূলিধূসরিত পৃথ্বীসচেতন কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিশেষত 'প্রথম পূজা' রচনাটি। রাজা বাদশা ক্ষত্রিয় সামন্ত নয়, আজ কবির কাছে কিরাত দলপতি মাধবের উপাসনাই একমাত্র সত্য—'দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম'। এই দর্শন-আলোকে কবি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এঁকেছেন তাদের ছবি, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে, যারা ক্ষেতে কারখানায় বন্দরে ঘাটে ঘাটে কাজ করে, যারা সত্যকে আধামিথ্যারূপে প্রচার করতে শেখে নি, যারা 'সভ্যতার পিলসুজ'। পত্রপুট সেঁজুতি নবজাতক জন্মদিনে প্রান্তিক শ্যামলী প্রভৃতি কাব্যের অসংখ্য মানবমুখী কবিতায় তিনি নিপীড়িত শোষিত ভাষাহারাদের পক্ষ নিয়েছেন ; মানুষের লোভ ও শোষণ, মানুষের সত্য ও সুন্দরকে আলাদা করে চিনতে পেরেছেন, বস্তুমুখী মানবধর্মের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। তাই আত্মপরিচয়ে বলেছেন, 'কবি আমি ওদের দলে,—আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন' (ব্রাত্য)।

রবীন্দ্রনাথের এই ক্রান্তিদর্শন শুধু স্বদেশবাসী সম্পর্কে নয়, সব দেশের নির্জিত মানুষ সম্পর্কেই। সীমাহীন বিশ্ববোধের পটভূমিকায় তিনি শেষ সপ্তকে শিবকে চিত্রিত করেছেন ধ্যানী-স্রষ্টা রূপে :

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গশিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি,
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে। (সাত)

এবং
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তের প্রতীক্ষায়। (একুশ)

সেই কালান্তরের সমাগম দেখেছেন ইহসচেতন কবি চারপাশের মারণ উচাটন শোষণ সংগ্রামের জিঘাংসার মধ্যে। পৃথিবী ক্ষতবিক্ষত, মানুষ ক্ষুব্ধ লুব্ধ, পদে পদে দুঃখ দৈন্য কুশ্রীতা অশ্লীলতা ; তবু তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি :

তবু তো বধির করে নি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি'—
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী। (পত্রোত্তর : বীথিকা)

শান্ত শিব নতুন পৃথিবীব উদ্‌গাতা। কিন্তু অশান্তি-সংগ্রাম ছাড়া তো তাঁর আবির্ভাব সম্ভব নয়। প্রলয়ের আগুনে ব্যর্থ আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে রুদ্র আবার বসবেন ধ্যানে, তপস্বীর তপস্যাবহ্নির শিখা থেকে 'নবসৃষ্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে' (প্রলয় : ঐ) এবং

সেই অভাবিত কল্পনাতীত আবির্ভাবের লাগি
মহাকাল আছে জাগি। (প্রতীক্ষায় : সেঁজুতি)

নতুন পৃথিবী, নতুন জীবন, নতুন মানুষ গঠনের দুরূহ কর্তব্য কবি তুলে দিয়েছেন যাঁর হাতে তিনি নটরাজ রুদ্র ও ধ্যানী শিব, যিনি প্রলয়মাধ্যমে নবীনকে সম্ভাবিত করেন। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী, লৌহনগরীর অষ্টাবক্র অক্টোপাস, যন্ত্রদানব-পক্ষীদানবের বীভৎস রক্তলোলুপতার সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বমানবতার সপক্ষে তিনি প্রার্থনা করেছেন :

হে বজ্রপাণি!
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে। (পক্ষীমানব : নবজাতক)

বিশ্বমঞ্চে শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে যে 'নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী'

(আরোগ্য), তিনি জেগে উঠবেন, অবসান হবে কুৎসিত লীলার, অন্ত হবে পাপ-যুগের, সেই চিতাভস্মের ওপর তপস্বী মানব

নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে।
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান। (জন্মদিনে)

শিব এখানে মানব, মানুষই শিব। জীবনের নানাদিকে তাই কবি তাঁকে নিয়ে গেছেন ইহবাদী প্রয়োজনে, শুধু কবিতায় নয়, সমাজসচেতন নাটকেও। এই রুদ্রশিবই আঘাতে-সংঘাতে অচলায়তনকে চলায়তনে পরিণত করেন দাদাঠাকুরের বেশে, বদ্ধ জীবনকে করেন মুক্তধারা অভিজিতের কানে যন্ত্রভেদের মন্ত্র শুনিয়ে, কামজয়ী মৃত্যুঞ্জয় ভৈরবরূপে তপতীর সূত্রধারণ করে থাকেন, রক্তসিক্ত মৃত্যুর মধ্যে রক্তকরবীর অমরতা দেন সংগ্রামী মানুষদের, কালের যাত্রায় হন রথী ও সারথী, মহাকালনাথ সব অসমতলকে অসমান সমাজকে সমান করে নেন বিপ্লবমাধ্যমে। ব্রাত্য ও ব্রাতপতি শিব চিরযোদ্ধা, নেতা হয়েও জনতা, সত্যসন্ধানী মানুষের প্রতিমা-প্রতীক। একজনের উল্লেখে অপরজনেরও নাম লেখা হয়ে যায়। যখন দেখেন 'প্রলয়শেষের আলোয় রাঙা' সর্বনাশকে (চার অধ্যায়) তখন, এবং যখন দেখেন সৃজনশিল্পী মানবকে, তখনও কবি স্মরণ করেন লোকালয়চারী শিবকে :

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়।
শুধু রেখে গেলেম নত মস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশ্যে
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে দুঃখের দীপ্তিতে।

খ। রবীন্দ্রসংগীতে রবীন্দ্রশিবের একটি মুখ্য স্থান আছে। নাটক ও নাট্যের প্রয়োজনে, স্বদেশী আন্দোলনে, অধ্যাত্ম আরাধনে, চিত্তের দোলনে কবি রচনা করেছেন গীতবিতান, প্রকৃতি-প্রেম-স্বদেশ-পূজা নানা ক্ষেত্রে শিব জড়িয়ে আছেন তাঁর নিবিড়তম বাসনালোকে। প্রকৃতি-বিষয়ক গানের পর্যালোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

সংগীত মানুষকে আপন অন্তরের গভীরে নিয়ে যায়, আবার বহুর প্রান্তরে ছড়িয়েও দেয়। রবীন্দ্রসংগীতে এই দুই ধারাই বর্তমান। একদিকে কবি মানসলোকে আত্মলীন : 'বিশ্ব হতে থাকি দূরে অন্তরের অন্তঃপুরে, চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার স্বপ্নজালে' ; অন্যদিকে তিনি মানবলোকে বিশ্বলীন : 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।' শিবও আছেন

কবির অন্তরে-বাহিরে। একপক্ষে তিনি তাঁর হৃদয়লোকে বীণা বাজান, 'সঘনে বিজনে বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে, আনন্দিত তান শোনাও হে মম অন্তরে' ; অন্যপক্ষে নিয়ে যান রূপলোকে মানুষের মাঝে : 'সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহংকার, খুলাও রুদ্ধদ্বার—পূর্ণ করো প্রণতিগৌরবে।' যেমন সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে তেমনি সংগীতলোকেও রবীন্দ্রনাথ শৈব ঐতিহ্যকে নবব্যঞ্জনায় শৈল্পিক ঐশ্বর্যে পরিণত করেছেন।

কতকগুলি গানে শিবের লোকপ্রচলিত রূপচিত্রকে কবি কথা ও সুরের আলপনায় ধরে রেখেছেন ; সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ভাবও এগুলিতে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। মহাযোগী শিবের ধ্যান করছেন তিনি :

গগনে গগনে হেরো দিব্য নয়নে
কোন মহাপুরুষ জাগে মহাযোগাসনে
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে
দেহে প্রাণে হৃদয়ে।

তিনি রুদ্র : 'হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ংকর, ওহে শংকর, হে প্রলয়ংকর' ; তিনি পিনাকী : 'পিনাকেতে লাগে টংকার, দানবদন্ত তর্জি রুদ্র উঠিল গর্জি' ; এবং 'ভীষণ সব কলুষনাশন রুদ্রতা'। আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মানবতত্ত্ব : 'লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহংকার' অথবা প্রেমভাবনা' : 'জয় প্রেম মধুময় মিলন তব, জয় অসহ বিচ্ছেদবেদনা।' অনেক গানে পুরাতন শিব নতুন হয়ে উঠেছেন ; যেমন শিখ দোহার অনুসরণে রচিত 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে, নাচে নাচে রম্যতালে নাচে' গানটিতে।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রশিবকে দেখি জনতার রাজপথে, স্বদেশতপস্যা হয়েছে রুদ্রতপস্যা, যার ধুয়া নির্ভয়তা : আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়। স্বদেশী গানে কবি পড়েন শৈবমন্ত্র : 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না' ; একলা চলতে হবে, জপ করতে হবে, 'আমি ভয় করব না ভয় করব না' ; তখন বাধা বন্ধন শিথিল হবে, চলার পথ সুগম হবে, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়ে গিয়ে জাগবে সংগ্রামশক্তি ; রুদ্রের আহ্বানে অলস দেহ সচল হয়ে উঠবে, একলা চলায় এসে মিলবে একে একে আরও অনেকে, সবাই। সমস্বর যাত্রীকণ্ঠে গান উঠবে :

আমাদের যাত্রা হল সুরু এবার ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।

বাতাস উঠুক তুফান উঠুক, আর ফেরা নয়, এগিয়ে যাওয়া ; নূতন যুগের ভোরে বৃথা সময় কাটানো নয়, যুগান্তরের সাধনা করা ; এই মুহূর্ত রাত্রির শেষ প্রহর, পরমুহূর্ত নবপ্রভাতের আলোকসূচনা ; সমকালের ভূমিতে মহাকালের ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথের ভারতসংগীতেও রুদ্রশিব আহূত হয়েছেন। নিমজ্জিত নিপীড়িত

মৃত দেশ রুদ্রবীণার আগ্নেয় স্পর্শে হবে মহামানবের বিশ্বতীর্থ, বজ্রস্তনিত আঘাত-বাহনে আসবে ভয়হর অমৃতবাণী। তাই কবির প্রার্থনা : 'এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ' এবং 'প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে'। তিনি ভারতবাসীর মুক্তিপ্রয়াসের মহেশ্বর সারথি, ঐক্যবিধায়ক দুঃখত্রায়ক মঙ্গলবিধায়ক, বিপ্লবের জয়রথে এগিয়ে আনেন নতুন দিনকে। কবিকণ্ঠে তাঁর জয়গাথা, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত :

জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা ॥
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ।
তবু শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ॥

কবির বিশ্ববোধেও এই রুদ্রবোধন যুক্ত হয়েছে, শিব তখন বিশ্বদেব। নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব-হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী, ক্রন্দনময় তাপদহনদগ্ধ কাতর পৃথিবী—উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষের কবি কামনা করেন দেবতার মঙ্গলশঙ্খ ও দক্ষিণপাণি, জীবনের শুভসংগীত ও সুস্মিত ছন্দ :

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

রবীন্দ্রনাথ শিবকে নিয়ে গেছেন জাতীয়তা থেকে আন্তর্জাতিকতায়, নিয়ে এসেছেন বাইরের জগৎ থেকে অন্তরলোকে। কবি দেখেছেন তাঁকে বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বনৃত্যে; তাঁর আপনভোলা প্রলয়নাচে 'সবহারা যে সব পেল তার কূলে কূলে' এবং 'সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু'। বিশ্বের তনুতে-অণুতে তাঁরই নাচের ছায়া ও মায়া, রূপ ও অরূপতা, আর

আমার সকল দেহের আকুল রবে মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে নবজনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সংগীতে বিরাজে ॥

এই উপলব্ধি কবিকে মুক্তিকামী করে তোলে। সুপ্তিজড়িত অন্ধকার পেরিয়ে তিনি আত্মসমর্পণে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, 'তনুমনপ্রাণ ধনজনমান, হে মহাভিক্ষু, মাগো'। আরামের শয্যাতল কেঁপে ওঠে, বজ্রবাঁশিতে বাজে অসহজ গান, অশান্তির পতাকা ওড়ে রুদ্রের অভ্রভেদী রথে, কবিকণ্ঠে জাগরগীতি, 'ত্যজিতে হইবে সুখশয়ন অশনিঘোষণে।' রক্তে চঞ্চল প্রাণ, আকাঙ্ক্ষায় বাঁধভাঙা বন্যা, 'আয় রে ছুটে টানতে হবে রশি', এবার 'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে'। রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা হবে কণ্ঠের বিজয়মাল্য, দহনজয়ী মন্ত্র পথচলার আলো : 'ভুবনেশ্বর হে, মোচন করো বন্ধন সব মোচন করো হে'; দৈন্য লয় কর, চিত্তকে নিঃসংশয়িত কর, অন্ধ যাত্রীর 'সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে' :

দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।

রবীন্দ্রশিব উত্তীর্ণ হয়েছেন জীবনপালা থেকে জীবনলীলায়, সেখান থেকে মনের খেলায়। প্রকৃতি-গীতিগুলির স্থান এখানেই, প্রেমারতির সংগীতেরও। মহুয়া কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যে শৈব প্রেমের সাধনা, তাঁর সংগীতে তার সুর বেজে উঠেছে, মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদ প্রাধান্য পেয়েছে; সে বিচ্ছেদ বিরহ নয়, সে মরণ-বরণ গান। কবি শংকিত, 'যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে, পাছে তার তালে মোর তাল না মেলে সেই ঝড়ে'; তাই 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়', বিপুল বেদনার অতল জলে স্নান করিয়ে 'মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার।' যখন ডাক আসবে, উতল হাওয়া দুলিয়ে দেবে গানের তরণীকে, নাচের তালে দোলা লেগে পথ অসমতল হবে,

সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
করি নে ভয়—নেবই তারে, নেবই তারে জিতে॥

এই জয় বাইরে থেকে নয়, অন্তর থেকে। এ যে দেওয়া-নেওয়ার আসা-যাওয়ার মিলন, যেখানে দেবার মানুষ আছে, নেবার মানুষ 'জানিনে তো কোথায় চলে'; তখন 'মিলবে নাকি মোর বেদনা তার বেদনাতে'। ফাল্গুনের ফুল দিন-অবসানে ঝরে যায়, ভরিয়ে দেয় ক্ষণিকের মুঠি; প্রেমের আসনও পথের ওপর পাতা, ক্ষণিকের চকিত সুখের অকারণ-গান; তবু 'যতখন থাকি ভরে দিবে না কি এ খেলারই ভেলাটাই'। কবির উদাসী প্রেমের ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়েছে রক্তকরবীধৃত গানটিতে:

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে—
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক
ওগো দুখজাগানিয়া॥

কবি ও শিবে আত্মীয়তা নিবিড়তর হয়। হৃদয় আরতি করে:

কান্নাহাসির দোলদোলানো পোষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা—

এই যদি তোমার খুশি হয় তবে আমাকে বলো, 'কেমন করে গান কর হে গুণী।' বিশ্বময় কবি অনুভব করেন সুরের আলো, সুরের হাওয়া, সুরের সুরধুনী; কিন্তু হৃদয়ে তার প্রতিধ্বনি কই, কণ্ঠে তার ধ্বনি কই? অতএব সুরগুরুর সুর-ধ্বনিতে তিনি প্রাণ ভরাবেন, চিত্তবীণায় তার বাঁধবেন; যে ধ্যান মনে, সে আসবে গানে। দিনে দিনে ফুলে মধুসঞ্চয়, ক্ষণে ক্ষণে আকাশে তারা ফোটা, ধীরে ধীরে গান এল

কবির মনে। সুরের আগুন জলে উঠল প্রাণে, ছড়িয়ে গেল সবখানে—মরা গাছের ডালে ডালে, আঁধারের তারায় তারায়, এলোমেলো পাগল হাওয়ায়। সুরু হল লীলা সুরগুরুর সঙ্গে কবিগুরুর। বীণা বাজে বিশ্বমাঝে : 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে; আকাশ কাঁপে তারার আলোয় গানের ঘোরে'; বীণা মাঝে মনোমাঝে : 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা; আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও সকল দুঃখের কথা।' এ লীলা সহজ ও মধুর নয়, আঘাতসংঘাতে চিত্ত প্রসাদিত প্রসাধিত হয়। ঝড়ের রুদ্রদেবতা আসেন কবির কাছে, কালোর মাঝে আলো হয়ে, রাতের শেষে ভোর হয়ে, 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।' কবির মনে বন্ধনবিমোচনের উল্লাস, তবু জিজ্ঞাসা জাগে 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খ্যাপা সে', প্রশ্ন জাগে 'পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে, খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে।' মনে মনে উত্তর মেলে, ভাঙনেই তো আনন্দ কারণ তার পরেই গড়ন, বিচ্ছেদে খণ্ড মিলনের পূর্ণতা। ভেরীর ডাক কানে এসে বাজে, পায়ে পায়ে মন চলে :

যেতে-যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথি।

দেবতার নিশান কবির নিশানা, দুর্গমের অভিসার অগম্যের অভিমুখে, চোখের আলোয় বাইরের দেখা থেকে নিরালোক আন্তর দর্শনে। সেই আলোহীন আলোয় ধরা দেয় 'সুন্দর যৌবনঘন রসময় মূর্তি,' 'চিরনবীন স্ফূর্ত মহিমা', যিনি কবির ভয়ের ভয় আবার আনন্দও। বাসনা যখন বিপুল আকার, ধুলায় জীবন অন্ধ, তখন কবি আবাহন করেন 'ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো।' তিনি আসেন হৃদয়দ্বারে, হৃদয় এগিয়ে যায় পথ চিনে চিনে, সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে সুমিতা আত্মনিবেদন করে অমিতার কাছে, 'মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে বন্দী করে কে আমারে।' আত্মমুক্তির সৌরভে কবির বোধিতে তখন ভাবুক কথার আলো, রূপসী সুরের অরূপতা :

অরূপ তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক সে আনি।
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা—
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি।

সেই শিখার গীতিলেখায় কবিপ্রাণের শূন্যতা ভরে ওঠে নির্বচন সুরে, রমণীয় বোধি মিলিত হয় পরম বোধনায়, রূপসায়রের সুন্দর অরূপরতন মধুরে :

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।

হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।
অন্তরগ্লানি সংসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।

শৈব কবি মননের পরিধি থেকে এখন আত্মার কেন্দ্রবিন্দুতে, যেখানে পূর্ণের সঙ্গে হয় পূর্ণমিলন, বিলসিত অনুভাব হয় উল্লসিত অনুভব: 'ওগো সবার ওগো আমার'—'সেই তো আমার তুমি'।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাটকে উপন্যাসে শৈব চেতনার প্রকাশ, গল্পে প্রবন্ধে শৈব চৈতন্যের বিকাশ, রবীন্দ্রসংগীতে আকাশের ওপারে আকাশ—যেখানে মনের নিভৃত ও ঘনিষ্ঠ ভাবনাগুলি আলো হয়, ফুল হয়, তারা হয়, সুরের সাগরে পাপড়ি মেলে রসের লীলাকমল।

৯। রবীন্দ্রসংস্কৃতির মূলে রবীন্দ্রজীবনদর্শন। সীমার মধ্যে অসীম, জীবনের মধ্যে মরণ, সংগ্রামের মধ্যে শান্তি, দুঃখের মূল্যে আনন্দ, মৃত্যু-মাধ্যমে অমৃত, বহুর অন্তরে এককে কামনা করেছেন কবি, ছোট-আমি থেকে বড়-আমিতে উত্তরণের সাধনা করেছেন। এই আদর্শকে তিনি জীবনের ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন গদ্যরচনাবলীতে ৩০, রূপরসায়িত করেছেন সৃজনীসাহিত্যে।

রবীন্দ্রজীবনদর্শনের মূলে রবীন্দ্রশৈবদর্শন। ভারতীয় মনীষায় বিশ্বের প্রাণপ্রবাহ প্রতিভাত হয়েছে ত্রিধারূপে: সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর; পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের দৃষ্টিতে জগৎতত্ত্বের ত্রৈতরূপ: স্থিতাবস্থা-বিরোধী অবস্থা-সমন্বয়। উভয় ক্ষেত্রেই এই তিন পর্বকে এক সূত্রে গাঁথা বলে ভাবা হয়েছে (অবশ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নতর রীতিতে): যখন পৃথিবীতে নেমে আসে অন্যায়ের আবর্জনা, ভারী হয় অসাম্যের বোঝা, অপমানিত হয় মনুষ্যত্ব—তখন দ্বন্দ্ব ও প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আবর্জনা-বোঝা লুপ্ত হয়ে যায়, শূন্যতা ভরে ওঠে নবতর সৃষ্টিসুখের উল্লাসে, সুন্দরতর পরিপূর্ণতায়। বিশ্বজাগতিক এই ত্রিতত্ত্ব সংহত হয়েছে শিবের মধ্যে, তিনি একাধারে থিসীস-অ্যান্টিথিসীস-সিন্থেসীস। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত করেছেন আদিম কৃষকের মৃত্যু-পুনর্জন্ম ভাবনা, নতুন অর্থ-ব্যঞ্জনায় তাকে জীবনদর্শন করে তুলেছেন। তাঁর শিব নটরাজ ও ধ্যানী, জীবনের চলৎশক্তির উৎস ও লয়, গতি ও স্থিতি। এই গতি নটরাজ রুদ্রের প্রলয়নৃত্যে, সার্বজাতিক ধ্বংসযজ্ঞে; এই স্থিতি ধ্যানী শিবের সৃষ্টিলীলায়, হরগৌরীর প্রেমের বন্ধনে—যে প্রেম জড়ে চেতনে প্রকৃতিতে প্রবৃত্তিতে। যিনি প্রলয়ী তিনি লয়ের সাধক, সেই লয়ভঙ্গ হলে তাঁর তৃতীয় নয়নে আগুন জ্বলে ওঠে, সেই আগুনে নিশ্চিহ্ন হয় ঝরা পাতা আর মরা ফুল। সমস্ত অসাম্যকে বিনষ্ট করে ভৈরব সমান করে নেন তাঁর আসন, সব বেতালাকে সমতালে এনে জাগিয়ে দেন গতির ছন্দকে। তারপর

আবার বসেন তপস্যায় সৃজনের ধ্যানে। এইভাবে তিনি বিশ্বের পালা বেঁধে দেন, শিবলীলাই বিশ্বলীলা। প্রেম-প্রকৃতি-জীবনসংগ্রামে এবং সাংগীতিকের হৃদয়দোলায় এই রাবীন্দ্রিক শৈবতত্ত্বের, তাঁর শিব-শিবানীর শিল্পপ্রমূর্তি আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতায় এই যুগলরূপের আর-এক অভিব্যক্তি: মহাকাল-মহাকালী। প্রতিমা তন্ত্রের, ভাষ্য কবির। রবীন্দ্রশিব কালের অধীশ্বর, স্থান কাল পাত্র পরিব্যাপ্ত করে তিনি নিত্য বিরাজমান; কালী কালের অধীনা, মুহূর্তের ফুলে তৈরি ক্ষণিকের মালা; তাই 'ইরাবতীর মুখে' কবি দেখেন, 'পুরানো সেই শিবের প্রেমে, নূতন হয়ে এল নেমে, দক্ষসুতা ধরি উমার অঙ্গ।' শিব অতল সমুদ্র, রূপহীন বর্ণহীন সীমাহীন আকারহীন; কালী তাঁর বুকের নিতল ঢেউ, রূপময়ী বর্ণময়ী আকারময়ী সীমান্তিকা; একজন নিত্য নিশ্চল মহাকাল, অন্যজন চঞ্চলের চলমান ছবি; কবি শুনেছিলেন সেই 'ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী' (বরণ: মহুয়া)। শিব মহাসমুদ্র, মহাকালী নদী; নদী অস্থির রূপবতী, সমুদ্র স্থির অরূপ: 'কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল, বাঁধে না তারে কালো কলুষ জাল' (মোহানা: পরিবেশ)। বর্তমানের ছবির মধ্যেও তিনি উপলব্ধি করেন 'নাচে তার বুকে ভৈরব-ভৈরবী' (নমস্কার: বীথিকা)। এই ভৈরব মরণ, ঐ ভৈরবী জীবন, জন্ম-মৃত্যু অর্ধনারীশ্বর:

> ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
> মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
> রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা। (রোগশয্যায়)

দ্বৈতে যার সুরু, অদ্বয়বোধে তার সমাপ্তি; অব্যক্ত ব্যক্তে প্রকাশিত, ব্যক্ত চলে অব্যক্তের অভিসারে: 'আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর কূলে। আলোর মন ভুলছে কালোয়, কালোর মন ভুলছে আলোয়' (জাপানযাত্রী)। গৌরী মিলে যায় মহাকালে, আকার লীন হয় নিরাকারে, সীমা হারিয়ে যায় অনন্ত অসীমে; সেই অসীম শিব। তিনি 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্', তিনি 'আনন্দরূপমমৃতম্', তপস্যা ও জ্ঞানের দ্বারা, দুঃখ ও দানের দ্বারা আত্মা নিজেকে ও তাঁকে লাভ করে, অনুভব করে 'তুমি শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' (ধর্ম)।

রবীন্দ্রসাহিত্য শুধুই শিল্পের কারুকার্য নয়, রাবীন্দ্রিক দর্শন নিছক তত্ত্বমাত্র নয়; দুয়েরই মূল জীবনের গভীরে। এ মন্তব্য কেবল তাঁর সমাজচিন্তা নয়, একান্ত আত্মগত চিন্তাচেতনা সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। কবির ব্যক্তিজীবন ও মানসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর শিল্পবোধ ও দর্শনচিন্তা। এবং একের এই নির্জন তপস্যার আরাধ্য রুদ্রশিব। রবি-প্রদক্ষিণরত সমালোচকবৃন্দের একজন বলেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শনের 'জীবনদেবতা নটরাজ শিব'[৩১]; আর একজন বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, শিবই তাঁর সগুণ ব্রহ্ম' ৩২—এই দুই সত্যের যোগেই রবীন্দ্র-সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রশিবের পূর্ণরূপ ও স্বরূপপ্রতিষ্ঠা।

জীবনাদর্শের শিল্পসুস্মিত প্রকাশে কবি নাট্যকলায় ধর্মগত প্রতীক-প্রতিমার সাহায্য নিয়েছিলেন। বাল্মীকির প্রতিভা ও বিসর্জনে কালী, মালিনী-অচলায়তনে বৌদ্ধ আচার বিহার, রাজা-ডাকঘরে বৈষ্ণবী লীলারীতি এবং মুক্তধারা তপতী বাঁশরী কালের যাত্রায় শৈব প্রতীক প্রযুক্ত হয়েছে। প্রতীক-প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবিমননের যে ক্রমাভিব্যক্তি, কবিমানসে প্রতিমা ধ্যানের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্যগোচর হয়। যাকে উদ্দেশ্য করে তিনি স্তব রচনা করেছেন, মৃত্যু-ঝুলনে দুলেছেন, বিশ্বনৃত্যে ভুলেছেন, তিনি আবির্ভূত হয়েছেন নৈবেদ্য কাব্যের অধীশ্বররূপে—যাঁর প্রতিমা কবির মনুষ্যত্ব, যাঁর মহিমায় মানবাত্মার মহত্ব। এই মহেশ্বর-রুদ্র খেয়ায় এসেছেন দুঃখরাতের রাজা হয়ে, ভক্তকে দিয়েছেন তরবারি 'জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্র হেন ভারী'। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যে তিনি লীলাময়, একের মধ্যে আছেন, আছেন সবহারাদের মাঝে। বলাকায় তিনি আসেন বৈরাগীর একতারা হাতে সর্বনেশে নেয়ের বেশে, কবিকে 'মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে বারে বারে নূতন করে' পান। পূরবীতে তিনি প্রাণগঙ্গার উৎস, মহুয়ায় প্রেমমন্দাকিনীর গঙ্গোত্রী, বনবাণীর আকাশবাতাস। মহেশ্বর রুদ্র অন্ধকার সরিয়ে আনেন আলো, বন্ধন খুলে দেন মুক্তি। রাজা নাটকেও তিনি সুদর্শনার সীমার বন্ধন মোচন করেন, ডাকঘরের অমলকে দান করেন সীমাহীনের সন্ধান। নটগুরুর চেলা লীলাগুরুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেন: ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে

নে রে তোর তাণ্ডবের দলে ;
দে রে চিত্তে মোর
সকল ভোলার ঐ ঘোর।

কিন্তু এই চিন্তার অনেকখানিই জনতার মাঝখানে বসে রচিত। কবির নির্জনতম চিন্তায় এই গতিতত্ত্ব শৈব দার্শনিক রূপ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম্, তখন মানুষ প্রকৃতির অধীন, সুখ সম্পদ প্রেয় তার লক্ষ্য; তারপর মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দের বিরোধ বাধে, মানুষ তার সমাধান খোঁজে: 'তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না, সেই অবস্থায় শিবম্, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, শেষ হচ্ছে প্রেম আনন্দ। সেখানে অদ্বৈতম্।...ধর্মবোধের এই যে যাত্রা—এর প্রথমে জীবন, তারপরে মৃত্যু, তারপরে অমৃত' (আমার ধর্ম)। যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্'—তিনি এই জীবন-মৃত্যু-অমৃতের অধীশ্বররূপে দেখেছেন ইষ্টদেবতা 'মহাগুরু নটরাজকে'। তিনি নিখিলকে কেবলই নিয়মের বাইরে টেনে আনেন, প্রতিদিনের একঘেয়ে তুচ্ছতার মধ্যে জ্বালিয়ে দেন আকস্মিকের অগ্নিকলাপ, জীবনকে

মৃত্যু পেরিয়ে নিয়ে যান অমৃতত্বে। তাঁর নৃত্যের তালে তালে পৃথিবী দুলতে থাকে, নীহারিকা গলতে থাকে, কবির হৃদয়বীণায় বাজে রুদ্রসংগীত। তিনি প্রার্থনা করেন, 'হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক' (পাগল) এবং সেই প্রলয়ংকর 'একের চরণে রাখিলাম বিচিত্রের নর্মবাঁশি, এই মোর রহিল প্রণাম' (প্রণাম : পরিশেষ)। পুনশ্চের 'বিচ্ছেদ' কবিতায় সেই পূর্ণের দিকে অপূর্ণ চলেছে আনন্দের কাঁটা মাড়িয়ে; বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা, বৈষ্ণবী রীতি আর শৈব আরতি একই তালে মিলে প্রদক্ষিণপথ সমাপন হয় :

আমার রুদ্রের মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলি গেঁথে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি,
লহো মালাখানি। (শেষসপ্তক)

কবির যাত্রা সুরু হয়েছিল 'নৃত্যপাগল নটরাজের পিছে', আর যাত্রাসমাপ্তি যেখানে সেই বিরামসমুদ্রতটে : 'সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক। সেই অতল অকূল অখণ্ড নিস্তব্ধ নিঃশব্দ সুগম্ভীর এক—কিন্তু কত তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত' ৩৩, এবং 'ঊর্ধ্বে শুভ্র, অধোতে শুভ্র, সম্মুখে শুভ্র, পশ্চাতেও শুভ্র, আরম্ভে শুভ্র, অন্তে শুভ্র, শিব এব কেবলম্—সমস্ত দেহমন শুভ্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া নমস্কার ৩৪।' কবিসাধক তখন প্রস্তুত সর্বস্ব সমর্পণের প্রত্যাশায় : 'হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তি দ্বারা, উদ্যত চেষ্টার দ্বারা, অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব ৩৫।' তখন কুণ্ঠা নয়, অভিভব নয়, দেবতার করাল বামহস্ত এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্ত দুইই সমান : 'জীবনকে তুমিই আমার প্রিয় করিয়াছিলে, মরণকেও তুমি আমার প্রিয় করিবে;...তোমার আলোক আমাকে শক্তি দিয়াছিল, তোমার অন্ধকার আমাকে শান্তি দিবে ৩৬' এবং 'যখন তোমার সেই অনন্ধকার আবির্ভূত হয় তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি, কোথায় সৎ, কোথায় অসৎ। শিব এব কেবলঃ, তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল। হে শম্ভব, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার; হে শংকর, হে ময়স্কর, তোমাকে নমস্কার; হে শিব, হে শিবতর, তোমাকে নমস্কার ৩৭।' অবশেষে নিবেদিত প্রণাম সংবৃত হয় আনন্দিত উপলব্ধিতে : 'যে আনন্দে আকাশে আকাশে আলোক উদ্ভাসিত আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ; সেই আনন্দে আমি কাহারও চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নহি, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। আমি আছি, কারণ আমাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আছেন ৩৮।'

আত্মসাধনার বিজন পথে নটরাজ ধ্যানী শিব এবং কবি-রাজ রবীন্দ্রনাথ একই

বিন্দুতে উপনীত হয়েছেন। সেই পরমদুর্লভ অনুভবক্ষণে হৃদয়ের গভীরতম অতল থেকে উৎসারিত হয়েছে একটি আশ্চর্য অমৃতমন্ত্র, মানবমন্ত্র :

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
স্বষ্টির প্রথম রহস্য—আলোকের প্রকাশ,
আর স্বষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে। (ব্রাত্য : পত্রপুট)

গ। রবীন্দ্রযুগ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যেসব সমচারী ও সমোচ্চারী কবি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের রচনায় রেনেশাঁস-উত্তর রোমান্টিকতার প্রচ্ছায়া স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান। সেইসঙ্গে গভীর অতীতপ্রীতি এবং পল্লীবাঙলার পরিবেশ-আবেশ প্রাধান্য লাভ করেছে। ভাবুকতার দিক থেকে এঁরা বিহারীলালের অনুগামী, অনেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। এঁদের কাব্যে মনন ও বস্তুসচেতনার অভাব না থাকলেও রসাবেগের প্রভাব সমধিক। ফলে এইসব কবি যে শিবকে চিত্রিত করেছেন, তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রশিবের সমগ্রতা সমুন্নতি ও সৌন্দর্য অনুপস্থিত। অবশ্য সশ্রদ্ধ বিনতি ও সত্য আন্তরিকতার অভাব কোথাও নেই। তবু আলোচ্য কাব্যধারাধৃত শিব নতুন স্বষ্টি নন, মূলত পৌরাণিক—তিনি মহান দেবতা এবং শিবানীসহ প্রণয়লীলায় সিদ্ধরসায়িত। ব্যক্তিগত কবিচিন্তাতেও শিব আহূত হয়েছেন। যখন অন্তরে জেগে ওঠে শূন্য নিরাশা অথবা শূন্যমনে জ্বলে ওঠে শুভ-কামনার অদীপ আলো কিংবা প্রবল হয় নির্দ্বন্দ্ব নির্বেদ—সকল অবস্থায় পরমেশ্বর মহেশ্বর স্তুত হয়েছেন ভক্তির আবেগে, কল্পনার অভিসিঞ্চনে।

অ। স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের (১৮৫৫) লেখনীপ্রসূত সনাতন শিবচিত্র পুরাণের অনুগামী ৩৯। দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫) শিবকে স্থাপিত করেছেন ব্যক্তিভাবনার ভিত্তিভূমিতে। স্বার্থপরতা ও ভেদবুদ্ধির অবসান কামনায় তিনি চেয়েছেন শৈব সরলতা ও মানবপ্রীতি, 'আলাভোলাক্ষ্যাপা হইব আবার তবেই পাইব রত্ন' (শ্যামামঙ্গল)। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর (১৮৫৮) লক্ষ্যও অভিন্ন। মানুষের আত্মপরায়ণতায় ব্যথিতা কবির কাম্য, আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রতা থেকে বিকেন্দ্রিক মুক্তি। হেমচন্দ্রের কাছে শিব ছিলেন অবিদ্যার রূপক, গিরীন্দ্রমোহিনীর কাছে তিনি স্বার্থের

প্রতীক, তাঁকে পদদলিত করে কালী স্বার্থবিসর্জনের শিক্ষা দেন (ভৈরবী : আভাস)। পরে তাঁর দৃষ্টিবদল হয়, শিবের মধ্যে তিনি অনুভব করেন সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য ; তখন বলেন, 'আমি শৈব আমি শাক্ত আমি সে বৈষ্ণব' (মন্ত্রহীনা : অলক)। ক্রমে শিব হন কবির ইষ্টদেবতা, 'জীবন-মরণ সখা ! জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়' (মৃত্যুঞ্জয় : শিখা)। অক্ষয়কুমার বড়ালের (১৮৬০) কবিকল্পনা ব্যষ্টিগত, তবে সমষ্টির কথাও তিনি ভোলেন নি। চারপাশের অন্যায় অত্যাচারে বেদনাহত কবি ব্যাকুলহৃদয়ে আহ্বান করেন :

কোথা তুমি কোথা তুমি হে দেব মহান চাও একবার।
কার্য হতে কত দূরে কারণের কোন পুরে
বিরাজ হে মহাযোগী যোগে আপনার। (প্রদীপ)

মানকুমারী বসুর (১৮৬৩) কবিভাবনায় জগৎ ও জীবনের স্থান থাকলেও ব্যক্তিভাবনার গভীরে ডুব দিয়ে রসলোকসৃষ্টিতে তাঁর তৃপ্তি। তাই আত্মার আলোকিত গোপনপুরে তিনি শিবকে উপলব্ধি করেন ; তাঁর শিবপদ ৪০ সংখ্যালঘু হলেও গুণগত বৈশিষ্ট্যে স্বতঃ উজ্জ্বল। তাঁর কাছে শিব 'জ্বলন্ত যোগী, সুখভোগে নহে ভোগী' এবং 'মৃত্যু-সুহৃৎ' :

আশা তার পরমার্থ, কোথা কিছু নাহি স্বার্থ, বিশ্বপ্রাণধ্যানে যেন আছে অবিরত,
দেখেছি সে পুণ্যময়ে মহাদেব মত। (মৃত্যু-সুহৃৎ)

তিনি পাপের অরি, স্বার্থের শত্রু, 'নিষ্কাম নির্বাণদাতা, বিশ্ববন্ধু বিশ্বপাতা' ; তাঁর চরিত্রে বিপরীতের সমন্বয়, তিনি সদানন্দ ভোলানাথ ও অনাসক্ত অনুরাগী, রাজরাজেশ্বর তবু ভিখারী, 'পবিত্র শঙ্কর' হয়েও 'ভূতপিশাচেরে পালে প্রীতি-মমতায়' ; সবার উপর তিনি আদর্শ প্রেমিক :

কার প্রেম হেন সাধা, কে দেয় জায়ারে আধা,
অর্ধনারীশ্বর কোথা মিলে দেবতায় ? (শিবপূজা)

গৃহে অফুরান ঐশ্বর্য, গৃহিণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা, তবু তিনি নিরাসক্ত, ভোগে-ত্যাগে, প্রেমে-বৈরাগ্যে মহিমময় ; কবি তাঁর পূজারতা, 'প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় আমি ভালবাসি'। ভালবাসার দৃষ্টিতে গৃহী-সন্ন্যাসী শিব কবির জীবনদর্শন ও জীবনদেবতা : 'এ ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গভূমি, এক অভিনেতা তুমি, তবুও আমারি তুমি' (ভাঙিও না ভুল)।

আ। শুধু হৃদয়মন্দিরে ভাবের আরতি নয়, প্রকৃতির মণ্ডপেও শৈব কল্পনারতি আলোচ্য কবিকৃতিতে বিদ্যমান। দেবেন্দ্রনাথ সেনের লেখনীতে বৈশাখ রুদ্র যোগী :

ললাটে অনল, হের ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে !
সর্বাঙ্গে বিভূতিভস্ম মাখি কুতুহলে,
তপে মগ্ন,—চিনিলে না 'বৈশাখ' দেবেরে ? (বৈশাখ)

বৈশাখের তৃতীয় নয়নের আগুনে দগ্ধ হয় চৈত্রমাস, তার স্ত্রী বাসন্তী যামিনী বিলাপরতা, জাত হয় গ্রীষ্ম। মনে পড়ে কুমারসম্ভবের ছবি এবং রবীন্দ্রনাথের

বৈশাখ, মদনভস্মের আগে ও পরে কবিতাগুলি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ রূপের কবি, তাঁর তুলিতে যত রঙ তত ভাব নেই ; ফলে বৈশাখী মুহূর্তটি হয়ে উঠেছে প্রকৃতির রঙফেরার জলছবি। ভাগীরথীর উৎসসন্ধানী জগদীশচন্দ্র বসু হিমালয়শিখরে দেখেছিলেন শিব ও রুদ্র, রক্ষক ও সংহারক, নন্দাদেবী ও ত্রিশূল, শিবানী ও শিবকে। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের (১৮৬৩) 'হিমাচলে' যোগী শিব এবং শুদ্ধা অম্বিকার ধ্রুপদভঙ্গিম চিত্র। সূর্যস্নাত হিমালয়ঃ

যেন, তুষারে ধবল-গিরির শৃঙ্গ ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জটি।
ঐ, সান্তর সোপান-মালার ঊর্ধ্বে শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা,
শোভে, অভ্র-সুষমা, যেন রে শুদ্ধা গৌর-কান্তি অম্বিকা।[৪১]

প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮) সনেটধৃত [৪২] শিব প্রকাশভঙ্গিতে বিশিষ্ট। যদিও তিনি বলেন ঃ

আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই!
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব,
কভু বসি যোগাসনে অঙ্গে মেখে ছাই (অন্বেষণ)—তথাপি নিরাকার যোগসাধনা অপেক্ষা সাকার দর্শন-আরাধনায়ই তাঁর সার্থকতর নয়ন-উৎসব। তাই তিনি ছবি আঁকেন ঃ

রজতগিরিতে হেরি তব শুভ্রকায়া,
চন্দ্র তব ললাটের চারু আভরণ
তব কণ্ঠে ঘনীভূত সিন্দূর বরণ,—
বিশ্বরূপ জানি আমি তব দৃশ্য মায়া ॥
যার স্ফূর্তি চরাচর, সে ত তব জায়া,
নিজ দেহে করিয়াছ বিশ্ব আহরণ,
তাই হেরি কৃত্তি তব চিত্র আবরণ,—
জীবনের আলোস্পৃষ্ট মরণের ছায়া! (শিব)

প্রিয়ম্বদা দেবীর (১৮৭১) প্রিয় দেবতা প্রলয়ী নটরাজ। তাঁর 'কালবৈশাখী' [৪৩] কবিতায় তাণ্ডবনৃত্যরত শিবের ঝঞ্ঝামদমত্ত ছবিটি বাত্যাদেব রুদ্র এবং রাবীন্দ্রিক প্রলয়ী নটকে স্মরণে আনে। চতুর্দশপদীর দৃঢ়পিনদ্ধ ললিতদেহে বহমান ছন্দে ঝড়ের গান এবং তার সঙ্গে নটরাজের মঞ্জীরধ্বনি যে ঐকতানের সৃষ্টি করেছে, অন্তিম ছত্র দুটির দীপ্ত অর্থদ্যোতনা তাকে গভীর ও গম্ভীর করে তুলেছে ঃ

জাগিছে ঈশান-কোণে রক্ত ভয়ঙ্কর,—
তোমার ললাট-দীপ্তি, ওগো দিগম্বর!

রূপের কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭) রূপময় তীর্থদেহে দেখেন শিব-উমার ছায়া-ছবি ঃ

দেখি দূরে 'নীলকণ্ঠ' শিলায় আলিপনা দেয় নাগে
জপমালা সম স্থূল বসুধারা গলিত অঙ্গরাগে।
হেথায় তাপসী উপবাসকৃশা উমারে অর্পি বর
রাখীবন্ধনে গৃহী হইলেন ভোলা শ্মশানেশ্বর।' (হৃষীকেশ : শতনরী)

যে ধ্রুপদী কাহিনী রবীন্দ্রনাথে পরিণত হয়েছে যৌবনবেদনরসে উচ্ছল শিল্পকর্মে, এখানে তা পুরাণচিত্র। যেখানে কবি ভাবুক, অরূপের পূজারী, সেখানেও সুন্দর-ভৈরবের আহ্বান অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র ; 'নমস্তে হে অ-দ্বয়, নমস্তে জ্যোতির্ময়' (ত্রিকূটে : ঐ)।

যতীন্দ্রমোহন বাগচির (১৮৭৮) হর-পার্বতী সীমা-অসীমের 'বন্ধ-মুক্তি যুগলমূর্তি' :
পার্বতী বলে, ঘর করি এসো, শিব বলে, চলো ঘর ছাড়ি ;—
এমনি করিয়া চিরদিন দোঁহে সংসারপারে সংসারী ! (হরপার্বতী : কাব্যমালঞ্চ)

যে তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ মননে অভিসিঞ্চিত করে প্রকাশ করেছেন, যতীন্দ্রমোহন তাকেই সহজ ভাবে সহজ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কাছে অর্ধনারীশ্বর পরিপূর্ণতার প্রতীক নয় ; নবীন সুখ-সংগতের জন্যে চাই হারিয়ে পাওয়া, মরণের বৃন্তে জীবনের ফুল ফুটিয়ে তোলা ; শিব ত্যাগের প্রতিমূর্তি, আবার চলমান মহাকালও। তথাপি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে অতীতের মায়া-অঞ্জন :

তোমার মত এমন সখা পাব কি আর সংসারে ?—
হে আশুতোষ, চরণে শত প্রণিপাত। (শিব সপ্তক : ঐ)

রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রেতর-ভাবনার সন্ধিস্থলের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২)। তাঁর শৈব কারুকৃতি সমকালীন রীতির অনুগ, পরকালীন রীতির সমীপ। হিমালয়ের লিপিলেখে শিব-শিবানীর চিরন্তন প্রেমলেখা দর্শন করে ছন্দের জাদুকর হন অলংকৃত চিত্রকর :

শিবের বিয়ের ওই যে টোপর, ওই যে গো বিরাজ করে।
ঐ যে 'হরমুকুট' উজল ঐ যে চির-চমৎকার,
বেড় দিয়ে ভুজঙ্গ সাথে গঙ্গা আছেন অঙ্গে যাঁর।...
মূর্তিময়ী হৈমবতী কবিরা কন কাশ্মীরে,
ফুটেছে ঐ সোনার কমল গিরিরাজের বুক চিরে।
(জাফরানিস্থান : বিদায় আরতি)

'বিদ্যুৎবিলাসে' কবি দেখেন 'রাজাধিরাজ রুদ্রের সদয় দানলীলা', সিন্ধুর তাণ্ডবে শোনেন 'মহেশ্বরের প্রলয়পিনাকের' টংকার, তার স্বভাবে-স্বরূপে অনুভব করেন রুদ্রপাগল নীললোহিতকে। সেই অনুভবে 'পাগলা ঝোরার' মন নিয়ে প্রলয়-।বষাণের প্রতীক্ষা করেন :

বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো ?
রুদ্রতালে নাচবে কবে ?

এই দৃষ্টি-আলোকে দেশসাধক অগ্নিপ্রথিকদের সামনে তুলে ধরেন শৈব সাধনার দৃষ্টিপ্রদীপ :

কাঁটাঝাঁপের বাজনা বাজে, ঢাকের গিঠে পাখনা দোলে,
মহেশ্বরে স্মরণ করে ঝাঁপ দিয়ে পড় কাঁটার কোলে।
দৃষ্টি রাখিস্ শিবের পায়ে চাসনে রে আর নিজের প্রতি,
কাঁটার জ্বালা ভোলায় ভোলা, ভুলিস নে তা ব্রতের ব্রতী।
(কাঁটাঝাঁপ : কুহু ও কেকা)

সত্যেন্দ্রনাথ শিবকে নিয়ে এসেছেন জীবনবৃত্তে, মানবতার উদার প্রাঙ্গণে :

একের মধ্যে দেখেছি অনেকে, বহুর মধ্যে দেখেছি একে,
শঙ্কাহরণ শঙ্কর তুমি, বিমোহিত মন মূরতি দেখে। (দেবদর্শন : ঐ)

শেষে শৈব সাধকের মত কবি ইষ্টের সঙ্গে অভেদ হয়ে গেছেন, অন্তরঙ্গ রসচেতনায় নিজেকে মনে হয়েছে মহাকাল মরণ প্রলয়ী :

আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিঘ্ন, আমিই শিব—
এ মহাদ্বন্দ্ব, ইহা আনন্দ, আমারি ডমরু ইহাতে বাজে।
(মহাদেব : তীর্থরেণু)

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩) শৈবভক্তির কবি। সোমনাথে লক্ষ কণ্ঠে একের স্তোত্রপাঠ শুনে তাঁর মনে হয়েছে, শিবশম্ভুর চরণে নত 'মহাভারতের মহামানবের হাট'। সোমনাথ সম্পর্কে তিনি আরও কয়েকটি কবিতা লিখেছেন; সেখানে বৈরাগ্য ভক্তি এবং শান্তরসের মধ্যে দিয়ে কবি নটরাজ মহাকালের ধ্যান ও আবাহন করেছেন। ভারত-আকাশ ঘিরে দেখেছেন তাঁরই জটাজাল, বজ্রে তাঁর শঙ্খসংকেত, বিদ্যুৎচমকে ত্রিশূলের জ্যোতি। অনন্তরূপী মহাকাল অনন্তপথযাত্রী বিশ্বমানবের নিয়ন্তা, মৃত্যুসাগরতীরে অমৃতবন্দরের নেয়ে; যখন সীমাশেষে 'সব হবে হিরোশিমা', সেই অবশ্যম্ভাবী শ্মশানে

সাথে রবে তুমি শুধু শ্মশানেশ্বর,
লয়ের আঁধার হতে ফুটাইবে সৃষ্টির অরুণিমা। (মহাকাল : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

অন্যদিকে বিশ্বের অবহেলিত জনগণকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'বীরভদ্ররূপে', যারা বিফলতার মাঠে সফলতার বীজ বোনে, যারা দুঃখহরণ করে দুঃখবরণের শ্রমে। কিন্তু শুধু বহির্জগতে নয়, কবি তাঁকে উপলব্ধি করেছেন অন্তরলোকেও :

আমার সর্ব মর্মবেদনা জানো অন্তর্যামী।
পথ চেয়ে আছি হে নীলকণ্ঠ আমি যে অহর্নিশ—
ফিরে এসো জগদীশ। (অঘোরপন্থী : ঐ)

কালিদাস রায় (১৮৮৯) বৈষ্ণব অনুগামী হলেও শৈবভাবান্বিত কবিতা অনেকগুলি লিখেছেন। তাঁর শৈব সাধু চন্দ্রধর 'দেবতারো বড়ো' (চাঁদ সদাগর :

বৈকালী)। শিবের মহিমান্বিত চিত্র যেমন তিনি এঁকেছেন তেমনি সহজ ভক্তিতে সরল ভঙ্গিতে গৃহিদেবতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন :

শুনতে ত পাই তুমিই নাকি তিন ভুবনের পতি !
ভাবছি, তবু হায় গো প্রভু তোমার কি দুর্গতি।…
ভিখ্ মেগে যাও, ধিক্কারো সও, ঘরে ভাঁড়ার খালি,
ভাঁড়টি ঝেড়ে মা ভবানী দুই বেলা দেন গালি।…
পাওনিক কাজ ? মোদের সাথে হও না কেন চাষী !

(দুঃখী দেবতা : আহরণ)

সরলাবালা সরকারের (১৮৭৫) 'অর্ঘ্য' কাব্যধৃত শিব-বন্দনাগুলিও সনাতন ও ভক্তিভাবিত। তাঁর 'জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়', 'শিববন্দনা' প্রভৃতি দেবরূপের প্রশস্তি। সঘন তন্ময়তায় কবি অনুভব করেন :

এক সেই শিবময় জীবনপ্রবাহ বহি চলে বিশ্বভূমতলে,
এক মহা বর্তিকায় অগণ্য জীবন-দীপ জ্বলে।
তখন স্ফূর্ত হয়—জীব শিব, শিব জীব, নমি বার বার।

(এক সেই : অর্ঘ্য)

আলোচিত কবিগোষ্ঠীর চারুশিল্পে শিব সনাতন হয়েও নিত্যনবীন ; আন্তরিকতা স্বাভাবিকতা এবং প্রকাশরীতির সহজতায় ছবিগুলি মধুর ও সুস্মিত। যদিও সকলের পশ্চাৎপট প্রায়-অভিন্ন তবু ব্যক্তিগত আবেগে ও আবেশে শৈব ভাবনাগুলি স্বতন্ত্র। কোথাও সে বস্তুঘনিষ্ঠ, কোথাও হৃদয়লগ্ন, কোথাও-বা এক বিশেষ মুহূর্তে জীবনদর্শন ও শৈবদর্শন অভেদাঙ্গ। শিব তখন কল্পলোকের শিল্পমাত্র নন, জাগতিক সাধনা, উপমা নন, অনুপম হৃৎপদ্মসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে বাংলা পৌরাণিক নাটকে অঙ্কিত শিবের চরিত্র ও চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য ; অবশ্য এক্ষেত্রে নাট্যকার নতুন কোন দিকের সন্ধান দিতে পারেন নি, গতানুগতিক ভক্তবৎসল দেবতাকেই মঞ্চস্থ করেছেন। এছাড়া কথাসাহিত্য এবং অ-পৌরাণিক নাটক বিধৃত মানবচরিত্রের অনেকগুলিতে শৈব গুণের আভাস লক্ষ্যগোচর হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মূলত 'কাব্যে শিব' বলে এসম্পর্কে বিস্তৃত পর্যালোচনার অবকাশ অল্প। তবু এখানে শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬) অঙ্কিত শিবোপম মানুষগুলির উল্লেখ অপরিহার্য। শ্রীকান্ত নরেন্দ্র দেবদাস উপেন্দ্রনাথ জীবানন্দ বিপ্রদাস সুরেন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রে অপার স্নেহময়তা ও গভীর জীবনবোধের সঙ্গে একটি অসীম নিরাসক্তি ও আপনভোলা পাগলামি জড়িয়ে আছে[৪৪]। এদের কেউ কেউ গৃহিসন্ন্যাসী, অনেকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পথে প্রান্তরে, মৃত্যুদোলনায় দুলিয়ে জীবনকে পরীক্ষা এবং আত্মসমীক্ষা করে অমৃতলাভের আশায়। বাঙালীর স্বরূপে ও স্বভাবে যে সহজাত শিবত্ব, রবীন্দ্রসংস্কৃতিতে যে সমুন্নত শিবায়ন, শরৎচন্দ্রের নায়কের মধ্যে আমরা পাই সেই শৈবভাবকে, সেইসঙ্গে বাঙালীকেও। প্রাগাধুনিক

বাংলা সাহিত্যে দেবদম্পতি অভিনয় করেছেন নর-নারীর ভূমিকায়, সেখানে মানব-মানবী ছায়া, কায়া শিব-শিবানী; শরৎসাহিত্যে শিব-শিবানীর ছায়ায় মানব-মানবীর কায়ারূপ গঠিত হয়েছে। তাই শরৎচন্দ্র এবং তাঁর সৃষ্ট নর-নারী আমাদের প্রিয়তম আত্মীয়।

ই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ—অনেক পথের, অনেক মনের ব্যবধান। অন্তর ও বাহিরের বিবিধ-বিচিত্র অভিঘাতে বাংলা কাব্যে নতুনতরের আবির্ভাব ঘটল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার সহগামী যেসব কার্য-কারণ এই পালা-বদলের মূলে, সেই মৌল প্রকরণগুলির উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে আমরা করেছি। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাবদলে দেশবিদেশের মানুষ ও মানবতা জীবন ও জীবনচেতনা নতুন পথে পদচারণা সুরু করেছে, কর্মে-চিন্তায় নতুন রূপ নিচ্ছে। চারপাশের আলোড়ন চিত্তে জাগিয়ে তুলছে অস্থিরতা, জমে উঠছে তিলোত্তম অতৃপ্তি ও অসন্তোষ, বন্ধ্যা মরুর ব্যর্থতা ও নিরাশা, চোখের জল আর মনের জ্বালা। (আবার এই অন্ধকারেই বসে আলোর সাধনা করে চলেছেন, এমন শান্তশীল চিত্তও নিতান্ত দুর্লভ ছিল না।) সাগরপারের এই অসমান ঢেউ ভারতের তীর স্পর্শ করেছে, তার জীবন ও মনকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু সাগরের ওপারের ঢেউ এপারে এসে ভেঙে গেছে, তার নিটোল রূপ দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে। বস্তুজাগতিক ও মনোজাগতিক কার্য-কারণে পরাধীন দেশের (রেনেশাঁসের মত তার) 'আধুনিকতাও' বিপরীতের সমাহার—একতীরে ক্ষয়, অন্যতীরে চয়, বাঁধনভাঙা ও বাঁধবাঁধা। একদিকে বিগত শতকের সুখী জীবন ও শান্ত মন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পুরনো বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সরলতা ও শৃঙ্খলা; অন্যদিকে তার গঠনচিন্তাকে প্রেরণা দিচ্ছে বন্ধনমোচনের দৃপ্ত সংগ্রাম, দেশপ্রীতির মহৎ আদর্শ, গণচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ জনশক্তি। অস্থির চারপাশের হাওয়া, অস্থির জাতির হৃদয়; তারই মধ্যে নতুন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে পাড়ি দেবার আশাভরা সংগ্রাম, আলোভরা চেতনা।

বাহির-জগতের এই আন্দোলিত পটভূমিকায় বাংলা কাব্যে তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একদল কবি উনবিংশ শতকের স্বপ্নে বিভোর, পায়ের তলায় ভূকম্পনকে না-মেনে অথবা জেনেও, সনাতন ভক্তি-ভাবে অবগাহনরত; এঁদের কথা পূর্ব উপ-অধ্যায়ে বলেছি। দ্বিতীয় ধারায় রবীন্দ্রনাথ—যিনি এই ভাঙনকে দেখেছেন, দেখিয়েছেন, কিন্তু তাকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নেন নি; নিবিড় জীবনমমতা, অপার মানবমমতা এবং দূরযানী দর্শন-দৃষ্টি দিয়ে তিনি অন্ধকারের অন্ধ কারার মধ্যে আলোর সন্ধান করেছেন, আঁধার-পথে আশার প্রদীপ জেলেছেন, অনিকেত বর্তমানে শুনিয়েছেন ভাবী সমসমাজের সংকেত-সংগীত। তৃতীয় দলের কবিকুলের মধ্যে ভেঙে-যাওয়া পৃথিবীর ধূসর রূপটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, কাব্যকৃতিতে

ফুটে উঠেছে হতাশা আর অবসাদ, দ্বিধা ও জটিলতা, খণ্ডদৃষ্টি ও বিক্ষোভ। এবং বৈপরীত্য—বাস্তবিক দেহযন্ত্রণা, অথচ কাল্পনিক হরণমন্ত্রণা, দেহসীমালগ্ন মাটিঘেঁষা ভাবনা সেইসঙ্গে ভাবের আকাশে সুন্দরের আরাধনা, প্রেমের মানসলেখার পাশে যৌন বেদনার তীব্র রেখা। কাব্যবীণায় বেজে উঠল নতুন সুর।

এই নতুন সুরে লয়সঞ্চার করেছেন প্রলয়ী ও প্রণয়ী শিব। আধুনিক কবি তাঁকে দেখেছেন নিজের অন্তরে ও জনতার প্রান্তরে, সংগ্রামের সীমান্তে এবং অতলান্ত প্রেমে, জীবনে ও দর্শনে। যে রৌদ্র চেতনায় পলাশী-উত্তর বাংলা সাহিত্যের যাত্রারম্ভ, তার সূত্রধার নটরাজ রুদ্র ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে এসেও দেখি তার পুনরাবৃত্তি। এখানে শিবের অন্যান্য রূপ-আদর্শ অবহেলিত না হলেও রুদ্র নটরাজই নবনব অভিযান-অভিসারের সহচর, তাঁর তৃতীয় নয়নের আলো-আগুনে একই সঙ্গে কুমারসম্ভাবনা ও কু-মারসম্ভাবনা। এই নটলীলার প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ, সেই পথের পথিক সাম্প্রতিক কবিরা। রাজবন্দী নজরুল ইসলামের দৃপ্ত ঘোষণায় তার রৌদ্রী অভিব্যক্তি : 'অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির প্রেম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম।...বাঙলার শ্যাম-শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাহক করে।' কল্লোল-পত্রিকার প্রচ্ছদপটে এই নটরাজেরই লীলাচিত্র। এবং সেই চিত্ররূপের ব্যঞ্জনা বন্দীর বন্দনা-রত কবিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বহুর প্রতিনিধিত্বে :

> উন্মাদ উদ্দামগতি ছুটে চলে জীবন-জাহ্নবী,
> জীবন রহস্য ভরা, পৃথিবী সে ব্যথায় বিশাল—
> আবর্তে হারায়ে যায় পুঞ্জীভূত কুৎসিত জঞ্জাল।
> মোদের প্রাণের মাঝে সেই প্রাণ, সে প্রেরণা লভি
> মোরা রচিতেছি গান ;—মোরা সেই জীবনের কবি।
> আমাদের চিরসঙ্গী নৃত্যক্ষিপ্ত রিক্ত মহাকাল।
>
> (মোরা তার গান রচি : বুদ্ধদেব বসু)

আধুনিকতার সরণিতে যে তিনজন কবি প্রথমেই স্মরণীয়, তাঁরা পরিপূর্ণভাবে আধুনিক না হলেও তার অগ্রগামী পতাকাবাহী। তাঁদের রচনায় পূর্বাগত ধারায় মিলেছে নবাগত স্রোত, তাতে বেজে উঠেছে দুঃখবাদের স্বর এবং আশাবাদের সুর—কারও আগে, কারও পরে, কারও বা একই সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ শিবের মধ্যে দেখেছেন ধ্বংস ও মঙ্গলকে, দুঃখ ও দুঃখান্তকে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭) যিনি মনে মনে ভাবেন 'মায়ের বাঁ পাখানি,' তিনি দেখেছেন নীলকণ্ঠ 'ব্যথার দেবতা'কে—যিনি কণ্ঠনীল নরনারীর সার্থক প্রতিনিধি (কচি ডাব : সায়ম্)। কবি তাঁর কাছে জানতে চান 'পূজার অর্ঘ্যে চাপাপড়া যত বেদনার ইতিহাস' (সিন্ধুতীরে : মরুশিখা)। কিন্তু জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না, আশাহত চিত্তে সঞ্চিত হয় ব্যর্থতার জ্বালা এবং তার জ্বালামুখী প্রকাশ :

মহাশব বুকে মহাশিব সুখে জাগাবে মহাশ্মশান।
সে দিনের আশে পরম নিরাশে বাজারে বগল বাজা।
জয় শংকর প্রলয়ংকর জয় দুঃখের রাজা। (শিবস্তোত্র : ঐ)

বিদ্রূপ অচিরে বিলীন হয়, ব্যথাসজল হৃদয় উপলব্ধি করে :

আলোরূপী শিবে করি শব চরণে চাপিয়া
কালরূপী মহাকালী নৃত্যপরা নিখিল ব্যাপিয়া। (অন্ধকার : ঐ)

শুধু শব-শিব নয়, কবি দেখেছেন ধ্যানী শিবকেও—কবিগুরুর মত বৈশাখে নয়, হেমন্ত-শেষে। শবাসনে যোগীশ্বর শীত ধ্বংসে রত, পূর্ণাহুতির মাধ্যমে তিনি জাত করবেন হাহাকারকে (শীত : মরীচিকা)। কালক্রমে কবির চিন্তায় শীতের পাশে আসে বসন্ত। আশার ইঙ্গিত হয় আলোর সংগীত। যতীন্দ্রনাথের ভাবনা তখন আর দুঃখবাদী নয়, রবীন্দ্র-বিরোধী বা বিপরীতও নয়। শিবের গাজনে কবি দেখেন, অনন্ত জুড়ে কালের চাকা ঘুরে চলেছে, তার মাঝখানে মরা বছরের বুকের ওপর 'নাচে শিব নাচে সুন্দর নাচে রুদ্র কাল', তাঁর 'চরণে ধ্বনিছে প্রলয়ছন্দ, নিমীল নয়নে সৃজনানন্দ।' কবি অনুভব করেন, যে চিতা তাঁর নিজের হৃদয়ে, সেই ব্যথার জ্বালা দেবতার সর্বাঙ্গে ; বিশ্বের আদিতে তিনি, অন্তিমেও 'বিভূতিভূষণ শংকর একা' (বহ্নিস্তুতি : ঐ)। অতএব 'সেই গুরু তোর, সেই ভোলানাথ, বিষের জ্বালায় প্রলয় নাচে।' নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করেন এই ভয়ানক-সুন্দর প্রাণদেবতার কাছে :

ভূতনাথের নাচের তালে, ভিড়ে যা তুই সেই ভূতের দলে,
যার কাছে তুই মন্ত্র নিলি সেই ঠাকুরের রাখ রে মান। (ভাঙ্গা বছর)

শৈব আনুগত্য বন্ধনমুক্তির স্বাদ নিয়ে আসে, মরুতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় প্রাণগঙ্গাধরের কাছে এসে ৪৫। কবিচিত্ত প্রণত হয় যে নটের নাচের তালে তালে 'চিত্তে চিত্তে পদ্ম ফুটায়, সে চির পদ্মপাদে' (ভাঙ্গা আসর : ত্রিযামা)। কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সশ্রদ্ধ পঞ্চারতি :

মন্দিরে মন্দিরে লহ এ আরাত্রিক,
পরমতীর্থ ওঁ ওঁ মহাযাত্রিক।
মন্দিরে মন্দিরে সান্ধ্য আরাত্রিক,
ওঁ শিব ওঁ শুভ ওঁ মহাযাত্রিক।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮) শিবের ভাবরূপের পূজারী। তাঁরও মধ্যে পাই সদসতের দ্বন্দ্ব এবং মৃত্যু-অন্তিম অমৃতত্বের চেতনা। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি 'কালবৈশাখী'র (হেমন্ত গোধূলি) মধ্যে শোনেন পিনাকের টংকার, ভীষণের মধ্যে দেখেন শোভনকে, যিনি শূন্যকে পূর্ণ করেন, অফলনকে ফলিয়ে তোলেন, দীর্ঘশ্বাসের খরাকে দেন 'নববিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ।' হৃদয়ভাবের গণ্ডীতে কবির যাত্রা সুরু দুঃখবাদের সীমান্ত থেকে। জীবনকে মনে হয়েছে 'ঘরের উঠান শ্মশান করে শব

হয়ে এই শবসাধনা' (শবসংগীত : বিস্মরণী), নিরাশাবাদী মন হয়েছে নৈরাশ্যের স্বপনপসারী :

কাঁচের পেয়ালা ভেঙে ফেল তোরা, লও রে অধরে তুলি
শ্মশানের মাটি লাগিয়াছে যায়—মড়ার মাথার খুলি।...
টিট্‌কারি দাও মৃত্যুরে, লও মড়ার মাথার খুলি।
চুমুক চুমুক দাও বারবার পড় গো সবাই ঢুলি।
(অঘোরপন্থী : স্বপনপসারী)

অঘোরপন্থী শৈব তান্ত্রিকের দেহবাদেও নিত্য-অনিত্যের চেতনস্ফুলিঙ্গ :

যারে পাওয়া যায় কোটি বরষেও কি তার মূল্য আছে ?
তাই মহেশের অচল বক্ষে মহামায়া ঐ নাচে। (মৃত্যুশোক : ঐ)

একের সঙ্গে মিলনে তিনি দেহবাসরে শ্মশানের বিভীষিকা দেখেন, মদনজিত স্মরজিৎ-এর অতৃপ্ত বাসনার কথা মনে পড়ে, দেহরতি দেহাতীত হতে চায় (স্মরগরল)। আশাহত কবির সামনে তমিস্র নির্জনতা আর অজস্র মৃত্যু। নিরাশার এই মাঝদরিয়া থেকে আশাদ্বীপে নিয়ে যায় তাঁকে স্বগত-মন্ত্র :

শিবনাম জপ করি কালরাত্রি পার হয়ে যাও—
হে পুরুষ ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার। (আহ্বান : ঐ)

নিজেকে অতিক্রম করে কবির দৃষ্টি যখন সমষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সামনে ভেসে ওঠে পরিপার্শ্বের অন্যায় অসত্য ক্লীবতা আর নির্বেদ। শবে আকীর্ণ পৃথিবী, তার মাঝে কোথায় ধূর্জটি, কোথায় তাঁর নয়নের অগ্নিজ্বালা, যাঁর তাণ্ডবনৃত্যে সব ধুয়ে মুছে যাবে, সুন্দরী নয়, সতীবেশে 'কোটি বরষের ধরাবধূ হবে স্বয়ম্বরা !' কবি আবাহন করেন :

জাগো মহাকাল ! রুদ্রদেবতা বর্ণবিহীন বিভূতিময় !
দাও খুলে তব গ্রন্থিল জটা, ব্যোমকেশ, কর সৃষ্টি লয় !
কেটে যাক নীল নভোবুদ্‌বুদ রঙের হাট !
মেদিনীর এই বেদী ভেঙে যাক—রূপের ঠাট !
সুন্দর হানো সত্যের শূল, টুটাও স্বপন হে নির্দয় !
নিত্যমরণ হরিয়া দাও গো নিত্য জীবন পুণ্যময়। (রুদ্র-বোধন)

নিত্যমরণ থেকে নিত্যজীবন, রতি থেকে আরতি, হতাশা থেকে নব আশায় উত্তীর্ণ হন কবি, শিবনাম জপ করে পার হয়ে যান অন্ধকার কালরাত্রি।

পারিপার্শ্বিক অবিচার ও বেদনা তাঁরও মর্মকে দগ্ধ করে, না-পাওয়ার বেদনা তাঁরও চিত্তকে ক্ষুব্ধ করে। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপেও নেই আশাহত জড়িমা অথবা দুঃখদীর্ণ কালিমা। আশ্চর্য এক বলিষ্ঠতায়, উজ্জ্বল এক আলোক-আশার আগুন জ্বলতে থাকে তাঁর বারুদ-হৃদয়ে। শিবের মতই তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও স্বভাবে বেহিসেবী ঝড়ো পাগলামি এবং উদাসীন আত্মভোলা সরলতা, অভাব আর অভাবের

পূর্ণতা। ইষ্ট ও ভক্ত অভিন্ন, একই পথের যাত্রী দুজনে, একই মেজাজ দুজনের—একের নয়ন জলে, অন্যের বুকে জ্বালা ; একের রুদ্রবীণা, আরের অগ্নিবীণা। সেই অগ্নিবীণার কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯)।

চারপাশের অবসাদের মধ্যে নজরুলের উচ্চকণ্ঠ এবং দৃঢ় প্রত্যয় বিস্ময়কর কিন্তু অভাবিত নয়। শৈবাদর্শ যাঁর অন্তরের গভীরে, তিনি অশিবকে অপ্রত্যয়কে চরম বলে মেনে নিতে পারেন না। তিনি জানেন, যতই 'শিবারা চেঁচাক, শিব অটল।' কবির দৃষ্টিতে শিব চির সংগ্রামী ভৈরব নটরাজ, জাতির নেতা ও অভ্রান্ত কাণ্ডারী। প্রেমে সন্ন্যাসে প্রলয়ে সৃজনে তিনি ধ্বংস ও মঙ্গল, ব্যষ্টি ও সমষ্টির আশ্রয়। অগ্নিবীণায় 'বিদ্রোহীর' আত্মঘোষণা নজরুল-কবির, নজরুল-শিবের :

আমি চিরদুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস।

বিষের বাঁশি কাব্যে ঝড়ের দেবতা অভিনন্দিত হন 'বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা' ব'লে, গানের শ্রুতিতে সুরের কাঁপন জাগে :

আমি ছন্দ-ভুল চিরসুন্দরের নাটনৃত্যে গো।
আমি অপ্সরা-মায়া ধ্যানভঙ্গের যোগী মহেন্দ্রের চিত্তে গো।

কবির হৃদয়পদ্মে বিদ্রোহী নটরাজ ; সেই 'প্রাণের সন্ন্যাসী' তাঁকে ঘরে থাকতে দেয় না, জ্বালা নিভিয়ে দেয় না। কণ্ঠনীল কবি পথে নেমে ছড়িয়ে দেন শৈব মন্ত্র :

আসছে এবার অনাগত প্রলয়নেশায় নৃত্যপাগল
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।
মৃত্যুগহন অন্ধকূপে, মহাকালের চণ্ডরূপে—
বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর !
ওরে ঐ হাসছে ভয়ংকর ! (প্রলয়োল্লাস)

কালিমামুক্তির বাসনায় কবি প্রার্থনা করেন, 'হে মহা রুদ্র ! চূর্ণ কর এ ভণ্ডাগার' (তূর্যনিনাদ), বজ্রবিষাণে আসুক আহ্বান 'বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব' (উদ্বোধন), তার সমতালে হোক 'রুদ্রবেদনে উদ্বোধন' (আত্মশক্তি)। যেসব পীড়িত নরনারী ঘর ছেড়ে এসে 'ভরিল নভোতল ক্রন্দনে' (সাম্যবাদী) এবং যেসব নরনারী ঘরে বসেই মরছে, তাদের 'শব করে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছ' (মরণবরণ)। আত্মশক্তিতে জেগে উঠুক সেইসব মারখাওয়া আর মরমর মানুষ, লাখ লাখ ভৈরব হয়ে এগিয়ে যাক রক্তপিচ্ছল পথে ; তাদের সঙ্গে 'নাচে ধূর্জটি সাথে প্রমথ, ববম্ বম্ বম্'…'মত্তপাগল পিনাকপাণি সত্রিশূল হস্ত ঘুরায়'। ভেঙে চুরমার হয়ে যাক যাকিছু ভঙ্গুর, মরুক যাকিছু মরণীয়, নিশ্চিহ্ন হোক যাবতীয় কলঙ্কচিহ্ন, প্রলয়ের বর্ষণে অন্ধকার নেমে আসুক বন্ধ্যা ভূমিতে। তারপর প্রলয়ান্তে নতুন সৃষ্টি, 'আসছে নবীন জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন' (প্রলয়োল্লাস)। নজরুল বিদ্রোহের কবি, নৈরাশ্যের নন। তাই পরিপূর্ণ সমাজবোধ নিয়ে ভাঙার পরেই গড়ার

কথা বলেছেন, ধ্বংসকে জেনেছেন 'নূতন সৃজন-বেদন' বলে, যুগান্তরের পরে নবযুগের কথা শুনিয়েছেন :

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ঐ এলো ঐ
এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর রে !
বল জয় সত্যের জয়
আসে ভৈরব বরাভয়
শোন্ অভয় ঐ রথঘর্ঘর রে ! (যুগান্তরের গান)

আকালের মাঝখানে বসে কবি আহ্বান করেছেন অকালকে নতুন কালের সম্ভাবনায়, অন্ধকারের মধ্যে ফুটিয়েছেন আলোর ফুল, শোষণ ও অনাচারের মধ্যে দেখেছেন 'সত্যবোধন আজ মুক্তিবোধন' (জাগৃহি)। বিদ্রোহী শৈব কবি হয়েছেন জাগৃহি কবি। তাঁর জীবন-সন্দর্শনে রবীন্দ্রদর্শনের প্রতিধ্বনি স্পষ্টত কানে বাজে; তবু এই প্রতিধ্বনি স্বয়ং ধ্বনি এবং স্বতঃ ধ্বনী।

ঐ। পতাকা যার সংকেত বহন করে এনেছিল, সেই নবতর চেতনা আবির্ভূত হল কল্লোলগোষ্ঠীর কবি-কর্মে। এই সময়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্বের জোয়ারী ঐশ্বর্য, যিনি, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 'স্বজাতির হাতে এক হিসেবে দূরবীণ দিয়েছেন যার সাহায্যে বাইরের জগৎ দেখা যায় ; আর সেই সঙ্গে অনুবীণ দিয়েছেন যার সাহায্যে মনোজগৎ দেখা যায়' ৪৬। এই বহির্জগৎ ও মনোজগতের যোগাযোগে আলোচ্য পর্বের কাব্যসাহিত্য ভাবে ভঙ্গিতে প্রত্যয়ে প্রকরণে বিদ্রোহী এবং প্রগত-নূতন হয়ে উঠল। কবিতার মানচিত্রে রূপ নিল নতুন মানসচিত্র, বস্তুলগ্ন দেশপ্রেম ও প্রেমের দেশ, তির্যক স্বপ্ন ও শব্দ, বৈপ্লবিক কলা ও কারু। বিশ ত্রিশ ও চল্লিশের দশক পেরিয়ে সে-শিল্প এগিয়ে এসেছে সাম্প্রতিকের সীমানায়।

বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে সাগরের ওপারে আধুনিকতার যে অগ্রসৃতি ঘটল, এপারে তার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তৃত হল কল্লোল-কবিদের মধ্যে। প্রকাশব্যাকুল তরুণ হৃদয় তখন সমসাময়িকতায় বিচলিত, অতীতের প্রতি অনীহ। সেই তরুণ হৃদয়কে বোবা ও জড় গতানুগতিকতার গণ্ডী থেকে বাইরে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ এবং এই মানসমুক্তির প্রকাশের পথনির্দেশ দিলেন টি. এস. এলিঅট (বিষ্ণু দে)। চারপাশের বাতাসে তখন (প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায়) 'বারুদের গন্ধ', তার 'অতর্কিত বিস্ফোরণে বিদীর্ণ মুহূর্তগুলি জ্বলে'। চারপাশে এবং মনে অবক্ষয়ের সূচনা। তাই কবিতার দেহেমনেও বিষণ্ণ ক্লান্তি, ধূসর অবসাদ, যন্ত্রণার আর্তনাদ, সংশয়ের অন্ধকার এবং বিশৃঙ্খল জটিল অপ্রত্যয়ী মানসিকতা। ব্যক্তিবাদের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি এবং আত্মরতির অন্তর্বৃত্ত তাকে আরও নির্জন করে তুলেছে। তাব'লে এই প্রবাহের সবটাই আশাহীন দীর্ঘশ্বাসের স্রোত নয়। কারও কারও

রচনায় আছে আশাভরা জীবনস্বাদ, সমাজচিন্তার নিশান্ত স্বপ্ন এবং মাটিঘেঁষা মানবতার বহির্বৃত্ত। কোথাও-বা একই কবির মধ্যে বিপরীত ভাবনা সমাহৃত হয়েছে : উষরমরুতে দুর্মর সূর্য-আশা, অনীহার মধ্যে ইহবাদ, করুণ জীবনজিজ্ঞাসার বলিষ্ঠ উত্তর। একদিকে যখন 'বাসর-রাতের দীপ নিভে গেছে বিধবা নয়নজলে', অন্যদিকে তখনও 'মনের বাতায়নে মোর রাখিলাম দীপ জ্বালি'। তৃষ্ণা ও তার শান্তি, দহন ও উজ্জীবন, দুঃখ ও দুঃখান্তের এই তপস্যাই শৈব সাধনা। আধুনিক কবি সেই সাধনাকে গ্রহণ ও অনুশীলন করেছেন—কেউ বহুজনতার ভীড়ে, কেউ একক হৃদয়ের নীড়ে। শৈবভাবে উদ্দীপ্ত এবং শৈব অলংকারে মণ্ডিত বাংলা কবিতা এগিয়ে গেছে ভাবাতিরেক থেকে ভাবনিবিড়তায়, আবেগতারল্য থেকে মননশীলতায়, রবীন্দ্র-বিমুখতা থেকে রবীন্দ্র-অভিমুখে।

নিবিড় আত্মরতির কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১) তিনি শিবকে স্মরণ করেছেন জনান্তিক প্রেমের প্রচ্ছদছায়ে। অর্কেস্ট্রার 'মহাশ্বেতা' কবিতায় দক্ষযজ্ঞ নতুন অর্থে দ্যোতিত হয়ে উঠেছে 'সার্বভৌম মিলনপার্বণ'-রূপে। যখন নবাগত ফাল্গুনে উমা-উপমা ধরণী রূপে-বর্ণে-গন্ধে প্রেমের উপহার এনেছে, তখনও আত্মদুঃখহত কবি তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি, তাণ্ডবে মত্ত হয়ে শূন্য নভে—

> রিক্ত প্রতিধ্বনি-স্ফীত অট্টহাসি করি,
> উড়ায়ে মরুর বায়ে বেদ-বেদান্তের পাতা,
> বলেছি পিশাচহস্তে নিহত বিধাতা। (বিস্মরণী : ঐ)

অবশেষে বিস্মরণ পেরিয়ে কবি এসেছেন স্মরণের পারে, প্রলয়নূপুরের তাণ্ডবধ্বনিতে শুনেছেন প্রেমের ঐকতান, মানসপ্রিয়াকে পেয়ে মনে হয়েছে 'সৃজনপ্রাতের প্রথম যমক মোরা, প্রলয়রাতের শেষ বনিতা-স্বামী।' হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী একসঙ্গে বেজে উঠেছে ঝন্‌ঝন্ ক'রে, ভালবাসার চারপাশে ভীড় করেছে সুন্দর-অসুন্দর মিলন-বিরহ, তারই মধ্যে দিয়ে অগ্রসৃত হয়েছে উল্লসিত রতি-অভিসার। তাই যখন স্বপ্নসঞ্চরণ-পালাগীতির মাঝে অকাল-বাদলে বেজে উঠেছে ডমরু, রুদ্রাণী দিগ্‌বসনা সুরু করেছেন নাচ, তখন কবি পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততায় তাকে স্বাগত জানিয়েছেন উত্তরণের আশায়, রতি থেকে আরতিতে :

> আজ মহেশ মেলেছে বিলোচন,
> পায়ে তাণ্ডব জেগে উঠেছে,
> হলো বিন্ধ্যের শাপ বিমোচন,
> পুন সৌরলোকে সে ছুটেছে।
> বুঝি উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের,
> যত তৃষিত পিশাচ মড়কের,
> তারা মেতেছে গাজনে চড়কের
> সারা বিশ্বের স্থিতি টুটেছে।

ওই রসাতলে যায় ত্রিভুবন ;
আজ প্রলয়েশ জেগে উঠেছে। (অর্কেস্ট্রা : ঐ)

'মহাশ্বেতা' এবং 'বিস্মরণী'তে যে শিব-শিবানী ছিলেন অলংকৃত প্রতীক, তাঁরা এখন সালংকারা প্রতিমা। তাঁদের সহায়ে বিন্ধ্যের শাপবিমোচন হয়, বন্ধ্যা প্রেম পরিণত হয় শস্যশ্যামলতায়। তারপর একদিন রুদ্র মত্ততা মোহিনীমায়ার আবির্ভাবে শান্ত হয়ে আসে, অতনুর স্পর্শে আগ্নেয় নয়নে জাগে সুখের আবেশ :

অতনুর ফুলসায়ক বক্ষে পশিয়া
আজি রুদ্রকে দক্ষিণমুখ করেছে।
পদতলে বসে গৌরী বদ্ধদৃষ্টি ;
বরমালাধৃত করযুগ নিস্পন্দ।
পুনরায় নির্বিঘ্ন সকল সৃষ্টি,
স্বর্গ অবার, দেবাসুরে নির্দ্বন্দ্ব। (পুনরাবৃত্তি : সংবর্ত)

কবির এই ক্রম-শান্ত প্রেমভাবনায় ছায়া ফেলেছে 'কুমারসম্ভবের' ধ্যানমৌন এবং 'তপোভঙ্গের' মুখর ধ্যানের ছবি, যদিও জীবনের বৃহত্তর পরিধি এখানে অনুপস্থিত। সুধীন্দ্রনাথের প্রেম আত্মরতিভর রোমান্টিক—জীবনের অভিযানে নয়, মনের অভিসারে ; রুদ্র-গৌরী তার পট ও প্রতীক-প্রতিমা। এখানে ভাব-অভাব বিচ্ছেদ-মিলন যোগ-বিয়োগের একটি পূর্ণায়ত বৃত্ত বর্তমান, সে বৃত্ত তাঁর স্বরচিত। কিন্তু যেখানে কবির ব্যক্তিগত মনীষায় দেশগত মানসের ছায়াপাত হয়েছে, সেখানে শিবের ভূমিকা বিপরীত রীতির। যে-দেবতা প্রেমবিলাসী চিত্তকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে নির্দ্বন্দ্ব সুন্দরলোকে, সমষ্টির ক্ষেত্রে তিনি কিংবদন্তীমাত্র :

তিলভাণ্ড সর্বনাশ : অতিদৈব বিশ্বের দেউল :
প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা :
প্রতিজ্ঞাবিস্মৃত কল্কি, কিংবদন্তী শিবের ত্রিশূল,
শূন্যকুম্ভ পুরাণ সংহিতা। (উপসংহার : ঐ)

নিঃসীম প্রত্যয়ের, অখণ্ড দৃষ্টির এবং ইহবাদী স্পষ্টভাষণের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪)। তাঁর কল্পনা জীবনাদর্শনিষ্ঠ, বস্তুদর্শন বিজ্ঞানভিত্তিক। জীবনমৃত্যুর অধীশ্বর চিরপথিক ব্রাত্য শিব তাঁর কাব্যদেবতা, প্রভঞ্জনী 'বিবাগী মনের দোলা লেগে' কবি যাযাবর সাগরপাখী। প্রথমা কাব্যগ্রন্থে উভয়ের নিকটতম সান্নিধ্য বিভিন্ন কবিতায় রূপ পেয়েছে। জীবনের ছন্দদোলায় পূর্ণ হন অপূর্ণ, আনন্দ হয় বেদনা, দেবতা নামেন গ্লানির পঙ্কে বীভৎস ক্ষুধার জঘন্য পাপের মাঝে :

মোর সাথে পাপী হলে
বুকে তুলে নিলে মোর তাপ ;
মোর সাথে দুর্বহ ব্যথার বোঝা স্কন্ধে নিলে তুলে (অপূর্ণ)

এই কান্নার খেলা অপরূপ অদ্ভুত। মেতে ওঠেন কবি ক্রন্দসী লীলায়, 'নিদারুণ

কপট কৌতুকে' পান করেন রঙীন বিষ। নীলকণ্ঠের সাহচর্যে সেই বিষ হয় অমৃত, জীবনশিয়রে নামে ব্যথাহর স্বপ্নের দোলা, বেদনাহলুদবৃন্তে ফুলের সবুজ (স্বপ্নদোল)। কবির সমাজভাবনাতেও উত্তরণের এই একই পালা। দিকে দিকে তিনি দেখেন জলন্ত অগ্নিকুণ্ড, বিকারের পয়োনালী, কঙ্কাল পথ, লোলুপ অন্ধকার; আশার শ্মশানে আনন্দের শবাসনে বসে মহাকালী আহ্বান করছেন অসুন্দরকে হিংস্র শক্তিকে (আশীর্বাদ)। মৃত্যুর শাসন আর শ্মশানের শোষণের মধ্যে তিনি দেখেন 'শিবের সাথে শ্বসছে রে শব', শোনেন 'কালভৈরব হুঙ্কার' (ইহবাদী)। অথচ তাঁর অট্টহাসিতে দোলে জীবন-মৃত্যু, জীবনের অভিযান হয় যৌবনের অভিসার, শব হয় শিব। সেই আশায় বিক্ষুব্ধ কবিমন উপনীত হয় ভাগ্যবিধাতা শিবের কাছে অভিনব অর্ঘ্য নিয়ে; বিশ্বজোড়া হাহাকার তাঁর স্তব, চিতাগ্নি তাঁর আরতি, ভস্মশেষ নৈবেদ্য আর মন্ত্র হতভাগাদের গান :

জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার!
লহ এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।
ক্রীতদাস মানবের মৃত্যুপুর হতে
আজি কমণ্ডলু ভরি
আনিয়াছি স্বেদ ও শোণিত,
—পূত পূজাবারি।
আনিয়াছি পুঞ্জিত কালিমা
লেপিতে ললাটে তব চন্দন-বিহনে,—
পূজা তব আজি বিপরীত! (নমস্কার : প্রথমা)

মাটির ঘরে মাটির মানুষের ব্যথা গ্লানি জ্বালা অভিশাপ 'কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ' চয়ন করে কবি যে প্রণামখানি বয়ন করেছেন, 'সেই নমস্কার তোমারে অর্পিনু আজি হে জীবন-বিধাতা আমার।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিভাবনার মূল আত্মরতি নয়, মানবারতি; জীবনকে তিনি দেখেন ভালমন্দ প্রেমপ্রবৃত্তি আলোকালো মিলিয়ে সমগ্র দৃষ্টিতে। এই বিপরীতের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করেন জীবন-মহাদেবের নৃত্য; পৃথিবী কাঁপে, সুন্দর-অসুন্দর জীবন-মরণ কাঁপে,

তারি সাথে যুগে যুগে দোলে দোলে দোলে,
নটরাজের নাচন চির-নারী-মাতার কোলে। (নটরাজ)

ললিত-কঠোর যৌবন-জীবনের এই নটরাজরঙ্গলীলায় মেতে ওঠেন কবি, চিত্ত হয় নাবিক-মন, মানুষের দল 'ফেরারী ফৌজ'—যারা অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে আনবে নতুন দিন। কিন্তু সেই সংশপ্তক বাহিনী আজও পলাতক; কবির মনে তাই জাগে হতাশা, জীবনকে মনে হয় স্বার্থের আবর্জনাস্তূপ, মহাকালের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, আঁধার আর অন্ধ বিভীষিকা (প্রহসন)। পরক্ষণেই তিনি আশায় উজ্জ্বল হন, মহাকালের হাতে নিহত হতে দেখেন ভয় হিংসা লোভকে, শোনেন পরিশুদ্ধ মৃত্যুজিৎ বাণী :

মারণ-অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়
শান্তির অমৃত-মন্ত্রে পায় শেষে লয়। (তিনটি গুলি)

মহাকালের স্রোতে, অভিযাত্রায় ও সংগ্রামে আসে মৃত্যু, আসে অমৃত। এই শৈব তত্ত্ব কবিকে নিয়ে এসেছে বেনামী বন্দর থেকে জনসমুদ্রে। জীবনের ছোটখাট পরিসরে এবং বৃহত্তর প্রসারে সেই চলার গান ডানা পেয়েছে 'সাগর থেকে ফেরায়'। মেলার ধারে জনতার মাঝখানে থাকতে চেয়েছেন কবি, যেখানে আসবে পাঁচটা গাঁয়ের মানুষ, যারা হৃদয় ছিঁড়ে প্রাণের সল্‌তে পাকায়, বুকের আগুনে আগ্‌লে ফেরে আশাপ্রদীপ। তাঁর আজকের আকাঙ্ক্ষা যৌবনের বাণিজ্য-যাত্রা নয়, স্থিতিশীল লেনদেন। কিন্তু তখনও তিনি যেমনি বহুবচনান্বিত, এখনও তেমনি। তাঁর 'দোকান'-এর এক পাশে থাকবে শান্ত জীবনের জলছবি, 'কত না মুখ, কত না পা পেরিয়ে যাবে চলে'; অন্যদিকে অশান্ত যৌবনের জ্বলন্ত ছবি :

জল পড়ে দুনিয়ার জ্বালা-করা চক্ষে
পাতা নড়ে প্রলয়ের ঝড়ে কি অলক্ষ্যে! (রাতজাগা ছড়া)

বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের অতিপরিচিত শ্লোকটি ছড়ার ছবি ও ছন্দে এক আশ্চর্য নতুন অর্থে স্নান করে উঠেছে! 'জল পড়া' বেদনার শাশ্বী প্রতীক, 'পাতা নড়া' প্রতিরোধের সশব্দ সংকেত। তাই 'শ্মশান-বন্দর', 'তরীর কঙ্কাল' এবং 'মৃত মহাদেশের' বুকে দাঁড়িয়ে কবি ঘোষণা করতে পারেন নবজীবনের প্রতিজ্ঞা, 'সুরু হবে আর এক লুপ্তিপণ খেলা' (আবিষ্কার)। সেই লুপ্তিপণ খেলার নায়ক শিব কবিভাবনাকে রক্তাক্ত আঁধারের পরপারে রক্তিম বিজয়ের বন্দরে নিয়ে গেছেন, মিথ্যা দ্বিধার আঘাটা থেকে নামিয়েছেন প্রত্যয়ের উজ্জ্বল স্রোতে। যে দুরন্ত বলিষ্ঠতা ও পরম উল্লাসে কবি 'হে-ইডি, হাইডি, হা-ই' বলে মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই আলোক-পিয়াসী অ-শোক আশায় নতুন দিনের আগমনী গেয়েছেন :

রক্ত এখনও দিতে হবে ঢের,
দিতে হবে আরো প্রাণ
মৃত্যুর তীরে জীবনের ধ্বজা ওড়াতে। (জীবনের গান)

সমকালীন জীবনের দীপ্ত স্পন্দন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়। প্রেমকেন্দ্রিক আত্মবৃত্তিতে তিনি পলাতক নন, বিশ্বকেন্দ্রিক সংগ্রামপ্রবৃত্তিতে ইহবাদী। দুঃখকে তিনি জেনেছেন কিন্তু হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন নি, অমৃতকে তিনি চেয়েছেন কিন্তু অলীক আশায় মুগ্ধ হন নি। বিক্ষিপ্ত জটিল নাগরিকতা অথবা তথাকথিত মননশীলতা তাঁর সাধ্য নয়। নিবিড় বাস্তব উপলব্ধি ও গভীর জীবনাদর্শ সহায়ে তিনি গেয়েছেন 'নগরের শিরা-উপশিরার রাস্তার ধূলির গান'। তাঁর এই স্বকীয় ঐশ্বর্যে যুক্ত হয়েছে ঐতিহ্য—ভারতসংস্কৃতি ইতিহাসবোধ বিজ্ঞানচেতনা এবং সেই সঙ্গে রাবীন্দ্রিক অখণ্ড দৃষ্টি। উদাহরণ হিসাবে সম্রাট গ্রন্থের 'নীলকণ্ঠ' কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে মৃত্যু-অমৃতত্বের ভাবনাকে কেন্দ্র করে

সম্মিলিত ও সংহত হয়েছে কবির ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য। মরণের অবশ্যম্ভাবিতা ও প্রাণের অমরতাকে তিনি স্বীকার করেছেন বিজ্ঞানের অনুগ হয়ে, নীলকণ্ঠ শিবের ধ্যান করেছেন ভারতসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথের অনুগামী হয়ে এবং সব মিলে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য :

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।
আনো তীব্র, তপ্ত, ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ,
সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে
যাদের জন্ম,
মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়ে।
ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ-করা অরণ্যের জগতে
কি লাভ গ'ড়ে কৃমি-কীটের সভ্যতা,
লালন ক'রে স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মত ?
অ্যামিবারও ত' মৃত্যু নেই !
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ।

—শুধু বেঁচে থেকে কি লাভ যদি না পরমায়ু নিয়ে আসে পরমার্থ? মৃত্যুর পথেই আছে নবজীবনের সেই জাতকপত্র ; তখনই জীবনের অর্থপরিবর্তন হয়, মরণের অর্থান্তর হয়। হৃদয় অনুভব করে—দূরতম নক্ষত্র আর অসীম অমর জীবাণু, জনস্রোত ও নির্জনস্রোত সকলের চলন একতালে :

এই পথে জীবনের বন্ধনের ছন্দ।
এই পথে জীবনের মুক্তির আনন্দ। (রাস্তা : প্রথমা)

এই পথের প্রথম-পথিক নীলকণ্ঠ ব্রাত্য নটরাজ। তাঁর প্রলয়তাণ্ডবে বন্ধনমুক্তির ছন্দ আনন্দিত, আনন্দ ছন্দিত হয়ে ওঠে ; 'মহাসাগরের নামহীন কূলের' হতভাগাদের বন্দর থেকে যাত্রীজাহাজ নোঙর নামায় 'ছুনিয়ার কিনারায়', যাযাবর সাগরপাখী হয় সাগর থেকে ফেরা পাখী। তার তীরে তীরে জীবনের কল্লোলগীতি, উল্লাসের ঝড়ে থরথর প্রাণ, সীমাহীন বিস্ময়ে ভাষারা মূক। প্রণামের বিরাট আকাশে তখন

চেতনা হারায়ে যায় আনন্দের অপার পাথারে
সেথা হতে ওঠে শুধু
বাঙ্ময় অর্চনা,
নমো নমো নমো
পরিপূর্ণ জীবনের প্রস্ফুটিত পদ্ম হতে ওঠে গন্ধসম
নমো নমো নমো। (নমো নম : ঐ)

নির্জন একাকিত্বের কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮)। পরিপার্শ্ব তাঁর মনে ঢেউ তোলে না, ঢেউ তুললেও কূল ভাঙে না, কূল ভাঙলেও নিয়ে আসে না জনতার সমুদ্রে। তাঁর আকাশসীমায় একটি তারার আলোই উজ্জ্বলতম—সে আকাশ তাঁর মনোজগৎ, সে তারা তাঁর আত্মরতি, সে আলো রোমান্টিক প্রেমের। বাহির-জগতের ছবি তিনি দেখেছেন, এঁকেছেন, তার রঙ তাঁর মননকে ময়ূরকণ্ঠী করে তুলেছে। সব ছবি সব রঙ এসে মিলেছে ঐ একটি আলোক-কেন্দ্রে, প্রেমের বিন্দুতে, সেখান থেকে আবার ছড়িয়ে পড়েছে নানা রূপে-রসে-রীতিতে। কিন্তু শুধু ছবি শুধু ছন্দ নয়, প্রথম যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমান্ত পর্যন্ত যত কবিতা লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, সেগুলির মধ্যে দিয়ে এই সংহতি ও সঞ্চরণের পথে একটু-একটু করে বিকশিত হয়েছে তাঁর স্বকীয় প্রেম-দর্শন। এবং এই দর্শনের অন্যতম ভিত্তিমূল যে শৈবাদর্শ, তা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত তাঁর সোচ্চার উক্তি, 'আমাদের চিরসঙ্গী নৃত্যক্ষিপ্ত রিক্ত মহাকাল', এই শ্লোকে স্বতঃ প্রকাশিত। নতুনপাতা-কাব্যের দুটি কবিতায় আছে শ্লোকটির ভাষ্য।

কবি শিবকে দেখেছেন দুই রূপে—বজ্র ও বসন্ত। দুয়েরই প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন : দেবতা শুধু মৃত্যুর নন, দেবতা উৎসবের,

দেবতা শুধু বজ্রের নন, দেবতা চুম্বনের।—একজনকে প্রণাম করেন, ভালবাসেন অপরজনকে ; ধ্যান করেন :

> তিনি আনন্দ, তিনি লাবণ্য, তিনি কল্যাণ।
> তাঁর নৃত্যের আবর্তে বিশ্বে ওঠে যে ধূলির ঘূর্ণি
> তা ধ্বংসের ধূলির নয়,
> তা নতুন সৃষ্টির, নতুন পৃথিবীর, নতুন আনন্দের।

তাঁর তৃতীয় নয়নে ভস্ম হয়েছিল প্রেম, বাসনা নয়। নির্বাপিত তৃতীয় নয়নে সেই বাসনার আলো জ্বেলে তাকালেন তিনি পার্বতীর মুখে। সেই দৃষ্টি থেকে সঞ্জাত হল

> নতুন সৃষ্টি, নতুন আনন্দ, নতুন মহিমা।
> রুদ্র কেবল রুদ্র নন,
> তিনি শিব। (দেবতা দুই)

মৃত্যুমাধ্যম নবজন্মকে, কামনাহত প্রেমকে কবি উপলব্ধি করেছেন শিব-পার্বতীর মধ্যে—কিন্তু বিপরীত রতিতে রীতিতে। অমৃতত্বের দিক থেকে তিনি দেখেছেন মরণের পরিভূষিত উৎসব, সুন্দরের দৃষ্টিকোণ থেকে অসুন্দরের অভিব্যক্তি, শিবের মধ্যে দিয়ে রুদ্রকে। তাঁর রুদ্রসাধনা তাই রুদ্ররসাত্মক নয়, শান্তরসের। ধ্বংসের দিক থেকে সৃষ্টির অভিমুখে তিনি চলেন নি, সৃজনের আসনে বসে প্রলয়ের অনিবার্যতাকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু আসন চিরস্থায়ী নয়, স্বীকৃতি সাধনা নয়। তাই সরে এসে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে জীবনদেবতার কাছে :

রুদ্র, আমি আজ তোমার,
আমি তোমার।

—মরণের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মৃত্যুকামনা করেছেন মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে, তিল তিল মরণ নয়, 'সম্পূর্ণ জ্বলন্ত মৃত্যু'। স্বীকৃতির ক্ষেত্রে পথ বিভিন্ন বিপরীত হতে পারে, শৈবসাধনার ক্ষেত্রে পথ একটাই। তাই বিপরীত রীতিপথ থেকে সরে এসেছেন সর্বজনীন পন্থায়, আসন ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছেন :

এই মৃত্যু থেকেই আসবে নবজন্ম ;

ভগ্ন স্তূপ থেকে উঠে আসবে আমার নতুন নগ্ন উজ্জ্বল শরীর। কিন্তু কবির মৌল দৃষ্টিভঙ্গিটি স্বতন্ত্র বলে এই উজ্জীবনে অশান্ত চাঞ্চল্য নেই, আছে শান্ত স্রোতের প্রবাহ। রুদ্রের আঘাতে জেগে-ওঠা নয়, চুম্বনে পুনর্জাত দেহমন নিয়ে তিনি যাবেন তার কাছে, 'আমার অপেক্ষায় যে বসে আছে, যার কাছে যেতেই হবে।' বাসনামুখর রতিবিলাপ তখন হবে ভালবাসার নীরব আরতি। কবি চান সেই নবজন্ম—'তপোভঙ্গ-উজ্জাবনের' জীবনদর্শন নয়, ব্যক্তিসাক্ষিক প্রেমদর্শন। তাই প্রার্থনা করেন :

হে রুদ্র,
আজ তুমি আমাকে নাও,
নাও তোমার জ্যোতির্ময় মৃত্যুতে।
এই পীত পৃথিবী পার হয়ে তোমার রক্তিম সুন্দর রোষাগ্নি,
মানুষের বিষাক্ত হত্যা পার হয়ে তোমার ধ্বংসের আর
পুনরুজ্জীবনের মহিমায়। (রুদ্রের আবির্ভাব)

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, সংগীত, সমাজতান্ত্রিক চেতনা এবং মধ্যযুগীয় বাঙলার লোকায়ত সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বিষ্ণু দের (১৯০৯) মানসলোক। জনতা এবং নির্জনতা উভয় ধারাই তাঁর কাব্যকে গতি দিয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি সমগ্র জীবনদর্শন রূপগ্রহণ করে নি, অখণ্ড অনুভূতি দানা বাঁধে নি। বিষ্ণু দে খণ্ডচিত্রের সার্থকতম কারুশিল্পী। তাঁর শিবচিত্রগুলি বিক্ষিপ্ত বিচিত্র, তবু সেই একটু-সীমার মধ্যেই তারা নিটোল নিখুঁত।

অম্বিষ্ট কাব্যে শিবের দুই রূপ। মৃত্যুঞ্জয় দেবতা-শিব—সংহারমাধ্যমে তিনি জাগিয়ে তোলেন পৃথ্বীকে, জাগেন সতীর মন্ত্রণায়, জয় করেন মুক্তিকে ; সে মুক্তি প্রকৃতির কোলে, আকাশের নীলে, মানুষের মনে :

সন্ন্যাসী, তোমার মুক্তি বাঁধা জড় পাথরে আকাশে
রৌদ্রেজলে ; ছায়াতপে বর্ষে বর্ষে উন্মুখ স্বাক্ষর
কঠিন কষ্টিতে লেখো নীলাকাশে, কালের ঈশ্বর ! (ইলোরা)

অন্যপক্ষে মাটির পৃথিবীর মৃত্যু-অধীন মানব-শিবের মুক্তি যন্ত্র-যন্ত্রণায়, প্রেমে নয়, কর্মে : আমরা ভাস্কর, নই মূর্তি, মুক্তি আনি কর্মে চাষে,

যন্ত্রের ঘর্ঘরে, নিত্য আন্দোলনে মুষ্টিভিক্ষা আসে ;
নীলকণ্ঠ, আমাদের মুক্তি নিত্য। আমরা নশ্বর। (ঐ)

দুই রূপেই শিব নীলকণ্ঠ, মুক্তিজয়ী। তবু দুজনে পার্থক্য আছে। এই ব্যবধান ক্রমে কমে এসেছে। নাম রেখেছি কোমল গান্ধার-এর 'বারোমাস্যা' কবিতায় শিবের প্রলাপনাট আর এক ভিন্নতর অর্থ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যষ্টিভাবনা থেকে সমষ্টিভাবনায় যখন চলে এসেছেন কবি, দেখেছেন জীবনের মারীরূপ, মরণের হাহাকার, 'আসন্ন নিপাত কবন্ধের হাঁক', মড়কের ধূম্রলোচনী লীলা এবং—

মেলে না পার্বতী পরমেশ্বরে এ বেতাল গাজনে,
হিরণ্ময় পাত্র ভাঙে চোরে চোরে, উলঙ্গ আকাশ।
তাই বুঝি থেকে থেকে ভৈরব ভ্রূকুটিভঙ্গে হাঁকে,
সতীর অস্থির অস্থি বিশ্বময় দুহাতে ছড়ায়।

কিন্তু মৃত্যু ও যন্ত্রণাই জীবনের শেষ কথা নয়, যেমন রাত্রি নয় দিনের অন্ত। নবজীবনের সাধনায় নটরাজের তালেতালে জনস্রোত চলে প্রাণতীর্থের অভিমুখে, যেমন চলে রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ'-যাত্রীরা (পুনশ্চ) ; এই যাত্রার এবং যাত্রাশেষের প্রযোজক-পরিচালক মৃত্যুঞ্জয় পিনাকপাণি শিব। এই উপলব্ধিতে দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার থেকে কবি এসে দাঁড়ান 'আশ্বাসের উন্মুক্ত আকাশের' সামনে। ক্ষুধার্ত বেতাল গাজন হয় ক্রান্তির গাজন, ক্রান্তির গাজন হয় শান্তির গাজন। সমষ্টির দিগন্ত থেকে কবি আবার ফিরে যান ব্যষ্টির সীমান্তে :

প্রাণ দাও হে আকাশ
বিদ্যুতে বজ্রের হাঁকে হাঁকে
প্রাণের আকাল দলে
রিমিঝিমি শান্তির গাজনে
ঝুলন ঝুলায় শ্যাম !
ছড়ায় সে অন্ত হাহাকার ॥

আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে বিষ্ণু দের শৈবভাবনা আরও ব্যাপক ও গভীর হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়-ত্রিকাল-কৈলাস প্রভৃতি শব্দ বারবার এসেছে—বাঙালী চাষীর বিশেষণ হয়ে, সময়-অসীমের বিশেষ রূপায়ণে, প্রেম-আরতির বিশেষত্বে। প্রকৃতির দিকে তাকান তিনি, বর্ষণমুখরিত পরিপার্শ্বিকে মনে হয় 'ফুৎকারে ঈশান সমুদ্রশ্বাসে অর্ধনারীশ্বর' (বর্ষা) ; প্রেমের আকাশে চোখে পড়ে মৃত্যুঞ্জয় ভালবাসার রঙিন ডানামেলা, যেখানে শূন্য পাত্র ভরে ওঠে নিত্য পূর্ণতায় (রাগমালা) ; প্রেম আর প্রকৃতি মিলে হয় সাদা-নীল জলছবি :

নীলকণ্ঠ যেন দিল গৌরীর পাণ্ডুর ভালে চুমা,
জ্যোতিষ্ক নয়নে জ্বেলে তাই বুঝি নির্নিমেষ উমা। (এই ধনী বসুন্ধরা)

শিব-পার্বতীর মত 'সৌন্দর্যে বিধুরে শুদ্ধ' এই প্রেম যখন জনতায় নামে, তখন

জোয়ারেরা হয় ভেদাভেদহীন, নীলকণ্ঠ যৌবনের সহযাত্রী হয় 'মৃত্যুঞ্জয় লাল' (পরিক্রান্ত)। কবির চোখে হিমালয় তাই আশা ও আশ্বাসের প্রতীক, সাম্য ও 'প্রাণের চূড়া'; সেখানে শিবা-শকুনের সমাধি আর 'রৌদ্র প্রেমের প্রসাদ' (৩১শে জানুআরি ১৯৪৮)। যখন হিমালয়ের চূড়া জন-সমুদ্রে নামে, তখন জীবনের লগ্ন হয় বজ্রবাহন, ইতিহাসের ইস্পাতে মেতে ওঠে ত্রিকাল, 'মানসহ্রদে কি রুদ্র তুফান তোলে, কিরাত দূরে পলায়' (মেলালেন তিনি মেলালেন— ২১শে জানুআরি)। তাই কবিচিত্তের অভিযাত্রা সেইখানে

যে কৈলাসের দৃষ্টিতে সব দ্বন্দ্ব
বর্তমানের খণ্ডিত শত পাক
অতীত কালের গ্রাহ্যতা আর ভবিষ্যতের আততি
সার্থকতায় অন্বিত। (আলেখ্য)

আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে অকারণে অবহেলিত কবি দিনেশ দাস (১৯১৫)৪৭। অথচ তাঁর 'এক একটি কবিতা বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদের মত। জটিল আধুনিক মনের সমস্ত প্রশ্ন, প্রেরণা ও প্রত্যাশা তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত কিন্তু তার স্বচ্ছতা কোথাও ক্ষুণ্ন নয়' (প্রেমেন্দ্র মিত্র : দিনেশ দাসের কবিতা)। সমকাল তাঁর রচনায় গাঢ় ছায়া ফেলেছে; সেই ছায়া 'নিষ্ফল আতিশয্য' নয়, 'অতলতার ইঙ্গিত'। কারণ 'কাস্তে'-র কবি যেমন জীবনের যন্ত্রণাকে ক্ষোভকে গভীরভাবে অনুভব করেছেন, তেমনি আবার ঘুঘুর ডাক, বৃষ্টির গান, দ্বীপের সবুজকেও অবহেলা করেন নি। তাঁর সংগ্রামী শিল্পচেতনা শুধু ভাঙ্গার পথে নয়, গড়ার পথেও অগ্রস্থত, বিষ্ণু দের মত সার্থকতায় অন্বিত। তাই শৈবাদর্শ তাঁর রচনায় অনিবার্য।

কবির মননে সমকালীন অবক্ষয় সত্ত্বেও অবশেষে 'মানুষের পরিচয় হবে মানুষতা'। মানবে এবং মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী কবি জেনেছেন, উদ্ধত অটল দিন চিরস্থায়ী নয়, অচল নিয়মের নাগপাশ ভেঙ্গে আসবে নতুন দিন :

পুরোনো পৃথিবী তাই স্বপ্ন দেখে নতুন পৃথ্বীর,
তাই তো নামিবে ভোর
পৃথিবীর ভগ্ন এই স্তূপের ওপর,
এবার নামিবে ভোর—নতুন সকাল—
জানি জানি ভোর হবে কাল। (আগামী : কবিতা)

রাত্রি পেরিয়ে ভোর হবে, মৃত্যু পেরিয়ে নবজন্ম—এই শৈব বিশ্বাস রোমাণ্টিক কবিচিত্তকে নিয়ে এসেছে সমাজচেতনার জোয়ারী স্রোতে, অনুভূতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি পরিত্যাগ করে প্রতীক-ব্যবহারের তির্যক পদ্ধতিতে। তাঁর সমাজসচেতন তত্ত্বের প্রতীক হয়ে এসেছেন—শিব ও শৈবতত্ত্ব। তত্ত্বের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রতীকের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের কথা এখানে মনে আসা স্বাভাবিক। তবু কবি স্ব-তন্ত্র।

অহল্যা কাব্যের 'তৃতীয় পৃথিবী' কবিতায় তিনি জীবনকে দেখছেন—রাতের বিভীষিকা, ভোর অনাগত, দুধারে আগুন জেলে শান্তির সোনালী নদী ম্রিয়মাণ এবং হিমালয় স্থির :

শিবভূমি হিমালয়ে শান্তির তুষার
গঙ্গা-যমুনার গান নতুন উষার :

কিন্তু তিনি জানেন, বিনামেঘে যেদিন ঝড় নামবে, সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠবে, তখন শান্তির জমাট তুষার গলে যাবে ; স্থির

গৌরীশঙ্কর-শিখরে
চমকাবে বজ্রশিখা প্রহরে-প্রহরে,
প্রশান্ত তুষার-দুধ
চোখের নিমেষে হবে রক্তের বুদ্‌বুদ্‌।

সেই আগুনঝরা রক্তাক্ত লড়াইয়ের পথে আসবে সত্য শান্তি, 'তৃতীয় পথ', তার শেষে 'তৃতীয় পৃথিবী'—অন্যায় অত্যাচার শোষণ মুছে ফেলে 'আশা, শান্তি, সবুজ শিশির !'

সেই ঝড়ো দিনের সেই সবুজ শিশিরের ঋত্বিক কবিরা। যুগে যুগে যখনই পৃথিবীতে নেমে এসেছে অসাম্য, শ্মশানের অন্ধকার, কবি তখন পিশাচসিদ্ধ সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন 'মহাতান্ত্রিক' রূপে, শবকে করেছেন শিব :

গলিত শবের শবে বারবার
হঠাৎ নতুন প্রাণ করেছি সঞ্চার।

তাঁরই সাধনায়-সংগ্রামে-প্রেরণায় বারেবারে মরা পৃথিবী প্রাণ পেয়ে হয় সবুজ পাখী, অসুন্দর-অশান্তি শান্ত-সুন্দর হয়ে ওঠে। কবি শিবের মত নীলকণ্ঠ, সিদ্ধতান্ত্রিক, শবসাধক, মরণের পথে পথে বাঁচার মন্ত্র শোনান :

আমি কবি পৃথিবীর শেষ জাদুকর—
আমি কবি শতাব্দীর শেষ তান্ত্রিক। (শেষ তান্ত্রিক : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

নগরজীবনের ক্লান্তি বিক্ষোভ বিরোধ এবং সংঘর্ষের সমাহারে সমর সেনের (১৯১৬) গদ্যকবিতা [৪৮] অভাবনীয়তায় দীপ্ত। শহর তাঁর কাছে ধূসর-বিবর্ণ, তাঁর কবিতায় হতাশা আর জটিলতার অবসন্ন সুর। কালের স্রোতে, তাঁর চোখে, আকালের মড়ক, শান্তিহর দুঃস্বপ্ন :

বৃদ্ধ মহাকাল
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এনেছে জরার যন্ত্রণা ; (একটি বুদ্ধিজীবী)

শিব তাঁর কাছে বৃদ্ধ মহাকাল, যিনি লড়াইয়ের নয়, জ্বালামুখী দেবতা। তিনি দেন অজরতা নয়, জরার যন্ত্রণা। কবির নাড়ীতে বাজে সেই যন্ত্রণার গান—বৃষ্টিবিহীন কালো দিনে

যখন দক্ষিণমুখ বৃষবাহন মহাদেব
হঠাৎ নিঃশ্বাসে হাওয়ায় দুঃসহ জ্বালা আনে। (জোয়ার ভাটা)

শুধু আপন নাড়ীতে নয়, চারপ্রাশের জীবনের শরীরে-অশরীরেও কবি দেখেন কূপমণ্ডূকতা লোভ বার্দ্ধক্য জড়ত্ব আর কৃত্রিমতার বীভৎস ক্ষত এবং তার মাঝে শবাসীন মৃত্যু-মহাকালকে :

কৃষ্ণবর্ণ লোলজিহ্বা করালবদন !
পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম,
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্ন শিশুর রক্তজবা !
ঘূর্ণী ঝড়ে, বন্যায়, বিস্ফোরকে জয়বাদ্য বাজে। (ক্রান্তি)

কিন্তু দেবতা তো কেবল শববাহন-রুদ্র নন, শব-উত্তর শিবও, শুধু ঘূর্ণী ঝড় আর মৃত্যু নন, শ্যামল শস্য আর নতুন জীবনও। তাঁর নিপুণ নেপথ্যবিধানে দীর্ঘশ্বসিত কবিচিত্ত নিরাশার পিলসুজে জ্বালিয়ে দেয় আশার আলো-দীপ, নাগরিকতার বিকার-পাষাণে ফুটিয়ে তোলে 'সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন'। লেখনী তখন রবীন্দ্রনাথের শৈব শ্লোকে প্রার্থনা জানায় :

ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়
হে মহানগরী ! (নাগরিক)

তখন কবি ফিরে পেতে চান, ফিরে যেতে চান ধূসর বিবর্ণ শহর থেকে 'সহজ শহরে'। এই সমানতা-সহজতা-স্বাভাবিকতার বাসনা যখন তাঁর মানস-মেরুতে আলো হয়ে দেখা দেয়, তখন তাঁরও রক্তে বাজে চিরন্তন সংগ্রামের আনন্দভৈরবী। পৃথিবীর দেশে-দেশে দেখেন জড়-বিজয়ের কেতন উড়তে :

ওরা যেখানে প্রাণ নেয়, সেখানে প্রাণের স্বাক্ষর,
যেখানে ওরা প্রাণ দেয়, সেখানে জীবন অমর। (লোকের হাটে)

কৃত্রিম জীবনের পিঙ্গল প্রহারে ক্ষতবিক্ষত কবি এই মৃত্যু-অমৃতত্বের শৈব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জানতে পারেন—'কালের গলিত গর্ত থেকে বিপ্লবের ধাত্রী যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে', এবং

জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে। (ঘরে বাইরে)

তখন তিনিও বর্ণহীন শীতের আড়ালে বসন্তের আগমনী শুনতে পান ; দেখতে পান বজ্রের অসহজ গানে মাঠে মাঠে সবুজ আগুন জ্বলে উঠতে। এবং অনুভব করেন—বিষণ্ণ বিক্ষোভের পাণ্ডুর শিরা-উপশিরায় নতুন রক্তকণিকাদের বিদ্যুৎগতি, নবজীবনের রুদ্রমন্ত্র, যা শিবম্ :

এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব
যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স্ গানে,
প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে। (বসন্ত)

এই শবসাধনা-শিবসাধনার উজ্জীবনী লড়াই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সুভাষ

মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯) জঙ্গী কবিতায় ৪৯। মার্কসবাদ রাজনীতিবাহনে এলেও এবং অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার মৌল সত্য সর্বকালীন সর্বস্থানিক ও সর্বস্বীকৃত। শৈব ঐতিহ্যে ও সংস্কারেও দ্বান্দ্বিক অগ্রস্থতি-তত্ত্বের রূপরেখা স্পষ্টত বিদ্যমান ; বাইরের ধর্মগত-সাধনগত প্রলেপ-আবরণ সরিয়ে ফেললেই তার এই মূল তাত্ত্বিক স্বরূপটি সহজেই চোখে পড়ে। তাই বামপন্থী কবির রচনায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের সঙ্গে শৈবতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ বিস্ময়কর বা অভাবিত নয়, বরং স্বয়মাগত।

কবির কাছে 'কৈলাস' অবশ্য উচ্চ আশার প্রতীক, বিষ্ণু দের মত পূর্ণতার রূপক নয় (কানামাছির গান : পদাতিক)। কিন্তু দুজনের কাছেই 'গাজন' নতুন দিনের জন্যে লড়াইয়ের আগমনী। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও অবক্ষয়িত জীবনকে, পীড়িত দেশকে দেখেন শবে আকীর্ণ 'স্পন্দিত শ্মশান', আর তারই কাছে অনুভব করেন রুদ্ধগতি পায়ে জেগে-ওঠা 'বিদ্যুৎকদম, ঘুম ভাঙে সম্মিলিত মুঠি'। গ্রামে গঞ্জে শহরে বাজারে মানুষ দুর্জয় সংকল্প নেয়, মৃত্যুকীর্ণ পথে এগিয়ে যায়, তুরঙ্গ-ইতিহাসের বল্‌গা তখন ধরে দেশপ্রেম, এবং

নতুন জন্মের ডঙ্কা বাজে,
বেদনায় পৃথ্বী থরো থরো। (ঘোষণা)

ভাঙার পরে গড়া, মৃত্যুর পারে নবজন্ম—এই রুদ্র-শৈবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি একদা উচ্চতম কণ্ঠে জনতার গান গেয়েছিলেন। কালপ্রবাহে সে উগ্রতা কমে এসেছে, সেই অনুপাতে দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে ; মনে হয়েছে—'মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না, জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে ঢ্যাঙা নয়' (শুধু ভাঙা নয়)। শুধু ভাঙা নয়, শুধু রুদ্র নয়, শিবও। তাই গাজনের গান হয় নিঃস্ব জনের গান, সংগ্রাম হয় শান্তির সোপান, রিক্ত মাঠে কবি স্বপ্ন দেখেন বজ্রগুম্ভিত উজ্জ্বল শ্যামল বর্ষণের :

মেঘে মেঘে ঢ্যাম্ কুড়কুড়
বাজনা বাজে গাজনের।
বাবুই তোমার বাসা উড়ুক
নতুন দিনের বাতাসে।
ঘর ছেড়ে আজ বাইরে এসো
ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
ফুঁ দাও।..............আজ আকাশের বুকে, জীবনের

কোলে গাজনের মেলা। সেখানে মেঘে মেঘে বেজে উঠুক ঢ্যাম্ কুড়কুড় বাজনা, কড়কড়িয়ে ডাকুক বাজ। তারপর

মাঠে মাঠে জল ছিটিয়ে
বৃষ্টি পড়ুক মন্ত্র
শান্তি শান্তি শান্তি। (গাজনের গান)

আধুনিক কবি ব্যক্তিত্ববাদী, ইহবাদী। প্রাগাধুনিক আদর্শের অনুলোম এখানে

অনুপস্থিত। একের ভাব অপরের ভাবনা নয়। তবু সকলেরই কল্পনায় ও প্রকাশে অভিন্ন শিব ও শৈবতত্ত্বের আলোকিত ছায়াপাত। প্রকৃতির পটে, প্রেমের ভূমিকায়, জীবনসংগ্রামে, নতুন সমাজগড়ার স্বপ্নদর্শনে—প্রতিটি ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়েছেন রুদ্র-শিব এবং তন্নিষ্ঠ তত্ত্ব-আদর্শ-প্রতীক। এইদিক থেকে দেখলে, আধুনিক কবিদের শৈবভাবাশ্রিত কবিতাগুলির মধ্যে একটি রমণীয় সাদৃশ্য এবং অদৃশ্য যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। শতযোজন ব্যবধানের পাঁচিল সত্ত্বেও এই 'সদৃশ যোগাযোগ'কে সম্ভাবিত করে তোলে যেসব কার্যকারণ, ঐতিহ্য তাদের অন্যতম। শৈব ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এইখানে, এই অনেক-এর মিলন সাধনে। পুরাগত অথচ ক্রম-পরিবর্তিত শৈব ভাব সমকালীন কবিদের জীবনসাধনাকে উদ্বোধিত করেছে, হৃদয়-আরাধনায় প্রেরণা দিয়েছে এবং সেই সাধনা ও আরাধনার শিল্পায়নকে উজ্জ্বল করে তুলেছে, আলো দেখিয়েছে। তার এই কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—নিরঙ্কুশ স্বকীয়তা এবং পারস্পরিক স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও যে কবিরা, মানুষেরা, মনগুলি এক জায়গায় মিলতে পারে, ব্যষ্টি হয়েও সমষ্টি হতে পারে—এই অতিপ্রয়োজনীয় বোধটুকুও সে জাগিয়ে দেয়। আরও বড় কথা: সমকালীন বিষাদ-অবক্ষয়ে ঘেরা অবসন্ন বিক্ষুব্ধ বিক্ষত কবিমনে শিব এনেছেন নিরলস সংগ্রামের চেতনা, মৃত্যুত্তীর্ণ শান্তি-অমরতার দ্যোতনা, খণ্ড জীবন পেরিয়ে অখণ্ড জীবনের সুন্দর পিপাসা। আধুনিক কবিতায় তাই অসংগতি একমাত্র কথা ও সুর নয়, তাতে আছে জীবননিষ্ঠ আদর্শ ও সংগতির ধ্রুপদী রাগিণীও। সেই রাগিণীর স্রষ্টা ও প্রযোজক শিব ও শৈবাদর্শ।

সম্প্রতিকালের তরুণ কবি-কৃতিতেও তত্ত্ববাহন শিব স্বতঃসিদ্ধভাবে উপস্থিত। তার মধ্যে যথারীতি ক্রম-আগত ঐতিহ্য আছে, আছে পূর্বগামী কবিতাবলীর পরকীয় প্রভাব এবং স্রষ্টার স্বগত ভাব। আর আছে ঐ সদৃশ যোগাযোগ: ছড়িয়ে-থাকা দ্বীপগুলির ছড়িয়ে থেকেই মহাদেশের অনুপম ইশারা জাগিয়ে তোলা। সেই ইশারা, সেই সামষ্টিক সমগ্রতার একটি রূপ এতক্ষণ দেখেছি, পথ শেষ হওয়ার আগে তার আর একটি রূপ দেখে নেওয়া অবশ্যকর্তব্য।

উ। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে শিবের অভিব্যক্তি দ্বিবিধ, দুটিই পরস্পর ঘনিষ্ঠ। একরূপে তিনি একটি মহৎ ভাবাদর্শ, বিশিষ্ট তত্ত্ব-দর্শন-সাধনা; অন্যরূপে তিনি মূর্ত বিগ্রহ, প্রমথ-দেবতা-মানব। বাংলা কবিতার আকাশেও শিবের দ্বৈত অভিব্যক্তি: একপক্ষে তিনি শুধু ভাব, শুধু আদর্শ, একটি বিশেষ তত্ত্ব; অন্যপক্ষে তিনি রূপগুণযুক্ত সাকার প্রতিমা, সজীব চরিত্র। প্রথমটিতে তিনি দর্শন, দ্বিতীয়টিতে জীবন এবং উভয়ের যোগে জীবন-দর্শন। এই জীবন-দর্শন আধুনিক বাংলা কাব্যেও স্বত।

একালের কবির হৃদয়ভাব এবং বাগ্‌ভঙ্গি স্ব-গত স্ব-তন্ত্র, তাঁদের আঁকা শৈব চিত্রগুলিও বি-ভিন্ন। তবু সবার মূলে একই শৈবাদর্শ থাকায় সব মিলিয়ে যেন একটি অখণ্ড শৈব সংস্কৃতি। শিবভাবে আছে এক বলিষ্ঠ বীর্যবত্তা; তাঁর প্রেম ললিতসুন্দর

নয়, পরুষকঠিন ; তাঁর সাধনা নিষ্ক্রিয় লীলাবিলাস নয়, অচপল সংগ্রাম। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় লড়াই যখন অনিবার্য, তখন ডাক পড়েছে আদিনট নটরাজের ; যখন মুক্তি-অন্তিম সৃজনের পালা, তখন আহূত হয়েছেন ধ্যানী রুদ্রশিব। যেখানে প্রাণের জন্যে প্রাণান্তকর প্রয়াস, সেখানে তিনি প্রলয়ী ; যেখানে একটি প্রাণের মধ্যে আরেক প্রাণের অনুভব, সেখানে তিনি প্রণয়ী। বিচ্ছেদকে তিনি করেন ছন্দোমধুর, যন্ত্রণাবোধে শোনান আশা-মন্ত্র, চলনপথের আঁধারকোলে জ্বালেন দিশারী আলো, মরণের অভিঘাতে জাগিয়ে দেন মনুষ্যত্বকে। আধুনিক জীবনসাধনায় ও জীবনদর্শনে এই শৈবাদর্শ যেভাবে উদ্দীপনা দিয়েছে ও প্রতিফলিত হয়েছে, তার উপাদানগুলি আমরা নানাদিক থেকে আহরণ করেছি। কিন্তু তাঁর মূর্ত বিগ্রহকে এখনও দর্শন করি নি। অথচ বিমূর্ত শৈব তত্ত্বের মত শিবের রূপমূর্তিও সমান সত্য। আধুনিক কাল তাঁর এই প্রমূর্ত রূপকে অস্বীকার করতে পারে নি, গড়ে তুলেছে শিবের মানব-প্রতিমা। তাঁর ইতিহাসের রক্তকণিকায় যে লোকায়তের অণু এবং সমষ্টি-আবেগের পরমাণু অন্তর্নিহিত, সেই অণু-পরমাণু এই প্রতিমায় প্রাণ সঞ্চার করেছে। যিনি আদিতে ব্রাত্য, আজও তিনি চিত্রিত হয়েছেন সাধারণ মানুষের অভিন্ন সহচররূপে।

আদিম কৃত্য-কথায় সেই যে প্রমথ-শিবের পাশে তাঁর মানব-রূপ স্বতঃ-আভাসিত হয়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালের তত্ত্বপ্রধান শাস্ত্রগ্রন্থেও তাঁর এই রূপ ঢাকা পড়ে নি। কারণ দেবতা ও দৈবকথা সবই তো মানুষের কল্পনা এবং কল্পনা বাস্তবেরই প্রতিরূপ বা প্রতীক। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের ছোট-বড় কাব্যে শিব-শিবানীর মধুররসাত্মক ঘরোয়া ও দাম্পত্যলীলা যখন ফুটিয়ে তোলা হল, তখন তাতে প্রকাশ পেল তৎকালীন অভিজাত সমাজ ও মানসের ছবি। অধিকাংশ সংস্কৃত কবিই ছিলেন এই শ্রেণীর সদস্য ; তাছাড়া গতানুগতিক রীতি অনুসরণের রেওয়াজও তখন ছিল। বাঙ্গালীর লেখা সংস্কৃত কবিতায় এই অভিজাত চেতনা ও রীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব-বিরহিত বাঙালীর জীবনচেতনা ও গৃহভাবনা পেখম মেলেছে দেশভাষায় লেখা চর্যাপদে। এখানে 'সহজে উনমতো' শবর-শবরীর যে দ্বৈত লীলা, তা সহজ বলিষ্ঠতার, উন্মাদিত উন্মথিত দুটি হৃদয়ের শক্তিমৎ-প্রেমের। পরবর্তী বাংলা কাব্যের 'পাগল-শিবের' মধ্যে এই শক্তিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিদ্যাপতির শিবও 'উনমত', কিন্তু তাঁর রচনায় কৃষির বর্ণনা সত্ত্বেও আভিজাতিক শিল্পকলার প্রাধান্য বেশি। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ঘর-বাহিরের এই ঐতিহ্য স্বতঃস্পন্দিত। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার নিজস্ব সৃষ্টি 'গৃহী শিব'—যিনি সুখে-দুঃখে ব্যথিত পীড়িত সাধারণ দরিদ্র মানব। তাঁর কাহিনীর মধ্যে গতানুগতিক সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণকথা যেমন আছে, তেমনি আছে কৃষ্ণ-কথার মত নৌকাবিলাস-মালঞ্চলীলা-অভিসার-ঝুলন, কুঞ্জলীলা-কলঙ্কভঞ্জন-নৃত্য ইত্যাদিও। শেষ-অংশের আখ্যানগুলি বড় বড় কাব্য অপেক্ষা লোকসাহিত্যেই বেশি স্থান পেয়েছে। এখানে শিব শুধু দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত গৃহস্বামীমাত্রই নন, তিনি আছেন

সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের মাঝে—কৃষক-শ্রমিক রূপে। মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে এসে লোকসাহিত্যবাহিত এই সাধারণ পরিচয়টিই ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

প্রমথ-শিব এবং দেবতা-শিবের মধ্যে যে মানবকে আমরা সেকালে পেয়েছিলাম, তিনি আবার এলেন একালের আঙিনায়, খোলা আকাশের নীচে, নির্বাক জনতার সরণিতে। শুধু গায়ের নামাবলীটি রেখে এলেন ও-কালের পরপারে। যুগ-যুগান্তরের পটের ওপর ফুটে-ওঠা মানব-শিবের ছবিগুলি একবার পাশাপাশি রেখে দেখলে তাঁর রূপময় প্রতিমার বৈচিত্র্য ও মহত্ত্ব পরিস্ফুট হবে।

একদা আর্যকবির মধুকণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছিল—

যজুর্বেদে : নমো গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো
নমো ব্রাত্যেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো।

সংস্কৃত সাহিত্যে : ত্যক্ত্বা ভস্ম কৃতাঙ্গরাগনিচয়ঃ শ্রীখণ্ডসারদ্রবৈ-
র্দেবঃ পাতু হিমাদ্রিজাপরণিয়ং কৃত্বা গৃহস্থঃ শিবঃ।

আর একদিন বাঙালী কবিকণ্ঠে গীত হল—

কর্ষণ-গীতিতে : শিব হে তুমি মোদের সাথি।
চাষী হয়্যা চাষীর ঘরে আছ দিবারাতি।
তুমি লাঙ্গল চালাও কাপড় বোনো অতি চমৎকার।
শিব হে তোমায় নমস্কার॥

সূর্যের গানে : মালি। লাউলের বাগানে কেরে কাটে পাত।
শিব। লাউলের ছোট ভাই শিবাই কাটে পাত।
মালি। শিবাই রে শিবাই রে না কাটিও পাত।
শিব। বাইছা বাইছা কাটুম নে সবরি কলার পাত

পটুয়াসংগীতে : তবে শঙ্খ বেছতে আইছি আমি শঙ্খের ব্যাপারী।
বঙ্গদেশে ঘর আমার জয় শিব শাঁখারী॥

গাজন গানে : গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত॥
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবুনী।

শূন্যপুরাণে : সুবন্নের কুদাল রূপার বাঁট
মহাদেব কুদালেন স্বর্গমর্ত্যপাতাল।

শিবায়নে : হাল ছাড়ি দুদণ্ডে হালুয়া আইল ঘরে।
বান্ধ-আলি বৈকালে বাঁধিলা তার পরে॥
ছোট হালুয়া হুঙ্কারে চোটায়ে তুলে চাপ।
শঙ্কর সাবাসি দেন বটে মোর বাপ॥

ছেলেভোলানো ছড়ায় : ওপারেতে তিল গাছটি তিল ঝুর ঝুর করে,
তারি তলায় মা আমার লক্ষ্মী পিদিম জ্বালে।

মা আমার জটাধারী ঘর নিকোচ্ছেন—
বাপ আমার বুড়ো শিব নৌকো সাজাচ্ছেন॥

এবং ব্রতে : এবার মরে মানুষ হব।
শিবের মত স্বামী পাব।

আর আধুনিক কবি বললেন—

দেবতা যখন পূজা পেয়ে পেয়ে হল মানুষের বাড়া।
শিব ভেঙে মোরা মানুষ গড়িব তবে ভাই পাবে ছাড়া॥ (যতীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথে আমরা পেলাম তাঁকে হালকা চালের ইঙ্গিতে :

আর যাই বলি নাকো একথাটা বলিবই,
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার ঝুলি বই।
অন্ন ভরিয়া দাও সুধা তাহে লুকিয়ে।
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে।

কালিদাস রায় তাঁকে আনলেন চেনা মহলে :

ভদ্র পাড়ায় ভিখ্ মেলে না আবার ফিরে এলে ?
বেশ করেছ। ত্রিশূলখানা কোথায় এলে ফেলে ?
আপদ গেছে। হেথায় থাক, ঘুরতে কেন যাবে ?
আমরা যদি দুমুঠো পাই তুমিও তাই পাবে।...
ভদ্রপাড়ায় আর যেও না ক্ষেপায় ওরা বড়,
মোদের সাথেই তামাক টানো গল্পগুজব কর।

শিব-জীব এক হয়ে যায়, শিব ভেঙে হয় মানুষ। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এই মানুষের একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন : 'কৈলাসের ছাইমাখা ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত শিব ত্রিশূল ছাড়িয়া জামাকাপড় পরিয়া লেখনীহস্তে আজ কেরানীগিরি করিতেছেন, রেশনব্যাগ হস্তে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে ট্রেন ধরিতেছেন এবং বাসে বাদুড়ের মত ঝুলিতে ঝুলিতে অফিসে ছুটিতেছেন। কৈলাসের শিবানীর মূর্তিই আজ ময়লা সাড়ি পরিহিতা দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের কর্মব্যস্ত গৃহিণীর মলিন ছবি। সেই চিরকালের বাঙালী গৃহস্থ, সেই চিরকালের বাঙালী গৃহিণী, দারিদ্র্যের সেই চিরন্তন সমস্যা ...।' আজও বাঙালী সংসারে দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, তা আঁকা হয় করুণ ও হাস্যরসের তূলিতে ; সপরিবার শিবই হন তার কুশীলব। কবি তাঁকে নিয়ে যান সমাজের আরও গভীরে। নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী মন বলে :

ও কে চণ্ডাল ? চমকাও কেন ? নহে ও ঘৃণ্য জীব !
ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁকে ডাক দিলেন বেঁচে থাকার প্রাত্যহিক লড়াইয়ের মাঠে :

আমাদের সাথে চলো গো ঠাকুর
ওই রোদে পোড়া মাঠে

দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল,
পাথরও যেন গো ফাটে।
শঙ্কর! হও সঙ্কর্ষণ,
মাটিছেঁড়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যশ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র শিবকে দেখলেন নিপীড়িত মানবের মিছিলে, যেখানে রাজপথে নিযুত নগ্ন পায়ের মহাসংগীত বেজে উঠছে মুটে মজুর খালাসী কুলি চাষী শ্রমিকের চলার তালে তালে:

আজ পাঁওদল, চলে নবজাগ্রত ভয়মুক্ত মানবের দল,
তার সাথে পাঁওদল, চলেছেন মানবের দেবতা,
আজ যদি চোখে জল আসে
সে কি দুর্বলতা?
ওই কালি-মাখা শ্রম-কাতর ঘর্মাক্ত দেহখানি
আলিঙ্গনের লোভে
বাহু যদি আপনা হতে প্রসারিত হয়
সে কি লজ্জার কথা?
দেবতা যে পাঁওদল চলেছেন ওই
নগ্নপদ কুলিদের সাথে ভাই—
তিনি যে আজ আহ্বান করেছেন ওই পথের ধুলায়।

বিষ্ণু দে মৃত্যুঞ্জয় মহাকালকে প্রত্যক্ষ করলেন কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে:

ভেঙেছে আসর কুঞ্জ শূন্য আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে হাতুড়িহাপরে তোমরা গড়েছো হাল;
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা সে মহাকাল।

নগ্ন পায়ের মহাসংগীত লড়াইয়ের গান হতে চায় অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১) কৃষক-জনতায়; অসহায় বুভুক্ষুর কানে কবি পড়েন চাষের আর ভাঙনের শৈব মন্ত্র:

আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।
গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
একলাখ হয়ে মাঠে নদীধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবে না অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ দৈত্যপুরী।

তোমরা অন্নদাতা।
জয় করো এই শানবাঁধা কলকাতা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বন্ধনমোচনের জাগরছন্দ নিয়ে আসেন রুদ্র প্রলয়ের যতিপাতনে :

শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা ;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।...
প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন আত্মা ॥

শেষ দুটি উদ্ধৃতিতে শিব নেই, তবুও তিনি আছেন। কারণ—যেখানে লড়াইয়ের সঙ্কল্প, এগিয়ে চলার কথা, মরণের মুখে জীবনের জয়গান, সেখানে রুদ্র-শিবই তো একমাত্র অধিদেবতা ও অধিনেতা। জীবনের ও মানসের প্রয়োজনে যেখানেই বীর ও রৌদ্র রসের গতিময় প্রদীপ্তি, সেখানেই তিনি ; সেই দীপ্তি তাঁর তৃতীয় নয়নের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সেই গতি তাঁর প্রলয়নাচের ছন্দ। আধুনিক কবির সংগ্রামী চেতনার উৎসমুখে জীবনের যে বিন্দুই থাক না কেন, মত-পথের যে আদর্শই সহায়তা দিক না কেন—সেই উজ্জীবনী চেতনার সঙ্গে অচিরে ও সহজে মিলন হয়েছে শিবের, তার পশ্চাতে সক্রিয় থেকেছে শৈবাদর্শ—স্বয়ং কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে। যেহেতু আপোষহীন সংগ্রাম এবং উজ্জীবনের চেতনাই রুদ্র-শৈবিক দর্শন, এবং তাঁর পদচিহ্নের পদাবলী কোমলকান্ত নয়, অশান্ত ভৈরব রাগ-অন্বিত।

যিনি আদিতে পথের দেবতা ও পথিক, কৃষির দেবতা ও কৃষক, শ্রমের দেবতা ও শ্রমিক, অন্তহীন অস্তিমে এসেও তিনি পথিক-কৃষক-শ্রমিকের দলে। হাজার হাজার বছর ধরে 'স উত্তীষ্ঠম্...স ব্যহচলন্' ; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী চলে, জীবন চলে, চলে রথ রথী ভূমি বনস্পতি জন্ম মৃত্যু ইতিহাস পুরাণ (ব্রাত্যসূক্ত : অথর্ববেদ)। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহুবিচিত্র প্রাঙ্গণেও তিনি চলমান প্রবাহিত জীবনের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের একজন হয়ে। আজকের মননশীল কবিচিত্ত তাঁর অমূর্ত ভাবাদর্শের পাশে ভাবানুসঙ্গী চিত্রকল্পরূপে সাদরে বহন করে চলেছে তাঁর এই মূর্ত মানব-বিগ্রহ—এবং রবীন্দ্রনাথও।

রবীন্দ্রনাথ জীবনসচেতন কবি। বিশ-ত্রিশের দশক থেকে এই চেতনা ব্যাপকতর এবং উত্তরতিরিশে অধিকতর বাস্তব ও ইহবাদী হতে থাকে, তাঁর অভিজাত আদর্শে লোকায়ত ভাবনা নিবিড়তম সাযুজ্য লাভ করে। রবীন্দ্র-শিব যেমন উচ্চবিত্ত দর্শনতত্ত্ব, তেমনি বাস্তুহারাদের দলপতি, ঘরছাড়া-লক্ষ্মীছাড়াদের চিরসাথী, মাটির ঘরের মনের মানুষ :

যেথায় থাকে-সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।

ধ্যান নয়, ফুলের ডালি নয়, ঘর্মাক্ত কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলতে হবে; কারণ:

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারোমাস।

দেবতার এই ব্রাত্য রূপ আরও সুন্দর ও সমন্বিত হয়েছে কালের যাত্রার 'রথের রশি'তে: মহাকাল নটরাজ ভৈরবের রথ ছুটে চলে ইতিহাসের পাতা পেরিয়ে পেরিয়ে; কিন্তু আজ সেই রথ থেমে গেছে অসাম্য অন্যায় অবিচারের অসমতলে বাধা পেয়ে; অচল রথ মেয়েলী ব্রতে সাড়া দিল না, ব্রাহ্মণের মন্ত্রে চলল না, ক্ষত্রিয়ের শক্তিতে টলল না, বৈশ্যের সোনালী স্বপ্নে নড়ল না; শতশতাব্দীর অবহেলিত শূদ্রদের হাতের ছোঁয়া লেগে সে মুহূর্তে সচল হয়ে ছুটে গেল সামনে—ব্রাহ্মণের মন্দির, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রাগার, বৈশ্যের ধনাগার ধুলোয় মিশিয়ে, সব অসমানকে সমান করে দিয়ে। তখন কবির প্রার্থনা:

যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

আর ঘোষণা: জয়,—মহাকালনাথের জয়।

শৈব দর্শনের আধারে কবি এখানে ইতিহাস দর্শন করেছেন। শরৎচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন: 'মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথটানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে[৫১]। 'রথের রশি'তে যে মহাকাল-শিব 'শূদ্রাণাম্ গণনায়কঃ', 'কবির দীক্ষা'য় তিনি স্বয়ং শূদ্র। রবীন্দ্রভাবনায় ভিক্ষাচারের একটি আদর্শ প্রতিভাত হয়েছে, বুদ্ধ ও শিবের ভিক্ষাবৃত্তির মহৎ ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। এখানে তার ছায়াপাত সত্ত্বেও শিবের মাধ্যমে সবহারা মানুষকেই কবি শিল্পরূপায়িত করেছেন। রথের রশি ও কবির দীক্ষা—নাটিকা ও কথিকা, ভাষ্য ও কারিকা, সমাজচিত্র ও সমাজতত্ত্ব। উভয় রচনা একত্রে 'কালের যাত্রা' নামে অভিহিত:

সমাজ তার রথ, মানবসম্বন্ধ রশি, মহাকাল সারথি, ইতিহাস পথ, রথী দুনিয়ার 'সভ্যতার পিলসুজ'-এর দল। মহাকাল ভৈরব শিব এখানে ব্রাতপতি ও ব্রাত্য, তাঁর সঙ্গে অভেদে কবিও ব্রাত্য মন্ত্রহীন পথচারী। তাঁর সব কথা ও শেষ কথা বলা হয়েছে কথিকাটির শেষ ছত্রে অশেষ ছন্দে :

মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়—
আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।…
অন্ন চাই বলে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে।
বেরল মানুষ লাঙল কাঁধে :
যে মাটি ফাঁকা ছিল, প্রকাশ পেল তাতে অন্ন।
বললেন চাই কাপড়।
হাত পেতেই রইলেন,—
বেরল ফলের থেকে তুলো,
তুলোর থেকে সুতো,
সুতোর থেকে কাপড়।
ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি অসীম
তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের।
নইলে দিন কাটত কুকুর বেড়ালের মতো।…
যখন শিবের ভোগ ভেঙে নিজের দিকে চুরি করে
উৎপাত বাধে তখন অশিবের।
ত্যাগের ধনে মানুষ ধনী, চুরির ধনে নয়।
আমরা কুঁড়ে, ভিক্ষুক দেবতাকে দিইনে কিছু।
তাই মরছি সবদিকেই—
ক্ষেতে ফসল যায় মরে,
পুকুরে জল যায় শুকিয়ে,
দেহে ধরে রোগ, মনে ধরে অবসাদ,
বিদেশী রাজা দেয় দুই কান মলে।
শিবের ঝুলি ভরব যেদিন, সেদিন আমাদের সব ভরবে।

(কবির দীক্ষা : কালের যাত্রা)

মনে পড়ে শুক্ল যজুর্বেদের মহান মন্ত্র :

নমো রুদ্রায়ততায়িনে ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমো
নমঃ সুতায়াহন্ত্যৈ বনানাং পতয়ে নমঃ।
ওঁ নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো
নমো কুলালেভ্যঃ কর্মকারেভ্যশ্চ বো নমো।
নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষবস্তেভ্যো
নমো ব্রাত্যেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমঃ। (রুদ্রাধ্যায়)

ঘ। উপসংহার

মাথার ওপর সুনীল আকাশ আর পায়ের তলে শ্যামল মাটি, মদমত্ত ঝঞ্ঝা এবং নৃত্যচপল শস্য—এই সুদূর দুই প্রান্ত থেকে জাত ও মিলিত 'রুদ্র-শিব' যেন দুই বিরাট বাহু দিয়ে অধিকার করে আছেন এই পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে, মানুষের জীবনকে। ভূলোক ও ভুবর্লোক, দেবভূমি ও দর্শনভূমি, সংসার ও হৃদয়—সর্বত্র তিনি সমভাবে বিরাজিত। অন্নময় থেকে আনন্দময় কোষ, কর্ম থেকে ধর্ম, বাস্তব থেকে কল্পনা—সর্বত্র তাঁর সমান বিহার। তিনি ছড়িয়ে আছেন শিল্পে কাব্যে নৃত্যে নাট্যে ছন্দে অলংকারে জ্যোতিষে আয়ুর্বেদে ব্যাকরণে কামশাস্ত্রে রসশাস্ত্রে। তাঁর সেই এক রূপ-গুণ : কিন্তু দেশেদেশে, কালেকালে, পাত্র ও ক্রিয়াভেদে তার নবনব প্রত্যয় ও প্রকাশ, শব্দ-অর্থ-ধ্বনি-ব্যঞ্জনা-রস।

তিনি এক ও দুই। তিনি বহু। এককরূপে—তিনি ধ্যানী শিব, সংগ্রামী রুদ্র, প্রলয়ী নটরাজ। তাঁর তৃতীয় নয়নের আগুনে ভস্ম হয় কাম, তাঁর ধ্বংসলীলায় বিমুক্ত হয় বন্ধন, তাঁর প্রলয়নৃত্যে বিলুপ্ত হয় পাপ, ত্রস্ত হয় অন্যায়। যখন রুদ্রবীণার আগুনশিখা জ্বলে ওঠে রক্ত-দিগন্তরে, তখন লয় আনে সৃষ্টি, সংগ্রাম আনে শান্তি, দুঃখ দেয় আনন্দ, মৃত্যু হয় অমৃতের দ্বার। শিবানীর সঙ্গে যোগে তিনি দুই—একাধারে দেব ও দেবী, মানব ও মানবী, পুরুষ ও প্রকৃতি, লয় ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম। দু'য়ে মিলে একই তত্ত্ব, একই জীবনদর্শনের দ্বৈতরূপ, বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব-সমন্বিত অর্ধনারীশ্বর। বহুরূপে—তিনি নীলকণ্ঠ ও মহাকাল, মৃত্যুঞ্জয় ও ভৈরব, কৃষক-শ্রমিক-তাঁতি-জেলে-কামার-কুমোর-শাঁখারী-ব্যাপারী। তাঁর পদচারণা তখন ঘরের আঙিনায়, পথের ভিড়ে, সংসারবেদনায়, পদাতিকের মিছিলে। তাঁর চলার তালে তালে ছন্দ জাগে, স্পন্দন জাগে, আনন্দ জাগে। বিশ্বের বেতালা চলনে দেবতার নিমীল নয়নে জ্বলে ওঠে বহ্নিশিখা, শান্ত শিব হয় উন্মদ অশান্ত, কালের পুতুল হয় কালের শিল্পী। সংগ্রাম ও মৃত্যুকীর্ণ পথে মুক্তধারা প্রাণের পদতলে সব অসমতল দলে পিষে পরিণত হয় সম তলে সমতালে। জীবন সত্য, সমাজ সুন্দর, মানুষ শিব হয়। শৈবতত্ত্ব নিরালম্ব কল্পাদর্শ নয়, বস্তুমুখী জীবনাদর্শ।

এমন বিচিত্র দেবতা, এমন বলিষ্ঠ অথচ কমনীয়, জীবননিষ্ঠ অথচ আদর্শায়িত, অচপল অথচ স্থিতিস্থাপক চরিত্র দেবসভায় দ্বিতীয়রহিত, সাহিত্যের আসরে অদ্বিতীয়। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির গভীর ব্যাপকতায় এমন করে আর কেউই প্রবেশ করেন নি। তাঁর ইতিহাস মানুষের ইতিকথা, সমাজের ইতিবৃত্ত, মানসের মানচিত্র। তাই বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন : 'আদর্শ পুরুষচরিত্র শিব। সমস্ত ভাবে তাঁহার প্রেম এবং বল প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমে বলে কোথাও বিযুক্ত হয় নাই। তাই শিবের চরিত্রে সৃষ্টি প্রলয়ের সহিত চিরবন্ধনে বদ্ধ।...শৈব সাহিত্যে প্রেমে এবং বলে মহত্ত্বের অনুশীলন।...এই জন্য সমাজ সংগঠনে শৈবের প্রভাব।...

মত্ততা শিবে নাই। তাঁহার চরিত্র বিশ্বের রহস্য মন্থন করিয়া নিঃশব্দে গঠিত হইয়াছে—পর্বতের মত অটল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর।···শৈব ভাবে গীতিকাব্য অপেক্ষা মহাকাব্য রচনার যেন সুবিধা অধিক ৫২।'

প্রকৃতি সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম শিল্প প্রজ্ঞা কল্পনা ইত্যাদির যোগাযোগে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সংগমমুখে সংস্কৃতি রূপ গ্রহণ করে। বাইরের পরিবেশে অন্তর-সংস্কৃতি যে শিল্পরূপ লাভ করে, তার বল্‌গা থাকে পরিপার্শ্ব-নির্ভর কবিচিত্তের হাতে। রূপান্তরের সূত্রধার মন—একদিকে বাস্তব পঙ্কবিধৃত, অন্যদিকে কল্পনার পঙ্কজধৃত, রুডল্‌ফ্‌ ইউকেনের ভাষায়, Man is the meeting point of various stages of Reality। আধুনিক কবির হৃদয় একক জটিল ও বহুরেখান্বিত। কিন্তু মধ্যযুগে ব্যক্তিত্ব ছিল সমাজের কাছে আত্মনিবেদিত, মন ছিল সংহিতায় সমর্পিত। ধর্ম ও কর্ম, বর্ণ ও বর্গ দিয়ে চিহ্নিত হত মানুষ, একটি মনই তখন বহুমনের প্রতিনিধিত্ব করত। সেকালীন শিল্পচেতনা তাই একটি বা দুটি মানুষের হৃদয়লগ্ন নয়, একটি জাতির সামগ্রিক সংস্কৃতির বিশিষ্ট স্ফুলিঙ্গ। শিব-সংস্কৃতি তাই বাঙালীর সংস্কৃতি।

সংখ্যাহীন কাব্যপ্রবাহে শিবের যে জীবনী প্রকাশিত হয়ে উঠেছে, তা বাঙালীর আত্মজীবনী; তাঁর যে দ্বান্দ্বিক চরিত্র রূপায়িত হয়েছে, তা তাঁর স্রষ্টা ও শ্রোতৃবৃন্দের আত্মদর্পণ। তৎকালীন গোষ্ঠী- শ্রেণী- ও ধর্ম-চেতনা শিবের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে; বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও সাহিত্যে তাঁর বিচিত্র রূপের পরিচিতি আমরা লক্ষ্য করেছি, দেখেছি: উচ্চবিত্ত বাসরে তাঁর এক রূপ, মধ্যবিত্ত আসরে আর, নিম্নবিত্ত পরিসরে বহু; ওপরতলায় তিনি যোগিরাজ ধ্যানমগ্ন অলৌকিক, মাঝের তলায় ভক্তি-অধীন দেবতা ও দরিদ্র গৃহস্বামী, নীচের তলায় চাষী তাঁতি শাঁখারি জেলে মালী। আবার এই তিন স্তরের মিলনে তাঁর সমন্বিত রূপ। এইসব ছবির মাধ্যমে তখনকার বাঙালী সমাজ ও মননের ইতিহাস কল্পনামণ্ডিত হয়ে প্রমূর্তি লাভ করেছে। আবার তাঁর চরিত্রের যে বৈপরীত্য, তা বাঙালীরই চরিত্র। দেবত্ব ও মানবত্ব, ত্যাগ ও ভোগ, উৎসাহ ও নিষ্ক্রিয়তা, আধ্যাত্মিকতা ও ইন্দ্রিয়পরতা, দুঃখবাদ ও ব্যঙ্গবচন, আদিরস ও করুণ রস—শিব এবং বাঙালী উভয়েরই চরিত্র, 'দেবস্য কাব্যম্‌' ও জাতীয় শিল্প, 'ন মমার ন জীর্যতি।'

কালক্রমে দেশজ ব্যবধান দূর হতে হতে বাঙালী ক্রমে একটি সমন্বিত সংস্কৃতিতে একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত শিবরূপও সংগ্রথিত হতে হতে একটি সুষম মাত্রায় একটি সম্পূর্ণ চরিত্রে পরিণতি লাভ করেছে। বাঙালীর

দ্বৈত সাধনা, জীবন-আরাধনা, মানবতাবোধ, মানসিক উচ্চতা-অবনতি তাঁকে আশ্রয় করে কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। কান্নাহাসির দোলদোলানো বাঙালীর জীবন ও মননই বাঙলার লোকশিবের দ্বন্দ্বময় ইতিহাস।

আধুনিক কালে যখন সমাজবিধির ওপরে ব্যক্তিত্ব নিজের স্বাক্ষর রাখল, জীবনায়নের পশ্চাতে দেখা দিল সুবিহিত জীবনদর্শন, তখনও দেখি শিবকে বাঙালী মানসের নিত্যসঙ্গীরূপে। একদিকে জীবনের তথ্য, হাহাকার নিরাশা ব্যর্থতা; অন্যদিকে কল্পলোকের তত্ত্ব, নতুন জীবনের আলাপন, নবধারাপাতের সূত্ররচনা; না-পাওয়ার বেদনায় ভারাতুর হৃদয়ের শোকগাথা, আবার পাওয়ার রোমাঞ্চনায় ভরাট অন্তরের আনন্দগীতি; মধ্যে ত্যাগ তপস্যা সংযম সংগ্রাম। এই আলো-আঁধারি দুইরঙা গোধূলি-মনে শিবই জীবনশিল্পীর একমেব উপাস্য। আদিতে তিনি দেবতা, মধ্যে মানব, অন্তে জীবনদর্শন। তবু সেই এক—স একঃ, কেবলঃ শিবঃ।

মানুষের জীবনে ও মনে, সমাজে ও ব্যক্তিতে নিয়ত দ্বন্দ্ব ও বিবর্তন ঘটে চলেছে। সে কোন একটি স্থির বিন্দুতে এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তাকে বারবার মৃত্যু-তোরণ পেরিয়ে-পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। ফলের মধ্যেই থাকে প্রলয়ের রক্তবীজ, সেই প্রলয়বীজে সম্ভাবিত হয় নতুন জীবন। স্থিতাবস্থায় জাগে বিরোধী আবর্তন, দুয়ের সংঘাতে সমন্বিত হয় নতুন উপসংহার। বৈপরীত্যের এই সামঞ্জস্য এবং উভয়ের মিলনে সুষম উপসংস্কৃতি—শিবের জীবন এই তথ্যের প্রমাণপঞ্জী, তাঁর তত্ত্ব এই দর্শনের মৌল ভিত্তি। স্থিতি ও গতি, চঞ্চল ও অচঞ্চলের সমাবেশই রুদ্র-শিব: একজন দেন দেবত্ব, আরজন আনেন মানবতা; একজন করেন ধ্বংস রুদ্রবীণার অগ্নিবন্যায়, আরজন করেন সৃষ্টি যোগক্ষেম শান্তিস্রোতে; একজন জগৎকাব্যে নিয়ে আসেন অমিত্রাক্ষরের দোলা, আরজন সেই দোলনকে আবার নিয়ে যান মিত্রাক্ষর ছন্দে। দুঃখের সাধনায় দুঃখের অন্ত, সংগ্রামের তপস্যায় শান্তির সিদ্ধি এবং ব্যথার সরোবরে আনন্দের পদ্ম ফুটিয়ে তোলা—এই-ই তো পৃথিবীর, ব্যক্তির ও জাতির পৌনঃপুনিক ইতিহাস। এই তথ্য-তত্ত্ব যুগে-যুগে শিবকে ঘিরেও—যেখানে অমিত্র-জগৎ থেকে উত্তীরণ বিশ্বমানবিক মিত্রতায়, যেখানে পাণ্ডুর জীবনে পলাতক রক্তকনিকাদের বারেবারে অমৃতত্বে ফিরিয়ে আনা। সমগ্র ইতিহাস যাঁর মধ্যে সংবৃত, ইতিহাসের মহাকাব্য যাঁর শিল্পরচনা, জীবন ও দর্শনের মনন ও মানসের মঙ্গলদায়ক ঐক্যবিধায়ক জনগণমন-অধিনায়ক সেই 'ব্রাত্য মহাযাত্রী'-কে সন্নত নমস্কার॥

জয় ভৈরব, জয় শংকর।

জয় জয় জয় প্রলয়ংকর, শংকর শংকর॥

জয় সংশয়ভেদন, জয় বন্ধনছেদন,

জয় সংকটহর শংকর শংকর।

তিমির হৃদ্‌বিদারণ জ্বলদগ্নিনিদারুণ,

মরুশ্মশানসঞ্চর শংকর শংকর।

বজ্রঘোষবাণী রুদ্র, শূলপাণি

মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শংকর শংকর॥ (রবীন্দ্রনাথ)

স উত্তীষ্ঠম্ স···ব্যহচলন্॥

তং বৃহচ্চ রথঞ্চ চাদিত্যাঞ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যহচলন্॥

তং যজ্ঞায়জ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চ যজ্ঞশ্চ যজমানশ্চ পশবশ্চানুব্যহচলন্॥

তং ভূমিশ্চাগ্নিশ্চৌষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ বানস্পত্যাশ্চ বীরুধশ্চানুব্যহচলন্॥

তং ঋতং চ সত্যং চ সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ নক্ষত্রাণি চানুব্যহচলন্॥

তং ইতিহাসশ্চ পুরাণঞ্চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যহচলন্॥

তং সভাসমিতিশ্চ সেনা চ সুরা চানুব্যহচলন্॥

অহ্না প্রত্যঙ্‌ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্‌ নমো ব্রাত্যায়॥

(ব্রাত্যসূক্ত: অথর্ববেদ)

পরিশিষ্ট

পাদটীকা

অধ্যায়—এক

(১) Studies in a dieing Culture P 131 (২) Golden Bough Chap I (৩) On Art and Literature P 144 (৪) Oraon Religion and Customs : Introduction—T. C. Hodson P xii (৫) Comparative Religion P 6 ; বিজ্ঞানের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২য় অঃ ; ঋগ্বেদ ৪র্থ ও ১০ম মণ্ডল (৬) Illusion and Reality P 25 (৭) Ibid p 35 (৮) Art and Ritual Chap III p 54 (৯) বাংলার শাক্তধর্ম—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১২শ বর্ষ ৩য় খণ্ড) পৃ ১৯২ (১০) সমাজভেদ : স্বদেশ পৃ ৮৮ (১১) Comparative Religion p 92 (১২) The Vedic Age pp 147-64 (art. by Dr. S. K. Chatterjee) ; ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা (ভারতের বিভিন্ন নৃজাতি ও ভাষাগোষ্ঠী সিংহাবলোকন) (১৩) ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা : সমাজ পৃ ৩২ (১৪) Totem and Taboo Chap II, III (১৫) The Vedic Mythology p 65 ; Evolution in Indian Polity p 6 (১৬) Totemism and Exogamy Vol I p 83 (১৭) Primitive Art p 68 ; বিজ্ঞানের ইতিহাস ১ম পৃ ২৭ (১৮) Art and Ritual P 44 ; E. R. E. vol 10 p 360 (১৯) The Civilization of Babylonia and Assyria P 234 ; The most ancient Egypt p 194 (২০) E. R. E. vol I p 227 (২১) সমাজ পৃ ৩২-৩৩ (২২) The Vedic Age p 165 (২৩) C. H. I. vol II p 1 (art. by Swami Jatiswarananda) (২৪) ভারতবর্ষের ইতিহাস : স্বদেশ পৃ ৪৪ (২৫) C. H. I. vol II p X (২৬) স্বদেশ পৃ ৪৬ (২৭) আমাদের পরিচয় পৃ ৯০ (২৮) A Study of Indo-Aryan Civilization p 34 (২৯) চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী ১ম পৃ ৩৮ (৩০) অগ্নিপুরাণ ৩১৭.৭ ॥

অধ্যায়—দুই : ক

(১) Ṛgvedic Culture p 445 (২) Islamic Culture—M. T. Akbar (C. H. I. II pp 357-58) ; History of the Arabs p 101 ; কোর্‌আণ শরীফ ('আমপারা') (৩) Hinduism and Buddhism p 231 (৪) Essay on Hindu and Chinese system of Asterism p 53 (৫) The Orion p 102 (৬) Ibid p 122, 124 (৭) পূজাপার্বণ পৃ ৯৮ (৮) The Orion p 172 (৯) মানব সমাজ ১ম পৃ ৭১ ; বিজ্ঞানের ইতিহাস ১ম পৃ ৩০, ৭৬, ৯৪, ৯৬ (১০) নানা প্রবন্ধ পৃ ৪১ (১১) Ṛgvedic Culture p 87, 445 (১২) বঙ্গ সাহিত্য

পরিচয় ১ম (ক. বি.) পৃ ২৩ (১৩). রুদ্রাধ্যায় ৬ (১৪) লিঙ্গপুরাণ ৬০ অধ্যায় (১৫) Vedic Age p 162 ; also Vedic Mythology p 78 ; Religion and Mythology of Veda p 147 (১৬) ঋক ১.১১৪. ১, ৫, ১০ । ২.৩৩.৮, ১০, ১১ । ৭.৪৬.৩ (১৭) বিশ্বকোষ ১৬শ পৃ ৬৩১ (১৮) বৈদিক দেবতা পৃ ৩২ (১৯) চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী ১ম পৃ ৩৯ (২০) Egyptian Myth and Legend chap; 1, XV ; Myths and Legends of Babylonia and Assyria ; Calcutta Review 1934 March (The Earliest Chapter of Indian Art—S. C. Bhattacharya) (২১) Vaishnavism, Saivism and other minor Religious Sects p 102 (২২) Development of Religion and Thought in ancient Egypt p 36, 74 (২৩) Vaishnavism Saivism p 105 (২৪) Religious Thought and life in India p 81 (২৫) C. H. I. II p 21 (২৬) Pr. Fl. N. I. p 3 (২৭) The Foundation of Living Faiths p 221 (২৮) The Dance of Shiva p 84 (২৯) Tho Foundation of Living Faiths p 223 (foot note) (৩০) Vaishnavism Saivism p 103, 104, 106 (৩১) বৈদিক দেবতা পৃ ১৭ (পাদটীকা) (৩২) আমাদের পরিচয় পৃ ৮৩ (৩৩) পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ৭. ৯, ১৬ (৩৪) শতপথ ব্রাহ্মণ ১. ৭. ৩. ১ (৩৫) Hinduism and Buddhism p 36 (৩৬) বিশ্বকোষ ২০শ ('শিব') (৩৭) সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র (৩৮) Vedic Age p 162 (৩৯) Ibid pp 194-95 (art.—A. D. Pusalkar) (৪০) The Indus Civiliza tion p 15 (৪১) Vedic Age p 163 (৪২) M. J. D. and I. V. C.-I. Plate XII Fig 17 (৪৩) C. H. I. II p 21, 23 (৪৪) M. J. D. and I. V. C.-I pp 52-56 ; I. V. C. p 16 ; J. A. S. B. XXX 1934 pp N5—N59 ; প্রাগৈতিহাসিক মোহেন জো দড়ো পৃ ৬৯ (৪৫) I. V. C. p 83 (৪৬) Advance 5. 8. 1936 (৪৭) Ency. Brit. vol 18 p 467 (৪৮) Ṛgvedic Culture pp 410-11, 487 ; Vedic Age p 203 (The Aryan Problem) (৪৯) Vaishnavism Saivism p 104, 106 ; The Age of Imperial Unity p 455 ; রুদ্রাধ্যায় ২৭ (৫০) Siva and Buddha p 9 (৫১) Vishnavism Saivism p 103 (৫২) The Foundation of Living Faiths p 223 (৫৩) R. Fl. N. I. pp 60-62 (৫৪) The Original inhabitants of India p 370 (৫৫) R. Fl. N. I. p 62 (৫৬) Primitive Art p 118 ; Ancient Races and Myths p V ; বিজ্ঞানের ইতিহাস ১ম পৃ ৫০ (৫৭) The Original inhabitants of India pp 450-51, 454 (৫৮) Ibid p 509 (৫৯) চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী ১ম পৃ ৫৯ (৬০) বাজ. সং. ১৬.৪০—৪৭ ; তৈত্তি. সং ৪.৫. ১-১১ ; মৈত্রা. সং ২. ৯. ১—১০ ; অথর্ব ৪.২৯ ; সাহিত্য পৃ ১৪৪ ; সমাজ পৃ ২২—২৩ ॥

অধ্যায়—দুই : খ

(১) ঋক ৩.৫৩.৪ | ৮.৩৩.১৭ | ১০.৩৪.২,৪ | ১০.৯৫.১৫ (২) Ṛgvedic Culture p 105, 106, 329 (৩) মধ্যযুগে বাঙ্গালা পৃ ৪৬৬ (৪) Evolution of Mother-Worship in India pp 14-18 ; পৃথিবী ও দেবী—শশিভূষণ দাশগুপ্ত (মাসিক বসুমতী ২.৫.১৩৬০) (৫) বিশ্বকোষ ২০শ ভাগ (৬) Vaishnavism Saivism p 111 (৭) সমাজ পৃ ৩৬ (৮) Evolution of Mother-Worship p 17 (৯) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ১ম ও ৪র্থ অ: (১০) কালিকা ৪৫ অ: ; দেবী ১১৭ অ: ; মৎস্য ১৫৪, ১৫৬ অ: ; বামণ ৫৪ অ: (১১) প্রাগৈতিহাসিক মোহেন জো দড়ো পৃ ৬৭-৬৮ (১২) C.H.I.-I p 60 (১৩) I.V.C. p 68, 83 (১৪) রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র পৃ ২৪৫ (১৫) M.J.D. & I.V.C. II p 57 (১৬) Vedic Age p 187 (১৭) The Original Inhabitants of India p 454 ; p 378, 398, 450-51 (১৮) Vedic Age p 158 ; Evolution of Mother-Worship p 15 ; Shakti and Shakta p 64 ; History of Bengali Language and Literature p 298 (১৯) V.G.S.I. p 6 (২০) Pr. Fl. N. I. p 84, 89-96 ; (২১) Creation and Evolution in Primitive Cosmogonies pp 6-13 ; Folklore in the Old Testament Part I Chap I (The Creation of Man) (২২) The Civilization of Babylonia and Assyria p 187-88 (২৩) Ency. Brit. 18 p 467 ; (২৪) Ṛgvedic Culture p 79 (২৫) Vedic Age p 187 (২৬) History of the Arabs pp 98-100 (২৭) বাংলার ব্রত পৃ ২২ (২৮) Pr. Fl. Ni. p 30, 39 (২৯) The Foundation of Living Faiths p 226 (৩০) Ency. Brit. 18 p 467 (৩১) Vedic Age plate VII Nos. 5, 6, 7, 8 (৩২) Ibid p 443 (৩৩) Ency. Brit. 18 p 467 (৩৪) Elements of Hindu Iconography p 40 (৩৫) ব্রহ্ম ৩৬ অ: ; শিব-উত্তর ১৭ অ: ; লিঙ্গ ১০২, ১০৬ অ: ; স্কন্দ-কুমারিকা ৬২ অ: (৩৬) Golden Bough Chap XI ; Art and Ritual Chap I, III (৩৭) E.R.E. vol 9 pp 822-30 (৩৮) The Universal Jewish Encyclopædia vol 2 p 2 (৩৯) V.G.S.I. p 29 ; The Original inhabitants of India pp 151-52 (৪০) Art and Ritual Chap III ; 'May Queen'—A. Tennyson (৪১) Outline of Islamic Culture p 716 ; History of the Arabs p 102 (৪২) Encyclopædia of Islam vol 4 pp 711-12 (৪৩) Psychology of the Unconscious chap V (Symbolism of Mother and Rebirth) (৪৪) Primitive Art p 59 (৪৫) দ্রষ্টব্য Golden Bough ; The Most Ancient Egypt ; The Civilization of Babylonia and Assyria ; Psychology of the Unconscious (৪৬) Development of Religion and Thought in Ancient Egypt pp 20-23 (৪৭) Art and

Ritual chap I (৪৮) Psychology of the Unconscious p 209 (৪৯) Hinduism and Buddhism p 16 (৫০) Social and Religious life in the Grihya Sutras chap X (৫১) ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা : সমাজ ॥

অধ্যায়—দুই : গ

(১) মানব গৃহ্যসূত্র ২. ২৪ ; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১.২৭১ (২) Indian Sculpture and Painting Plate XXVII (৩) বরাহ ২৯ অঃ ; বামণ ৫৪ অঃ ; দেবী ১১১ অঃ ; লিঙ্গ ১০৪ অঃ ; স্কন্দ-মাহেশ্বরঃ কেদারখণ্ড ; (৪) 'তাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ সর্বাঃ'—বরাহ ১৭.৩৪ ; (৫) ঋগ্বেদ ২. ২৩. ১। ৪. ৫০. ৫, ৬। দ্রঃ দেবী ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (৬) লিঙ্গ ১০৪-০৫ অঃ ; (৭) Vedic Age p 162 ; মহাভারত-বনপর্ব ; দ্রঃ স্কন্দ (৮) ব্রহ্ম ৩ অঃ ; বামণ ৫৭ অঃ ; ব্রহ্মবৈবর্ত-গণেশ ১-১৪ অঃ (৯) শৈবধর্ম—ডঃ যত্নবংশী পৃ ৮৯ ; ষষ্ঠী—গুরুদাস ভট্টাচার্য (গাঙ্গেয় ১৩৬৩ বঙ্গসংস্কৃতি সংখ্যা) পৃ ২৪০ (১০) মনুসংহিতা ৩. ৮৯ (১১) কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ পৃ ৩৭৯-৮০, ৪৫৮ (১২) ঋগ্বেদ ১০. ১২৭. ২-৩ ; বৃহদ্দেবতা ২. ৭৯ ; Shakti and Shakta App II p 148 ; সরস্বতী পৃ ১১৯ (১৩) বৈদিক দেবতা পৃ ৪৪ (১৪) শিবসংহিতা পৃ ২৯ পাদটীকা ; (১৫) বৈদিক দেবতা পৃ ৪৫ (১৬) J. A. S. B. XXX NS 1934 pp 44-37 ; (১৭) The Meaning of Art : Plate 2 (১৮) শিব-পূর্ব ৩ অঃ ; ব্রহ্মবৈবর্ত-প্রকৃতি ১২ অঃ (১৯) শিব-পূর্ব ১৩ অঃ (২০) ঐ-ঐ ৬ অঃ (২১) ঐ-মধ্য ১২ অঃ ॥

অধ্যায়—দুই : ঘ

(১) M. J. D. & I. V. C. I p 57 (২) Calcutta Review 1934 March, April (art.—S. C. Bhattacharya) (৩) Egyptian Myths and Legends Chap I (৪) Vaishnavism Saivism p 104 (৫) J. A. S. B. 1901 pt I pp 38-83 ; Ibid 1134 pp 107-8. N5-N59 (৬) Pr. Fl. NI. p3 (৭) বৈদিক দেবতা পৃ ২৭ (৮) D. Mackenjie Chap I (৯) Vedic Mythology p 50 (১০) Calcutta Review 1934 April pp 59-60 (১১) Shakti and Shakta App II pp 443-44 (১২) তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪. ১০. ১৩ ; কাঠক সং. ৩. ৯. ১৩ ; মৈত্রায়ণী সং. ২. ১৫. ২০ (১৩) J. A. S. B. 1932 pp 54-55 (Studies in Rigvedic Rites—E. N. Ghosh) (১৪) Ibid 1934 XXX art 317 (১৫) The Origin of the Cross p 171 (১৬) Golden Bough II p 4 E. R. E. Vol 5 (১৭) Art and Ritual Chap IV (১৮) Ancient Races and Myths p 58 (১৯) Siva and Buddha p 9 (২০) Vedic Age p 395 Social and Religious Life in the Grihya Sutras Chap X (২১) কামসূত্রম্ ১. ৮ (২২) Egyptian Myths and Legends Chaps I, V (২৩) Ancient Races and

Myths p 107 (২৪) Religious Thought and Life in India p 313; C. H. I. I p 60 (২৫) Ṛgvedic Culture p 167 (২৬) বিশ্বকোষ ১৬শ ভাগ (২৭) E. R. E. Vol 11 pp 399-423 (২৮) R. Fl. NI. p 399 (২৯) p 115 (৩০) প্রাগৈতিহাসিক মোহেন জো দড়ো পৃ ৭২ (৩১) M. J. D. & I. V. C. II p 56 (৩২) The Religious System of the Parsis pp 13-14 (৩৩) E. R. E. Vol II pp 399-423 (৩৪) Introductory Lectures on Psycho-analysis pp 129-30 (৩৫) J. A. S. B. 1901 p 67, 68, 81 (৩৬) V. G. S. I. p 22 (৩৭) E. R. E. Vol II p 399 (৩৮) Vedic Mythology p 72, 152, 158 (৩৯) R. Fl. NI. p 399 (৪০) মনসা-শীতলা—গুরুদাস ভট্টাচার্য (গাঙ্গেয় ১৩৬২ বঙ্গ-সংস্কৃতি সংখ্যা) (৪১) Vaishnavism Saivism p 114; Vedic Age p 187 (৪২) Art and Ritual Chap V (৪৩) Ṛgvedic Culture p 164 (৪৪) Phallism p 2 (৪৫) The Origin of the Cross (Sex-Worship in India) (৪৬) Ṛgvedic Culture pp 164 66 (৪৭) C. H. I. II p 21 (৪৮) p 115, 139 (৪৯) Ṛgvedic Culture p 166 (৫০) J. R. A. S. of Great Britain and Ireland Vol VIII p 330-39 (Art.—Dr. Stevenson) (৫১) The Origin of the Cross pp 1-2 (৫২) প্রাগৈতিহাসিক মোহেন জো দড়ো পৃ ৭১ (৫৩) The Foundation of Living Faiths p 225 (৫৪) M. J. D. & I. V. C.-I Plate XIII No. 8, 13 Plate XII No. 7 (৫৫) Ibid p 64 (৫৬) Vedic Age p 150, 163 (৫৭) The Foundation of Living Faiths p 227; E. R. E. Vol 9 (৫৮) Vedic Mythology p 155 (৫৯) Art and Ritual Chap V (৬০) R. Fl. NI. pp 89-90 (৬১) The Foundation of Living Faiths p 228 f. n. (৬২) Ency. Brit. Vol 21 pp 439-40; E. R. E. Vol 9 pp 815-31 (৬৩) The Chamars p 122 (৬৪) R. Fl. NI. pp 61-62, 109 (৬৫) The Old Testament Gen. 46.26; Exod. 1.5; Judges 8.30 (৬৬) Ṛgvedic Culture p 165 (৬৭) Psychology of the Unconscious (The Transformation of the Libido) (৬৮) Ibid p 93 (৬৯) গাজনগম্ভীরা —গুরুদাস ভট্টাচার্য (দেশ ১. ২. ১৩৬১) (৭০) R. Fl. NI. pp 89-90 (৭১) কালিকাবিলাস ২৪ অ: (৭২) বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ ৭৪ (উদ্ধৃত) (৭৩) The Original Inhabitants of India p 378; Vedic Mythology p 155 (৭৪) Psychology of the Unconscious pp 71-74 (৭৫) Cultural History of of the Vayu Purana pt II (৭৬) কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ পৃ ২৭৩ (৭৭) J. A. S. B. 1901 pt V pp 38-63, 64-88 ॥

অধ্যায়—দুই ঃ ৩

(১) ভারতবর্ষীয় বিবাহ ঃ সমাজ পৃ ৫৫ (২) বাংলার ব্রত পৃ ৩১ (৩) ঐ পৃ ৪

(৪) ঐ পৃ ৫ (৫) ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা : সমাজ পৃ ১৪ (৬) সমাজ পৃ ৫৫ (৭) Vaishnavism Saivism. Art. 83, 84 (৮) শ্বেত. ৫.১০। ৬. ১৯ (৯) বিশ্বকোষ ২০শ ভাগ (১০) ১.১১৪. ১,৫ (১১) ১. ২৭. ১০। ২. ১. ৬ (১২) শিব-পূর্ব ৩, ১৩ অ: ; ঐ—উত্তর ৪ অ: ; ব্রহ্ম ৭১-৭৪ অ: (১৩) বিশ্বকোষ ২০শ (১৪) শিব-পূর্ব ৮২ অ: ; ঐ—উত্তর ৭, ৮ অ: ; লিঙ্গ ৭১, ৭২ অ: ইত্যাদি (১৫) স্কন্দ—আবন্ত্য ৪৯ অ: মৎস্য ১৮৭ অ: ; ব্রহ্ম ৩. ২০৬ (১৬) বামণ ৩ অ: (১৭) কালিকা ১৯ অ: ; বরাহ ৯৭ অ: ; লিঙ্গ ৯২ অ: (১৮) India and Java ; শৈবধর্ম ৮ম অ: (১৯) সমাজ পৃ ৩৪-৩৫ (২০) আমাদের পরিচয় পৃ ৮৩-৮৬ (২১) C. H. I. II p 9 (art.—Swami Jatiswarananda) (২২) Ibid p 10 (২৩) Hymns of Tamil Saivite Saints, Verses 19, 22 ॥

অধ্যায়—তিন : ক-গ

(১) Vedic Age ('Race movements') ; বাঙ্গালীর ইতিহাস ('ইতিহাসের গোড়ার কথা') (২) গৌড়রাজমালা পৃ ১২ (৩) বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ ৫৯২-৯৬ (৪) Excavation in Bangarh p 21, 30-31, 33, 38 (৫) ভারতবর্ষ ১৩৫৬ শ্রাবণ (রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস) পৃ ১২৫-২৯ (৬) বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ ৬০২ (৭) প্রবাসী ১৩৫৯ আষাঢ় (পশ্চিম সুন্দরবনে শৈব মূর্তি) পৃ ৩২১-২৩ (৮) বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ ৬১৫, ৬১৯ ; গৌড়লেখমালা ১ম স্তবক পৃ ১২ ; গৌড়রাজমালা পৃ ১২, ৪২ ; J. R. A. S. B. IV NS pp 101-02 ; রামচরিতমানস-সন্ধ্যাকর নন্দী ২. ২১-২৭ ; Inscriptions of Bengal III (৯) বা. দে. ই. পৃ ২০৬-০৭ (১০) বাংলার সাধনা পৃ ৩৬-৩৭ (১১) নাথ সম্প্রদায় : পরিচায়িকা পৃ ৬-৭ ; ব. ভা. সা. পৃ ৯৭ (১২) বা. ম. ই. : ভূমিকা পৃ ৪ ; গৌড়ের ইতিহাস ২য় পৃ ৩৭-৩৮ ; Inscriptions of Bengal III ; The Modern Buddhism : Introduction—H. P. S'astri p 21 ; বা. দে. ই. পৃ ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯০, ১৩১, ১৪৫ ; সা. প. প. ১৩১৫ ৩য় সংখ্যা (১৩) J. A. S. B. 1936 vol II pp 21-25 (১৪) গৌড়লেখমালা পৃ ২২, ৫৯, ৭৩ (১৫) রাগ ও রূপ : ভূমিকা—ও. সি. গাঙ্গুলী পৃ ১৪ (১৬) সদুক্তিকর্ণামৃত (১৭) History of Bengal I pp 426-27 (১৮) An Advanced History of India Chap IV ; History of Bengal II Chap II ; বা. সা. ই. ১ম খণ্ড ২য় পর্ব ৪র্থ পরিচ্ছেদ ; বাংলার ইতিহাস সাধনা পৃ ৯-১১ ইত্যাদি (১৯) E. B. S. P. pp 2-3 (২০) বা. ম. ই. পৃ ৬৩ (২১) বা. সা. ই. ১ম পৃ ৪ ; E. B. S. P. p 2 (২২) E. B. S. P. p 5 (২৩) শিবার্চনতত্ত্ব (২৪) গৌড়ের ইতিহাস ২য় পৃ ২১৫ ; Descriptive Ethnology of Bengal p 89 ; Essays on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes p 145 (২৫) E. B. S. P. p 3 (২৬, ২৭) Essays on the Koch, Bodo etc., p II, 147 ; কোচবিহারের ইতিহাস পৃ ২৯-৩০ ; গৌড়ের

ইতিহাস পৃ ২১২ (২৮) Indian Census Report 1951 Chap V ; Ethnography p 116, 117 (২৯) Annals of Rural Bengal p 111, 121, 127 (৩০) Ibid p 127, 136 (৩১) The Oraons of Chhotonagpur : Introduction—A. C. Haddon p XIX ; Ethnography p 116, 119 ; E. R. E. vol 5 p 2 (৩২) Oraon Religion and Customs p 81 (৩৩) The Hill Bhuiyas of Orissa Chap X (i) p 208 (৩৪) ব. ভা. সা. ভূমিকা ; শূন্যপুরাণ (স. নগেন্দ্রনাথ বসু) পৃ ২।৶০ ; ধর্মপূজাবিধান : ভূমিকা পৃ ৪-৫ ; গোপীচাঁদের গান ২য় ভূমিকা ; রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১ম ভূমিকা ; Hinduism and Buddhism II p 32 f. n. (৩৫) J.A.S.B. 1934 NS XXX pp 151-61 ; প্রবাসী ১৩৫৭ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২০৫ ; ঐ ১৩৪৪ কার্তিক পৃ ৩৫ ; আদ্যের গম্ভীরা ; V.G.S.I. ইত্যাদি (৩৬) আ.বা.প. ৩১,১২,১৩৫৮ (নীলব্রত ও শিবের গাজন) (৩৭) V.G.S.I. p 36 (Vizaর গ্রীক চার্চে এই জাতীয় অনুষ্ঠান হত—E.R.E. vol 9) (৩৮) চৈত্রমাসে পূজে নর নানা উপচারে। ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥ জিব কাটে জিব ফোড়ে করয়ে চরক। অভিমত ফল পায় না জায় নরক॥ (৩৯) বা. ম. ই. পৃ ৫০৩ (৪০) প্রবাসী ১৩৫৯ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৪২ (৪১) যুগান্তর ২২, ৮, ৫৩ ; ২৯, ৮, ৫৩ ('কালপেঁচার বঙ্গদর্শন') (৪২) E. B. S. P. p 48 (৪৩) শ্রীশ্রীশিবপূজাবিধি (৪৪) কাব্যমালঞ্চ : ভূমিকা। (৪৫) Influence of Islam p 112, 213 ; Bengal under Akbar and Aurangzeb ('Trends of Religion and Culture') ; বা. সা. ই. ১ম পৃ ৫৭, ১৪০ ; History of Bengal II p 71 (৪৬) Influence of Islam p 217 (৪৭) বিনয় সরকারের বৈঠকে ১ম (৪৮) 'আদম্ফ হৈল শূলপাণি' (নিরঞ্জনের রুষ্মা) ; 'মহেশ হইল বাবা আদম' (কলিমাজাল্লাল) (৪৯) বা. প্রা. পু. বি. ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ১৩২০ ; 'নবীবংশ' : বা. সা. ই. ১ম পৃ ৬২৪ (৫০) যুগান্তর ২৪, ১০, ৫৩ ; ১৬, ১, ৫৪ (কালপেঁচার বঙ্গদর্শন) (৫১) বা.দে.ই পৃ ১৬৯-৭০ (৫২) Excavation at Bangarh p 36 (৫৩) E.B.S.P. p 7 (৫৪) J.A.S.B. 1908 Lxx pp 31-37 (৫৫) বা. দে. ই. পৃ ১৭১ চিত্র ২৭খ (৫৬) O.R.C. Chap XIV ; কৌলজ্ঞাননির্ণয় পৃ ৫ ; গোরক্ষবিজয় (ব.সা.প.) পৃ ৩০ ; বাঙ্গালীর ইতিহাস ('ধর্মকর্ম') ; N.I. Antiquary vol 1 1936 p 14 ('Buddhist Tantric Literature of Bengal'—Dr. S. K. De) (৫৭) কল্যাণ, যোগাঙ্ক পৃ ৭৮৩ (৫৮) গোপীচন্দ্রের গান ১ম খণ্ড (৫৯) Great Temples pp 22-23 (৬০) রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১ম ভূমিকা পৃ ৸০-৸৶০ (৬১) J.A.S.B. IV NS pp 101-02 (৬২) শিব-উত্তর ২৬, ২৯ (৬৩) বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার পুঁথি নং ৯২৭, ৯৩০, ৯৯৯ (৬৪) স্কন্দ—আবন্ত্য ৩৭ অঃ ; ঐ মাহেশ্বর ১৭ অঃ ; বামণ ৬৩ অঃ (৬৫) পদ্ম—ক্রিয়াযোগসার ১৫ অঃ ; ঐ-ভূমি ১০১ অঃ ; ঐ পাতাল ৬৫, ৬৭ অঃ ; স্কন্দ-প্রভাস ১৬৭ অঃ ; বিষ্ণু ৩৫ অঃ (৬৬) দ্রষ্টব্য :

কালিকা ভবিষ্য বৃহদ্ধর্ম ইত্যাদি পুরাণ; বিশ্বসার বৃহন্নীল তন্ত্রসার ইত্যাদি তন্ত্র (৬৭) Evolution of mother-worship art. 2 VII (৬৮) Bihar Peasant Life p 406 (৬৯) Man in India II 1922 p 266 (৭০) Ibid XI 1931 pp 57-58 (৭১) মঙ্গলচণ্ডীর গীত—দ্বিজ মাধব (ভূমিকা) (৭২) গৌড়ের ইতিহাস ২য় পৃ ২১২ (৭৩) বা. দে. ই. পৃ ১৪৫; Calcutta Review Nov. 1955 pp 173-78 (Human Sacrifice by Tantriks & its Suppression—K. Lahiri) (৭৪) চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী ১ম পৃ ৭৫ (৭৫) Hill Bhuiyas of Orissa pp 238-39 (৭৬) গোপীচন্দ্রের গান ২য় পৃ ২৩ (৭৭) বাংলা সাহিত্য পৃ ৬৯ (৭৮) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পৃ ৯১, ৯২ (৭৯) মনসা-শীতলা: গাঙ্গেয় ১৩৬২ (৮০) Inscription of Bengal III App. 4 (৮১) মনসা-শীতলা : গাঙ্গেয় (৮২) The Muria and their Ghatul p 186 (৮৩) ষষ্ঠী : গাঙ্গেয় (৮৪) J.A.S.B. II 1936 pp 14-16 (৮৫) বা. সা. ই. পৃ ৯ (৮৬) Inscriptions of Bengal III plate IV verse 18 (৮৭) Ibid plate XII (৮৮) J.A.S.B. VIII 1942 (Dharma Worship—K. P. Chattopadhyay); পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৮৯) প্রাকৃতপৈঙ্গল (গৌরীশৃঙ্গার: লক্ষ্মীবরস্ত) (৯০) History of Bengal I pp 426-27; II Chaps II XII XIII XXVI XXVIII; বা. সা. ই. ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ ও ১২শ পরিচ্ছেদ (৯১) বাংলার ইতিহাস সাধনা (৯২) The Origin of the Bengali Script: Introduction p 3; প্রাচীন বাংলা কাব্যের আঙ্গিক—গুরুদাস ভট্টাচার্য (অগ্রণী শারদীয়া ১৩৬২) (৯৩) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ১ম পর্ব প্রথমাংশ পৃ ২২৩, ৩৪৫ (৯৪) বামণ ৬২, ৬০ অ:; স্কন্দ-বিষ্ণু ৩৫ অ:; ঐ—কাশী. উত্তর ৬০ অ:; গরুড়—পূর্ব ১ অ:; সৌর ২৪ অ: ইত্যাদি (৯৫) বা. সা. ই. পৃ ৬২৩-২৪ ॥

অধ্যায়—তিন: ঘ

(১) Vaishnavism S'aivism (Chaps. on Saiva Sects & Philosophy); C. H. I. II (The Philosophy of Saivism—S. L. S'astri; A Historical Sketch of Saivism—K. A. N. S'astri); শিবসংহিতা; শিবোপনিষদ; গোরক্ষসংহিতা; সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি; হঠযোগ প্রদীপিকা; ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ইত্যাদি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত (২) Vaishnavism Saivism p 161; C. H. I. II p 29 (৩) গোরক্ষবিজয় (ব. সা. প.) পৃ ৩ (৪) ময়নামতীর গান (ঢাকা সাহিত্য পরিষদ) পৃ ৫ (৫) Buddhist India p 239 (৬) নাথসম্প্রদায়: পরিচায়িকা পৃ ৬-৭ (৭) The Modern Buddhism: Introduction p 114 (৮) The Origin of the Cross p 150 (৯) ভারতীয় সাধনার ঐক্য পৃ ২১ (১০) দ্র: সায়নাচার্য ও আনন্দগিরির শংকরজীবনী-গ্রন্থ (১১) An Introduction

to Tantric Buddhism p 190 (১২) Kern's Manual of Buddhism p 133 (১৩) গৌড়ের ইতিহাস ২য় পৃ ৩৭-৩৮ (১৪) মধ্যযুগে বাঙ্গালা পৃ ১৯-২১ (১৫) Shakti and Shakta Chap XV (১৬) বা. দে. ই. পৃ ১৫৪ (১৭) সা. প. প্র. ১৩৩২ (১৮) The Modern Buddhism : Introduction p 12 (১৯) An Introduction to Tantric Buddhism p 130 (২০) নাথ সম্প্রদায় পৃ ৬২ (২১) C. H. I. II p 219 (art.—C. H. Chakraborty) ; নাথ সম্প্রদায় : পরিচায়িকা পৃ ৬ ; আমাদের পরিচয় পৃ ১১২ (২২) Shakti and Shakta p 146 ; ত্রিপুরোপনিষদ, নাদবিন্দুপনিষদ ইত্যাদি দ্র: (২৩) ভারতীয় সাধনার ঐক্য পৃ ২১ (২৪) কৌলমার্গ-রহস্য পৃ ১০ ; Principles of Tantra I, II (২৫) কল্যাণ শক্তি অঙ্ক পৃ ২৫৩ ; অকুলবীরতন্ত্র পুঁথি : নাথ সম্প্রদায় পৃ ১৬৭, ১৭২ (২৬) Evolution of Mother-Worship p 24 ; এই গ্রন্থের 'কাব্যে দেবী-শিবানী' অধ্যায় দ্রষ্টব্য (২৭) কালিকা ১২ অ: (বিষ্ণুর শিবদেহে প্রবেশ) ; শিব ৬০ অ: (শিবের দেবীদেহে প্রবেশ) (২৮) ভারতীয় সাধনার ঐক্য পৃ ২৪ (২৯) O. R. C. p 140 (৩০) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃ ৪-৬ (৩১) V. G. S.I. p. 30 (৩২) পুরোহিত দর্পণ, শিবলিঙ্গপূজনবিধি, শিবার্চনতত্ত্ব, শ্রীশ্রীশিবপূজাবিধি, শ্রীশ্রীশিবপূজা ও শিবরাত্রি, পঞ্জিকা—গুপ্ত প্রেস ও পি এম বাগচি (৩৩) মেয়েদের ব্রতকথা, মেয়েলী ব্রত ও কথা, ব্রতদর্পণ (৩৪) বাংলার ব্রত ; মেয়েদের ব্রতকথা—গুরুদাস ভট্টাচার্য (সন্দীপন ১৩৫১ কার্ত্তিক) (৩৫) শিবায়ন, পুরোহিত দর্পণ, শিবরাত্রি ব্রতকথা—দ্বিজ রাজ (বিশ্বভারতী পুঁথি নং ১৫৮) এবং ব্রত-কথাগুলি দ্রষ্টব্য। (৩৬) ঋগ্বেদ ১.১১৪. ১,২,৫ । ২.৩০.৬ । ২.৩৩. ২,৪,৭,১২,১৩ ; শুক্লযজু ১৬.৪,৫ ; শিবপুরাণ ২৮,৬১, ১৬৩ অ: ; মৎস্য ২৪৯ অ: ; স্কন্দ-কাশী : পূর্বার্ধম্ (৩৭) ধর্মঠাকুর-গোষ্ঠী, পঞ্চানন্দ-গোষ্ঠী এবং রাঢ়-গোষ্ঠীর প্রমথ ও দেবতাবৃন্দ রোগহর (৩৮) তারকেশ্বর তথ্য পৃ ৪ ; স্বদেশ ১৩১৪ বৈশাখ পৃ ২৩ (৩৯) V. G. S. I. p 142 (৪০) শ্রীশ্রীঝাড়েশ্বর মাহাত্ম্যম্ (৪১) সা. প. প. ৫৮শ বর্ষ ৩য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা পৃ ৪২ (৪২) তদেব (৪৩) বাংলার সাধনা পৃ ৪৮ (৪৪) শিবপুরাণ (বৈদ্যনাথ-উৎপত্তি বর্ণন) ৫৫-৫৬ অ: ॥

অধ্যায়—চার : ক

(১) Illusion and Reality p 35 (২) কীর্তিলতা (৩) বিদ্যাপতি : ক. বি. (৪) পাচালী—দাশরথি রায় (৫) কবিওয়ালাদের গীতসংগ্রহ (৬) Golden Bough p 406 (৭) Oraon Religion and Customs p 348, 378-91 (৮) বায়ু ২৭ অ: ; মৎস্য ১৭১ অ: ; স্কন্দ-আবন্ত্য ২অ: (৯) লিঙ্গ ৭০ অ: ; বায়ু ১০ অ: ; ব্রহ্মাণ্ড ১৫ অ: ; বরাহ ২১ অ: (১০) বা. প্রা. পু. বি. ৩য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা ৩৪৮ নং (১১) The Modern Buddhism (১২) ঐ-ব্রহ্মাণ্ডভূগোলগীতা (১৩) নাথ সম্প্রদায় ('নাথ ও শৈব') (১৪) মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা : সা. প. গ্র. ৫৭ (১৫) স্কন্দ-কুমারিকা

৬২ অ: ; ঐ—প্রভাস ৩ অ: (অহং বীজধরঃ শ্রেষ্ঠত্বং তু ক্ষেত্র বরাননে) (১৬) বায়ু ৩০ অ: ; দেবী ২৭ অঃ (শিব 'অন্ন', দুর্গা 'ওষধি') (১৭) দ্বিজ বংশীর পদ্মাপুরাণ স. রামনাথ ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (১৮) বামণ ১, ২ অ: ; ব্রহ্ম ৩৮ অ: ; স্কন্দ—বিষ্ণু ৩২ অ: ; মনুসংহিতা ২.১৮৮ ইত্যাদি (১৯) শিবমঙ্গলকাব্য—নির্ঝরিণী সরকার (বেতার জগৎ ২৩।১৪শ সংখ্যা) (২০) The Oraons of Chhotonagpur pp 463-76 (২১) Annals of Rural Bengal App. 9 (২২) রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১ম ভূমিকা পৃ ॥৵০ (২৩) পটুয়াসংগীত ('চাষপালা' ও 'মাছধরা') ; তুলনীয় : 'অহং সো ধীবরো দেবি'—কৌলজ্ঞাননির্ণয় ১৬।১২ ; বৃহৎ তরজার লড়াই পৃ ৩১ ; বিশ্বভারতী পুঁথি নং ৯৩০, ৯৯৯ ; নকুণ্ডা পুঁথি : পল্লীশ্রী সংগ্রহ পুঁথি নং ১৮০ ; গুড়্যা পুঁথি : ঐ—নং ৯৪ (২৪) শিব-পূর্ব ৬ অ: (২৫) স্কন্দ-মাহেশ্বর ৮ অ: (২৬) Vedic Age p 163 (২৭) Golden Bough II p 118 (২৮) R. Fl. NI. pp 67, 89-91 (২৯) Ibid p 107 ; E. R. E. Vol 5 p 10 (৩০) The Chamars p 173 (৩১) The Discovery of Alcohol—V. Elwin (The Statesman 8.6.1952) (৩২) বিশ্বভারতী পুঁথি নং ৯২৭, ৯৩০ (৩৩) কালিকা ৪৪ অ: ; বরাহ ২২ অ: ; বামণ ২১; ৫১-৫৪ অ: ; স্কন্দ—বিষ্ণু ৯ অ: ; ঐ—মাহেশ্বর ২৩, ২৪ অ: (৩৪) R. Fl. NI. p 107, 108 (৩৫) J. A. S. B. 1934 NS XXX pp 29-31 (৩৬) Santhalia and the Santhals pp 54-56 (৩৭) Oraon Religion and Customs pp 193-227 (৩৮) প্রান্তবাসীর ঝুলি (দেশ ২১।৯ম সংখ্যা) (৩৯) কোচবিহারের ইতিহাস পৃ ৭০-৭২, ৮৭-৮৮ (৪০) পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ ('নীল পুজোর গান') (৪১) বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১ম ক. বি. ; আ. বা. প. ১৩. ৪. ৫২ (৪২) বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১ম ; বাংলার ব্রত। ব্যক্তিগত সংগ্রহ (৪৩) বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১ম (৪৪) Folk element in Hindu Cult p 85 ; বিশ্বভারতী পুঁথি নং ৯২৭ (৪৫) পটুয়াসংগীত (৪৬) শিবায়ন—রামেশ্বর পৃ ৯ ভূমিকা (৪৭) গোরক্ষবিজয় : ব. সা. প. সং. ; তুলনীয় : 'জনমে জনমে তোমার মহামায়া দাযি'—বিশ্বভারতী পুঁথি নং ৯৩০ (৪৮) বিশ্বভারতী সং ॥

অধ্যায়—চার : খ

(১) Evolution of Mother-Worship p 15 (২) Ibid p 14 (৩) লিঙ্গ ১০২, ১০৬ অ: ; ব্রহ্ম ৩৬ অ: ; শিব-উত্তর ১৭ অ: ; স্কন্দ-কুমারিকা ৬২ অ: (৪) স্কন্দ-প্রভাস ৩ অ: (৫) An Introduction to Tantric Buddhism p 108 (৬) জিজ্ঞাসা ৩০০-০১ (৭) মহানির্বাণ তন্ত্র ৪.১২ (৮) Shakti and Shakta Introductory ; Vaishnavism Saivism p 146 (৯) Influence of Islam p 156 (১০) The Religious System of the Parsis pp 8-14 ; Zoroastrianism—J. S. Taraporewala (C.H.I. II pp 332-39) (১১)

Ṛgvedic Culture p 78 (১২) Psychology of the Unconscious (Symbolism of Mother & Rebirth) (১৩) Ibid p 149 (১৪) E. R. E. vol 5 (১৫) Evolution of Marriage pp 43-44, 65-66 ; চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী ১ম পৃ ৬৫ (১৬) মানবসমাজ ১ম পৃ ১০৪ (১৭) The Mothers p 591 (১৮) E. R. E. vol 11 p 91 ; V. G. S. I. p 30 (১৯) বায়ু ৯, ৪১ অঃ ; বরাহ ২, ৩৩ অঃ ; লিঙ্গ ৪১ অঃ ; স্কন্দ-বস্ত্রাপথ ৯ অঃ ; ঐ—মাহেশ্বর ২৭ অঃ ; ঐ—প্রভাস ৩ অঃ ; ঐ—অরুণাচলমাহাত্ম্যম্ ২১ অঃ (২০) Psychology of the Unconscious p 96, 242, 261 (২১) Introduction to the Science of Mythology pp 73-74, 93 (২২) শিবদেহে দেবী ও দেবীদেহে শিবের প্রবেশ—শিব : পূর্ব ৫৮, ৬০ অঃ ; লিঙ্গ ১০৬ অঃ ; আনন্দভৈরব (২৩) কথাসরিৎসাগর (বিষ্ণু পার্বতীরূপে শিবদেহে লীন হন) (২৪) দুর্গামঙ্গল ; ভবানীমঙ্গল (২৫) Psychology of the Unconscious (Sacrifice) ॥

অধ্যায়—চার : গ

(১) ভারতবর্ষীয় বিবাহ : সমাজ পৃ ৫৬ (২) সাহিত্য পৃ ১৬০ (৩) গ্রাম্যসাহিত্য : লোকসাহিত্য (৪) বামণ ৬ অঃ ; শিব ২৬-২৮ অঃ ; কালিকা ১৭-১৯ অঃ (৫) দাশরথি রায়ের পাঁচালী (৬) বিজয় গুপ্ত (৭) বৃহৎ তরজার লড়াই পৃ ৬ (৮) শিব ১৩ অঃ ; মৎস্য ১৫৫, ১৭৯ অঃ ; বামণ ৬ অঃ ; স্কন্দ-অর্বুদ ৩৯ অঃ ; লিঙ্গ-পূর্ব ২৯ অঃ (৯) মধ্যযুগে বাঙ্গালা পৃ ৪৭১, ৪৭৪ (১০) তুলনীয় : গৌড়বহো-বাকপতি (কিরাতশবরদের উপাস্যা দেবীর উল্লেখ) (১১) তুঃ কোচনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান। শঙ্কর ভ্রমর তায় করে মধুপান—রামেশ্বর (১২) বিশ্বভারতী পুঁথি নং ৯৯৯ (১৩) দুর্গার ষোলসয় গতি (ধর্মপূজাবিধান) ; বলরাম-কানাইয়ের ষোলশত অনুচর (নারায়ণ দেব) ; রত্নসেনের ষোলশত সঙ্গী (পদ্মাবতী) ; শিবের ষোলশত সঙ্গিনী (সূর্যের গান) ইত্যাদি (১৪) বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১ম পৃ ১৩০ (১৫) চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী ১ম পৃ ৪৬ (১৬) শিবসঙ্গীত পৃ ১৬ (১৭) শিবদুর্গাসম্বাদ : বা. প্রা. পু. বি. ২।১ (১৮) বৃহদ্ধর্ম-মধ্য ৬ অঃ (১৯) শিব-পূর্ব ১২ অঃ (২০) মৎস্য ১৫৫ অঃ ; বামণ ৫৪ অঃ (২১) স্কন্দ-মাহেশ্বর ৩৪ অঃ (২২) ব. ভা. সা. পৃ ১১৬ ॥

অধ্যায় চার : ঘ

(১) India and Java : Bulletin No 5 (২) 'The Saivites neglected communicating their views through the vernacular and hence their literature is poor compared with that of the Vaishnavas' —Long's Catalogue (ব. ভা. সা. পৃ ১২৩) (৩) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ৮, ২ (৪) সাহিত্য পৃ ১৫৩ (৫) প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃ ২৪৭ (৬) শিবায়ন

—রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র ব. সা. প. (ডঃ সুকুমার সেনের মতে, কাব্যটি আরও পরবর্তী কালের রচনা : বা. সা. ই. পৃ ৬৫০) (৭) সত্যপীরের কথা—রামেশ্বর : ভূমিকা পৃ ॥৵০—॥৶০ (৮) কালিকা ২৯-৩০ অঃ ॥

অধ্যায়—পাঁচ

(১) The New York Daily Tribune. June 10.1853 (২) বর্তমান ভারত (৩) শিল্পায়ন পৃ ১৫ (৪) Bengali Literature in the 19th Century (৫) গ্রন্থাবলী : বসুমতী সং (৬) জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ৩য় সং পৃ ১৬০ (৭) বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় ১ম পৃ ১৫০-৫১ (৮) The Master as I saw Him p 167, 184 (৯) বর্তমান ভারত (১০) বন্দে মাতরম্ : ধর্ম ১৩১৬ মাঘ (১১) শিব : প্রবন্ধাবলী (১২) হিন্দু দেবদেবীর চিত্র : ঐ (১৩) পঁচিশে বৈশাখ—সৈঅদ মুজতবা আলী (দেশ ২৮শ সংখ্যা ১৩৫৯) (১৪) ত্রয়ী পৃ ২৩৬ (১৫) সৌন্দর্যবোধ : সাহিত্য (১৬) কুমারসম্ভব এবং কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা : প্রাচীন সাহিত্য (১৭) সুন্দর : শান্তিনিকেতন ২য় (১৮) তপোবন : ঐ (১৯) আদি ব্রহ্মসমাজ যন্ত্রে প্রকাশিত ১ম সং ১২৯৯ সাল (২০) কেতকী, শ্রাবণগাথা, শেষ বর্ষণ, বসন্ত, নবীন, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন (২১) যাত্রী ১৬ নং পত্র (২২) নারিকেল এবং হাসির পাথেয় : বনবাণী (২৩) সব পেয়েছির দেশে পৃ ৯৯-১০০ (২৪) রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (২৫) নতুন কাল : সেঁজুতি (২৬) ধাবমান : পরিশেষ (২৭) কলুষিত : বীথিকা (২৮) প্রান্তিক (২৯) বিপ্লব : সানাই (৩০) ধর্ম, মানুষের ধর্ম, আত্মপরিচয়, পথে ও পথের প্রান্তে, চিঠিপত্র, শান্তিনিকেতন, আমার ধর্ম, কালান্তর ইত্যাদি (৩১) ত্রয়ী পৃ ২৪৬ (৩২) বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ৩য় পৃ ২১১ (শৈব রবীন্দ্রনাথ) (৩৩) আনন্দরূপ : পথের সঞ্চয় (৩৪) আমেরিকার চিঠি : ঐ (৩৫) দুঃখ : ধর্ম (৩৬) দিন ও রাত্রি : ঐ (৩৭) প্রাচীন ভারতের এক : : ঐ (৩৮) আনন্দরূপ : ঐ (৩৯) গোবিন্দ-চয়নিকা (৪০) কাব্যকুসুমাঞ্জলি (৪১) যজ্ঞভস্ম (৪২) সনেট পঞ্চাশৎ (৪৩) রেণু (৪৪) শরৎসাহিত্যে শাশ্বত নারী ও পুরুষ : বাংলা সাহিত্যে নবযুগ (৪৫) কবি যতীন্দ্রনাথ পৃ ৫, ১১, ১৬ (৪৬) বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (৪৭) কবিতা ; অহল্যা ; শ্রেষ্ঠ কবিতা (৪৮) সমর সেনের কবিতা (৪৯) পদাতিক ; চিরকুট ; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা (৫০) ভারতবর্ষ ১৩৫৯ আষাঢ় (৫১) বিচিত্রা ১৩৩৯ কার্তিক (৫২) শিব : বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী ॥

গ্রন্থপঞ্জী

বৈদিক সাহিত্য

আনন্দাশ্রম (প্র): যজুর্বেদ। পুণা ১৮২৭ খ্রীঃ
ডঃ ম্যাক্স্‌মুলর (স): ঋগ্বেদ। লণ্ডন ১৮৫৪-৭৪ খ্রীঃ
হুইট্‌নী, ডব্ল্যু. ডি (স): অথর্ববেদ। হারভার্ড ওরিএণ্টাল সিরিজ

ব্রাহ্মণ-আরণ্যক

আপ্তে, নারায়ণ শাস্ত্রী (স): যাজ্ঞবল্ক্য ১৯৩০
এগ্‌লিঙ্, জে. (স): শতপথ ১৮৮২-১৯০০
ওয়েবর (স): বাজসনেয়। লণ্ডন ১৮৪৯
কীথ, এ. বি. (স): ঐতরেয়। কৌষিতকী। তৈত্তিরীয়। হারভার্ড ইউনিভারসিটি প্রেস
ক্যালাণ্ড, ডব্ল্যু (স): পঞ্চবিংশ।
সাতবলেকর (স): মৈত্রায়ণী। ১৯৯৮ বিক্রম সংবৎ

উপনিষদ

আনন্দাশ্রম (প্র): ছান্দোগ্য। পুণা
উপনিষৎ কার্যালয় (প্র): বৃহদারণ্যক ১৯৫১ সংবৎ
জ্যাকোল, জি. এ. (স): নীলরুদ্র
তত্ত্বভূষণ, পণ্ডিত সীতানাথ (স): ঈশ। কঠ। কেন। মুণ্ডক। শ্বেতাশ্বতর। কলকাতা ১৯০৪
বেদমন্দির (প্র): ঐতরেয় ১৩১৮ সাল। কৌষিতকী ১৩১৮। তৈত্তিরীয় ১৮০৫ শকাব্দ। ত্রিপুর ১৩২০। নাদবিন্দু ১৩১৮।
শাস্ত্রী, লক্ষ্মণ (স): কৈবল্য। নারায়ণ। বোম্বাই ১৯২৭

সূত্র

গাইকোআড় ওরিএণ্টাল সিরিজ (প্র): মানব গৃহ্যসূত্র। বরোদা
সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইষ্ট (প্র): আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র। পারস্কর গৃহ্যসূত্র। সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র। ২৯শ খণ্ড। লণ্ডন ১৮৮৬।

পুরাণ

আনন্দাশ্রম (প্র): অগ্নি ১৮৪২। পদ্ম ১৮৯৪। মৎস্য ১৯০৭। বায়ু ১৯০৫। ব্রহ্ম ১৮৯৫। ব্রহ্মবৈবর্ত। সৌর ১৯২৪। পুণা।

তর্করত্ন, পণ্ডিত পঞ্চানন (স) : বৃহদ্ধর্ম। বৃহৎ-নারদীয়। স্কন্দ। কলকাতা।
বঙ্গবাসী (প্র) : কালিকা ১৩১৬ সাল। গরুড় ১৩৩৮। দেবী। ব্রহ্মাণ্ড ১৩১৫। শিব ১৩১৪। কলকাতা।
বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত জীবানন্দ (স) : বিষ্ণু। কলকাতা ১৮৮২
বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ : বরাহ। এ. এস. বি
বেঙ্কটেশ্বর প্রেস (প্র) : লিঙ্গ। বোম্বাই ১৯২৪
ব্রীজ, কে. ডি. (স) : নীলমত ১৯৩৬
শাস্ত্রী, লক্ষ্মণ (স) : ভবিষ্যৎ ১৮৯৩। মহাভাগবত। মার্কণ্ডেয় ১৮৪৬। বামণ ১৮০৮। বোম্বাই।

সাহিত্য

অশ্বঘোষ : বুদ্ধচরিত। অকস্‌ফোর্ড ১৮৯৩
কালিদাস : কুমারসম্ভবম্। মেঘদূতম্। বসুমতী সং।
দণ্ডী : দশকুমারচরিত। বোম্বাই ১৮৮৩
বাকপতি : গৌড়বহো। ২য় সং। পুণা ১৯২৭
বাণভট্ট : কাদম্বরী। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর অনূদিত।
বাল্মীকি : অদ্ভুত রামায়ণম্। বাল্মীকি কার্যালয়। ৩য় সং। ১২৯৫ সাল :
ঐ : রামায়ণ। বসুমতী সং। ১৩১৭ সাল
বিষ্ণুশর্মা : হিতোপদেশ। কলকাতা ১৯০৭
বেদব্যাস : মহাভারত। বসুমতী সং ও কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ
শূদ্রক : মৃচ্ছকটিকম্। বোম্বাই ১৮৯০
শ্রীহর্ষ : নৈষধচরিত। পাঞ্জাব ওরিএণ্টাল সিরিজ। লাহোর ১৯২৩
সাতবাহন : গাথাসপ্তশতী। বোম্বাই ১৯৩৩
সোমদেব : কথাসরিৎসাগর। বোম্বাই ১৯৩০
হাল : গাথাসত্তসঈ। স এম. এস. শাস্ত্রী

শাস্ত্রগ্রন্থ

আনন্দগিরি : শংকরবিজয়ঃ। (স) নবদ্বীপ গোস্বামী ১৮৬৮

আভেলন, আর্থার (স) : মহিম্নস্তবঃ। লণ্ডন ১৯১৭
তর্করত্ন, পণ্ডিত প্রমথ (স) : মনুস্মৃতি। কলকাতা ১৯২০
পুরাণ কার্যালয় (প্র) : শিবসংহিতা। কলকাতা ১২৯৮ সাল
বাৎস্যায়ন : কামসূত্রম্। ওরিএণ্টাল এজেন্সী। কলকাতা
বেদান্ত প্রেস (প্র) : শিব-উপনিষৎ। কলকাতা ১২৯৬ সাল
ভরত : নাট্যশাস্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ
শাস্ত্রী, আর. এ. (স) : শিবসহস্রনামস্তোত্রঃ। মাদ্রাজ ১৯০২
সরকার, বিহারীলাল (স) : শিবতাণ্ডবস্তোত্রম্ ১৩৪২ সাল
সায়নাচার্য : শংকরবিজয়ম্। (স) শ্রীনাথো মিশ্র ১২৯০ সাল।

তন্ত্র

আভেলন, আর্থার (স) : কুলার্ণব। প্রপঞ্চসার। শারদাতিলক।
কবিরত্ন, প্রসন্নকুমার (স) : গোরক্ষ সংহিতা ১৮১৩ শকাব্দ
চট্টোপাধ্যায় রসিকমোহন (স) : রুদ্রযামল
তর্করত্ন, পণ্ডিত পঞ্চানন (স) : তন্ত্রসার। মহানির্বাণ
বসুমতী সাহিত্য মন্দির : হঠযোগপ্রদীপিকা
বাগচি, ডঃ প্রবোধচন্দ্র (স) : কৌলজ্ঞাননির্ণয়
বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র (স) কৌলমার্গরহস্য
ভট্টাচার্য, ডঃ বিনয়তোষ (স) : সাধনমালা (১ম, ২য় খণ্ড)। সৌন্দর্য-লহরী। বরোদা ১৯২৮

সংকলন

আচার্য গোবর্ধন : আর্যাসপ্তশতী। বিনয়সাগর প্রেস
এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (প্র) : কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ঃ। প্রাকৃতপৈঙ্গল। সৎপদ্যরত্নাবলী। সদুক্তিকর্ণামৃত। কলকাতা।

বাংলা কাব্য। আদি ও মধ্যযুগ

অজ্ঞাত : সেখ শুভোদয়া। (স) ডঃ সুকুমার সেন ১৯২৭
ঈশাননাগর : অদ্বৈতপ্রকাশ। নূতন সং। (স) সতীশচন্দ্র মিত্র ১৩৩৩ সন।
কমলাকান্ত : সাধকরঞ্জন। ব. সা. প. ১৩৩২ সন
কাশীরাম দাস : মহাভারত। (স) ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। ১২শ মুদ্রণ ১৯০৮

কৃত্তিবাস ওঝা : রামায়ণ। ৩য় সং। অক্ষয় লাইব্রেরী ১৩৫৪ সন

ঐ : ঐ (অযোধ্যাকাণ্ড)। ব. সা. প. ১৩০৭ সন

কৃষ্ণ দাস : শ্রীকৃষ্ণবিলাস। ব. সা. প. ১৩২৬ সন

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত। (স) রাধানাথ কাবাসী ১৩৪৫ সন

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসার ভাসান। ৩য় সং। ব. সা. প. ১৩১১

ঐ : ঐ। (স) কুশদেব পাল। কলকাতা ১৭৯১ শক

ঐ : ঐ। (প্র) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পরিবর্ধিত ২য় সং ১৯৪৯

ঘনরাম চক্রবর্তী : ধর্মমঙ্গল। বঙ্গবাসী সং

ঐ : ঐ। (স) চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ। শিলচর ১৩১৯ সন

জয়দেব গোস্বামী : গীতগোবিন্দম্। (স) বাণেশ্বর ঘোষাল ১৩২৯ সন

জয়ানন্দ : চৈতন্যমঙ্গল। ব. সা. প. ১৩১২ সন

দাশরথি রায় : পাঁচালী। বেণীমাধব দে অ্যাণ্ড কোং ১২৯৬ সন

দীন শরৎ : বাউল গান। কলকাতা ১৩৪১ সন

দুঃখী শ্যামদাস : গোবিন্দমঙ্গল। ২য় সং। বঙ্গবাসী সং ১৩১৭ সন

দুর্লভ মল্লিক : গোবিন্দচন্দ্র গীত। (স) শিবচন্দ্র শীল ১৩০৮ সন

দ্বিজ কমললোচন : চণ্ডিকাবিজয়। রংপুর সাহিত্য পরিষদ

দ্বিজ মাধব : মঙ্গলচণ্ডীর গীত। ১ম সং। ক. বি.

ঐ : শ্রীমদ্ভাগবতসার। কলকাতা

দ্বিজ রতিদেব : মৃগলব্ধ। ব. সা. প. ১৩২২ সন

„ রামচন্দ্র : দুর্গামঙ্গল। মেটকাফ প্রেস ১৩০৫ সন কলকাতা

„ রামভদ্র : সত্যনারায়ণ ব্রতকথা। কলকাতা

„ বংশী : পদ্মাপুরাণ। (স) রামনাথ ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ১৩১৮ সন কলকাতা

ঐ : ঐ। (স) পূর্ণচন্দ্র সিংহ ১৯০৪ ঢাকা

ঐ : ঐ। ৩য় সং। (স) পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ঢাকা

নরহরি দাস : নরোত্তমবিলাস। অধরচন্দ্র চক্রবর্তী প্রকাশিত ১৩৩১ সন

ঐ : ভক্তিরত্নাকর। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা ১৩১৯ সন বহরমপুর

নারায়ণ দেব : পদ্মাপুরাণ। ক. বি. ১৯৪৭

নিত্যানন্দ দাস : প্রেমবিলাস। যশোদাদুলাল তালুকদার (প্র) ১৩২০ সন

ভবানীপ্রসাদ রায় :	দুর্গামঙ্গল। ব. সা. প. ১৩২১ সন
ভবানী দাস :	মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা। ব. সা. প. চট্টগ্রাম
ঐ :	ময়নামতীর গান। ঢাকা সাহিত্য পরিষদ ১৩২১ সন
ঐ :	গোপীচন্দ্রের গান (১ম, ২য়)। ক. বি. ১৯২২, '২৪
ভারতচন্দ্র রায় :	অন্নদামঙ্গল। ব. সা. প.
ঐ :	ঐ। বসুমতী সং
ভীম সেন :	গোর্খবিজয়। (স) পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী
ভোলানাথ প্রামাণিক :	শ্রীশ্রীশিবমঙ্গল। শান্তিপুর ১৩৪৪ সন
	শ্রীধর্মপুরাণ। ব. সা. প. ১৩৩৭ সন
মাণিক গাঙ্গুলী :	ধর্মমঙ্গল। ব. সা. প.
মাধবাচার্য :	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। বঙ্গবাসী ১৩১০ সন
মালাধর বসু :	শ্রীকৃষ্ণবিজয়। ক. বি.
ঐ :	ঐ। বৈষ্ণব পর্জিটরী। কলকাতা
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী :	চণ্ডীমঙ্গল। ক. বি. ১৯২৪
মুক্তারাম সেন :	সারদামঙ্গল। ব. সা. প. ১৩২৪ সন
রঘুনাথ ভাগবতাচার্য :	শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। বঙ্গবাসী ১৩১৭ সন
রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র :	শিবায়ন। ব. সা. প. ১৩৬৩ সন
রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার :	হরপার্বতীমঙ্গল। কলকাতা ১২০৮ সন
রামদাস আদক :	অনাদিমঙ্গল। ব. সা. প. ১৩৪৫ সন
রামনারায়ণ :	ভবানীমঙ্গল। (স) অজয় কুমার চক্রবর্তী ১৩৫৭ সন ধুবড়ি
রামপ্রসাদ সেন :	কালীকীর্তন। বসুমতী সং
ঐ :	বিদ্যাসুন্দর। ঐ
রামরাজা :	মৃগলুব্ধ সংবাদ। ব. সা. প. ১৩২২ সন
রামলোচন দাস :	শ্রীকল্কিপুরাণ। ব. সা. প. ১৩২০ সন
রামাই পণ্ডিত :	ধর্মপূজাবিধান। ব. সা. প. ১৩২৩ সন
ঐ :	শূন্যপুরাণ। ব. সা. প. ১৩১৪ সন
ঐ :	ঐ। বসুমতী সং ১৩০৬ সন
রামেশ্বর ভট্টাচার্য :	শিবায়ন। ২য় সং। বঙ্গবাসী ১৩১০ সন
ঐ :	সত্যনারায়ণ পাঁচালী। পুরোহিতদর্পণ-ধৃত
ঐ :	সত্যপীরের কথা। (স) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রূপরাম :	ধর্মমঙ্গল (১ম খণ্ড)। বর্ধমান সাহিত্যসভা ১৩৫১

লোচনদাস ঠাকুর : চৈতন্যমঙ্গল। বঙ্গবাসী ১৩০৮ সন
বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ৩য় সং। ব. সা. প.
বলরাম কবিশেখর : কালিকামঙ্গল। ব. সা. প. ১৩৩৭ সন
বিজয় গুপ্ত : মনসামঙ্গল। ২য় সং। বাণীনিকেতন, বরিশাল
বিজয় পণ্ডিত : মহাভারত। ব. সা. প.
বিজয়রাম সেন : তীর্থমঙ্গল। ব. সা. প. ১৩২২ সন
বিদ্যাপতি : কীর্তিলতা। (স) ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৩১ সন
ঐ : পদাবলী। ২য় সং। ক. বি. ১৩৪৮ সন
বৃন্দাবন দাস : চৈতন্যভাগবত। ২য় সং। (স) শিশির কুমার ঘোষ
শ্যামদাস সেন : মীনচেতন। ঢাকা সাহিত্য পরিষদ ১৩২২ সন
শ্রীকর নন্দী : মহাভারত (অশ্বমেধ)। ব. সা. প.
সন্ধ্যাকর নন্দী : রামচরিতমানস। (স) ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
শুকুর মামুদ : গোপীচাঁদের সন্ন্যাস। চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ
সেখ ফয়জুল্লা : গোরক্ষবিজয়। ব. সা. প. ১৩২৪ সন
সৈঅদ আলাওল : পদ্মাবতি। চট্টগ্রাম ১৩১৭ সন

সংকলন

অমরেন্দ্রনাথ রায় (স) : শাক্ত পদাবলী। ক. বি. ১৯৪৭
আবদুল কাদের ও রেজাউল করীম (স) : কাব্যমালঞ্চ। ১৯৪৫
কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (স) : শিবসংগীত। অধরচন্দ্র চক্রবর্তী ১৩৩২ সন
গুরুসদয় দত্ত (স) : পটুয়া সংগীত। ক. বি. ১৯৩৯
চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী (স) : বাইশ কবি মনসা। কলকাতা ১৩১৮ সন
জে.জি. চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড কোং (প্র) : কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ। কলকাতা ১৮৬২
ডায়মণ্ড লাইব্রেরী (প্র) : তারকেশ্বর মাহাত্ম্য। কলকাতা
তিনকড়ি বিশ্বাস (প্র) : বৃহৎ তরজার লড়াই। কলকাতা ১৩১৩ সন
দিননাথ ঘোষ ও আশুতোষ ঘোষ (প্র) : শ্রীশ্রীঝাড়েশ্বর মাহাত্ম্যম্। মেদিনীপুর ১৯১৪

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১ম, ২য় খণ্ড)। ক. বি. ১৯১৪

দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : শিবাখ্যাকিঙ্কর কাব্য। জন্মভূমি প্রেস ১৩১৯ সন

নবীনচন্দ্র বিশ্বাস : বাইশ কবি মনসা। চট্টগ্রাম ১৩০১ সন

পরমেশপ্রসন্ন রায় : মেয়েলী ব্রত ও কথা। গুরুদাস চট্টোঃ ১৩১৫ সন

মণীন্দ্রমোহন বসু : সহজিয়া সাহিত্য। ক. বি. ১৯৩২

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ [১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ; ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা ৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যা ; ৩য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা]

শশিভূষণ কবিরত্ন : মেয়েদের ব্রতকথা। কলকাতা

সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ব্রতদর্পণ। কলকাতা ১৩০৬ সন

ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (স) : বৌদ্ধ গান ও দোহা। ২য় মুদ্রণ। ব. সা. প. ১৩৫৮ সন

বাংলা কাব্যসাহিত্য। আধুনিক যুগ

অমিয় চক্রবর্তী : পারাপার

অক্ষয়কুমার বড়াল : প্রদীপ। কনকাঞ্জলি। শঙ্খ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : গ্রন্থাবলী। বসুমতী সং

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : শতনরী

কালিদাস রায় : আহরণ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক : শ্রেষ্ঠ কবিতা

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। গ্রন্থাবলী

গোবিন্দ দাস : গোবিন্দ চয়নিকা

জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি

দিনেশ দাস : অহল্যা। কবিতা ১৩৪৩-৪৮। * শ্রেষ্ঠ কবিতা

দেবেন্দ্রনাথ সেন : শ্যামামঙ্গল

নজরুল ইসলাম : অগ্নিবীণা। দোলনচাঁপা। বিষের বাঁশি। সঞ্চিতা

প্রমথ চৌধুরী : সনেট পঞ্চাশৎ

প্রিয়ম্বদা দেবী : রেণু

প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রথমা। ফেরারী ফৌজ। সম্রাট। * সাগর থেকে ফেরা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার :	যজ্ঞভস্ম
বিষ্ণু দে :	অন্বিষ্ট। * আলেখ্য। নাম রেখেছি কোমল গান্ধার। সাত ভাই চম্পা
বিহারীলাল চক্রবর্তী :	সাধের আসন। সারদামঙ্গল
বুদ্ধদেব বসু :	নতুন পাতা। বন্দীর বন্দনা। শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর
মধুসূদন দত্ত :	চতুর্দশপদী কবিতাবলী। মেঘনাদবধ কাব্য।
মানকুমারী বসু :	ক
মোহিতলাল মজুমদার :	বিস্মরণী। স্মরগরল। হেমন্তগোধূলি
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত :	অনুপূর্বা। ত্রিযামা। মরীচিকা। মরুশিখা। সায়ম্
যতীন্দ্রমোহন বাগচি :	* কাব্যমালঞ্চ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :	আরোগ্য। উৎসর্গ। কথা ও কাহিনী। কল্পনা। কড়ি ও কোমল। খেয়া। গীতাঞ্জলি। গীতিমাল্য। চিত্রা। জন্মদিনে। নবজাতক। নৈবেদ্য। পত্রপুট। পরিশেষ। পুনশ্চ। পূরবী। প্রভাত সংগীত। প্রহাসিনী। প্রান্তিক। বনবাণী। বলাকা। বিচিত্রিতা। বীথিকা। মহুয়া। মানসী। রোগশয্যায়। শিশু ভোলানাথ। শেষ সপ্তক। শৈশব সংগীত। সানাই। সেঁজুতি। সোনার তরী॥ গোরা। ঘরে বাইরে। যোগাযোগ। শেষের কবিতা॥ অচলায়তন। ডাকঘর। তপতী। ফাল্গুনী। বাঁশরী। বিসর্জন। মুক্তধারা। রক্তকরবী। রাজা। রাজা ও রাণী। শারদোৎসব॥ চণ্ডালিকা। চিত্রাঙ্গদা। শাপমোচন। শ্যামা॥ কেতকী। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। নবীন। বসন্ত। শেষ বর্ষণ। শ্রাবণগাথা॥

	আত্মপরিচয়। কালান্তর। চিঠিপত্র। ধর্ম। পথে ও পথের প্রান্তে। পথের সঞ্চয়। প্রাচীন সাহিত্য। বিচিত্র প্রবন্ধ। ভানুসিংহের পত্রাবলী। মানুষের ধর্ম। যাত্রী। লোকসাহিত্য। শান্তিনিকেতন। সঞ্চয়। সমাজ। সাহিত্য। স্বদেশ ॥
	কালের যাত্রা। লিপিকা ॥
	গীতবিতান ॥
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত :	কুহু ও কেকা। তীর্থরেণু। বিদায় আরতি
সমর সেন :	* সমর সেনের কবিতা
সরলাবালা সরকার :	* অর্ঘ্য
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত :	অর্কেস্ট্রা। সংবর্ত
সুভাষ মুখোপাধ্যায় :	চিরকুট। পদাতিক। * সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :	দশমহাবিদ্যা। বৃত্রসংহার

আলোচনা গ্রন্থ। বাংলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর :	বাংলার ব্রত। বিশ্বভারতী ১৩৫০ সন
ঐ :	শিল্পায়ন। সিগনেট প্রেস ১৩৬১ সন
অমূল্য বিদ্যাভূষণ :	সরস্বতী। কলকাতা ১৩৪০ সন
অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ :	শিবার্চনতত্ত্ব। ব্রাহ্মণরক্ষাসভা ১৩২৯ সন
অক্ষয়কুমার দত্ত :	ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২য় ভাগ)। ১২৮৯ সন
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় :	গৌড়লেখমালা। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি। ১৩১৯ সন
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ :	আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য। গুরুদাস চট্টো: ১৯৩৫
আবুল হাসানাৎ :	মাতৃমঙ্গল। ঢাকা ১৩৫৪
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য :	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। ২য় ও ৩য় সং কলকাতা
ঐ :	বাংলার লোকসাহিত্য। কলকাতা ১৯৫৪
উপেন্দ্রকুমার দাস :	ভক্ত কবীর। কলকাতা ১৯৫৫
ডঃ কল্যাণী মল্লিক :	নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী। ক. বি. ১৯৫০

কালিদাস রায় : বঙ্গসাহিত্যপরিচয় (১ম, ৩য় খণ্ড)। ১৩৫৬ সন
ঐ : প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য (২য় খণ্ড)। ১৩৪৯ সন।
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : মধ্যযুগে-বাঙ্গালা ১৩৩০ সন
কালীপ্রসন্ন সিংহ : মহাভারত (অনুবাদ) ১ম সং
ঐ : হুতোম প্যাঁচার নক্সা। নূতন সং। ব. সা. প. ১৩৫৫ সন
কালীপ্রসাদ চৌধুরী : শিবলিঙ্গপূজনবিধি। কলকাতা ১৮০৪
কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী : প্রাগৈতিহাসিক মোহেন জো দড়ো। ক. বি. ১৯৩৬
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী (১ম খণ্ড) ক. বি. ১৯২৫
চিত্তরঞ্জন দেব : পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ। ১ম সং
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী : শাক্ত পদাবলী ও শাক্ত সাধনা। কলকাতা ১৩৬৩ সন
ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত : প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম সং। ক. বি.
ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ষষ্ঠ সং
ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস। ১ম সং
প্রবোধচন্দ্র সেন : বাংলার ইতিহাস সাধনা। কলকাতা ১৩৬০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী (১ম—৪র্থ খণ্ড) ১ম সং
প্রমথ চৌধুরী : বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ক. বি. ১৯৪৪
ভগবতীচরণ শর্মা : কোচবিহারের ইতিহাস। কোচবিহার ১২৮৯ সন
ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়) ১ম সং
ডঃ মদনমোহন গোস্বামী : রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। ১ম সং
ডঃ মনমোহন ঘোষ : বাংলা সাহিত্য। ১ম সং
ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : পূজাপার্বণ। ১ম সং
রজনীকান্ত চক্রবর্তী : গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড)। মালদহ ১৯০৯

রমাপ্রসাদ চন্দ : গৌড়রাজমালা। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ১৩১৯ সন

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস।.২য় সং ১৩৫৬ সন

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড) ৩য় সং

রাজকুমার বেদতীর্থ : তারকেশ্বর তথ্য। কলকাতা ১৩১৬ সন

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : নানা প্রবন্ধ। ৩য় সং। ১৯০৪

রাজনারায়ণ বসু : বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা। ১৯৩৫

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ : * গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (১ম পর্ব প্রথমাংশ)। ১৩৬৩ সন

রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ৩য় সং। ১৩১৭ সন

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : জিজ্ঞাসা। ১৩২৭ সন

রাহুল সাংকৃত্যায়ন : মানবসমাজ। পুঁথিঘর ১৩৫২ সন

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রন্থাবলী। ব. সা. প.

বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মা : শিবের বুকে শ্যামা কেন। উপনিষদ রহস্য কার্যালয় ১৩২৩ সন

বিনয় ঘোষ : * পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। ১৯৫৭

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : বৈদিক দেবতা। বিশ্বভারতী ১৩৫৭ সন

বুদ্ধদেব বসু : উত্তরতিরিশ। কালের পুতুল। সব পেয়েছির দেশে। কবিতা ভবন

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : কবি যতীন্দ্রনাথ। ১ম সং

ঐ : ত্রয়ী। ১ম সং

ঐ : ভারতীয় সাধনার ঐক্য। বিশ্বভারতী ১৩৫২ সন

ঐ : বাংলা সাহিত্যের নবযুগ। ৩য় সং

ঐ : শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ। ১ম প্রকাশ

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ। ১ম সং

সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য : শ্রীশ্রীশিবপূজা ও শিবরাত্রি। শিববাড়ী, নেত্রকোণা

সমরেন্দ্রনাথ সেন : *বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম খণ্ড)। কলকাতা ১৩৬২ সন

সারদাচরণ শাস্ত্রী : শ্রীশ্রীশিবপূজাবিধি। রাহুল চতুষ্পাঠী ১৩২২ সন

ডঃ সুকুমার সেন : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ১৯৪০
ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত : আমাদের পরিচয়। ১৯৪১
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। ৩য় সং
ঐ : ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা। বিশ্বভারতী ১৩৫৬ সন
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : রাগ ও রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম। দার্জিলিং
স্বামী বিবেকানন্দ : বর্তমান ভারত। বেলুড় ১৩৪৮ সন
হরিদাস পালিত : আদ্যের গম্ভীরা। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি ১৩১৯ সন
ক্ষিতিমোহন সেন : বাংলার সাধনা। বিশ্বভারতী ১৩৫২ সন
ঐ : হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ। বিশ্বভারতী ১৩৫৪ সন

কোষ-গ্রন্থ

গুপ্ত প্রেস : পঞ্জিকা। ১৩৬০ সন
প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু (স) : বিশ্বকোষ (১৬শ, ১৮শ, ২০শ, ২২শ ভাগ) ১ম সং
পি এম বাগচি অ্যাণ্ড কোং : পঞ্জিকা। ১৩৬০ সন
সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পুরোহিত দর্পণ। ২৪শ সং কলকাতা ১৩৩৭
সুবলচন্দ্র মিত্র : বাঙলা ভাষার অভিধান।

আলোচনাগ্রন্থ। ইংরাজী

Adam, Leonhard : Primitive art. Pelican 1954
Apte, V.M. : Social and Religious life in the Grihya Sutras. Bombay 1954
Avalon, Arthur : Principles of Tantra (vol I, II) London 1914
Bains, A : Ethnography (Castes & Tribes) Strassburg 1912
Banerjee, R.D. : The Origin of the Bengali Script. C.U. 1919
Bhandarkar, Dr. R. G. : Vaishnavism S'aivism etc. Strassburg 1913

Bhattacharya, Dr. Ashutosh : Early Bengali Saiva Poetry 1st. ed 1951

„ Dr. Benoytosh : The Indian Buddhist Iconography Oxford University Press 1924

„ Haridas : The Foundation of Living Faiths vol I, 1st ed

Bompus, C : Folklore of the Santhal Parganas

Bose, M.M. : Post-Chaitanya Sahajiya Cult. C. U. 1930

Breasted, J.H. : Development of Religion and Thought in ancient Egypt. London 1912

Briffault, R. : The Mothers. New York 1927

Briggs, S.W. : The Chamars. O.U. Press 1920

Caudwell, C. : Illusion and Reality. Reprint 1956

Do : Studies in a dieing Culture Part I 1st. ed

Chakraburty, Chandra : Ancient Races and Myths. Cal.

Chatterjee, Dr. B. L. : India and Java, Greater India Society Bulletin No 5 2nd. ed 1933

Coomerswami, A. : The Dance of Shiva 1st. ed Bombay

Crooke. W. : Popular Religion and Folklore of North India 1896

Do : Religion and Folklore of North India 1926

Dalton, E.T. : Descriptive Ethnology of Bengal Calcutta 1872

Das, Dr. A. C. : Ṛgvedic Culture. Calcutta 1925

Das Gupta, Dr. S.B. : An Introduction to Tantric Buddhism 1st. ed. C.U.

Do : Evolution of Mother-Worship in India (Aspects of Indian Religious Thought)

Do : Obscure Religious Cults C.U.1946

De, Dr. S. K. : Bengali Literature in the 19th Century C.U. 1919

Eliot, Charles : Hinduism and Buddhism. London 1921

Elwin, Verrier : The Muria and their Ghatul

Frazer, J. G. : Creation and Evolution in Primitive Cosmogonies. London 1935

Do : Folklore in the Old Testament (abridged) London 1923

Do : Golden Bough (vol I-XII) 3rd.ed London ; abridged ed. London 1949

Do : Totemism and Exogamy (vol. I-IV) London

Freud, Sigmund : Introductory Lectures on Psycho-analysis 2nd ed. 5th. impression London 1936

Do : Totem and Taboo. Penguin

Gordon Childe, V. : The most ancient Egypt (Reprinted) London 1929

Goswami, K. G. : Excavation at Bangarh C.U. 1948

Harrison, Jane : Ancient Art and Ritual London 1913

Havell, E. B. : A Study of Indo-Aryan Civilization. London 1915

Do : Indian Sculpture and Painting London 1908

Hitty, P. K. : History of the Arabs 5th. ed. London 1954

Hodgson, H. H. : Essays on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes. Calcutta 1847

Hunter, W. W. : The Annals of Rural Bengal London 1872

Jastrow, M. :	The Civilization of Babylonia and Assyria. London 1915
Jevons, F. B. :	Comparative Religion. Cambridge University Press 1913
Jung, C. G. :	Introduction to Science of Mythology 1951
Do :	Psychology of the Unconscious London 1946
Keith, A. B. :	Religion and the Mythology of the Veda and the Upanishads. H. U. Series 1925
Kern, Dr. :	Manual of Buddhism
Lenin, V.I. :	On Art and Literature
Letourneau, C.F.	Evolution of Marriage. New York 1891
Macdonell, A.A. :	Vedic Mythology. Strassburg 1897
Mackenjie, D. :	Egyptian Myth and Legend. London 1st. ed
Do :	Myths and Legends of Babylonia and Assyria. London 1st. ed
Man, E. G. :	Santhalia and the Santhals
Marshall, John :	Mohen-jo-Daro and Indus Valley Civilization (vols I, II) London 1938
Mazumder, N. G.	Inscriptions of Bengal (vol III) V. A. Samity
Modi, J.J. :	The Religious System of the Parsis. Bombay 1903
Monier, Williams :	Religious Thought and Life in India 1883
Morgan, H. L. :	Ancient Society 1877
Oppert, G. :	The Original inhabitants of India. Leipzic 1893
Patil, D.R. :	Cultural History from the Vayu Purana, Poona 1946

Payne, E. A. : The Saktas 1933
Rao, T.A. G. : Elements of Hindu Iconography Madras 1914
Read, Herbert : The meaning of art/Pelican 1951
Rhys Davids, T. W. : Buddhist India. London 1903
Risley. H.H. : Tribes and Castes of Bengal 1891
Roy, S. C. : The Hill Bhuiyas of Orissa Ranchi 1935
Do : The Oraons of Chhotonagpur 1915
Do : The Oraon Religion and Customs 1928
Roy Choudhury, Dr. T. K. : Bengal under Akbar and Aurangzib 1st. ed
Sarkar, B. K. : Folk elements in Hindu Cult London 1917
Satyananda, Swami : The Origin of the Cross Cal. 1923
Sen, Dr. D.C. : History of the Bengali Language and Literature. C.U. 1st. ed
Shakespeare, J. : The Lushei Kuki Clans. London 1912
Shastri, Dr. Shama : Evolution in Indian Polity
Shushtery, A.M.A. : Outlines of Islamic Culture Bangalore 1938
Sister Nivedita : Siva and Buddha 2nd. ed Udbodhan 1946
Do : The Master as I saw Him 6th ed Udbodhan 1948
Roychoudhury, H.C.etc : An Advanced History of India
Tarachand, Dr. : Influence of Islam in Indian Culture. Allahabad 1946
Tilak, Lokamanya B. G. : The Orion/Poona 1916
Vasu, N. N. : The Modern Buddhism/ Calcutta 1911
Vivekananda, Swami : Letters/3rd ed/Advaita Ashram 1944

Wheeler, Mortimer : The Indus Civilisation/Camb. U. Press 1953

Whitehead, H. : The Village Gods of South India/Oxford 1921

Woodroff, John : Shakti and Shakta/2nd ed 1920

কোষ-গ্রন্থ

Census Report of West Bengal : 1951

Encyclopaedia Britannica : Vol 18

Encyclopaedia of Islam : Vols 1, 4

Encyclopaedia of Religion and Ethics : Vols 1, 5, 9, 10, 11

History of Bengal : Vols I, II/Dacca University

Hymns of the Tamil Saivite Saints : O. U. Press 1921

Indian Census Report : 1951

Jewish Encyclopaedia : Vol 2

The Age of Imperial Unity : Bharatiya Vidya Bhabana

The Cultural Heritage of India : Vols I, II

The Great Temples : C. L. Society/Madras 1894

The Vedic Age : Bharatiya Vidya Bhabana

শাস্ত্র-গ্রন্থ

কোর্-আন্-শরীফ্

The Old Testament

হিন্দী গ্রন্থ

ডঃ যদুবংশী : শৈবধর্ম। বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ পাটনা ১৯৫৫

পত্র-পত্রিকা

Advance : 5. 8. 1936

Calcutta Review ; March, April 1934/ November 1955

J. A. S. B. : Vol Lxx pt I 1901/N. S.Vol xxx 1934/Vol II 1936/Vol VIII 1942

Man in India : Vol II 1922/Vol XI 1931

N. I. Antiquary : Vol I 1936

The Statesman : 17. 4. 52/8. 6. 52
অগ্রণী : শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬২
আনন্দবাজার পত্রিকা : ৩১. ১২. ১৩৫৮
গাঙ্গেয় : বঙ্গসংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৬২ ও ১৩৬৩
দেশ : ৩০. ১২. ১৩৫৮।২৫. ১. ১৩৫৯। ১৮. ৯. ১৩৬০। ১. ২. ১৩৬১
ধর্ম : মাঘ ১৩১৬
প্রবাসী : কার্ত্তিক ১৩৪৪। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯। আষাঢ় ১৩৫৯
ভারতবর্ষ : শ্রাবণ ১৩৫৬। আশ্বিন ১৩৫৬। অগ্রহায়ণ ১৩৫৭। বৈশাখ ১৩৫৮। আষাঢ় ১৩৫৯
যুগান্তর : ২২.৮.৫৩। ২৯.৮.৫৩। ২৪.১০.৫৩। ১৬. ১. ৫৪
বসুমতী : চৈত্র ১৩৫৭। ভাদ্র ১৩৬০
বিচিত্রা : কার্ত্তিক ১৩৩৯
বিশ্বভারতী : ১২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
বেতারজগৎ : ২৩শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা
সন্দীপন : কার্ত্তিক ১৩৫৯
সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা : ৫৮শ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

অমুদ্রিত পুঁথি

[বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার। বাংলা পুঁথি বিভাগ। তপনমোহন সংগ্রহ]
কৃষ্ণদাস : শিবায়ন। পুঁথি নং ৯৩০
ঐ : ঐ। ,, ,, ৯৯৯
দ্বিজ রাজ : শিবরাত্রি ব্রতকথা ,, ১৫৮
নরসিংহদাস : শিবপুরাণ। ,, ,, ২৬৩
বিনয় লক্ষ্মণ : শিবায়ন। ,, ,, ৯২৭
[পল্লীশ্রী সংগ্রহ। অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল। বিশ্বভারতী]
গুচুড়্যা পুঁথি। পুঁথি নং ৯৪ } চাষপালার সুবিস্তৃত বর্ণনা
নকুণ্ডা পুঁথি। ,, ,, ১৮০ }

শব্দ-সূচী